মুসলমানদের উত্থান ও পতন

মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী

মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী

মুসলমানদের উত্থান ও পতন

মাওলানা খুরশিদ উদ্দীন

অনুদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

মুসলমানদের উত্থান ও পতন
মূল : মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী
অনুঃ মাওলানা খুরশীদ উদ্দীন

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন : ৭৬
ইফাবা প্রকাশনা : ১৬১৭
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.০৯

প্রকাশকাল
১৩৯৬ আশ্বিন
১৪১০ সফর
১৯৮৯ সেপ্টেম্বর

প্রকাশক
অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মুদ্রক
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সূর্যমুখী আর্ট প্রেস
২৪, শিরিশদাস লেন,
ঢাকা—১১০০

বাঁধাইকার
মাখন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস
২৪, শিরিশদাস লেন,
ঢাকা—১১০০

প্রচ্ছদ অংকনে
কামাল আহমেদ
মূল্য : ৬০·০০ (ষাট টাকা মাত্র)

MUSALMANDER UTTHAN-O-POTAN (Rise and fall of Muslims) Written by Maulana Sayeed Ahamad Akborabady in Urdu, translated by Maulana khurshid uddin into Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka

September 1989

Price : Tk, 60·00 only U. S Dollar 3·00.

আমাদের কথা

একদিন মুসলমান অর্ধ জাহান শাসন করেছেন। রোমান পারস্য পরাশক্তি তাদের পদনত হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে তাদের অবদান সর্বজন স্বীকৃত; কিন্তু কালের আবর্তে মুসলমান শক্তি বিভক্ত হয়েছে। একদিন গ্রানাডা হতে দিল্লী পর্যন্ত তাদের বিজয়ের গাঁথা উচ্চারিত হয়েছে বারবার। পৃথিবীতে তাঁরাই সৃষ্টি করেছে নতুন সভ্যতার আলোকে উজ্জ্বল সড়ক। যে, সড়ক বেয়ে অন্য জাতি তাদের ভাগ্য নিয়েছে গড়ে, আর মুসলমানরা পড়েছে পিছিয়ে। অতীত ইতিহাসের আলোকে তাঁদের যে একক ভবিষ্যৎ গড়তে হবে এ প্রয়াস তাদের মধ্যে কোথায়? মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী উর্দু ভাষায় মুসলিম চেতনাকে তাদের অতীত ইতিহাসের আলোকে উজ্জীবিত করে 'মুসলমানঃ কা উরূজ ও জাওয়াল' গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষ যাতে এই বইয়ের সাথে পরিচিত হতে পারে, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করছে। অনুবাদ করেছেন মাওলানা খুরশীদ উদ্দীন। বইটি পাঠ করে পাঠক সমাজ আমাদের ইতিহাসের ধরাবাহিক অধ্যায়ের সাথে যেমন পরিচিত হবেন, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের নানা দিক সম্পর্কে জানতে পারবেন। পাঠক সমাজ বইটি থেকে সামান্যতম উপকৃত হলেও আমাদের এই প্রয়াস সার্থক মনে করবো। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে নিজকে জানার এবং নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভের তওফীক দিন। আমীন।

পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

উৎসর্গ ঃ

'মুসলমানদের উত্থান ও পতন'
আমার মরহুম আব্বাজানের রূহের
মাগফিরাত কামনায় এবং আমার
আম্মাজানের কল্যাণ কামনায় উৎসর্গকৃত।

মুহাম্মদ খুরশীদ উদ্দীন
অনুবাদক

অনুবাদকের কথা

ইতিহাস মানুষের অতীত কীর্তিসমূহ স্মরণীয় করে রাখে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের কর্মপন্থার নির্দেশ প্রদান করে। 'মুসলমানদের উত্থান ও পতন' নামক গ্রন্থেও মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাস ও কীর্তিসমূহের বর্ণনা দিয়ে বর্তমান যুগের অধঃপতিত ও লাঞ্ছিত মুসলমানদের সংশোধন ও ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণের প্রতি উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হওয়ায় বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম সমাজের সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে মিনতি জানাই, তিনি যেন আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করে সকলকেই উপকৃত করেন।

বিনীত
মুহম্মদ খুরশীদ উদ্দীন

ভূমিকা

১৯৪১ খৃীস্টাব্দে 'আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে' 'আঞ্জুমানে তারিখ ও তামাদ্দুনে ইসলামী' এর তত্ত্বাবধানে সম্মানিত লেখক জাতির উত্থান ও পতনের কারণসমূহের উপর এক মৌখিক ভাষণ দেন। পরবর্তী সময়ে এতে আরো কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজন করে একটা প্রামাণ্য পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়।

এই প্রবন্ধে ধ্বংস প্রাপ্ত ও অধঃপতিত মুসলমানদের উত্থান ও পতনের ইতিহাসকে অতি সহজ-সরল ভাষায় ও মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্যে পাঠকের উপর এর প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁরা ঐতিহাসিক সত্যতার এই স্বাধীন বর্ণনাভঙ্গীকে খুবই পসন্দ করেন এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি একে পুস্তক আকারে প্রকাশের আবশ্যকতা অনুভব করেন।

ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই অনেক বিষয় সংযোজন এবং ব্যাখ্যা ও বর্ণনার ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর একে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। পুস্তক রূপে প্রকাশিত হওয়ার পর অনুভূত হল যে, এই পরিমাণ সংযোজন এবং কাট ছাঁট করা সত্বেও এতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় অধ্যায় বাদ পড়েছে।

বর্তমান সংস্করণে সেই সে অভাব পূরণ করা হয়েছে এবং স্পেন ও উপমহাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে দু'টি পৃথক অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে। এই দু'টি অধ্যায় সংযোজনের ফলে পুস্তকের কলেবর খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথমতঃ শুধু ১৯ লাইনের ১৬৮টি পৃষ্ঠা ছিল। বর্তমানে ২১ লাইনের ৩৪৮ পৃষ্ঠা হয়েছে।

পুস্তকের মানের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, এই বিষয়বস্তুর উপর একটি তথ্যবহুল বিশুদ্ধ পুস্তক অস্তিত্ব লাভ করলো। তৃতীয় সংস্করণে সম্ভবতঃ প্রাথমিক অধ্যায়গুলোর উপর পুনঃ দৃষ্টির আবশ্যক হবে। এমনিভাবে সমস্ত অধ্যায়ে সামঞ্জশীল হয়ে যাবে।

আতিকুর রহমান উসমানী
ব্যবস্থাপক, নদওয়া তুল-মুসান্নেফিন,
দিল্লী, ১০ই শাওয়াল,
১৩৬৬ হিজরী, মুতাবিক,
২৭শে আগস্ট, ১৯৪৭ ইং

সূচীপত্র

মুসলমানদের উত্থান ও পতন ১
বিজ্ঞান ৩
তাওহীদ ৬
তাকাওয়া অবলম্বন ৯
তাওহীদ বিশ্বাস ও তাকওয়ার সার্বিক প্রভাব ১১
খলীফাদের সরলতা ১৪
রাজকোষের সংরক্ষণ ১৬
ন্যায় বিচার ও সাম্য নীতি ১৭
খলীফা নির্বাচন ১৯
সরকারী কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান ও তাঁদের হিসাব গ্রহণ ১৯
হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভবিষ্যৎবাণী ২৫
হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাত ২৮
হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফত যুগ ২৯
হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রতি বিদ্রোহ ৩৬
হযরত আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর কর্ম পদ্ধতি ৩৭
সালিসীর ঘটনা ৩৮
হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফত কালের পর্যালোচনা ৪০
হযরত আলী (আঃ)-এর ব্যর্থতার কারণ ও বংশগত পক্ষপাতিত্বের বিকাশ ৪১
ইসলামে পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতির কঠোর নিন্দা ৪২
ঈমানের স্তরসমূহের পার্থক্য ৪৫
হযরত আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর দৃষ্টান্ত ৪৬
অনারবীয় মুসলমানদের প্রভাব ৪৭
বড় বড় সাহাবাদের নির্জন বাস ৪৮
বনু উমাইয়ার যুগ ৪৯
রাজতন্ত্রের প্রভাবসমূহ ৫২
ইয়াযিদের জন্য বায়'আত গ্রহণ ৫৪
বনু উমাইয়ার রাজত্বকালের পর্যালোচনা ৫৫
কর্মচারীদের অত্যাচার ৫৯
বনু উমাইয়াদের পক্ষপাতিত্ব ৬০
রাজকোষের অনিয়ম ও বিশৃংখলা ৬০

বিভেদ ও অনৈক্য	৬১
বিশ্বাসের সর্থত্তা	৬৩
আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান	৬৩
খারেজীদের মূলোৎপাটন	৬৩
মুখতারের ফিতনা	৬৩
তাওয়াবীন	৬৪
ইরাকীদের ষড়যন্ত্র	৬৫
ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালিক	৬৭
কনস্টান্টিনোপলের উপর ক্রমাগত ব্যর্থ হামলা	৬৮
সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিকের রাজত্বকাল	৭১
ব্যর্থতার কারণসমূহ	৭৩
হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)	৭৬
ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালিক	৮১
হিশাম ইবনে আবদুল মালিক	৮২
আব্বাসীয় বংশের রাজত্বকাল	৮৮
বেদনাদায়ক অত্যাচার	৮৮
আবুল আব্বাস সাফ্ফাহর কথা ও কাজ	৯০
স্থলাভিষিক্ত বানানোর বিপজ্জনক পরিণতি	৯৩
তুর্কী দাসদের আধিপত্য	৯৪
আব্বাসীয় খিলাফতের দু’যুগ	৯৫
পতনের যুগ	৯৬
মন্ত্রীত্বের দুরাবস্থা	৯৮
খিলাফতের বিভক্তি	১০০
হাম্বলীদের উপর কঠোরতা	১০১
বাগদাদের খিলাফতের শেষ নিঃশ্বাস বা পতনকাল	১০২
বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি এবং জাতির অধঃপতনে তার প্রতিক্রিয়া	১০৩
কুরআন মজীদ বুঝবার মূলনীতি	১০৫
দর্শন শাস্ত্রের দলীল গ্রহণ পদ্ধতি	১০৬
কালাম শাস্ত্র	১০৮
একটি সন্দেহ ও এর অপনোদন	১১০
ইসলামের উপর ক্রুসেড হামলা	১১২
ক্রুসেডারদের আক্রমণের দাঁত ভাঙ্গা জবাব	১১৪
সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী	১১৫

সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী ১১৫
সুলতান সালাহউদ্দীনের মৃত্যুর পর রাজ্যের বিভক্তি এবং ইউরোপীয়দের আক্রমণ ১১৭
সালজুকী সম্প্রদায় ১২১
বনু হামদান ১২৩
তাতারীদের আক্রমণ এবং প্রতিরোধ ১২৪
মালিক জাহির বিবরাম ১২৫
বাতেনীয়া সম্প্রদায়ের মূলোৎপাটন ১২৬
তাতারীদের উপর ক্রমাগত বিজয় ১২৬
তাতারীদের ইসলাম গ্রহণ ১২৯
বাগদাদের আব্বাসী খিলাফতের বীরপুরুষ কে ছিলেন ? ১৩০
মানসুরের রাজত্বকালে ইসলামী চরিত্রের সংরক্ষণ ১৩১
মিসরে দ্বিতীয়বার আব্বাসী-খিলাফত প্রতিষ্ঠা ১৩৬

উসমানী বংশ

প্রথম উসমান খানের চরিত্র ১৪২
ক্রমাগত বিজয় এবং ইউরোপে ইসলামের প্রবেশ ১৪৪
সুলতান মুরাদ আউয়াল ১৪৫
সুলতান-বায়যীদ ইলদেরাম ১৪৭
বিভিন্ন বিজয় ১৪৯
ক্রুসেডীয় একতা ১৪৯
আঙ্গুরার যুদ্ধ ১৫১
আঙ্গুরার যুদ্ধে ইসলামের প্রতিক্রিয়া ১৫৪
উসমানী রাজত্বের দ্বিতীয় বার খুশীর ঢেউ ১৫৫
সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ ১৫৬
সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর কনস্টান্টিনোপল বিজয় ১৫৭
অন্যান্য বিষয়সমূহ ১৫৯
সুলতান সালিম আউয়াল ১৬০
খিলাফত ১৬০
হারামায়নুশ শারিফায়নের সেবা ১৬৪
ইসলামী শরীয়তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ১৬৫
তুর্কীদের সামুদ্রিক শক্তি বৃদ্ধি ১৬৬
সুলায়মান আজম কানূনী ১৬৬
রাজ্যের সুশৃংখলা ও ন্যায় বিচার ১৬৭
সেনাবাহিনীর সুদৃঢ়তা ১৬৮

জনহিতকর কাজ	১৬৮
উসমানী রাজত্বের দু'যুগ	১৬৯
বনু আব্বাস এবং উসমানী বংশের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা	১৬৯
উসমানী রাজত্বের পতনকাল	১৭২
অধঃপতনের কারণসমূহ	১৭৩
স্থলাভিষিক্তকরণ প্রথা	১৭৬
বিজাতীয় মহিলাদের সাথে বিবাহ-শাদী	১৭৮
সৈন্যদের বিদ্রোহ	১৮১
আমীর ও মন্ত্রীদের আত্মসাৎ ও বিশ্বাসঘাতকতা	১৮১
জীবিকা উপার্জন ও বৃত্তিমূলক কাজে অধঃপতন	১৮৩
আলিমগণের স্থবিরতা	১৮৩
তুর্কীদের প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিসমূহের জাগ্রতা	১৮৫
আরবদের বিদ্রোহ	১৮৬
খিলাফতের পরিসমাপ্তি	১৮৬
বর্তমান অবস্থা	১৮৭
স্পেনে মুসলমানদের রাজত্ব ও তার পতন	১৮৮
স্পেনে মুসলমানদের কীর্তিসমূহ	১৯১
স্পেনে ইসলামী রাজত্বের বিভিন্ন যুগ	১৯৭
কাসিম ইবনে হুমুদ	২০১
স্পেনে উমাইয়াদের শেষ নিঃশ্বাস	২০৩
মুরাবেতীন	২০৫
ইউসুফ ইবনে আশফীন এবং যুলাকার যুদ্ধ	২০৬
ইউসুফ ইবনে তাশফীনের স্পেনের উপর আধিপত্য	২১০
আল-মোওয়াহ্‌হেদুন	২১২
ইবনে হুদ	২১৩
গ্রানাডার রাজত্ব	২১৬
আবু আব্দুল্লাহ্‌র ইন্তিকাল	১২৯
গ্রনাডার মুসলমান অধিবাসীদের প্রতি অত্যাচার	২৩০
পুস্তকে অগ্নি সংযোগ	২৩৩
জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ	২৩৫
সাধারণ হত্যাকাণ্ড	২৩৫
ভারতবর্ষে মুসলমানদের রাজত্ব এবং তার পতন	২৩৬
মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের সিন্ধু আক্রমণ	২৩৮
মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের শেষ পরিণতি	২৪১

সিন্দু রাজাদের ইসলাম গ্রহণ	২৪৩
আব্বাসী খিলাফতের সময়ে সিন্ধু	২৪৫
আমীর সবুক্তগীন	২৪৬
সবুক্তগীনের ইন্তিকাল	২৪৮
সুলতান মাহমুদ গযনবী	২৪৮
পাঞ্জাব আক্রমণ	২৪৯
সুলতানের সৈন্য প্রেরণ	২৫০
পেশোয়ার যুদ্ধ এবং নগরকোট বিজয়	২৫১
থানেশ্বর বিজয়	২৫২
কাশ্মীর আক্রমণ	২৫৩
কানুজ বিজয়	২৫৩
সোমনাথ মন্দির বিজয়	২৫৩
ইন্তিকাল	২৫৫
চরিত্র ও ব্যবহার	২৫৫
গযনী রাজত্বের পতন	২৬০
ঘোরী বংশ	২৬০
দাস বংশ : কুতুব উদ্দীন আইবেক	২৬৫
সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ-বা (আলতামাশ)	২৬৭
খালজী বংশ	২৮১
আলাউদ্দীন খালজী	২৮৭
আলাউদ্দীনের অহমিকা এবং আমিত্ব	২৮৯
হযরত নিযাম উদ্দীন আউলিয়ার প্রতি বিশ্বাস	২৯৬
রাজ্যের সংস্কার	২৯৭
খালজী বংশের পরিসমাপ্তি	৩০৯
তুগলক বংশ	৩০৯
তুগলক বংশের পরিচয়	৩১১
সুলতান মুহাম্মদ ইবনে তুগলক	৩১৩
স্বেচ্ছাচারিতা এবং চঞ্চলতা	৩১৭
সুলতান ফিরোয শাহ তুগলক	৩২৪
আমীর তাইমুর	৩২৯
'সৈয়দ (সাদাত) বংশ' (১৪২৪-১৪৫০ খ্রীঃ)	৩৩১
লোদী বংশ	৩৩২
বাবর	৩৩৪
বাবরের গুণাবলী ও পূর্ণতা	৩৩৬

হুমায়ুন	৩৩৭
শেরশাহ এবং শূরী বংশ	৩৩৮
মুগলদের রাজত্বকাল	৩৪২
জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ আকবর	৩৪৩
আকবরের নতুন ধর্মীয় কুসংস্কার এবং ইসলামের অধঃপতন	৩৪৪
আকবরের ইন্তিকাল	৩৪৬
জাহাঙ্গীর	৩৪৭
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী	৩৫০
ইন্তিকাল	৩৫১
শাহজাহান	৩৫১
আওরঙ্গজেব-আলমগীর (১৬৫৮-১৭০৭ খৃীঃ)	৩৫৫
শিক্ষাদীক্ষা	৩৫৬
ন্যায় বিচার	৩৫৮
সংস্কারমূলক কার্যসমূহ	৩৫৯
আলিমগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	৩৬০
বীরত্ব	৩৬০
আলমগীরের মৃত্যুকালে ভারতবর্ষের অবস্থা	৩৬৬
বাহাদুর শাহ	৩৬৮
মুহাম্ম শাহ	৩৭১
নাদির শাহের আক্রমণ	৩৭২
পানি পথের যুদ্ধ	৩৭৩
সিরাজুদ্দৌলা	৩৭৫
দেওয়ানী	৩৭৭
হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী ও তাঁর বংশ	৩৭৯
হযরত শাহ সাহেবের বংশ পরিচয়	৩৮২
হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রঃ)	৩৮৩
পর্যালোচনা : বর্তমান ও অতীতের তুলনা	৩৮৫
সত্যপন্থী আলিমগণের সংস্কার উদ্যোগ	৩৮৬
সম্মানিত সূফীদের জাতীয় সংস্কার কার্যে অংশগ্রহণ	৩৯৩
ইসলামী রাজত্বের সাধারণ বরকত বা প্রাচুর্যসমূহ	৩৯৪
উপসংহার	৩৯৫

মুসলমানদের উত্থান ও পতন

মুসলমানদের উত্থান ও পতন

বিশ্বের ইতিহাসে এ ঘটনা কতইনা-আশ্চর্যজনক ও বেদনাদায়ক যে, এককালে যে মুসলমানগণ অতিশয় আশ্চর্যজনকভাবে চরম উন্নতি করেছিলেন এবং স্বীয় কৃতকর্মের চিহ্ন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এমনভাবে স্থায়ী করেছিলেন যে, জগতের অন্যান্য জাতি-তাঁদের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সামনে আনুগত্য সহকারে মাথা নত করতে বাধ্য। (পরিতাপের বিষয় যে,) আজ সেই মুসলমানদের উপর দুর্বিপাক ও অধঃপতন চড়াও হয়ে তাদেরকে ঘিরে বসেছে। তাঁদের জাতীয় শৃংখলাবোধ বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলো। তাঁদের আলোচনা সভায় জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা খুবই নগণ্য। মস্তিষ্ক সৃজনীশক্তি ও আবিষ্কার হতে বঞ্চিত। তাঁদের হস্ত রাজনৈতিক শক্তি সামর্থের লাগাম হতে অপরিচিত বা অজ্ঞ। আদম শুমারী অর্থাৎ জন সংখ্যার দিক থেকে মুসলমানদের সংখ্যা আজকের মত পূর্বে কখনও ছিলনা কিন্তু এতদসত্বে (এ কথাও বলতে হয় যে,) জ্ঞানে ও কর্মে ঈমান ও আকিদায়, আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এত অধঃপতন ও দুর্বল অবস্থা ইতিপূর্বে কখনও ছিল না।

ইসলামী ইতিহাসের একজন প্রাথমিক স্তরের ছাত্রও একথা জানে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইনতিকালের কয়েক বৎসর পরেই মুসলমানগণ আরব উপদ্বীপ থেকে বহির্গত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যখন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলেন, তখন প্রবল শত্রুতা ও প্রতিকুল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও এমন দ্রুতগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হতে ছিলেন যে, হিজরী প্রথম শতাব্দী শেষ হওয়ার পূর্বেই তাঁরা --পূর্বে সিন্ধু, চীন ও তুর্কিস্থান এবং পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত নিজেদের শাসন ও রাজত্বের সীমা রেখা বিস্তৃত করেছিলেন। আর এই বিজিত দেশসমূহে শুধু রাজনৈতিক শক্তি সমর্থই অর্জন করেনি বরং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং ইসলামী সভ্যতা ও কৃষ্টির এমন উপযুক্ত ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, গুটি কতক

দেশ ব্যতীত সমগ্র বিজিত দেশসমূহ খাঁটি ইসলামী দেশে পরিণত হলো। অতঃপর জ্ঞান বিজ্ঞানে, আবিষ্কার ও সৃজনী শক্তিতে, আত্মিক সভ্যতা ও কৃষ্টিতে এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে শৃংখলাবোধের পরিপাটিতে তাঁরা স্বীয় মন মগজের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব এবং অসাধারণ ব্যবহারিক ও কার্যকরী জ্ঞানের অধ্যবসায়ও গবেষণার এমন উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন যে, বড় বড় বৈরীভাবাপন্ন ঐতিহাসিকগণ ও একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সাহস করেননি। কিন্তু এখন অবস্থা সম্পূর্ণ উল্টো। জীবনের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় তাঁদের উপর অধঃপতন চেপে বসেছে। জ্ঞান ও কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁদেরকে সকলের পশ্চাতে দৃষ্টি গোচর হচ্ছে। কোথায়ও মূর্খতা ও অজ্ঞতার প্রতিযোগিতা—আর কোথাও বা বিজাতীয় পণ্ডিতদের অন্ধ অনুকরণ। ইসলামী ব্যক্তি সত্বা বা ব্যক্তিত্ব আজ সর্বাবস্থায় এত অধঃপতিত যে, বর্তমান সময়কার মুসলমানদেরকে সার্বিকভাবে পূর্বেকার মুসলমানদের স্থলাভিষিক্ত কিংবা উচ্চপদমর্যাদা ও গৌরবের উত্তরাধিকার বলা—আপনাতেই হাসির উদ্রেক করে।

এই বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখে ইতিহাস দর্শনের ছাত্রদের স্বভাবত; ঐ সমস্ত কারণ, খোঁজার একান্ত আগ্রহ জাগে--যার উপর ভিত্তি করে মুসলমানদের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে উল্টে গেছে। কিন্তু ঐ সমস্ত কারণ বর্ণনার পূর্বে প্রথমতঃ সার্বিকভাবে সে সব মৌলিক কার্যবলী ও প্রতিকার জানা চাই, যা' -মুসলমানদের সুমহান গৌরবোজ্জল উন্নতির উপকরণ হয়েছিল এবং যে গুলো সম্মিলিতভাবে তাদেরকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সভ্যতম জাতি হিসেবে গড়ে তুলে ছিল। এই সমস্ত কার্যাবলী ও প্রতিকারগুলো জানার পর যদি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় তা'হলে দীর্ঘদিন অতিবাহিতের সাথে সাথে বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আকৃতিগত কার্যাবলীর মধ্যে কিভাবে অধঃপতন সৃষ্টি হতেছিল এবং পরিশেষে কয়েক শতাব্দী অতিবাহিতের পর যখন এই ক্রমাগত অধঃপতন শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল তখন উহার ফল কি দাঁড়াল তা' আজ আমাদের সামনেই উপস্থিত। এর হৃদয় বিদারক করুণ দৃশ্য প্রত্যেক অনুভূতিশীল মুসলমানের চক্ষুকে ক্রমাগত রক্তাশ্রু বিসর্জনের আহবান জানায় এবং প্রত্যেক ব্যথিত হৃদয়কে ক্রমাগত ফরিয়াদ করার অনুমতি দেয় ও বিলাপের উপকরণ যোগায় – ।

প্রকাশ থাকে যে, এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে এক হাজার বৎসরের অধিককালের দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ এক দুর্বিষহ অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়—। এজন্যে আমি এখানে মূলতঃ কতিপয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি শুধু ইঙ্গিত দিয়ে যাব।

বিজ্ঞান

শিক্ষিত সম্প্রদায় জানেন যে, মানুষের মধ্যে দু'টো বিশেষ শক্তি রয়েছে।

একটি হল চিন্তা ও গবেষণা করার শক্তি, যা'কে দর্শন শক্তি বলে। এই শক্তির বলে, বস্তু জগতের নিগূঢ় তথ্য সমূহ অবগত হওয়া যায় এবং উহার সূক্ষ্ম তথ্য ও প্রকৃত অবস্থার সন্ধান পাওয়া যয়। অতঃপর বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের বিভিন্ন দিকের প্রতি গভীর চিন্তাভাবনার পর সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, কোন্ কাজটা-উত্তম ও গ্রহণযোগ্য আর কোন্ কাজটা মন্দ ও পরিত্যাজ্য-।

অপরটি হল "কুওয়াতে আমালিয়া" অর্থাৎ ব্যবহারিক শক্তি আন্দোলিত হয় এবং উহা দর্শন শক্তির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কোন কর্ম করা-বা-না করার বৈপ্লবিক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই উভয় শক্তি মানব সত্বার সাথে সম্পর্কযুক্ত। একটি অনুভূতি উদ্দীপক আর দ্বিতীয়টি কার্যশক্তি উদ্দীপক। অতঃপর এই উভয় শক্তির অধীনে আরো অনেক শক্তির উন্মেষ ঘটে যা' নিজ নিজ কর্ম পরিমণ্ডলে কর্মরত থাকে। সমস্ত চারিত্রিক দর্শনের ভিত্তিমূলক ঐ উভয় শক্তির বৈপ্লবিক আলোড়ন ও প্রস্তুতি এবং উহার চাহিদানুযায়ী প্রকাশ্য আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। উল্লিখিত উভয় শক্তির মধ্যপন্থা অবলম্বন ব্যতীত যখন কম ও বেশী করার কাজে লিপ্ত হয় তখন নিকৃষ্ট চরিত্রের উন্মেষ ঘটে। আর যখন উহাকে মধ্যপন্থা অর্থাৎ ভারসাম্য অবস্থায় পাওয়া যায় তখন উহা হতে উন্নত ও উত্তম চরিত্রের বিকাশ ঘটে ।

চরিত্র দর্শনের পরিভাষায় এই উভয় শক্তির পরিপূর্ণতার নামই হিকমত। আর এই হিকমতই মানুষের সৃষ্টি কুলের শ্রেষ্ঠ হওয়ার ভিত্তিমূল। এই, পরিপ্রেক্ষিতে জীবন পদ্ধতি ব্যক্তিগতই হউক কিংবা সমষ্টিগতই হউক—সর্বাবস্থায় উহার সফলতার এবং উন্নতির ভিত্তিমূল এই কথার উপর প্রতি-

ষ্ঠিত যে, ব্যক্তিগত বা একক কিংবা জাতীয় ও সমষ্টিগত দর্শন শক্তি এবং ব্যবহারিক শক্তি উভয়ই যেন সুস্থ হয় এবং প্রয়োজনাতীত কম কিংবা বেশী যেন না হয়। বরং মধ্য পন্থায় প্রতিষ্ঠিত থেকে কোন বস্তুকে ভাল কি মন্দ বুঝা কিংবা কোন কাজ করা বা না করা সম্পর্কে ঐ পন্থাই অবলম্বন করা চাই যা, যথার্থভাবে একটা সুস্থ ভারসাম্য শক্তির গ্রহণ করা উচিত। যেমনি ভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি দর্শন শক্তি এবং একটি ব্যবহারিক শক্তি থাকে ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যেক জাতির ও একটি মানসিক অবস্থা আছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র জাতির ও একটি দর্শন শক্তি থাকে যার দর্পণে সমস্ত বস্তু জগতের ভালমন্দ দেখা যায় এবং পরীক্ষা করা যায়। অতঃপর এমনিভাবে সমগ্র জাতির একটি ব্যবহারিক শক্তি থাকে যার কারণে জাতির প্রত্যেকটি সদস্য একতাবদ্ধ হয়ে কাজ কর্ম সম্পাদন করে। এ সময় এর সদস্যদের বিশ্বাস ও কর্মে পরস্পর নির্ভরশীল। ইস্পাত কঠিন মনোবল, একতা এবং দৃঢ়তা পাওয়া যায় এবং উহাদের সকলের দৃষ্টির কেন্দ্রস্থল অভিন্ন হয়। একই উদ্দেশ্য এবং একই প্রেরণার অধীনে তাদের সমস্ত কর্ম হয়ে থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, যদি ঐ জাতির মানসিক অবস্থায় ভ্রান্তি না আসে এবং উহার মস্তিষ্ক ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকে তা'হলে ঐ জাতীয় প্রতিটি পদক্ষেপ হবে সুন্দর এবং উহার প্রতিটি কর্ম হবে পুণ্যময়। আর এই জাতিই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য করুণা ও প্রাচুর্যের প্রবাহমান স্রোতস্বিনীর মত ফলপ্রসূ হয়ে থাকবে। ঐ জাতি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করবে সেদিক হতেই মিথ্যা ও বিশৃংখলার সমস্ত অন্ধকার আপনাতেই দূরীভূত হয়ে যাবে। আর সত্য ও সততার সূর্যালোক ক্রমাগত বিস্তৃতি লাভ করবে।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর ইসলামী শিক্ষার উপর যদি আপনি চিন্তা করেন তা'হলে আপনার বুঝে আসবে যে, সমস্ত ইসলামী শিক্ষা মৌলিক ও ভিত্তিমূলের দিক দিয়ে দু'টি বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত। তম্মধ্যে একটি হল মানুষের বিশ্বাস, অপরটি হল মানুষের কর্ম ও কীর্তি। বিশ্বাসের সম্পর্ক দর্শন শক্তির সাথে এবং কর্ম ও কীর্তির সম্পর্ক ব্যবহারিক শক্তির সাথে। মোদ্দাকথা এই যে, ইসলাম এই উভয় প্রকার শক্তির কার্যসীমা

এবং উহার কর্তব্য সমূহ নির্ধারণ করে মানুষের হাতে এমন একটি অকাট্য দলীল প্রদান করেছে যার আলোকে সম্পূর্ণ পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, দর্শন শক্তিকে কোন বস্তুর সম্পর্কের কারণে উত্তম কোন বস্তুর সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে নিকৃষ্ট হওয়ার হুকুম দেয়া উচিত আর এই সম্পর্কের কারণে ব্যবহারিক শক্তিকে পছন্দ ও অপছন্দের জগতে কোন কাজ করার কিংবা না করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ইসলামের মৌলিক আইন অর্থাৎ প্রথম কুরআন থেকে শেষ পর্যন্ত ঐ সমস্ত কার্যাবলীর ব্যাখ্যা ও মর্যাদার বর্ণনা এবং সেগুলোর সীমা রেখা ও পরিমাণ বর্ণনা ও ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত। এর পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না যে, ইসলামের উদ্দেশ্য মানুষের দর্শন শক্তি ও ব্যবহারিক শক্তিকে পরিপূর্ণ করে তাকে পূর্ণ জ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করা এবং এমনিভাবে প্রকৃতপক্ষে তাকে সৃষ্টিকুলের সেরা জীব হিসাবে তৈরী করাও মূল লক্ষ্য।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর নবুওতকে বিশ্বাসীদের জন্যে স্বীয় অনুগ্রহ হিসেবে ঘোষণা করে বলেন যে,

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ

اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ

وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ—

“নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসীগণের উপর অনুগ্রহ করেছেন – যখন তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্যে হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের নিকট তাঁর ‘আয়াত’ বা নিদর্শনবলী পাঠ করেন ও তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করেন যদিও তারা ইতিপূর্বে প্রকাশ্যে বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল।”

ইহা সেই জ্ঞান ও বিজ্ঞান—যাকে কুরআন মজিদের আয়াতে—
خَيْرًا كَثِيْرًا ‘প্রচুর কল্যাণ’ বলা হয়েছে। আয়াতটি হল –

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا

অর্থাৎ "যাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করা হয় ফলতঃ সে নিশ্চয়ই প্রচুর কল্যাণ লাভ করে।" 'জ্ঞান' কে خير كثير (প্রচুর কল্যাণ) বলার কারণেই চরিত্রবান আলিমগণ বলেন যে, حكمة (হিকমত) শুধু জ্ঞানেরই নাম নয়—বরং عمل বা ব্যবহারিক বিদ্যাও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা যে বিদ্যা আমল বিহীন, তা দিয়ে অধিক কল্যাণ হওয়া তো দূরের কথা বরং তা প্রকাশ্য ধ্বংস ও বিপজ্জনক। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—"আমল বিহীন বিদ্যা বিপজ্জনক এবং ইলম বিহীন আমল ভ্রষ্টতা।

মোটকথা এই যে, কুরআন মজীদ এমন একটি কার্যবিধি এবং বিশ্বাস ও চরিত্র গঠনমূলক বিধান যে, যদি দর্শনশক্তি এবং ব্যবহারিক শক্তি উভয়ের কার্যকারিতা সে বিধানের আলোকে করা হয় তবে এই উভয়শক্তির সংমিশ্রণে প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ ঘটবে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি নিজের যাবতীয় বিশ্বাস ও কার্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তা'হলে তার জীবন যাপন সার্বিকভাবে সফলকাম হবে। ঠিক তেমনিভাবে যে জাতি কুরআন মজীদকে বিশ্বাস ও কার্যে নিজেদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে তারা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সভ্যতম ও উন্নততর জাতিতে পরিগণিত হবে এবং উন্নতি ও উচ্চ পদমর্যাদা তাদের প্রাপ্য হয়ে থাকবে। এখন এরূপ ধারণা ঠিক হবেনা যে, একজন মুসলমান হিসেবে এই দাবী শুধু বিশ্বাসের উপরই নির্ভরশীল হবে না। আমি এর প্রমাণসমূহ বর্ণনা করছি।

বিজ্ঞানের সমস্ত প্রকারভেদ বর্ণনা করা এবং ইসলামী বিশ্বাস সমূহ ও কার্যসমূহের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করা দীর্ঘ অবকাশের প্রয়োজন। এজন্যে আমি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে ইসলামী বিশ্বাস ও আমল সমূহের কতিপয় বুনিয়াদী কর্মের উল্লেখ করবো যেগুলোর মুসলমানদের উত্থান ও উন্নতির জন্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এতে আমাদের বুঝে আসবে যে, ইসলাম মানুষের দর্শনশক্তি ও ব্যবহারিক শক্তিকে পরিপূর্ণ করার লক্ষ্যে কি পরিমাণ বিশেষ সজাগ দৃষ্টি রেখেছে এবং মুসলমানদের সমৃদ্ধি ও উন্নতির উপর এর কি প্রভাব বর্তমান রয়েছে।

তাওহীদ

তাওহীদের সম্পর্ক দর্শনশক্তির সাথে সম্পর্কিত। প্রত্যেক মুসলমানই জানে যে, ইসলামী আকীদা সমূহের ভিত্তি তাওহীদের বিশ্বাসের উপর

সুপ্রতিষ্ঠিত। এই আকীদার উপকারিতা এই যে, মানুষ আল্লাহর 'জাত' ও 'সিফাত' অর্থাৎ স্বত্বা ও গুণাবলীর কোন একটিতে কাহাকেও আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার করবে না। সে অন্তরে এই বিশ্বাস রাখবে যে, জগতের সমস্ত লাভ লোকসানের একমাত্র মালিক আল্লাহ্। তিনি আমাদের সৃষ্টি কর্তা এবং আমরা তাঁর সৃষ্টি জীব। আমরা শুধু তাঁরই আনুগত্য ও দাসত্ব করবো। অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সামনে আমাদের মস্তকাবনত করবো না। আমাদের উপজীবিকা, মৃত্যু, জীবন যাপন, সম্মান ও অপমান, সফলতা ও ব্যর্থতা, প্রাচুর্য ও দারিদ্র ইত্যাদি পাওয়া না পাওয়া সবই শুধু আল্লাহর নির্দেশেই হয়। ইহা ব্যতীত কোন ব্যক্তি সে যত বড় বাদশাহই হউক না কেন উল্লিখিত বস্তু ও বিষয় সমূহের সামান্যতম অংশেরও মালিক হতে পারেনা। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে শুধু আল্লাহকেই ভয় করা চাই, তাঁর কাছেই নিজের আশা আকাংখার সম্পর্ক রাখা চাই। আর যা কিছু চাইতে হয় তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা উচিত। এই বিশ্বাস ও ভরসার সঙ্গে অন্তরে এ কথাও স্বীকার করা চাই যে, সব মানুষেই সমান। কেহ কারও শাসক এবং কেহ কারও শাসিত নয়। কোন মানুষের অন্য মানুষের উপর আজ্ঞাবহ দান হিসাবে প্রাধান্য বিস্তারের অধিকার নেই। কোন ব্যক্তির এ অধিকার ও নেই যে, আল্লাহর আইন ব্যতীত মনগড়া কোন আইন তৈরী করে তা আল্লাহর বান্দাদের উপর অত্যাবশ্যক করে দেয়। অবশ্য, জীবন যাপন পরিচালনার শৃংখলা রক্ষার জন্য উপযুক্ততা ও যোগ্যতানুসারে কর্ম বন্টন অত্যাবশ্যকীয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে কেহ আমীর, কেহ উযীর, কেহ কাজী এবং কেহ মুফতী হবেন। আর কেহ হবে কারিগর ও ব্যবসায়ী। কিন্তু তাদের কারও জাতীয় মর্যাদার প্রাধান্য হবেনা। মানবীয় পদ মর্যাদায় সকলেই সমান। উহার দৃষ্টান্ত একটা বড় ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশের মত এমন যে, সমস্ত যন্ত্রাংশ নিজ নিজ স্থানে কার্যরত থাকলে ইঞ্জিনটি চলে। আর এমনিভাবে মানুষের সমষ্টিগত জীবন যাপনের রেল গাড়ীটি (জাতীয় প্রতিটি সদস্য কার্যরত থেকে) টেনে নিয়ে যায়।

অতএব সমস্ত কল্যাণ এবং প্রকৃত সফলকাম ও উন্নতি ঐ সমস্ত ভাগ্যবান মানুষের জন্য যারা স্বীয় অস্তিত্বকে খোদার অসীম ও অনন্ত স্থায়ী অস্তিত্বে বিলীন করে, নিজের ব্যক্তিগত কোন অভিপ্রায় এবং আকাংখা পোষণ

করেনা—। তাদের ভালবাসা, শত্রুতা, দারিদ্র ও সাধুতা, ধন-দৌলত এবং জগদ্বাসীর সাথে সম্পর্ক ও তাদের প্রতি সহমর্মিতা এই সবই শুধু আল্লাহ্‌র জন্যে এবং তাঁর হুকুমের অধীন তাঁরই দাসত্বের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য করে। আর উহা ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশের ন্যায় নিজের যাবতীয় লাভ-লোকসনের কথা ভুলে গিয়ে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাজ করতে থাকে। এতদ্ব্যতীত যারা আল্লাহর আইনের অবাধ্য ও বিদ্রোহী হয় এবং পৃথিবীতে অশান্তি ও বিশৃংখলা বিস্তার করে তাদের দৃষ্টান্ত ঐ পাথরের ন্যায় যা'-রেলগাড়ীকে বাধা প্রদানের জন্য রেল লাইনের উপর নিক্ষেপ করা হয়। প্রকাশ থাকে যে, যদি পাথরটি ছোট আকৃতির হয় তবে তাকে ইঞ্জিনের দ্রুতগতি আপনাতেই পথ হতে সরায়ে দিবে এবং লাইন পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর যদি পাথর বিরাটাকৃতির হয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তবে উহাকে সরানোর জন্য অনেক চেষ্টা তদবীর ও কষ্ট করতে হবে। যা' হউক একথা বুঝা চাই যে, জীবনের রাজ পথে-সমষ্টিগত জীবনের ইঞ্জিন পরিচালনার জন্য যেমন ইঞ্জিনের সমস্ত যন্ত্রাংশের ঐক্য ও সহযোগিতার সাথে কাজ করা অত্যাবশ্যক ঠিক তেমনিভাবে আবশ্যক লাইনটি পরিষ্কার রাখা এবং উহাতে যদি কোন পাথর বা অন্যকিছু পতিত হয় তবে তা' সরিয়ে দেয়া।

তাওহীদ বিশ্বাসের এই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার পর আপনারা নিজেরাই অনুভব করতে পারবেন যে, যে জাতি এই বিশ্বাসকে নিজের মন-মানসিকতায় বদ্ধমূল করে রাখে এবং শুধু মুখেই প্রকাশ করেনা বরং এই বিশ্বাসের অকাট্যতা ও দৃঢ়তার আস্থা তার অন্তরে এমনভাবে মোহরাংকিত (সীল) হয়ে থাকে যে, লাখো বিতর্কিত দলীল প্রমাণ ও তাতে সামান্যতম দোদুল্যমানের সৃষ্টি করতে পারে না। এমন জাতি কি কখনও কোন বিজাতির শাসিত হয়ে জীবন যাপন করতে পারে ? এই বিশ্বাসের ফল এমন ছিল যে, প্রথম যুগের মুসলমান নিজেদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে' নিজেদেরকে খোদার অস্তিত্বের এক প্রতিবিম্ব মনে করতো-। যেন তাদের মুখ হতে আপনাতেই এই শব্দ বের হয়ে আসতো যে,

"আমি সমুদ্র তুল্য জল রাশি আর অন্তর এর এক বিন্দুমাত্র,

আমরা তাঁরই (আল্লাহর) তরে, আমাদের পরিচয়-সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্যকি? এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাসের কারণেই তাঁদের দৃষ্টি ছিল উচু, ধৈর্য ছিল অসাধারণ এবং শক্তি সাহস ছিল অপরাজেয়। তাদের বিশ্বাস ছিল আমাদের জীবন, মরণ ও উঠা-বসা, খাওয়া দাওয়া সবই আল্লাহর জন্যেই। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য আল্লাহর যাবতীয় আদেশ নিষেধের বাস্তবায়ন এবং পৃথিবীতে এর সফল প্রচার ও প্রতিফলন। তা'ছাড়া জীবনে আর কোন কর্ম ব্যস্ততা নেই। এরূপ ধ্যান ধারণা ও দৃঢ় ঈমানের কারণেই এক দিকে তাঁরা যেমন পৃথিবীর বড় বড় রাজকীয় শক্তি এবং পার্থিব উচ্চাসন ও দাপটে সামান্যতম ভীত হতেন না, ঠিক তেমনি অন্যদিকে তাদের ইস্পাত কঠিন মনোবল এবং একটা কেন্দ্রীয় শক্তির সাথে সুসম্পর্ক থাকার কারণে তাদের আকাংখা ছিল পাহাড়ের মত শক্ত ও অটল। এই জন্য তাদের কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না—। ব্যক্তিত্ব দর্শনের ইহাই ছিল গোপন রহস্য যা' তাদের অন্তরে লুকায়িত ছিল--এবং তা' বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হয়ে আশ্চর্যজনক কীর্তির প্রকাশ ঘটিয়েছে যারা ইচ্ছা শক্তির সঠিক জ্যামিতি বিদ্যার সাথে পরিচিত তাঁদের একথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হবেনা যে, একটি জাতি জগতের কল্যাণ প্রদানের প্রারম্ভিক স্থান হতে নিজের সম্পর্ক সুদৃঢ় করে পৃথিবীতে কত রকম অভূতপূর্ব আশ্চর্যজনক কীর্তি সম্পাদন করতে পারে- ।

তাকওয়া অবলম্বন

উপরোক্ত আলোচনায় আপনার ধারণা হয়ে থাকবে যে, ইসলাম তাওহীদের শিক্ষা দিয়ে মানুষের দৃষ্টিভংগী কি পরিমাণ ভারসাম্য, পুণ্যময় ও ও সঠিকভাবে তৈরী করেছে এবং কিভাবে তাকে বস্তুসমূহের ভালমন্দ বুঝার এক কষ্টি পাথরের সন্ধান দিয়েছে। যে কোন বস্তুই এই কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করা হবে তা'তে কোন ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকবে না।

অতএব তাওহীদের স্বীকৃতি দানের পর স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, কোন 'আমল' বা কর্মে আল্লাহ খুশী হন এবং কি করলে অল্লাহর

সন্তুষ্টি অর্জিত হয়? আর এই কর্মই বা কি যা' তার অসন্তুষ্টি ও অভিশাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ ব্যতীত ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা ঐ সমস্ত কাজের বর্ণনা এবং উহার ব্যাখ্যা ও বিস্তৃতির মধ্যে শামিল। ইসলামের যাবতীয় কাজ কর্মে প্রয়োজনাতীত কম ও বেশী থেকে দূরে সরে মধ্যপন্থা অর্থাৎ ভারসাম্যের প্রতি পরিপূর্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে--।

সুতরাং অতি সংক্ষিপ্তভাবে এ কথা বলা যায় যে, সমস্ত ইসলামী আমল বা কর্মসমূহের ভিত্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ যে সব কাজ কর্মের সম্পর্ক আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের সাথে সম্পর্কিত এবং যে সব কাজ কর্ম এক মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে করে থাকে, এই উভয় প্রকার কাজ কর্ম মৌলিকভাবে এ কথার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, সমস্ত মানবীয় কাজ কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য খোদার হুকুমের বাস্তবায়ন। এমন কি যদি পিতা পুত্রের জন্যে কিছু খরচ করেন কিংবা পুত্র-পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে তবে তার উদ্দেশ্যও এটাই হতে হবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা পিতৃত্ব সন্তানের সাথে সম্পর্কের কারণেই আমাকে এ হুকুম দিয়েছেন, এজন্যেই আমি এ কাজ করছি। যদিও একাজে অবশ্য আত্মতুষ্টি ও অর্জিত হতে পারে কিন্তু জাতীয় আত্মতুষ্টি কলহ বিবাদের দ্বারা হাসিল হওয়া উচিত নয়। এই একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উপরই অন্যান্য ব্যক্তিগত ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের 'কিয়াস' বা অনুরূপ ধারণা করুন।

মোটকথা, ইসলামী কার্যসমূহে তাকওয়ার জীবনী শক্তির একই ফর্মা (একজাতীয় জিনিস তৈরীর মেশিন) হওয়ার ফল এই হয় যে, মানুষের দল ও ব্যক্তিকে বংশগত পক্ষপাতিত্ব এবং অন্যান্য মূর্খতাজনিত যথাঃ—দেশগত বর্ণ ও বংশগত প্রাধান্য, ধন দৌলতের অহংকার, শারীরিক শক্তি ও শক্তির অহমিকা, স্বার্থপরতা, ব্যক্তি পূজা, ভোগ্যবিলাস, পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ, ব্যক্তিগতই হউক কিংবা সমষ্টিগতই হউক প্রত্যেকটির অভিশাপ হতে মুক্তি মিলবে। আর এগুলোর অভিশাপে আবদ্ধ হয়ে মানবতাকে যে দুঃখ কষ্টের মুকাবিলা করতে হয় মানব সমাজ তা থেকে নিরাপদ হয়ে সুখ শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারে;

ইসলামী আদেশ নিষেধের চর্চা যদি আপনি আত্মিক জ্ঞানের দ্বারা করেন তা'হলে আপনার বুঝে আসবে যে, ইসলাম কার্যকরী শক্তি সমূহের কোন শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পাথরের ন্যায় নিঃশ্চল করে নাই এবং উহাকে এমন ভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছেড়েও দেয় নাই যে, যা ইচ্ছে তাই করবে। বরং মানবিক চাহিদা গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক শক্তির কার্যসীমা নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। যথাঃ—আত্মতুষ্টির আকাংখা শক্তির কাজ হল নরম ও মুলায়েম বস্তু আহরণ এবং বীরত্ব শক্তির কাজ অনিষ্টের প্রতিরোধ। অতএব ইসলাম জানিয়ে দিয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে নরম ও পছন্দনীয় বস্তু কোনটি ? অতঃপর এ জানিয়ে দিয়েছে যে, যদি এইসব বস্তু মুলায়েম ও পছন্দীয় হয়ে থাকে তবে তা আহরণের পন্থা কি ? তার ব্যাখ্যাও করে দিয়েছে যে, এই আহরণ ও সংগ্রহের পরিমাণ কত ? উহার কি পরিমাণ স্বার্থদায়ক এবং কি পরিমাণ ক্ষতিকারক ? এমনিভাবে বীরত্বশক্তির কাজ হল অনিষ্টের প্রতিরোধ। সুতরাং ইসলাম এই শক্তির সৌন্দর্য-বর্ধনের জন্য জানিয়ে দিয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে কোন কোন বস্তু ক্ষতিকারক অতঃপর যে সব বস্তু ক্ষতিকারক এবং কষ্টদায়ক ঐ গুলোকে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়। ইসলামী শিক্ষার ইহাই সেই ব্যাপকত্ব এবং যথার্থতা যার কারণে এতে এত আগ্রহ যে, তা সর্বকালে এবং সর্বস্থানে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই অনুসরণ যোগ্য।

তাওহীদ বিশ্বাস ও তাকওয়ার সার্বিক প্রভাব

ইসলামী আকীদা ও আমল সমূহের মূল শক্তি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর একথা স্পষ্ট বুঝে আসবে যে, যে সমাজ উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অভ্যস্ত সে সমাজ সন্দেহাতীত ভাবে পৃথিবীতে সবচেয়ে অধিক সভ্য, চরিত্রবান ও সুনাগরিকত্বের অধিকারী। কেননা এর ফলে তা এমন এক সমাজে রূপান্তরিত হবে যাদের অন্তরে কোন ব্যক্তি কিংবা কোন জাতির বিরুদ্ধে ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করার প্রেরণা সৃষ্টি হবেনা। এ দল সত্যের ধ্বজাধারী এবং অসত্যের জন্য লৌহ প্রাচীর কিংবা ধারাল তরবারীর ন্যায় হবে। এ দৃষ্টিতে ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, সাদা-কালো, আরব-আজম সবই সমান। জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত হিংসা-বিদ্বেষ

শত্রুতার কারণে এই দল কোন ব্যক্তি কিংবা কোন জাতির অনিষ্টের কারণ হবেনা। রাজ্য বিস্তার কিংবা রাজ তোষণনীতি এই দলের চিন্তা ফিকর বহির্ভূত। আল্লাহর সাধারণ বান্দাদের মঙ্গল সাধন এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও মমত্ববোধ জাগ্রত করার পরিবেশ সৃষ্টি করা তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে।

দ্বিতীয়তঃ এই দলের থাকবে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা। এ জন্যেই তাঁরা যে কর্মের ইচ্ছা করে দাঁড়াবে তাতে প্রবল বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও এতে তাঁরা সফলকাম হবেই। এই দলের কোন প্রভাব পতিপত্তি ও জাঁকজমক সম্পন্ন দলপতি ও একজন নির্জন বসবাসকারী ফকিরের ন্যায় নম্র ও বিনয়ী হবে। তিনি নিজের ধন দৌলতকে আল্লাহর দান মনে করে তা অকাতরে খোদার সৃষ্ট জীবের মঙ্গলার্থে উৎসর্গ করে দিবে। পরন্তু তাঁদের মধ্যে যারা ফকির ও নিঃস্ব তাঁদের হাত যদিও কপর্দকহীন হয় এবং তাদের ঘরে যদিও বা বিছানার চাটাই ও না থাকে - তথাপি তাদের চোখে থাকবে অভাবহীনতার উজ্জ্বল আলো এবং তাদের ললাটে দৃষ্টি গোচর হবে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শান্তি পূর্ণ চিহ্ন। দীন—হীন এমন কি নিঃস্ব হওয়া সত্ত্বেও তাদের চেহারায় সিকান্দার বাদশাহ শান শওকতের ন্যায় জৌলুসের উজ্জলতা এবং দরবেশ ফরিদুদ্দীনের সম্মান ও উচ্চপদ মর্যাদার ন্যায় সীমাহীন পদমর্যাদা ও সম্মান তাদের আকৃতি ও প্রকৃতিতে দৃষ্টি গোচর হবে। তাঁরা হবেন আল্লাহর জন্যে নিবেদিত এবং আল্লাহ হবেন তাদের জন্যে আপন। তারা যেদিকেই ধাবিত হবেন উন্নতি ও সফলতা তাদের পদাংক অনুসরণ করবে। (যুদ্ধ জয়ের জন্য) তাঁদের অস্ত্র এবং কামান বন্দুকেরও তত প্রয়োজন হবেনা। তাঁরা যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন সে দিকেই জাতি ও দলের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিবেন। তারা যে দেশে (যুদ্ধের) ঘোড়া দৌঁড়াবেন সেখানকার মাটি তার ধন ভাণ্ডার উগলিত করে তাদের হাতে উহার চাবি তুলে দিবে। শুধু স্থল দেশে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগেই নয় বরং বিশাল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে ও সত্যের ঝাণ্ডা সুউচ্চে ধরে রাখার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লে এই বিশাল তরঙ্গমালা ও তাদের দৃঢ় ইচ্ছার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না।

হযরত সাহাবায়ে কিরামদের স্বর্ণযুগের বিভিন্ন অবস্থা পর্যালোচনা করে আপনারা কি বলতে পারবেন যে, ঐ সমস্ত সাহাবাদের (রাঃ) ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন জাতি বা দল ঐসব গুণাবলী সম্পন্ন হতে পেরেছে।

উপরে আমি যা ব্যক্ত করলাম তাতে সামান্যতম ও কবিত্ব কিংবা পাণ্ডিত্যের বাড়াবাড়ি নেই। বরং এ এমন সত্য ঘটনা যার সাক্ষ্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আজও বিদ্যমান। পৃথিবীতে রুস্তম ও সোহরাবের মত অনেক বড় বড় বীর পুরুষের জন্ম হয়েছে, কিন্তু বলুন তো কোন দেশে বা জাতির মাঝে হযরত আলী (রাঃ) এর মত কোন বীর পুরুষের জন্ম হয়েছে কি ? যিনি নিজের জীবনের শত্রু এক বিধর্মীকে হত্যার সম্পূর্ণ সুযোগ পেয়েও শুধু এই জন্যে ছেড়ে দিলেন যে, সে তাঁর মুখে থুথু ফেলে দিয়েছিল। তিনি বল্‌লেন, এখন যদি আমি তাকে হত্যা করি তা'হলে ব্যক্তিগত আক্রোশে প্রতিশোধের আশংকা হতে পারে।

পৃথিবীতে বড় বড় ন্যায় পরায়ণ, সুবিচারক ও অনুগ্রহশীল শাসক অতিবাহিত হয়ে গেছেন। কিন্তু কোন জাতি কি হযরত ওমর (রাঃ) এর মত কোন সুশাসকের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে পেরেছেন ? যিনি তালিযুক্ত জামা পরিধান করে এবং মাটির আসনে বসে সমগ্র আরব ও ইরানের শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। যিনি গরীব বিধবার উনুনে আগুন জ্বালিয়ে খাদ্য পাকাতে ও কোন কুণ্ঠাবোধ করেন নি। দেশ ও জাতির জন্য মহান ত্যাগী লোকের সংখ্যাও মোটেই কম নয়। কিন্তু মানুষের অত্যন্ত পরিশ্রমের পরিপূর্ণ ইতিহাস ও তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর মত মহামানবের এমন কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন কি ? যখন বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীরা তাঁর বাসস্থান অবরোধ করেছিল, এমন কি এক ব্যক্তি তাঁর বাসস্থানে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করতে উদ্ধত হয়েছিল, তখনও মহান খলিফা ঐ সমস্ত লোকদের মুকাবিলায় কাহাকেও অস্ত্র ধারণের অনুমতি দেননি। কারণ তিনি ভাবলেন, কখনও যেন তাকে বিশৃংখলা সৃষ্টির মূল বলে চিহ্নিত করা না হয়।

একটু চিন্তা করুন, অপরিসীম বীরত্ব ও বাহাদুরীর সঙ্গে বিনয় ও নম্রতা এবং তাকওয়া রাজনৈতিক শক্তি সামর্থ ও দাপট সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের

সঙ্গে সম্পূর্ণ সাম্যের বরং সেবামূলক আচরণ, কঠোরতার সঙ্গে আন্তরিক অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শন, দারিদ্রের সঙ্গে পূর্ণ অভাবহীনতা ও আত্মিক শান্তি, পরিপূর্ণ ধন দৌলতের মালিক হয়েও আশ্চর্যজনক আত্মভোলা স্বার্থহীনতা, বংশগত পক্ষপাতিত্বের বিষাক্ত পরিবেশে লালিত পালিত হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন হল যে, ইসলাম গ্রহণ করে একে অন্যের ভাই হয়ে গেল। একে অন্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হল। যদিও মূর্খ যুগের বংশগত বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যে তাদের মাঝে কতই না যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে। আর আজ এর সম্পূর্ণ উল্টো অবস্থায় নিজের প্রিয়দের, নিকট আত্মীয়দের এবং বন্ধুদেরকে আল্লাহর পথে হত্যা করতেও প্রস্তুত। অথচ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যাদেরকে সাহায্য ও সহানুভূতি করা এবং শত্রুপক্ষের প্রতিরোধ করা তাদের জীবনের প্রধান কর্তব্য ছিল। সারকথা এই যে, সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী ও পরস্পর বিরোধী চরিত্র মাঝে এমন তুলনামূলক ও ভারসাম্য অবস্থা কি সাহাবাদের দল ব্যতীত অন্য কোন দলে পাওয়া যেতে পারে? যাদের দৃষ্টিভংগী ও আমল এক অসাধারণ প্রভাবের অধীনে অতিশয় ভারসাম্য ও সুসভ্য অবস্থায় পৌঁছেছিল। যারা সর্বপ্রকার ব্যক্তিসত্বাকে বিস্মৃত হয়ে নিজেই নিজেকে এক মহান ও মর্যাবান সত্বা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে নিয়েছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পর থেকে হযরত আলী (রাঃ)-এর যুগ পর্যন্ত খিলাফতে রাশেদার ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করলে অবগত হওয়া যাবে যে, ঐ সমস্ত গুণাবলী ও পূর্ণত্ব একমাত্র খিলাফতে রাশেদার যুগেই অধিকতর পরিপূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে নবুওতের যুগ ব্যতীত ইসলামের পুরো ইতিহাসে সবচেয়ে অধিক গৌরবোজ্জল ও কৃতিত্বের যুগ এটাই। এই যুগের শাসন পদ্ধতি প্রকৃত অর্থেই যে কোন রাষ্ট্রের জন্য উত্তম শাসনতন্ত্র বলা যেতে পারে। অতএব সেই খিলাফতে রাশেদার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্ণিত হল।

খলিফাদের সরলতা

খুলাফায়ে রাশেদীন অতিশয় সরল জীবন-যাপন করতেন। বাহ্যিক শান শওকত তাদের মাঝে দৃষ্টি গোচর হত না। হযরত আবু বকর (রাঃ)

খলিফা হওয়ার পূর্বে কোন এক মহিলার ছাগলের দুগ্ধ দোহায়ে দিতেন। তিনি যখন খলিফা হলেন তখন মহিলাটি বললো, "এখন আমাদের ছাগলের দুধ-কে দুইয়ে দিবে?" হযরত আবু বকর (রাঃ) ইহা শুনে বললেন, খিলাফতের দায়িত্ব ভার আমাকে খোদার সৃষ্ট জীবের সেবা করা হতে বিরত রাখতে পারবে না।

হযরত ওমর (রাঃ) যেভাবে সরল জীবন যাপন করতেন বিশ্ব ইতিহাস অনুরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে অক্ষম। তার এমন প্রতাপ ছিল যে, তার সেনাদল ইরানের দুর্ধর্ষ 'শাসানী' সম্প্রদায়ের রাজ সিংহাসন উল্টে দিয়ে ছিল। রোম সম্রাট ও পারস্য সম্রাটদের সামনে যখন তার নাম উচ্চারিত হত তখন তাদের শরীরে কম্পন সৃষ্টি হত। হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) এবং হযরত খালেদ ইবনে ওলীদের মত সেনাপতিদের নিকট হতেও যখন কৃত কর্মের কৈফিয়ৎ তলব করা হত তখন কারও কি সাধ্য আছে যে, তাদের ললাটে অসন্তোষ কিংবা আদেশ লংঘনের চিত্র পরিলক্ষিত হয়? কিন্তু এইরূপ প্রতাপ প্রতিপত্তি ও উচ্চ পদমর্যাদা থাকা সত্বেও সরলতার অবস্থা এমন ছিল যে, শরীরে তালিযুক্ত জামা মাথায় ছেড়া পাগড়ী এবং পায়ে অতি সাধারণ জুতো থাকতো। ভ্রমণকালে এই মহান খলিফার জন্যে কোন বিরাট তাবু কিংবা রাজ মহলের প্রয়োজন হত না। ভ্রমণ করতে করতে যেখানেই নিদ্রা আসতো সেখানেই কোন বৃক্ষের ছায়াতলে শুয়ে পড়তেন। নিজ বাসস্থানের জন্য প্রহরী কিংবা দেহরক্ষীর কোন ব্যবস্থা ছিল না। যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময় নির্বিবাদে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতো এবং নিজের প্রয়োজনীয় কথা বর্ণনা করতে পারতো। সর্বোপরি খিলাফতের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি এমন সজাগ দৃষ্টি ছিল যে, নিজেই গরীব ও অসহায় লোকদের খবরা-খবর নিতেন। আর প্রয়োজন বোধে তাদের গৃহকর্মও সম্পাদন করতেন। বাজার হতে সদায় পাতি কিনে আনতেও কোন লজ্জানুভব করতেন না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে কাসীর বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত আলী রঃ) তার খিলাফতের সময়ে বাজারে গমন করেন এবং এক দিরহাম মূল্যের ফল ক্রয় করে নিজের

জামায় রেখে নিজেই বহন করে নিতে ছিলেন। এমতাবস্থায় রাস্তায় এক ব্যক্তি বলল, হে আমীরুল মুমেনীন! নিজের বোঝাটা কাহাকেও দিয়ে দিন। তিনি প্রতি উত্তরে বললেন, ابو العيال احق بحمله অর্থাৎ "সন্তান-সন্ততিদের অধিপতি ব্যক্তির এই বোঝা বহন করা অধিক সঙ্গত।"

রাজ কোষের সংরক্ষণ

স্বার্থত্যাগ আত্মত্যাগ এবং নিষ্ঠা ও সর্বকাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বাসনা থাকার কারণে খুলাফায়ে রাশেদীন রাজকোষের প্রতিটি পয়সা অতি যত্নের সাথে সংরক্ষণ করতেন এবং তা যথাযথভাবে খরচ করার ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতেন। তারা রাজকোষের অর্থকে জাতির আমানত বা গচ্ছিতধন মনে করতেন। তাই তারা এর একটি কপর্দক ও ব্যক্তিগত কিংবা পরিবারের কোন সদস্যের বিলাসিতার জন্য খরচ করাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম মনে করতেন। খলিফাগণ রাজকোষ হতে নিজ জীবন যাপনের প্রয়োজন কিছু গ্রহণ করলেও তা শুধু এই পরিমাণ হত যে, উহা দ্বারা কোন ক্রমে জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটানো সম্ভব হয়।

একদা হযরত ওমর (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসক কর্তৃক ঔষধের মধু ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। রাজ ভাণ্ডারে তখন মধু সংরক্ষিত ছিল। লোকজন বললো, এখান থেকে কিছু মধু গ্রহণ করুন। কিন্তু তিনি সাধারণ মুসলমান নাগরিকদের অনুমতি ব্যতীত তা থেকে মধু গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। অতঃপর তিনি মসজিদে নববীতে গমন করে সাধারণ মুসলমানদের নিকট হতে রাজ ভাণ্ডার থেকে মধু ব্যবহারের যথাবিহিত অনুমতি গ্রহণ করলেন। (এ ঘটনাটি 'তাবকাতে ইবনে সা'দ" নামক হযরত ওমর (রাঃ) এর ঘটনা অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দাস আবু রাফে হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফত কালে রাজকোষের ট্রেজারী অফিসার বা কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। একদা হযরত আলী (রাঃ) তাঁর কন্যাকে দেখতে পেলেন যে, একটি মোতির হার পরিধান করেছেন। তিনি চিনতে পারলেন যে, এই মোতির হারটি রাজ-

ভাণ্ডারে ছিল। হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এই হার কোথা হতে আনা হয়েছে? আমি নিশ্চয়ই এই মেয়ের হাত কেটে ফেলব! আবু রাফে' এ অবস্থা দেখে মিনতি জানাল—ওহে আমীরুল মুমেনীন! আল্লাহর শপথ! এই মোতির হার আমি তকে দিয়েছি। অন্যথায় সে উহা কোথা হতে আনতে পারতো? হযরত আলী (রাঃ) তখন বললেন দেখ আমি যখন ফাতিমা-(রাঃ) কে বিবাহ করি তখন আমার নিকট একটি ভেড়ার শুকনো চামড়া ব্যতীত (বিছানার) আর কিছু ছিল না। আমরা উভয়েই উহাতে শয়ন করতাম এবং দিনের বেলায় উহাতে উটের ঘাস ও খাদ্য রাখতাম। হযরত ফাতিমা (রাঃ) ব্যতীত গৃহস্থালী কর্ম সম্পাদনের জন্য অন্য কোন লোক ও ছিলনা।

(এ ঘটনাটির তারিখে ইবনে আসীর গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ১৫৯ পৃষ্ঠায় এবং তাবরী গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডের ৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।)

যে ভাবে রাজকোষের খরচাদির ব্যাপারে অসাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করা হত, ঠিক সে ভাবে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর পরিশোধের বেলায় ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হত যাতে কোন সরকারী কর্মচারীর পক্ষ হতে কোন অবৈধ কঠোরতা কিংবা বাড়াবাড়ির কাজ দেখা না দেয়। কোন সরকারী কর্মচারী যেন কোন নাগরিকের নিকট হতে কোন প্রকার কর আদায় করার সময় যুলুম বা অত্যাচার করতে না পারে।

ন্যায় বিচার ও সাম্যনীতি

আইন কানুন প্রয়োগের বেলায় আপন পরের কোন প্রভেদ ছিলনা। প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে এমন ব্যবহার করা হত-যা, শরীয়ত কর্তৃক অধিকার নির্দ্ধারিত আছে। বংশগত আত্মীয়তা কিংবা অন্য যে কোন নৈকট্যের ভিত্তিতে কাহার ও প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব করা হত না। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) -এর পুত্র আবু শাহমা যখন মদ্য পানের অপরাধ করল তখন তিনি নিজ হাতে পুত্রকে এমন ভাবে বেত্রাঘাত করলেন, সে প্রাণ হারাল। (ঘটনাটি 'মারেফ ইবনে কুতাইবা নামক গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।।

কুদামা ইবনে মাযউন—যিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর শ্যালক ছিলেন এবং একজন উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন সাহাবা ও ছিলেন। যখন তিনি উক্ত (মদ্যপানের) অপরাধে ধৃত হলেন, তখন তাকে প্রকাশ্যে আশিটি বেত্রাঘাত করা হ'ল।

(এই ঘটনাটি তাবাকাত ইবনে-সা'দ" নামক গ্রন্থের تذكره قدامه কুদামার বর্ণনা অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।)

মিশরের গভর্ণর হযরত আমর ইবনে-আ'স (রাঃ) সম্পর্কে যখন একজন কিবতী-রাজদরবারে তাঁর অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি সম্পর্কে অভিযোগ করল ওমর (রাঃ) তৎক্ষনাৎ তাঁকে মিশর হতে ডেকে এনে শাস্তি দিলেন। (এই ঘটনাটি হুসনুল মুহাদারা" নামক গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১ম পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।)

সর্বোপরি যদি খলিফা নিজেও কোন ব্যাপারে অভিযুক্ত হতেন, তা হলে সাধারণ মানুষের মত তাঁকে ও বিচারালয়ে উপস্থিত ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করে ঐ-রায়-বা ফায়সালা দিতেন-যা' শরিয়তের দৃষ্টিতে অন্য সাধারণ লোকের বেলায় প্রযোজ্য।

একদা চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-এর লৌহ বর্ম কোন খৃষ্টান ধর্মালম্বী নিয়ে গেল। আমিরুল মুমেনীন হযরত আলী (রাঃ) বিচারপতি শারীহ (রাঃ) এর আদালতে ইহার মুকাদ্দমা দায়ের করলেন। বিচারপতি শরিয়তের-ধারা البينة للمدعى و اليمين على من انكر (অভিযোগ কারীর জন্যে প্রমাণ পেশ করা এবং অস্বীকার কারীর জন্য শপথ গ্রহণ করে বলা) অনুযায়ী হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট হতে সাক্ষী তলব করলেন। হযরত আলী (রাঃ) প্রতি উত্তরে বললেন, আমার কাছে এর কোন প্রমাণ নেই। তখন বিচারপতি শারীহ (রাঃ) ইহা-শ্রবণ করে হযরত আলী (রাঃ) এর বিপক্ষে রায়-বা-ফয়সালা দিয়ে দিলেন। (ঘটনাটি তারিখে ইবনে আসীর গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ১৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।)

হযরত ওমর (রাঃ) একজন মহা প্রভাবশালী-খলীফা হওয়া সত্বে ও একদা উবাঈ-ইবনে কা'ব-এর সঙ্গে তার ঝগড়া হল। বিচারপতি যায়দ ইবনে সাবিত (রাঃ) এর আদালতে এ ব্যাপারে মুকাদ্দমা দায়ের

করা হল। হযরত ওমর (রাঃ) আদালতে উপস্থিত হলে বিচারপতি তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়ালেন এবং নিজ আসন হযরত ওমরের জন্য ছেড়ে দিলেন। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বিচারপতিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, প্রাথমিক পর্যায়ে আপনি এই মুকাদ্দমায় যে আচরণ করলেন, তা অন্যায়। এই বলে তিনি অভিযুক্ত সাথীর সঙ্গে বসে পড়লেন।

খলিফা নির্বাচন

রাষ্ট্রীয় খলিফার নির্বাচন জনগণের ভোটে হত। অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোকেরা নির্বাচন করতো মুসলানদের প্রতিনিধিত্বের যোগ্য এবং যাদের সঠিক সিদ্ধান্তের উপর সকলেরই আস্থা ছিল। এমন নয় যে, কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি জীবদ্দশাতেই নিজের ছেলে কিংবা চাচা-ভাতিজার জন্যে মুসলমানদের নিকট হতে অগ্রিম 'বায়াত' বা শপথ নিয়ে নিবে, কিংবা তাকে খলিফা হিসাবে নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করে জগৎ হতে বিদায় নিবে।

সরকারী কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান ও তাঁদের হিসাব গ্রহণ

খুলাফায়ে রাশেদীন নিজেরা যেমন ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সাধুতা, সরলতা এবং নিঃস্বার্থপরতা ও উদারতার জীবন যাপন করতেন ঠিক তেমনিভাবে সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য দায়িত্ব পূর্ণ পদের লোকদের বেলায় ও কড়া দৃষ্টি রাখতেন, যাতে তাঁরা ও তাঁদের মত জীবন যাপন করেন। প্রথমতঃ তাঁদের উল্লিখিত পদে নির্বাচনটাই অতি সাবধানতা ও সতর্কতার সাথে হত। অতঃপর নির্বাচিত হওয়ার পরে প্রত্যেকের নিকট হতে এই মর্মে অঙ্গিকার নেয়া হত যে, তিনি তুর্কী ঘোড়ায় অরোহণ করবেন না, মিহিন কাপড় পরিধান করবেন না, ছানাযুক্ত আটার রুটী ভক্ষণ করবেন না, গৃহের দ্বারে প্রহরী নিয়োগ করবেন না এবং অভাবী ও প্রয়োজনে স্বাক্ষাৎ কারীদের জন্যে সদাসর্বদা গৃহদ্বার খোলা রাখবেন। (এই ফরমান 'তুবারী' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।)

প্রত্যেক কর্মচারীর আয়-ব্যয় এবং অন্যান্য আসবাব পত্রের প্রতি তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখা হত। যদি কোন কর্মচারীর আসবাবপত্র কিংবা তার আয়ের চাইতে ব্যয়ের পরিমাণ বেশী অনুভব করা হত তবে তৎক্ষণাৎ তার মাল

সম্পত্তির হিসেব নেয়া হত। হিসাবের গরমিল হলে আধা আধি করে বিভক্ত করা হত। ('ফতহুল বুলদান' নামক গ্রন্থে এরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আছে।)

প্রকাশ থাকে যে, হযরত ওমর (রাঃ) কর্মচারীদেরকে কর্মস্থলে প্রেরণের সময় খাওয়া দাওয়া এবং পরিধানের পোষাক সম্পর্কে যে সব অঙ্গিকার নিতেন এর অর্থ কখনও এই নয় যে, ভাল খাদ্য গ্রহণ এবং মিহিন পোশাক পরিধান করা হযরত ওমর (রাঃ) এর নিকট নাজায়েয বা হারাম ছিল। বরং উদ্দেশ্য এই ছিল যে, মুসলমানদের মধ্যে আত্মসংযমের অভ্যাস হউক। তাঁদের জীবন যাপন সৈনিকের ন্যায় হউক এবং সকলেরই জীবন পদ্ধতি এক ধরণের হউক। একদা হযরত ওমর (রাঃ) কে সাদা রুটী সম্ভবতঃ ময়দার হবে; পরিবেশন করা হল। তিনি প্রশ্ন করলেন, সকল মুসলমানই কি এরূপ খাদ্য খায়? উত্তর 'না' বাচক হল। তখন তিনি বললেন, যাক তবে আমিও ইহা খাব না।

একদা হযরত উতবা ইবনে ফারকাদ আস সালমী (রাঃ), যিনি আযারবাইজানের অফিসার বা কর্মচারী ছিলেন হযরত ওমর (রাঃ) এর সমীপে তিনি কিছু বিশেষ ধরণের হালুয়া বা মিষ্টান্ন কাগজে প্যাকেট করে উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) ইহা দেখে বললেন, "উহা ফেরৎ দিয়ে দাও"। তার সঙ্গে সঙ্গে উতবা (রাঃ) কে লেখলেন, আপনি নিজে এবং আপনার পিতার কষ্ট ও পরিশ্রম ব্যতীত কি এ ধরণের মিষ্টান্ন ভক্ষণ করেন? স্মরণ রাখবেন, আমরা ঐ সমস্ত বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তু ভক্ষণ করবো না যা সাধারণ মুসলমানগণ নিজ গৃহে পরিতৃপ্তির সাথে ভক্ষণ করতে পারেন।

খুলাফায়ে রাশেদীনের চরিত্রেই কি উল্লিখিত গুণাগুণ সীমাবদ্ধ? যেসব জামায়াত বা দল সোজাসুজি নবুওতের প্রদীপ শিখা হতে আলো প্রাপ্ত হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই একটি উজ্জ্বল সূর্য্য তুল্য নক্ষত্রের ন্যায় ভাস্বর। ইহাতে কোন সন্দেহ নেই যে, সর্বযুগে প্রত্যেক সম্প্রদায়েই সৌন্দর্য মণ্ডিত বড় বড় মহৎ লোকের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত মেলা বড়ই কঠিন যে, আরবের বেদুঈনদের মত অসভ্য ও বর্বর প্রকৃতির লোকদের

মধ্য হতে হঠাৎ করে একটা এমন বিরাট দল সৃষ্টি হয়ে গেল যার প্রতিটি সদস্য সুন্দর কাজকর্ম ও মন-মানসিকতায় আকাশের উজ্জ্বল চন্দ্র সূর্যের ন্যায় দীপ্ত হয়ে থাকবে। যাঁরা ধ্যান ধারণা ও দৃষ্টিতে এবং কর্মে ও চরিত্রে সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করে শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হতে এমন একটি সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে যে, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে মুসলমানদের যে জামা'য়াত বা দল সৃষ্টি হ'ল তাঁরা -চিন্তা-ফিকর-বা ধ্যান ধারণার দিক দিয়ে তাওহীদের উপর পূর্ণ আস্থা ও দৃঢ় ঈমানের অধিকারী ছিলেন। অতঃপর ব্যবহারিক দিক দিয়ে সকল কাজ কর্মে ইবাদত ও পারস্পরিক আচরণে, চরিত্রেও অভ্যাসে তাদের মধ্যে খোদাভীরুতার রুহ বা আত্মা সঞ্জীবিত ছিল। এদিক থেকে এই দল ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে অধিক কল্যাণকামী। কল্যাণকামী দল হিসেবে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই এই দলের সবার উপর প্রাধান্য বিস্তারের অধিককার ছিল। অতএব, একারণেই মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে শুভ সংবাদ প্রদান করা হল—وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ۝ 'তোমরা শৈথিল্য করোনা ও চিন্তিত হয়োনা এবং তোমরাই হবে সমুন্নত, যদি তোমরা (প্রকৃতপক্ষে) বিশ্বাসী হও"। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাদেরকে নিজের দল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের জন্য বিজয়ের অঙ্গীকার করেছেন। আল্লাহ বলেন - أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ "সাবধান। নিশ্চয়ই আল্লাহর দলই (পরিণামে) বিজয়ী হবে।" এ প্রসঙ্গে জাতীয় কবি আল্লামা ইকবাল বলেন یقیں محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی

میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں

দৃঢ়বিশ্বাস, নিয়মিত কার্যক্রম, বিশ্ববিজয়ী ভালবাসা, আর জীবন যুদ্ধে ঐ সমস্ত বীর পুরুষদের তরবারী সমূহ থাকবে নিবেদিত।

এতে সন্দেহ নেই যে, দৃঢ়বিশ্বাস এবং নিয়মিত আ'মল (কর্ম)-এমন দুটি অস্ত্র, যা' দ্বারা যে কোন জাতি নিজের শত্রুদের উপর বিজয়ী হতে পারে। কিন্তু আমি ইতিপূর্বে, যা কিছু বললাম, তা কেবল মুসলিম

সন্তানদেরই বৈশিষ্ট্য। তবে কথা হচ্ছে যে এই দৃঢ়বিশ্বাস কিসের? বংশগত, দেশগত কিংবা আমলের দিক থেকে অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্যে নয় বরং অনন্ত অসীম মহা প্রভুর কুদরতী হস্ত আলোকিত করার নিমিত্ত।"

আবার এই জাতি নিয়মিত আমল (কর্ম) তো করবেই, তা সেই ঈমানী চিন্তাধারারই প্রভাবে এরি ভিত্তিতে মুসলমানদের দৃঢ়বিশ্বাস এবং নিয়মতান্ত্রিক আমল নিজেদের মাঝে এমন উন্নত বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করবে যে, তাওহীদের দৃঢ়বিশ্বাস এবং কর্ম সমূহে খোদাভীরুতার ছোঁয়া ব্যতীত কারও মাঝে তা সৃষ্টি হবে না।

তৃতীয় যে বস্তুর কথা আল্লামা ইকবাল বলেছেন তা হচ্ছে ভালবাসা' যা'কে তিনি অভিহিত করেছেন বিশ্বজয়ী শক্তি হিসেবে। দৃঢ়বিশ্বাস এবং নিয়মিত আমলের মত এই ভালবাসাও মুসলমানদের ন্যায় অন্যান্য জাতিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মুসলমানদের ভালবাসা এবং তাদের বিশ্বাস ও কর্ম অন্যান্য জাতির ভালবাসা ও কর্ম হতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাদের ভালবাসা ব্যক্তি কেন্দ্রিক কিংবা ব্যক্তিগত আশা আকাংখা চরিতার্থের উপর ভিত্তি করে নয় বরং আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে ঐ ভালবাসার মূলমন্ত্র মানবীয় ভ্রাতৃত্ববোধ ও আন্তরিকতা এবং সকল কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রেরণার উপর ভিত্তি করে রচিত। এরূপ ভালবাসাকেই حب فى الله বা আল্লাহর জন্যে ভালবাসা বলা হয়। এই ভালবাসার ফল এমন যে, মুসলমান যদি অন্য কোন জাতির সাথে যুদ্ধও করে তথাপি তাতে রাজ্য বিস্তারের আকাংখা কিংবা রাজ্য শাসনের প্রেরণা সৃষ্টির কোন মনোভাব থাকেনা বরং আল্লাহর বান্দাদের সংশোধন ও সরল পথ প্রদর্শন এবং বিশেষ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছায় সত্যের বাণী সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে এ জন্যে তাঁরা সাধারণ বিশ্ববিজয়ীদের মত বিজিত জাতির সাথে অনভিপ্রেত যুলুম ও কঠোর আচরণ করেন না, বরং দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নির্দেশিত বিধি নিষেধের অনুসরণ করেন। এ প্রকার আল্লাহ প্রদত্ত সন্ধির প্রভাব ও ফলাফল এই হয় যে, বিপক্ষ তাদের আক্রমণ, হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার পথ পরিহার করে যখন তা'দের আভ্যন্তরীণ পবিত্র অনুভূতি সমূহ ও প্রেরণা সমূহের

হিসাব নেন তখন তাদের শত্রুতা ভালবাসার রূপ নেয়, আর পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ রূপান্তরিত হয় বন্ধুত্ব ও সহাভূতিতে।

ফলে মুসলমানরা শুধু দেশের ভূমিই জয় করেননি বরং নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করার প্রেরণা এবং মানবীয় কল্যাণ চিন্তা ও উত্তম বন্ধুত্বের কারণে দেশবাসীর অন্তর ও জয় করে নেন। এ কারণেই ইরান যুদ্ধে চার হাজার ইরানী সৈন্য এক যোগে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল এবং নিজেদের মিত্র পক্ষ ছেড়ে মুসলমানদের যুদ্ধ সারিতে এসে মিলিত হয়েছিল। তারপর তারা দেখায়ে দিল যে, শুধু মুসলমানই হয় নাই বরং তাদের তরবারী যা' মুসলমানদের বিপক্ষে কার্যরত ছিল' এখন তাদের ছত্র ছায়ায় আন্তরিক সাহায্য ও সহানুভূতির কাজে লিপ্ত। পরিশেষে সবই হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাছ (রাঃ)-এর ঝাণ্ডাতলে সমবেত হয়ে 'মাদায়েন' এবং জালুলার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে বিজয়ী হয়েছিলেন।

সিন্ধু বিজয়ী মুহাম্মদ-বিন কাসিমকে কোন্ ব্যক্তি না চেনে? তিনি সিন্ধুর শত্রুপক্ষকে কি পরিমাণ ধ্বংস করেছিলেন, তা সকলেরই জানা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী চরিত্র ও সদাচার দ্বারা বিজিতদের অন্তরও জয় করেছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লামা বালাযুরী (রঃ) বলেন যে, ইয়াযিদ ইবনে আবি কাবশা আস সাকসাকি যখন সিন্ধুর নবনিযুক্ত গভর্ণর হয়ে এলেন এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমকে বন্দী করে ইরাক যাত্রা করেন, তখন সিন্ধুর আবাল বৃদ্ধ বণিতা ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ল এবং তারা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে তার প্রতিকৃতি তৈয়ার করে স্বযত্নে ঘরে রাখলো। (এ ঘটনাটি ফতহুল বুলদান গ্রন্থের ৪২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।)

প্রাসঙ্গিক কারণেই আমি ভালবাসার এই বর্ণনা প্রদান করলাম। অন্যথায় এর কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা তাওহীদের বিশ্বাস ও খোদাভীরুতা, এ,দুটি এমন মৌলিক বিষয় যার উপর চরিত্রের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত। চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে ভালবাসা ও একটি বৈশিষ্ট্য চারিত্রিক 'দর্শনে ন্যায়বিচারকে চরিত্রের সামগ্রিক

বৈশিষ্ট্য বলা চলে। আমরা বলতে পারি যে, তাওহীদের বিশ্বাস এবং খোদাভীরুতা এ দুটি গুণের প্রভাব এমন যে, মানুষের মধ্যে যখন ন্যায় বিচারের উন্মেষ ঘটে তখন সে দর্শন ও কর্ম এই উভয় শক্তিতে পূর্ণত্ব ও বৈশিষ্ট্য অর্জনে সক্ষম হয়। তখন এই জাতির মাঝে এক অসাধারণ শক্তি সামর্থ এবং কষ্ট সহিষ্ণুতা অর্জনের বীরত্বপূর্ণ সাহস সৃষ্টি হয় যার ফলে অন্যান্য দল তাঁদের সামনে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়ে যায় এবং এই দলের অসাধারণ ইস্পাত কঠিন দৃঢ় আকাঙ্খা দেখে মহা প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তির ও হিম্মত টুটে যায়।

হযরত নুমান ইবনে মুকরান (রাঃ) এর তত্বাবধানে সুফরায়ে ইসলাম ইরানের শাহান শাহ ইয়াযদে গেরদ এর দরবারে যখন উপস্থিত হলেন তখন ইরানের প্রথানুযায়ী রাজদরবার এমন জাঁকজমকের সাথে সুসজ্জিত করা হল যা দর্শকের চক্ষুকে ঝলসিয়ে দেয়। কিন্তু এই সুফরায়ে ইসলাম-ই যখন আরবীয় লম্বা জামা পরিধান করলেন কাঁধে লম্বা চাদর ফেলে এবং হাতে ছড়ি (লাঠি) নিয়ে এবং মোজা পরিধান করে অসাধরণ বীরত্ব এবং সীমাহীন জাঁকজমকতার সাথে রাজদরবারে প্রবেশ করেন তখন তাঁর চেহারায় এমন ভীতিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হতো যা দেখে ইরানের শাহান শাহ্ পর্যন্ত ভীত হয়ে যেত।

আবু রিজাউল ফারেসী এর দাদা যিনি পরবর্তীকালে মুসলমান হয়ে ছিলেন তিনি বর্ণনা করেন যে, আমি কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম এবং ইরানীদের পক্ষ হয়ে মুসলমানদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে ছিলাম। প্রথমতঃ আরব মুসলমানরা যখন আমাদের উপর তীর নিক্ষেপ করত তখন আমরা বল্‌তাম, 'এই তীর কিসের? ইহাতো "ফলকহীন তীর"। কিন্তু পরিশেষে এই ফলকহীন তীরই আমাদেরকে ধ্বংস করে দিল। আমাদের দিক হতে যে সব তীর নিক্ষেপ করতাম, উহা মুসলমানদের কাপড়ে যেয়েই আটকে যেত। কিন্তু মুসলমানদের পক্ষ হতে যেসব তীর আসতো তা, কঠিন লৌহ বর্ম পর্যন্ত ভেদ করে বের হয়ে যেত। (ফতহুল বহুলদান পৃঃ ২৬০ঃ)

এ রকম আরও একটি ঘটনা শুনুন, ইরানীদের পরাজিত সৈন্যগণ-কাদেসীয়া হতে পলায়ন করে' মাদায়েন চলে গেল। মধ্য পথে ছিল দজলা

নদী। ইরানীরা নদী পার হয়ে-সমস্ত নৌকা তীরে তুলে নিল এবং নদীর উপরের পুল আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিল যেন মুসলমানগণ নদী অতিক্রম করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে না পারে। কিন্তু মুসলানগণ নদীতে ঘোড়া নামিয়ে দিয়ে নদী পার হয়ে গেলেন ইরানীরা-সেই দৃশ্য দেখে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, অল্লাহর কসম, তোমরা তো মানুষের সাথে নয়-, জিনের সাথে যুদ্ধ করছ। (ফতহুল বুলদান-পৃঃ ২৬৩ দ্রঃ)

এখন বলুন তো! এমন দৃঢ় মনোবল ও চরিত্র কি আধ্যাত্মিক শক্তি ব্যতীত কোন জাতিতে সৃষ্টি হতে পারে? কখনও নয়। সুতরাং ঈমানও আমলের এই উচ্চ স্তরে উপনীত হয়ে সাহাবা কিরামের দল সফলকাম, সব চেয়ে অধিক-সুসভ্য ও কল্যাণকামী হতে পেরে ছিলেন। সত্যিকার ভাবে প্রাকৃতিক নিয়মেই এই দলের সকলের উপর প্রাধান্য বিস্তারের অধিকার চিরকালের। পরিশেষে তাই হ'ল এবং এরূপ হওয়াই ন্যায় সঙ্গত। ইতিহাসের পৃষ্ঠা-তাঁদের গৌরবময় কীর্তিতে পরিপূর্ণ। আর এই ভিত্তিমূল তাই যা' ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদবাণী

পরিতাপের বিষয় যে, মুসলমানদের এই গৌরবোজ্জল স্বর্ণ যুগ বেশী দিন স্থায়ী ছিলনা। আর থাকবেই বা-কি করে? যখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেই এমন সত্য ভাষণ দিয়ে গেছেন যে,

خیرامتی قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم
ثم ان بعدکم قوما یشهدون ولا یستشهدون ویخونون
ولا یؤتمنون وینذرون ولا یفون ویظهر فیهم السمن
(صحیح بخاری)

"আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম যুগ আমার যুগ। অতঃপর তৎসংলগ্ন যুগের অধিবাসীদের যুগ। অতঃপর তৎসংলগ্ন অধিবাসীদের যুগ। তারপর তোমাদের পরে এমন এক জাতির আবির্ভাব ঘটবে যারা সাক্ষ্য দিবে, অথচ তাদের নিকট হতে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা হবে আমানত ভঙ্গকারীর দল, আমানত রক্ষাকারী তারা হবে না। তারা (বিপদে

পড়ে) মান্নত করবে-কিন্তু উহা পূর্ণ করবেনা। তাদের (শরীরে) মেদ বৃদ্ধি পাবে—"।(১)

ইরশাদ হল—

ان هذا الامر بدأ رحمة ونبوة ثم يكون رحمة وخلافة
ثم كائن ملكا عضوضا ثم كائن عتوا وجبرية وفسادا فى
الارض يستحلون الحرير والفروج والخمور ويرزقون
على ذلك وينصرون حتى يلقوا الله

"এই রাজত্বের প্রারম্ভ রহমত এবং নবুওত দ্বারা হয়েছে। অতঃপর ইহা রহমত ও খিলাফতে রূপান্তরিত হবে। তৎপর অত্যাচারীর রাজত্বে পরিবর্ত্তিত হবে। অতঃপর বিদ্রোহ, কঠোরতা এবং পৃথিবীতে হবে বিশৃংখলা। মুসলমান বাদশাহগণ রেশমী-পোশাক ও মদ্যপানকে-হালাল মনে করবে, অবৈধ যৌন কার্য্যে লিপ্ত হবে। আর এতে তাদের পরিপূর্ণ সুযোগ ও সাহায্য মিলবে। এই ভাবে তারা খোদার সাথে মিলে যাবে। অর্থাৎ মৃত্যু ঘটবে।" (আল বেদায়া ওয়ান্নেহায়া গ্রন্থের ৮ম খন্ড, পৃঃ ২০ দ্রঃ)

উল্লিখিত ভবিষদ্বাণীতে লক্ষণীয় বিষয় যে, হযরত মুহাম্দ (সাঃ) পরপর আগত যুগকে উত্তম যুগ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উৎকৃষ্টতার দিক দিয়ে তিনটি যুগ সমান নয়। কেননা আরবী-ভাষায় "সুম্মা" শব্দটি যে ভাবে পশ্চাৎযুগের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে ঠিক তেমনি ভাবে মর্যাদায় পশ্চাতের অর্থ ও তাতে স্পষ্ট বুঝা যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত

টীকা

(১) হাফিয ইমামুদ্দীন ইবনে কাসীর (মৃত্যু-হিঃ ৭৭৪) তিরবানী কিতাবে আর ও একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে ঝগড়া ফাসাদ এবং অত্যাচারের রাজত্বের কতক চিহ্নের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, ইসলামের ইতিহাসে প্রথম থেকে অদ্যাবধি- যা কিছু বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে এবং রাজনীতিতে যে সব পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে এ সবের একটা সামগ্রিক চিত্র হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে প্রথমেই দেখানো হয়েছিল।

হাদীসের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইসলামের সর্বোত্তম যুগ বলতে ঐ যুগকে বুঝায় যে যুগে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাব ঘটেছিল এবং পৃথিবী ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়ে ধন্য হয়েছিল। এর পর সাহাবাদের যুগ উত্তমযুগের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নবুওতের যুগ হতে এ যুগের মর্যাদা কম। এমনি ভাবে তাবেঈনদের যুগ ও উত্তম যুগের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এতে সাহাবাদের যুগের মত তত কল্যাণ হবেনা। অন্য অর্থে একথাও বলা যায় যে, উল্লিখিত হাদীসের ঐ দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, সাহাবাদের যুগে এমন কিছু ঘটনার আবির্ভাব ঘটবে, যাকে মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের ইতিহাসের প্রথম দ্বার বলা হবে। তখন থেকেই মুসলমানদের প্রকৃত সঞ্জিবণী শক্তির অধঃপতন শুরু হবে। তাবেঈনদের যুগে এই অধঃপতনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এই উভয় যুগের অধঃপতন ও দুর্দশা অবোধগম্য। এই জন্য সার্বিক চিন্তাধারা আগত ভবিষ্যতের অনুপাতে এই যুগ ও উত্তম যুগের অন্তর্ভুক্ত হবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যদি কোন বস্তু সম্পূর্ণ সাদা হয় তবে উহাতে কালোর কোন চিহ্নই থাকে না। কিন্তু যখন বস্তুটির সাদা রং ক্রমে কমতে থাকে তখন যে গতিতে উহা কমতে থাকবে সেই গতিতে সাদার উল্টো রং কালো বাড়তে থাকবে। প্রথমতঃ উহা খুব একটা অনুভব করা যাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন এক সময় আসবে যে, কালো রং সমস্তটিকে ঘিরে ধরবে। তখন কারোও ধারণা ও হবে না যে, উহা কোন এক সময় সাদা ছিল। কিংবা দৃষ্টান্ত স্বরূপ এও বলা যায় যে, যৌবনকাল অতিবাহিত হওয়ার পর শারীরিক শক্তিতে ক্রমশঃ দুর্বলতা ও অধঃপতন সৃষ্টি হতে থাকে। তবে প্রথমতঃ এ অবস্থা খুব একটা বুঝা যাবে না। কোন বিজ্ঞ ডাক্তার ব্যতীত কোন ব্যক্তিই এই দুর্বলতার অবস্থা অনুভব ও করতে পারে না। অতঃপর যৌবনের সূর্য যখন অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হয়ে জীবন সায়াহ্নে অন্ধকার বিস্তার করে এবং সমস্ত সৃষ্ট জগতের প্রতিটি বস্তুই তার কাছে অন্ধকারময় ও নিবু নিবু দৃষ্টি গোচর হয়, এমন সময় মানুষের জীবনেব অধঃপতনটা পরিপূর্ণ ভাবেই অনুভূত হয় এবং তখনই হারানো দিনের ক্ষতিপূরণের চিন্তা হয়।

মহানবী (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হ'ল। এতে সামান্যতম সন্দেহ ও নেই যে, প্রত্যেক সাহাবা (রাঃ) ব্যক্তিগত জীবনে ঈমান ও আমলের দিক দিয়ে আকাশের চন্দ্র সূর্যতুল্য উজ্জ্বল ছিলেন। এ সম্পর্কে নবীর বাণী হ'ল - "তাঁদের (সাহাবাদের) মধ্য হতে যে কোন ব্যক্তিকে তোমরা অনুসরণ করবে, সরল পথের সন্ধান পেয়ে যাবে।" কিন্তু ঘটনা এই যে, ইসলামের সেই দৃষ্টান্তহীন সার্বিক জীবন বিধান যা নবুওতের যুগ এবং পরবর্তী তৃতীয় খলিফার যুগ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হত্যা কান্ডের (৩৫ হিজরীর) পর পূর্ববর্তী অবস্থা আর স্থায়ী ছিলনা। ভালর সাথে মন্দ মিশ্রিত হলো। হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) এর যুগের বিভিন্ন বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু এই উভয় মহামানব স্বীয় অসাধারণ ধর্মীয় অনুভূতি, বীরত্ব ও হিম্মতের দ্বারা ঐ গুলোর এমনভাবে মূলোৎপাটন করলেন যে, দ্বিতীয় বার আর মাথা চাড়া দিয়ে উঠার কোন সুযোগ ছিল না।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদাত

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে এমন এক হৃদয় বিদারক ও লোম হর্ষক ঘটনা যার দৃশ্যপট মুসলমানদের সামগ্রিক জীবন বিধানের মাঝে একটা বি-কেন্দ্রিক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। আর এতে বিশৃংখলা ও ঝগড়া ফাসাদের এক বিরাট দ্বার উদঘাটিত হয়ে গেল। এ দুর্ভাগ্যের কালো ছায়া অনাগত ভবিষ্যৎ কালের দিন গুলোতে ও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। তৃতীয় খলিফা যিন্নুরাইন হযরত ওসমান (রাঃ) এর নিষ্ঠুর হত্যা কান্ডের ব্যাপারে কোন দুর্ভাগার বিরূপ কথা থাকতে পারে ? কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, যদি হযরত ওসমান (রাঃ) ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার স্থলে ফারুকে আযম (রাঃ)-এর বীরত্ব পূর্ণ কর্ম তৎপরতার ন্যায় তৎপর হতেন, তা হলে বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ উল্টে যেত। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে সাবা এর মত মুনাফিকের হিংসাত্মক গোপন তৎপরতা ও কোন কার্যকরী সফলতা অর্জন করতে পারতো না। আর মিশর ও ইরাকের দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের খেলাফতের বিপক্ষে বিদ্রোহের ঝান্ডা উত্তোলন করার অশালীন হিম্মত ও হতোনা। হযরত ওসমান (রাঃ) অকাতরে

জীবন দিয়ে ছিলেন। কিন্তু বিশৃংখলা সৃষ্টির ভয়ে কেন বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের অনুমতি দিলেন না। যা হউক, বিধাতার যা বিধান ছিল তাই পূর্ণ হল। তৃতীয় খলিফা সীমাহীন নির্মমতা ও অত্যাচারের মাঝে শহীদ হলেন। দু'দিন পর্যন্ত মুবারক মৃতদেহ গোর-কাফনহীন অবস্থায় পড়ে ছিল। শাহাদতের রক্তে রঞ্জিত পবিত্র দেহের গোসলের কি প্রয়োজন ? তৃতীয় দিন কয়েকজন লোক জীবন হাতে নিয়ে দাফনের ব্যবস্থা করলেন।

হযরত আলী (রাঃ) এর খিলাফত যুগ

হযরত ওসমান (রাঃ) এর অসাধারণ ত্যাগ সত্ত্বে ও তাঁর যে বিষয়ের প্রতি সন্দেহ ছিল তা, যথার্থ ভাবে সঠিক প্রমাণিত হল। ইসলামের সামগ্রিক জীবন বিধানের ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ উলট পালট হয়ে গেল। তাঁর পরে হযরত আলী (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হলেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর আত্মভোলা ও নিঃস্বার্থ পরায়ণতার পরিমাপ একথা দ্বারাই অনুমান করা যায় যে, তিনি প্রথমতঃ খিলাফতের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, আমি এই দায়িত্ব ভার বহনের উপযুক্ত নই। আর ইহাতে আমার কোন প্রয়োজনও নেই। আপনারা যাঁকে ইচ্ছা করেন তাঁকেই খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করুন। আমি এতে সম্মত আছি। হযরত তালহা (রাঃ) এবং হযরত যুবায়র (রাঃ) সাহাবাদের প্রতিনিধিত্ব করতে ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) এর অস্বীকৃতি দেখে তাঁরা বললেন, মদীনায় খিলাফতের জন্য আপনার চেয়ে অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন আর দ্বিতীয়জন নেই। তখন তিনি বললেন, "এমন বলবেন না। আমি আমীর হওয়ার চেয়ে মন্ত্রী হওয়ার অধিক যোগ্যতা রাখি।" কিন্তু যখন মদীনার বড় বড় সাহাবাগণ একাধিক বার এই প্রস্তাবে দৃঢ়তা পোষণ করেন তখন তিনি জনগণের রায় বা অভিমতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে যেয়ে খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে রাজী হলেন। (ইবনে কাসীর, তৃতীয় খণ্ডের ৭৪ পৃঃ দ্রঃ)

হযরত আলী (রাঃ) এর সম্মানজনক পদমর্যাদা, খোদাভীরুতা, সততা আন্তরিকতা এবং সকল কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বাসনার প্রতি কারও কোন সন্দেহ বা সমালোচনা করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু অসুবিধা হলো এই যে, কপট মুসলমানদের ষড়যন্ত্র মূলক কর্ম এবং কিছু সংখ্যক

মুসলমানের অজ্ঞতার সুযোগে ইরাক ও শাম প্রদেশে যে আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও দলাদলি সৃষ্টি হয়েছিল তা' খুবই নাজুক অবস্থা ধারণ করল। উহা দমনের জন্য যে প্রকার অসাধারণ রাজনৈতিক পরিপক্কতা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন ছিল, হযরত আলী (রাঃ) এর মত পবিত্র আত্মা ও উন্নত চরিত্রের মানুষের পক্ষে উক্ত পদের দায়িত্ব সম্পাদন তেমন সহজ ছিল না। তিনি খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথমেই শাম প্রদেশের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন গভর্ণর আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) কে বরখাস্ত করার ইচ্ছে করলেন। মদীনায় হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মত সম্মানিত এবং রাজনীতিতে পরিপক্ক সাহাবা বসবাস করতেন। তাঁরা হযরত আলী (রাঃ) কে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, আপনি যদি অগত্যা আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) কে শাম প্রদেশের গভর্ণরের পদ থেকে বরখাস্ত করতেই চান, তা' হলে প্রথমতঃ তাঁর নিকট হতে আপনার খেলাফতের বায়াত বা অনুগত্যের শপথ নিয়ে নিন। সম্ভবতঃ তিনি তাতে আপনার বিরোধিতা করবেন না। তারপর আপনি তাঁকে বরখাস্ত করতে পারবেন। অন্যথায় আপনি যদি বায়াত বা আনুগত্যের শপথ নেয়ার পূর্বেই তাঁকে শামের গভর্ণরের পদ থেকে অপসারণ করেন, তা' হলে তিনি হযরত ওসমান (রাঃ) এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের বাহানা করে আপনার বিরোধিতা করার ক্ষেত্র তৈরী করবেন এবং জনগণের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত মুগীরা (রাঃ) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উভয় বুযুর্গের অভিমত খুবই সঠিক ছিল। কিন্তু কার সাধ্য আছে যে, ভাগ্যের লিখন খণ্ডন করতে পারে? হযরত আলী (রাঃ) তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, এতে সন্দেহ নেই যে, পার্থিব কল্যাণের জন্যে আপনাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা বাঞ্চনীয় ছিল এবং আমীর মুয়াবিয়া ও তাঁর সঙ্গীদেরকে এই মুহূর্তে বহাল রাখা আমার উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমার যা' জানা আছে এর পরিপ্রেক্ষিতে এবং সত্য ও সততার খাতিরে আমার কর্তব্য হ'ল তাঁকে অপসারণ করা। তিনি যদি

আমার আদেশ মান্য করেন তবে ভাল। অন্যথায় তরবারী দ্বারাই এর ব্যবস্থা করবো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) পরিশেষে এ পর্যন্ত বললেন যে, যাক আপনার যদি উমাইয়া কর্মচারীদেরকে অপসারণের একান্ত ইচ্ছাই থাকে তবে অন্ততঃ পক্ষে আপাততঃ আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)-র ব্যাপারটি স্থগিত রাখুন। একবার কোন ক্রমে তাঁর নিকট হতে আপনার বায়াত বা আনুগত্যের শপথ নিয়ে নিন। তার পরেও যদি কোন বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় তবে আমি তা দেখবো। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ তা গ্রহণ করলেন না। শুধু আমীর মুয়াবিয়াই নন, বরং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যাঁরা হযরত ওসমান (রাঃ) এর সময় থেকে বিভিন্ন স্থানে গভর্ণর ছিলেন, তাঁদের সকলের নামেই বরখাস্তের ফরমান জারী করে দিলেন। আর তাদের স্থলে নূতন নূতন গভর্ণর নিয়োগ করলেন।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ওসমান ইবনে হানীফ (রাঃ) কে বসরার,, উমারা ইবনে শিহাব (রাঃ) কে কুফার, উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে-ইয়ামেনের, কাইস ইবনে সা'দ (রাঃ) কে মিসরের এবং সাহল ইবনে হানীফকে শাম প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করলেন। কিন্তু এই সমস্ত স্থানের পরিবেশ এমন উল্টো ছিল যে, জনগণ হযরত আলী (রাঃ) এর নবনিযুক্ত কর্মচারীদের সাহায্য সহযোগিতা করতেও প্রস্তুত ছিল না। অতএব শামের পথে যাত্রা কালে সাহ্‌ল ইবনে হানীফের সাথে তাবুক নামক স্থানে একদল লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন' আপনি কে ? তিনি উত্তরে বললেন, আমি একজন নবনিযুক্ত গভর্ণর। জনগণ বললেন, কোথাকার ? উত্তরে বললেন, শাম প্রদেশের। তখন জনগণ বললেন, আপনাকে যদি হযরত ওসমান (রাঃ) এর পক্ষ হতে পাঠানো হয় তবে শিরধার্য। অন্যথায় যদি অন্য কেহ আপনাকে নিয়োগ করে থাকেন, তবে আপনি ফেরৎ চলে যান। সাহ্‌ল ইবনে হানীফ বললেন, প্রকৃত পক্ষে যা কিছু ঘটছে সে সম্পর্কে আপনাদের কোন খবর নেই। তাঁরা প্রতি উত্তরে বললেন, কেন নয় ? এরূপ কথোপকথনের পর সাহ্‌ল ইবনে হানীফ ফেরত চলে এলেন।

এমনিভাবে উমারা ইবনে শিহাব (রাঃ)কে কুফার গভর্ণর নিযুক্ত করে প্রেরণ করলেন। পথিমধ্যে যুবালা নামক স্থানে তার সাথে তালহা ইবনে, খোয়ালেদ-এর সাক্ষাৎ হল। তালহা বললেন, আপনারা ফেরত চলে যান কেননা কুফার জনগণ তাদের বর্তমান গভর্ণরের পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তির শাসন মানতে রাজী হবে না। আর যদি আপনারা ফেরত যেতে অস্বীকার করেন, তবে আমি আপনাদেরকে হত্যা করবো। উমারা (রাঃ) দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন। এই কথোপকথনের পর তিনি ভীত হয়ে সোজা সুজি-হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট ফেরত চলে গেলেন। ইয়ামেনের আবস্থাও অনুরূপ হল। হযরত আলী (রাঃ) এখানকার গভর্ণর উবায়দুল্লাহর পরিবর্তে ইবনে আব্বাসকে নিয়োগ করলেন। তাঁর ইয়ামেন পৌঁছার আগেই ইউলা ইবনে উমাইয়া (প্রাক্তন গভর্ণর) রাজস্ব করের সমস্ত টাকা পয়সা আদায় করে মক্কায় নিয়ে এলেন।

হযরত আলী (রঃ) যখন এই সব অবস্থা অবগত হলেন তখন তিনি হযরত তালহা এবং যুবায়র (রাঃ) কে বললেন, যে বিষয়ের আমি ভয় করতে ছিলাম তাই হ'ল। যা হউক, যা' হবার তাই যখন হল তখন এর মীমাংসা ইহা ব্যতীত আর কিছুই না যে, এই অন্যায়ের দ্বার চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হবে। আর যে বিশৃংখলা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তা চিরতরে নির্মূল করে দেয়া হবে। আমার সাধ্যমত সতর্কতা অবলম্বন করবো। কিন্তু যখন অবস্থা আয়ত্বের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হবে তখন আমাকে অবশ্যই বাধ্য হয়ে অস্ত্র ধারণ করতে হবে। কেননা-দাগ লাগানোই -রোগের শেষ চিকিৎসা"।

ব্যাপারটি এ পর্যন্ত থাকলেও অবস্থা এত খারাপ হত না। হযরত আলী-(রাঃ) বর্তমান অবস্থা হয়তঃ দ্রুত গতিতে আয়ত্বে আনতে সক্ষম হতেন, কিন্তু যখন তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আমীর মুয়াবিয়ার নামে বরখাস্তের আদেশ পাঠিয়ে দিলেন এবং তাঁর নিকট হতে নিজের জন্যে খেলাফতের বয়াত' বা আনুগত্যের শপথ চাইলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) এর ধারনানুযায়ী অবস্থা খুবই-নাজুক হয়ে গেল। প্রথমতঃ তো আমীর মুয়াবীয়া

(রাঃ) বিশ—বাইশ বৎসর যাবৎ শামের গভর্ণর হিসেবে ছিলেন, এখানকার মানুষের সভাব-চরিত্র এবং-মন-মানসিকতা সম্বন্ধে তাঁর খুব ভাল জানা ছিল। তদুপরি খুবেই দানশীল এবং উপঢৌকন ও পুরস্কার প্রদানে অভ্যস্ত ছিলেন। এই জন্য শামবাসী তাঁকে খুব-ভাল বাসতো। ঐসমস্ত লোকদেরকে হযরত আলী (রাঃ) র বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা খুব কঠিন কাজ ছিলনা। এ দিকে মাযলুম খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) র হত্যার প্রতিশোধের আহবান জানিয়ে সারা দেশে (বিদ্রোহের) এক আগুন লাগিয়ে দিলেন।

অতঃপর এর সুত্র ধরে যখন আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) দামেশকের জামে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে 'হযরত ওসমান (রাঃ) র রক্তাক্ত জামা এবং তাঁর একান্ত অনুগত বিবি-নায়েলা (রাঃ) র কর্তিত তিনটি অঙ্গুলি জনগণের সামনে তুলে ধরলেন, তখন-যুবক, বৃদ্ধ সকলই অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে শপথ করতে লাগলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নিষ্পাপ খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) র হত্যার প্রতিশোধ না নেওয়া হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কারো হাতে খেলাফতের বায়াত' করবোনা। যে দূত হযরত আলী (রাঃ) র ফরমান মুয়াবিয়া (রাঃ) র নিকট নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি শাম হতে ফেরত এসে যখন সমস্ত ঘটনা হযরত আলীর নিকট বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, হে খোদা! আপনি তো সাক্ষী-আছেন যে, আমি হযরত ওসমান (রাঃ) র হত্যা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। আমিরুল মু'মেনীন আলী (রাঃ) যা' বললেন, এর সততা সম্পর্কে কোন কথা নেই। কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে যে, একদিকে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) র পরামর্শানুযায়ী কাজ না করায় একটি বড় ধরণের ভুল করলেন। অন্যদিকে মুহাম্মদ ইবনে আবি-বকর এবং আশ্তার নাখ্ঈ এর মত লোকদেরকে—যাদের বিরুদ্ধে হযরত ওসমান (রাঃ) র হত্যার কিংবা-এই অপরাধে শরীক থাকার অভিযোগ ছিল, তাঁদেরকে বড় বড় সরকারী পদ দিয়ে নিজের বিপক্ষের পরিবেশকে আরো-উত্তপ্ত করে দিলেন।

আশ্চর্যের বিষয় যে, উল্লিখিত বিষয় সমূহের উপর ভিত্তি করে শাম বাসীরা তো হযরত আলী (রাঃ) র বিরুদ্ধে ছিলেনই, তদুপরি হযরত তালহা (রাঃ) এবং হযরত যুবায়র (রাঃ) যাঁরা ওসমান (রাঃ) র শাহাদাতের পর অনেক চেষ্টা করে হযরত আলী (রাঃ) কে খেলাফতের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করার জন্যে বাধ্য করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, ما نختار غيرك "আমরা আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকেও পছন্দ করি না।" তাঁরা ও মক্কায় গিয়ে উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) র দলে শরীক হলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) র হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে হযরত আলী (রাঃ) র বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। অথচ হযরত তালহা (রাঃ) ও যুবায়র (রাঃ) মদীনায় উপস্থিত থাকার কারণে তাঁদের অজানা ছিল না যে, হযরত ওসমান (রাঃ) র হত্যার ব্যাপারে আলী (রাঃ) র কোন হাত ছিল না এবং এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। বিরোধিতার এটাই ছিল দু'টি কেন্দ্র বিন্দু, যেখান থেকে আলী (রাঃ) র বিদ্রোহের লালন পালন হচ্ছিল।

এদিকে শাম ও হেজায প্রদেশেও একই অবস্থা চলছিল। অন্যদিকে মিশরের অবস্থা ছিল এই যে, কিছু সংখ্যক লোকের কান কথায় তিনি (আলী (রাঃ)) মিশরের গভর্ণর কাইস ইবনে সা'দ (রাঃ) কে অপসারণ করেন। অথচ তিনি হযরত আলী (রাঃ) র সত্যিকার শুভাকাঙ্ক্ষী ও অনুগত ছিলেন। আর তাঁর স্থলে মুহাম্মদ ইবনে আবি বক্কর (রাঃ) কে তথাকার গভর্ণর নিযুক্ত করে পাঠালেন। হযরত আলী (রাঃ) র এহেন কার্যের ফল দাঁড়াল এই যে, তাঁর প্রতি মিশরবাসীদের খারাপ ধারণা সৃষ্টি হ'ল। ফলে সেখানকার অধিকাংশ লোক আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) র পক্ষাবলম্বন করতে লাগল।

অতঃপর এতে আরো এমন কিছু অতিরিক্ত বিষয় সংযোগ হ'ল যে, হিজরী ৩৬ সালে জঙ্গে জামালের (উটের যুদ্ধ) পর আরো বিভিন্ন ধরণের বিশৃংখলা ও রক্তক্ষয়ী হাঙ্গামা সৃষ্টির কারণে হেরেমে নববী মদীনার সম্মান হানী হচ্ছিল। এসব বিবেচনায় তিনি কুফাকে নূতন রাজধানী হিসাবে ঘোষণা দিলেন। এতে সন্দেহ নেই যে, হযরত আলী (রাঃ) র এই কাজ অন্যান্য কাজ কর্মের ন্যায় তাঁর পবিত্র নিয়্যত ও পবিত্র আত্মার

সদিচ্ছা অনুসারেই হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক দিক দিয়ে উহার কার্যকারিতা এমন হ'ল যে, মদীনায় যে সব বড় বড় সাহাবা স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন, তিনি তাঁদের সৎ পরামর্শ থেকে বঞ্চিত হলেন। এদিকে কুফার অনারব নও মুসলিমগণ তাঁর চার পাশে এসে ভিড় জমাল।

হযরত আলী (রাঃ) যা করে ছিলেন, তার সবচে বড় অজুহাত হিসেবে বলা যায় যে, তিনি নিজে যেমন পবিত্র আত্মা ও দ্বীনদার ছিলেন, তেমনি অন্যান্যদেরকে ও অনুরূপই মনে করতেন। আর এতে তাঁর আশা ছিল যে, জনগণ জাতীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করে রাষ্ট্রীয় যাবতীয় আদেশ নিষেধ নির্বিবাদে পালন করবেন। সন্দেহ নেই যে, হযরত আলী (রাঃ) র এ রূপ ধারণা জাতীয় দৃষ্টি কোণ থেকে তাঁর বুযুর্গীর এক প্রমাণ। কিন্তু দৃশ্যতঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন অনেক অবস্থারঃ সৃষ্টি হয় যা'তে অনেক ভাল ধারণাও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তবুও যদি তাঁর সুচিন্তার সাথে হযরত ওমর (রাঃ) র মত প্রভাব প্রতিপত্তিও থাকতো তাহলে হয়ত অবস্থা এত শোচনীয় আকার ধারণ করতো না। হযরত আলী (রাঃ) শক্তি প্রয়োগ করে তাঁর নির্দেশাবলী কার্যকর করতে পারতেন। আর যদি কোন বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো তবে তাতেও তিনি প্রভাব খাটিয়ে সফলকাম হতে পারতেন। কিন্তু আক্ষেপ এমন অবস্থাও বর্তমান ছিল না। হযরত ওমর (রাঃ) খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) র মত সর্বজন প্রিয় সেনাপতিকে অপসারণ করলেন, তখন কোন ব্যক্তির ও এর প্রতিবাদে নিঃশ্বাস ফেলার ও সাহস হ'ল না। এমনিভাবে মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) এবং কাদেসীয়া যুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতি হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) কে কুফার গভর্ণরের পদ থেকে অপসারণ করলেন, তখনও কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধাচারণের হিম্মত হয় নাই। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) কে শামের গভর্ণরের পদ থেকে অপসারণের ফরমান পাঠালেন, আর তখনই সমগ্র শাম প্রদেশে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো এবং আলী (রাঃ) র বিরুদ্ধে বিদ্রোহের তুফান বয়ে গেল।

হযরত আলী (রাঃ)র প্রতি বিদ্রোহ

উল্লিখিত সমস্ত বিরুদ্ধাচরণের মূল কারণ হ'ল আলী (রাঃ) ওসমান (রাঃ) র হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণে সফলকাম না হওয়া। সফলকাম হতে পারলেন না কেন? এখানে তা আলোচনার অবকাশ নেই। কিন্তু ঘটনা এটাই।

তা' ছাড়া এ ও সত্য যে' কোন আমীরের রাজনৈতিক সফলতার ভিত্তি হলো জনগণ তাঁর আনুগত্য করবে কিনা এবং তাঁর রাষ্ট্রীয় আদেশ নিষেধ দ্বিধাহীন চিত্তে বাস্তবায়িত করবে কিনা তার উপর। যে সব লোক আলী (রাঃ) র আনুগত্যের দাবীদার ছিল, প্রকৃত পক্ষে তারা আন্তরিকতার সাথে আলী (রাঃ) র সাথী ও সাহায্যকারী ছিল না। সুতরাং একবার তিনি তাঁর ভাষণে নিজ দলকে লক্ষ্য করে আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন — "আমি যখন তোমাদেরকে শীতকালে শামবাসীদের সাথে যুদ্ধ করতে বলি, তখন তোমরা বল যে, এখন ভীষণ শীত। কিন্তু যখন গ্রীষ্মকালে বলি যে, এখন তোমারা তাদের সাথে যুদ্ধ কর তখন ও তোমরা বল যে, আজ কালতো ভীষণ গরম, উত্তপ্ত হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে। সাধারণ লোকেরা বলে যে, আলী (রাঃ) র রাজনৈতিক পরিপক্কতা নেই। হাঁ ঠিকই বলেছে, যে ব্যক্তির আনুগত্য করা হয় না তাঁর রাজনৈতিক দক্ষতাও নেই"।

এতেই অনুমান করা যায় যে, ঐ সময়ের অবস্থা কত ঘোলাটে ছিল। একদিকে শাম, মিশর এবং হেজায প্রদেশের অধিকাংশ লোক হযরত আলী (রাঃ) র বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগেছিল। অন্যদিকে যে দলটি আলী (রাঃ) র প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল তন্মধ্যে আনুগত্য ও সাহায্যের পূর্ণ তেজস্বিতা ও দীপ্ততা ছিল না। কিন্তু তিনি তো সঠিক ও সত্য পন্থায় খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রাষ্ট্রীয় নির্দেশাবলী অমান্যকারীদেরকে শাস্তি প্রদান ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। হযরত আলী (রাঃ) র রাষ্ট্রীয় দূরদর্শিতার ব্যাপারে বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু তাঁর অসাধারণ বীরত্ব সম্পর্কে কারও সাধ্য নেই যে, বিতর্ক করে। পরিশেষে এই দলাদলীর ফল জঙ্গে জামাল' ও জঙ্গে' সিফ্‌ফীনের আকারে

প্রকাশিত হ'ল। ইসলামের এই বীর সৈনিকগণ, যাঁরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বদর ও হুনাইনের যুদ্ধে নাস্তিকতাবাদ ও অংশীবাদের শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাজিত করে ছিলেন, আজ' তারা নিজেরা পরস্পর একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে অধঃপতিত হচ্ছেন। (হায় আফসুস্।)

হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) র কর্ম পদ্ধতি

ইতিপূর্বে যা' কিছু সংঘটিত হ'ল এর সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব শুধু আলী (রাঃ) র উপরই বর্তায় না। আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) একজন বিখ্যাত চিন্তাবিদ এবং পরিপক্ক রাজনীতিবিদ ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। আর নিঃসন্দেহে তিনি ইসলামের বিরাট খেদমত করেছেন। তিনিই তারাব্লিসুশ্শাম (طرابلس الشام) বিজয় করেছিলেন। তা' ছাড়াও তিনি শামের সমস্ত সীমান্তবর্তী এলাকা নিজ দখলে এনে-শামকে-রুমীদের লুণ্ঠন থেকে রক্ষা করেছিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) র সময়ে তাঁর অনুমতি ক্রমে একটি সামুদ্রিক বাঁধ নির্মাণ করেন এবং রোম সাগরের বিখ্যাত দ্বীপ 'সাইপ্রাস' বিজয় করেন। এই সামুদ্রিক বাঁধ এত শক্তিশালী ও মজবুত ছিল, যে কারণে মুসলমানগণ রোমীদের সামুদ্রিক আক্রমণ হতে নিরাপদ হয়ে গেল। এই সমস্ত বিজয়ের কৃতিত্ব ছাড়াও তিনি অসাধারণ মেধাশক্তি সম্পন্ন ও সাবধান ছিলেন। এই জন্য সর্বদা সমস্ত আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গণ্ডগোল এবং ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকতেন। এর পরিপ্রেক্ষিতেই অনেক ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হওয়ার আগেই তিনি উহাকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত গুনাগুণ থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, আলী (রাঃ) র বিরুদ্ধে তাঁর খেলাফতের কার্যক্রম ব্যর্থ করার জন্যে তিনি যা' কিছু করলেন, তা' অন্ততঃ পক্ষে তাঁর মত বুযুর্গের নিকট হ'তে আকাঙ্খিত ছিল না।

যদি হযরত ওসমান (রাঃ) র হত্যার প্রতিশোধ নে'য়ার একান্ত ইচ্ছাই তাঁর থাকতো, তা'হলে আলী (রাঃ) র হাতে খেলাফতের 'বায়াত' করার পরেও তা, করতে পারতেন। দেখা যাচ্ছে যে, বড় বড় সাহাবাদের জীবন বিনষ্ট হচ্ছে, উম্মতের মাঝে বিশৃংখলা ও বিভক্ত সৃষ্টি হয়েছে, ইসলামের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা লণ্ড ভণ্ড হয়ে গেছে, কিন্তু ওসমান

(রাঃ) র হত্যার প্রতিশোধ-নেয়া সম্ভব হচ্ছেনা। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) র ইনতিকালের পর খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে যখন আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে কঠিন মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, তখন হযরত ওমর (রাঃ) সময়ের নাজুকতা অনুভব করে হযরত আবুবকর (রাঃ) র হা'তে খেলাফতের 'বায়াত' করলেন এবং এক অপ্রীতিকর ঝগড়া-বিপদের নিষ্পত্তি করে দিলেন। যদি ঐ সময় আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) ও তেমনি কার্য পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, তা, হলে নিঃসন্দেহে উম্মাতে মারহুমা (অনুগ্রহপ্রাপ্তদল) এক বিরাট ঝগড়া ফাসাদ থেকে বেঁচে যেতেন। আর বিশৃংখলার এরূপ ছিদ্রপথ ও সৃষ্টি হতনা, যা এখন হচ্ছে। হযরত আলী (রাঃ) র বিরুদ্ধে আমীর মুয়াবিয়ার নিজ খেলাফতের উপর জেদ করা এক এমন ব্যাপার, যা'কে ইসলামের উত্তম খেদমত বলা চলেনা।

(تحكيم) সালিসীর ঘটনা

বিষয়টির বাস্তবতা সালিসী ঘটনা থেকেও প্রতীয়মান হয়। সালিসী প্রস্তাব সর্ব প্রথম আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) র পক্ষ হতেই উত্থাপিত হয়েছিল। যখন তিনি দেখলেন যে, 'লায়লাতুল হারীর" যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, তখন আমর ইবনুল আস (রাঃ) বললেন যে, "আমি এমন একটি ফন্দী বলে দিতে পারি যার ফলে আলী (রাঃ) র সৈন্যদের মাঝে বিবাদ-সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং এর ফলে আমাদের সকলেরই মঙ্গল হবে"। আমীর মুয়াবিরা (রাঃ) বললেন, সে ফন্দী কি ? আমর ইবনুল আস, (রাঃ) বললেন, তা হ'ল-আমরা বল্লমের অগ্রভাগে কুরআন শরীফ উত্তোলন করে ইরাকবাসীদেরকে আহ্বান জানাবো যে, এসো ! ইহা (কুরআন) আমাদের ও তোমাদের মাঝে নিষ্পত্তি করবে। সুতরাং তাই করা হ'ল। সে সময় হযরত আলী (রাঃ) নিজ সাথীদেরকে বল্লেন, আপনারা ওদের ধোকায় পড়বেন না। আমি তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ভাল ভাবে অবগত আছি। কিন্তু ইরাকবাসীদের এক বিরাট ংশ এই ধোকায় নিপতিত হ'ল। তারা-আলী (রাঃ) কে জোর করে কুরআন মজিদের হুকুম মানতে বাধ্য করলেন। যুদ্ধ থেমে গেল। ঠিক হ'ল যে, আমীর

মুয়াবিয়া (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) র প্রত্যেকের পক্ষ থেকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হবে এবং তারা যে সিদ্ধান্ত দিবেন দৃঢ়তার সাথে উহার বাস্তবায়ন করা হবে। এই পরামর্শদাতা ইহাও বললেন যে, হযরত আলী (রাঃ) এই প্রস্তাব গ্রহণ করুন কিংবা বাতিল করুন, উভয় অবস্থাতেই আমাদের স্বার্থ রক্ষা হবে।

উল্লিখিত শব্দাবলীর দ্বারা আপনাতেই বুঝা যায় যে, যাঁরা (تحكيم) সালিসী প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, তাঁদের নিয়্যতে আন্তরিকতা নেই। তাঁরা সাময়িক ভাবে এই বাহানা দ্বারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চাচ্ছিলেন। সম্ভবতঃ হযরত আলী (রাঃ) একারণেই ঐ প্রস্তাব প্রথমতঃ অস্বীকার করেছিলেন। আর তিনি ভাল করেই বুঝে ছিলেন যে, এ (تـحـكـيـم) সালিসী উত্থাপন ৭০ হাজার ইসলামের বীর সন্তানদের ধরাশায়ী হওয়ার পর হতে যাচ্ছে, কিন্তু সৎ নিয়্যতের উপর ভিত্তি করে নয়। বরং উহার ভিত্তি ধোকাও প্রবঞ্চনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু মুশকিল হ'ল এই যে, আম্‌র ইবনুল আস-(রাঃ)র ধারনা অনুযায়ী খোদ ইরাকীদের মাঝেই বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। এই জন্য আলী (রাঃ)র সামনে ইহা গ্রহণ করা ছাড়া আর উপায়-ই বা কি-ছিল? কিন্তু যে পদক্ষেপ ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্য হয়েছিল তাতে জাতীয় স্বার্থ ও কল্যাণের কতটুকু আশা করা যায়? এর ফল ইসলামের জন্য খুবই ভয়াবহ হ'ল। আর সবচেয়ে অধিক ক্ষতির দিক হ'ল এই যে, এখন পর্যন্ত ও মুসলমানদের মাঝে হযরত আলী (রাঃ) র গুণগ্রাহীদের পৃথক পৃথক দু'টি দল বিদ্যমান। আবার খাওয়ারেজ নামে-আর একটি নূতন দলের সৃষ্টি হ'ল, যারা উভয় দলের ঘোর শত্রু।

এখন একটু চিন্তা করে দেখুন! হযরত আলী (রাঃ) কে ব্যর্থ করে দেয়ার এক ফন্দী (تحكيم) সালিসী। চিন্তাধারা 'আজনাদীন' বিজয়ী সেনাপতি আম্‌র ইবনুল আস (রাঃ) র মাথায়-ই সর্ব প্রথম ঢুকে ছিল। (ভেবে দেখুন!) কিভাবে উহা উম্মাতের মাঝে বিভিন্ন ধরনের ফেতনা এবং অনৈক্য সৃষ্টির কারণ হয়েছিল! 'খাওয়ারেজদের আবির্ভাব ও উহার সূত্র ধরেই হয়েছিল। এই দলের এক অংশ প্রথম থেকেই তাদের মাঝে-

(অপ্রকাশ্য ভাবে) বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাদের জেগে উঠা এবং শৃংখলাবদ্ধ হওয়ার সুযোগ মিলেনি। এখন তাদের সকলই একই কেন্দ্রস্থলে একত্রিত হয়ে একটি পৃথক এবং খুবই ভয়ানক ক্ষেত্র তৈরী করলো। 'নাহ্‌রেয়ান' নামক স্থান ছিল এই দলের চেষ্টা সফল করার চারনভূমি। হযরত আলী (রাঃ) এই দলের ভয়ানক পরিণাম অনুভব করে এই বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করলেন এবং পরাজিত করে তাদের প্রবল শক্তি নিশ্চিহ্ন করে দিলেন।

খাওয়ারেজদের সুশৃংখল চেষ্টা তদবীর ব্যর্থতায় পরিণত হ'ল। এখন তাদের সন্তান সন্ততিরা আলী (রাঃ), আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) এবং আম্‌র ইবনুল আস (রাঃ), এই তিনজনকেই হত্যা করার এক পরিপূর্ণ ষড়যন্ত্র করল দিন, তারিখ ঠিক হ'ল। কিন্তু আম্‌র ইবনুল আস (রাঃ) ভাগ্য ক্রমে বেঁচে গেলেন। আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) তাদের আক্রমণে আহত· হলেন, কিন্তু চিকিৎসার পর সুস্থ হলেন। আর আমীরুল মুমেনীন হযরত্ আলী (রাঃ) দু'জন খারেজীদের দ্বারা মারাত্মক ভাবে আহত হলেন। পরিশেষে জ্ঞান ও কর্মের এই উজ্জ্বল সূর্য এবং খেলাফতে রাশেদার সর্বশেষ নক্ষত্র, হিজরী ৪০ সালের রমযান মাসে মাটির পৃথিবী ছেড়ে চির বিদায় নিলেন (ইন্নালিল্লাহ···রাজেউন)।

হযরত আলী (রাঃ) র খেলাফত কালের পর্যালোচনা

হযরত আলী (রাঃ) র রাজত্বকাল খুব বেশী দিন স্থায়ী ছিল না। এ সময় টুকুর প্রতি ও যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়, তবে দেখা যাবে যে, তাঁর শাসন প্রণালী খেলাফতে রাশেদার পদ্ধতিতেই ছিল। তাঁর নির্বাচন সম্পূর্ণ তাঁর অনিচ্ছার উপর হয়েছিল। ঐ সমস্ত আনসার ও মুহাজিরগণ তাঁকে নির্বাচিত করেছিলেন, যারা হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) কে নির্বাচিত করেছিলেন। তারপর ও তাঁর শাসন পদ্ধতি ছিল কল্যাণ মূলক। কারো সঙ্গে শরীয়তের বরখেলাফ কোন অত্যাচার মূলক ও কঠোরতা মূলক আচরণ করেন নাই। যদি ও ঐ সময় কপট মুসলমানদের প্রচেষ্টায় সার্বিক অবস্থা এমন ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি উহা সুচারু রূপে সামলাতে সক্ষম হননি। কিন্তু তাঁর শাসন পদ্ধতিতে রাজতন্ত্রের কোন গন্ধ ও ছিল না। তিনি খোদাভীরুতা পবিত্রতা ও সরলতার ভিত্তিতে এমনভাবে জীবন যাপন

করেছেন, যেভাবে খুলাফায়ে রাশেদীনগণ জীবন যাপন করতেন। এমন কি মৃত্যুকালে যখন তাঁর পরে হাসান (রাঃ) এর নির্বাচন সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, তখন তিনি 'হাঁ' বা 'না' বাচক কোন উত্তর দেন নাই। বরং জ্ঞানী গুণী সাহাবাদের সিদ্ধান্তের উপরই বিষয়টি ছেড়ে দিলেন। তাঁর শাসনামল তালাশ করে ও এমন কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি কোন সময় কূটনৈতিক পদ্ধতিতে কার্য করেছেন। তাঁর ভিতর ও বাহির এক রকম ছিল। যা কিছু অন্তরে থাকতো তাই মুখে প্রকাশ পেত। আর যা মুখে বলতেন, তা অন্তরে ও থাকতো। তিনি খেলাফতের আসনে থাকা কালীন সময়ে নিজের জন্যে কিংবা নিজ পরিবারের কোন সদস্যের জন্যে ও কোন অবৈধ স্বার্থ সিদ্ধি করেননি। তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ খোদাভীরুতা বিদ্যমান ছিল। এসব কারণে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তাঁর রাজ্য শাসন খেলাফতে রাশেদা এবং ইসলামের আদর্শ শাসন পদ্ধতির ভিত্তিতে পরিচালিত ছিল।

দু'টি বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। তম্মধ্যে একটি হ'ল-খলীফা নিজে কি ধরণের চরিত্র ও গুণাবলীর অধিকারী এবং তিনি নিজ শাসনকার্য কিভাবে পরিচালিত করতে চান? আর অপরটি হ'ল—তাঁর সদিচ্ছার মাঝে তিনি কতটুকু সফলকাম হতে পারলেন? হযরত আলী (রাঃ) র বেলায় প্রথমটি সম্পর্কে কারো কোন বিতর্ক থাকতে পারে না। তবে হাঁ, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত আলী (রাঃ) র খেলাফত কাল এদিক দিয়ে ব্যর্থ যে, তিনি তাঁর সত্য দর্শনানুসারে ইসলামী গণতন্ত্র পরিপূর্ণভাবে পরিচালিত করতে সফলকাম হননি এসব ব্যর্থতার কারণ নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হলো—

হযরত আলী (রাঃ) র ব্যর্থতার কারণ

বংশগত পক্ষপাতিত্বের বিকাশ

আমাকে স্পষ্ট ভাষায় বলতে হয় যে, এসব কারণের মধ্যে প্রধান হ'ল দলগত ও বংশগত পক্ষপাতিত্বের বিকাশ। এটা কোন অস্পষ্ট সত্য নয় যে, জাহেলী যুগের এই পক্ষপাতিত্ব এমন এক বিষাক্ত জিনিস, যা' কোন জাতির শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করলে তার সমস্ত চারিত্রিক এবং কার্যকরী

শক্তিকে দুর্বল কিংবা এর চাইতে ও অধিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় নিপতিত করে। আর যখন পক্ষপাতিত্বের এই 'বিষ' ক্রমে ক্রমে কোন জাতির মন মানসিকতার উপর পরিপূর্ণভাবে প্রবল হয়ে যায় তখন এই জাতির উপর এমন এক পাগলামী অবস্থা প্রবল হয় যে, সে তখন মানবতা, গণতন্ত্র এবং সাধারণের গ্রহণযোগ্য সমস্ত আশা-আকাঙ্খাকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে পশুত্ব আচরণকে কোন ক্ষতিকর বলে মনে করে না। এতে নিজের প্রাধান্য এবং শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি এত প্রবল হয় যে. সে তখন স্বীয় গোপনীয় প্রেরণার শান্তনার জন্যে বৈধ ও অবৈধের পার্থক্যের ও কোন খেয়াল রাখেনা। এখানে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কোন আন্তর্জাতিক সার্বিক শাসন পদ্ধতি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত এই পক্ষপাতিত্বের মূলোৎপাটন করা না হয় এবং বংশগত ও দলগত প্রাধান্যের অনুভূতির স্থলে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের পূর্ণ দৃঢ় আস্থা স্থাপন করা না হয়।

ইসলামে পক্ষপাতিত্ব ও স্বজন প্রীতির কঠোর নিন্দা

আরব দেশ ছিল এই 'বিষেই সর্বাধিক বিষাক্ত, এরি পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে পরবর্তী সময়েও হত্যা, ঝগড়া-ফাসাদ সদা বিদ্যমান ছিল। তারা কোন অনারব জাতির সাথে সম্মিলিত ভাবে কোন শাসনতন্ত্রের অধীন একত্রিত হবে কিভাবে ?

নিজেরাই তো একে অন্যের সাহায্য ও সহযোগিতায় কোন উল্লেখযোগ্য আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম ছিল না। অতঃপর ইসলামের আগমনের ফলে তাওহীদের এমন কুরদতী কার্যকারিতা হ'ল যে, তাঁরা জাহেলী যুগের পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি থেকে মুক্ত হয়ে একটি কেন্দ্র বিন্দুতে একত্রিত হ'তে পেরেছিল। যা'রা প্রথমতঃ একে অন্যের জীবনের শত্রু ছিল, তাঁরা এখন দুধ চিনির মত মিলে মিশে জীবন যাপন করতে লাগলো। জাহেলী যুগের পক্ষপাতিত্বের ভয়াবহতা ও বিষাক্ততার অবস্থা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)র জীবন সায়াহ্নের বিদায় হজ্জের গুরুত্ব পূর্ণ ভাষণ থেকে অনুমান করা যায়। তিনি তাঁর ভাষণে ধর্মের মৌলিক বিষয় সমূহের প্রতি আলোকপাত করেন এবং সাথে সাথে

মুসলমানদেরকে জাহেলী যুগের পক্ষপাতিত্ব ও স্বজন প্রীতি থেকে বেঁচে থাকার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।

ইরশাদ হল—

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ
كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ـ

"অতএব তোমাদের রক্ত, মাল-দৌলত, তোমাদের সম্মান ও মর্যাদা আজকের দিনের পবিত্রতার ন্যায় পবিত্র।

অতঃপর ইরশাদ হল :

وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ـ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا
بَعْدِي ضُلَّالًا ـ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ (بخاری باب
حجة الوداع)

"আর অতিসত্বর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। সাবধান! আমার পরে তোমরা এমনভাবে পথভ্রষ্ট হয়োনা যে, তোমরা একে অন্যের ঘাড়ে প্রহার করবে"।

বুখারী ও মুসলিমের অপর একটি বর্ণনায় এর চেয়ে কিছু অধিকও অতি স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন—

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ

"সাবধান! স্মরণ রেখো যে, জাহেলী যুগের সকল কার্যক্রম আমার দু' পায়ের নীচে দলিত।

বংশের, কৌলিণ্যের, বর্ণবৈষম্যের, প্রাচুর্য ও দারিদ্রের যত বিভেদ ছিল এবং যেগুলো সদা সর্বদা পৃথিবীতে ঝগড়া ফাসাদ ও অশান্তির কারণ

ছিল, এসবের মূলোৎপাটন করে একটি চুড়ান্ত ঘোষণা ঘোষিত হ'ল। তিরমিযী শরীফের বর্ণনা মতে রাসূলে খোদা (সাঃ) স্বীয় ভাষণে ইরশাদ করেন যে,—

ان الله اذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالاباء
انما هو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس كلهم بنو ادم
وادم خلق من تراب—

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জাহেলী যুগের আচরণ এবং বাপ-দাদাদের উপর গৌরব করার প্রচলিত প্রথা বিদূরিত করেছেন। এখন শুধু পৃথিবীতে দু'প্রকার লোক হবে। এক প্রকার খোদাভীরু, বিশ্বাসী, দ্বিতীয় প্রকার হতভাগা অবাধ্য নাস্তিক। সকল মানুষই এক আদমের সন্তান। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মৃত্তিকা থেকে।

মদীনায় হিজরতের পর মহানবী (সাঃ) মুহাজির ও আনসারদের মাঝে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন তাও ঐ প্রকার একটি সেতু বন্ধন। মহানবী (সাঃ) হযরত সালমান ফারসী সম্পর্কে যা, বলেছিলেন, তা' হল—سلمان منا اهل البيت—"সালমান তো আমাদের পরিবারেরই একজন সদস্য"।

অতএব এর উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমান আরবীয় এবং অনারবের পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাবে। এই কারণেই জাহেলী যুগের পক্ষপাতিত্ব মানুষকে সার্বিক জীবন বিধানের পরিপূর্ণতার পথে সবচেয়ে বড় কঠিন পাথরের মত প্রতিবন্ধক। এই জন্যে ইসলাম এসে যখন এই কঠিন পাথরকে সরায়ে সাধারণের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের প্রেরণা সৃষ্টি করে দিল তখন আল্লাহ তায়ালা একে মুসলমানদের জন্যে নিজের বিশেষ অনুগ্রহ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হল—

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا

আর তোমরা খোদার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তখন তিনিই তোমাদের অন্তর সমূহে প্রীতি স্থাপন করেছিলেন, তৎপর তোমরা তাঁর অনুগ্রহে একে অন্যের ভাই হয়ে গেলে।

অতঃপর এই কর্মের মহত্বের পরিমাপ এভাবেও হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা নবী করীম (সাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, হে মুহাম্মদ! মানুষদেরকে পরস্পর মিলিয়ে দেয়ার কাজ আপনার ছিল না। বরং এর কর্তৃত্ব স্বয়ং আল্লাহর যিনি অন্তর সমূহের উলট পালট কারী। ইরশাদ হল—

هُوَ الَّذِىْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلَّفَ بَيْنَ

قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ

قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

তিনিই স্বীয় সাহায্যে আপনাকে এবং মোমেনদের শক্তি সম্পন্ন করেছেন এবং তিনি তাঁদের অন্তর সমূহে প্রীতি সঞ্চারিত করেছেন। যদি আপনি পৃথিবীর সমস্ত মিছু ব্যয় করতেন তবুও তাদের অন্তরসমূহে সম্প্রীতি স্থাপন করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের মাঝে প্রীতি স্থাপন করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়।

ঈমানের স্তর সমূহের পার্থক্য

জাহেলী যুগের পক্ষপাতিত্বের ধ্বংসাত্মক অবস্থা এবং ইসলামে এর কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর আপনি এ বিষয়ে সামান্য চিন্তা করে দেখুন যে, আয়েম্মায়ে মুহাদ্দিসীন (হাদিস বেত্তাগণ) الايمان يزيد وينقص "ঈমান বাড়ে ও কমে" অধ্যায়ে কি বর্ণনা করেছেন? ইহা এমন এক সত্য যে, ঈমান যে দৃঢ় বিশ্বাস মূলক অবস্থার নাম উহাতে সবল' ও 'দুর্বল' উভয় শক্তিই বিদ্যমান। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আজকাল সকল মুসলমান (ঈমানের দিক দিয়ে) এক রকম নয়। বরং ঈমানের স্তর সমূহের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। এমনি ভাবে সাহাবায়ে কিরামদের ঈমানের স্তর সমূহ একই পর্যায়ের ছিলনা।

নিজের আত্মিক শক্তি এবং প্রাকৃতিক যোগ্যতা, স্বভাবগত দুঃখ দুর্দশা এবং সর্বোপরি নবী করীম (সাঃ)র সম্মান জনক সাহচর্যের (شرف صحبت) কম বেশীর কারণে ঐ সব সম্মানিত ব্যক্তির মধ্যে ও পরস্পরের মর্যাদার বেশ কম ও পার্থক্য পরিলক্ষিত ছিল।

হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)-র দৃষ্টান্ত

উদাহরণ স্বরূপ আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) র কথাই ধরা-যাক না কেন। তাঁর সম্পর্কে একজন অসাহাবীর কথোপকথনের কি অধিকার আছে? এতদসত্বেও এটা সত্য যে, তিনি মক্কা বিজয়ের পর তাঁর সম্মানিত পিতা আবু সুফিয়ানের সাথে মুসলমান হয়েছিলেন। এই জন্য চার খলীফার মত-নবী করীম (সাঃ) র পবিত্র সান্নিধ্যে থেকে এবং সরাসরি নবুওত ও রেসালতের সূর্য থেকে বরকতময় আলো অর্জনের তাঁর খুব বেশী সুযোগ মিলেনি। ফল দাঁড়াল এই যে, কুরাইশদের একজন সম্মানিত ব্যক্তি এবং বিখ্যাত বংশের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে তাঁর মাঝে যে সব উত্তম গুণাবলীর সমাবেশ ছিল যেমন – রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, স্থিরতা ও দৃঢ়তা, মহত্ব ও বীরত্ব, ইসলাম গ্রহণের পর উহার শক্তি বৃদ্ধি পেল বটে, কিন্তু ঐ শক্তিসমূহের প্রয়োগস্থল পরিবর্তিত হয়ে গেল।

এতদসত্বেও দীর্ঘদিন ধরে বনু উমাইয়া ও বনু হাশিম বংশের পরস্পরের মাঝে যে, বিরোধ চলে আসছিল, আমীর মুয়াবিয়ার চিন্তা ধারাও তা থেকে মুক্ত ছিল না। হযরত আলী (রাঃ) র মুকাবিলায় তিনি যা কিছু করলেন, এতে অন্যান্য কারণ সমূহের মত এই চিন্তাধারার বিশেষ প্রভাব ছিল। সম্ভবতঃ হযরত আলী (রাঃ) র উপর ও এরূপ সন্দেহ করা যেতে পারে। কিন্তু তবুও এটা স্বীকার করতে হবে যে, আলী (রাঃ) র খেলাফত আমলে এমন কোন কার্য করেননি যা'কে বংশগত বিরোধিতার কারণে ইসলামের শিক্ষা কিংবা উহার জীবনী শক্তি (روح) পরিপন্থী বলা যায়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) র বীরত্ব উচ্চ মর্যাদা, প্রশস্ত অন্তর এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দিক দিয়ে সমকালীন লোকদের মাঝে অদ্বিতীয় ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন এই সমস্ত শক্তি নাস্তিকদের বিরুদ্ধে কাজে লাগালেন, তখন তিনি এমন গৌরবময়

কীর্তি স্থাপন করলেন, যা মুসলমানদের ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছে। কিন্তু যখন তাঁর এই যোগ্যতা উমাইয়া বংশের শিকড় দৃঢ় করার কাজে ব্যয় হতে লাগলো তখন তাতে এমন এক রাজনৈতিক কাঠামো রচিত হ'ল যাকে খেলাফতে রাশেদার পদ্ধতি বলা যায় না।

রাসূলে করীম (সাঃ) র ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, হে মুসলমানগণ! নবুওতের পরে তোমাদের মাঝে নবুওতের পদ্ধতিতেই খেলাফত চলবে. যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা ততদিন তা, থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তা উঠিয়ে নেবেন। তৎপর অত্যাচারের রাজত্ব চলতে থাকবে। (মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল)

অনারবীয় মুসলমানদের প্রভাব

(২) দ্বিতীয় কারণ হ'ল—ইসলামের বিভিন্ন বিজয়ের কারণে অনারব জাতির যে সব মানুষ মুসলমান হয়ে আরব মুসলমানদের সাথে মিশে গিয়েছিল তারা ছিলেন নওমুস্‌লিম। আর মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে তাঁদের ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার খুব বেশী সুযোগ মিলেনি। সুতরাং ইসলামের প্রকৃত রূপ বা জীবনী শক্তি তাঁদের মন মানসিকতায় প্রসার লাভ করতে পারেনি। অতএব জাহেলী যুগের কিছু চাল-চলন ও রীতিনীতির প্রভাব তাঁদের জীবনেও প্রতিফলিত হচ্ছিল। এদিকে 'সাবাঈ'দের দল ধর্ম প্রাণ মুসলমানদের মাঝে বরাবরের মত নিজেদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য চরিতার্থের কাজে লিপ্ত ছিল। ধীরে ধীরে মুসলমানদের একতা ও তাওহীদকে বিষাক্ত করার চেষ্টা করতে ছিল। দোষমুক্ত শুধু আল্লাহর যাত (ذات) বা সত্তা। আম্বিয়া কিরাম ব্যতীত কেহই নিষ্পাপ নয়। এই দু'শ্রেণীর লোকের সাথে মিলন বা উঠা বসার ফলে কিছু সময়ের মধ্যই বড় বড় দৃঢ় বিশ্বাসী মুসলমানদের ও মারাত্মক পদস্খলন শুরু হ'ল। সুতরাং তাঁরা নিজেদের ত্রুটি গুলোও অনুভব করতে পারেনি যা' তাঁদের কার্যক্রমের দ্বারা সৃষ্টি হতে ছিল।

বড়বড় সাহাবাদের নির্জন বাস :

উল্লিখিত কারণে মুসলমানদের মাঝে বিরোধ ও বিভক্তির যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হ'ল তা আরও অধিক তীব্র ও বিস্তৃত হলো। কারণ কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী সাহাবা যাঁরা নবুওতের যুগে ও পরবর্তী তিন খলিফার পবিত্র যুগেও কার্যকরী দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য গৌরবময় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁরাও এই সমস্ত গণ্ডগোল ও বিশৃংখলা দেখে গণসংযোগ থেকে সম্পর্ক ছেদ করে নির্জন বাস শুরু করলেন। এখন খালি মাঠ তাদেরই দখলে যাদের শক্তি ছিল। এ ব্যাপারে হযরত আবু মুসা আশ্‌আরী (রাঃ) র নাম উল্লেখযোগ্য। যখন তিনি (تحكيم) সালিসী ঘটনায় আম্‌র ইব্‌নুল আস (রাঃ) র কার্যক্রম অবলোকন করলেন, তখন তিনি এতে খুবই দুঃখিত ও ব্যথিত হলেন। তিনি সমস্ত রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে এক নির্জন গ্রামে চলে গেলেন এবং ঘরোয়া জীবন যাপন শুরু করলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) জঙ্গে জামাল (উটের যুদ্ধ) এর কারণে মদীনা হতে বসরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কুফাবাসীরা এতই ব্যথিত হলেন যে, তাঁরা অঝোরে ক্রন্দন ও আহাযারী শুরু করে দিলেন। তাদের এই অস্বাভাবিক ক্রন্দনের ফলে সেই দিন (يوم ا النحيب) 'ক্রন্দন দিবস' নামে খ্যাতি লাভ করলো।

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বারা একজন খুবই সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তিনি উম্মুল মুমেনীনের আহবানে সাড়া না দিয়ে পৃথক ভাবে জীবন যাপন করাকেই মঙ্গল জনক মনে করলেন। উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফসা (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ) র সঙ্গে বসরা যেতে মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁকে বুঝালেন এবং আল্লাহর কসম দিয়ে বসরা যাওয়া থেকে বিরত রাখলেন।

মোটকথা এই যে, এসব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ ভাল করেই বুঝে ছিলেন যে, ইসলামের মধ্যে বিশৃংখলার স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। সে ব্যথা নিজেদের অন্তরে অনুভব করে অশ্রু বিসর্জন দেয়া শুরু করলেন। সুতরাং কথায় ও কাজে এবং বক্তৃতা বিবৃতিতে তাঁরা কোন প্রকার তত্ত্বাবধায়ণ মূলক দায়িত্ব পালন করেন নি। কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার এই যে, তাঁরা এমন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন যাদের কোন রাজনৈতিক দক্ষতা ছিল না। বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠান ও উচ্চ পদ অন্যান্যদের ছিল। এর অত্যাবশ্যকীয় ফল এই দাঁড়াল যে, খোদাভীরু ও ভাল লোকদের আহবান বিজন মাঠের আহবানের ন্যায় কিংবা বাদ্য যন্ত্রের ঘরে তোতা পাখীর আওয়াজের ন্যায় ক্ষীণ রূপ ধারণ করলো। অতঃপর যা, কিছু সংঘটিত হ'ল, তা অনাকাংখিত ছিল।

প্রথমেই যা ব্যক্ত করা হয়েছিল, এই সমস্ত ঘটনাবলী এ কথারই সাক্ষ্য যে, উম্মতের অধঃপতনের যুগ শুরু হয়ে গেছে! কিন্তু তা সত্বেও মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এ যুগও (خير القرون) উত্তম যুগের অন্তর্ভুক্ত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, সে সময় ও সে সব বড় বড় সাহাবাগণ বর্তমান ছিলেন, যাঁরা দীর্ঘদিন যাবত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) র (صحبت) সাহচর্য লাভ করে ধন্য হয়ে ছিলেন।

ঐ সময় যদিও রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁদের প্রভাব খুব বেশী উল্লেখযোগ্য ছিল না কিন্তু ওয়াজ নসিহত, শিক্ষা-দীক্ষা, বক্তৃতা ও বিবৃতির কল্যাণ প্রবাহ এই সব বুযুর্গদের পবিত্র আত্মার বদৌলতে বরাবরের ন্যায় প্রচলিত ছিল। ফলে ব্যক্তিগত জীবনে কেহই অন্যায় ও পাপের কাজে লিপ্ত হতে সাহস করতো না। কোন গভর্ণর কিংবা বিচারকের পক্ষ হতে ও যদি কোন অত্যাচার মূলক কার্য প্রকাশ পেত তা হলেও কুরআন-হাদীস অনুসারে বিচার হতো। তাঁরা পরস্পর যতই ঝগড়া করুন না কেন কিন্তু নাস্তিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের বেলায় সকলেই নিজেদের বিভেদ ভুলে গিয়ে এক হয়ে যেতেন। এজন্যে সেই সময়েও উন্নতি এবং বিজয়ের পদক্ষেপ থেমে যায়নি বরং বরাবরের ন্যায় অগ্রগামী ছিল। আর দেশ জয়ের সঙ্গে ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজ রীতিমত চলছিল।

বনু-উমাইয়া'র যুগ

হিজরী ৪১ সালে আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) র হাতে সর্বসাধারণের 'বায়াত' বা আনুগত্যের শপথ হ'ল। সে দিন থেকেই বনু উমাইয়াদের রাজত্বকাল আরম্ভ হ'ল। এই যুগের সাথে উম্মতে মারহুমার (অনুগ্রহ প্রাপ্ত দল) উত্থান পতনের বিভিন্ন ঘটনাবলী ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। আমীর

মুয়াবিয়া (রাঃ) এই বংশের প্রথম খলিফা। তাঁর রাজত্বকাল হিজরী ৪১ সাল থেকে হিঃ ৬০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০ বিশ বছর ছিল। তাঁর রাজত্বকালকে খেলাফতে রাশেদা বলা যায় না, তিনি খলিফা রাশেদ (সরলপন্থী খলিফা) ছিলেন না। কিন্তু তা সত্বেও তিনি অল্প কিছু দিন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) র সঙ্গ লাভে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি একজন সাহাবী এবং অহী লেখক ছিলেন। এই জন্যে বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও তাঁর অন্তর প্রতিপালকের ভয় এবং ইসলামের উন্নতির প্রেরণা থেকে খালি ছিলনা।

তাফসীরে তাবারীতে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি শামের কোন স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এমন সময় তাঁর সম্মুখ দিয়ে তাঁর শান শওকতের সামগ্রী যথা—ঘোড়া, দাস-দাসী এবং গাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন যেতে ছিল। তিনি উহা দেখে নিজেই লজ্জিত হলেন এবং তাঁর পার্শ্বে বসা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ তায়ালা আবু বকরের উপর অনুগ্রহ করুন, তিনি পৃথিবীকে চান নাই আর পৃথিবীও তাঁকে চায় নাই। উমর (রাঃ)-কে পৃথিবী অনেক চাইল কিন্তু তিনি নিজে উহাকে চাইলেন না। অবশিষ্ট রইলেন-উসমান (রাঃ), তাঁকে পৃথিবী থেকে কিছু মিলেছে আর পৃথিবী ও তাঁর কাছ থেকে কিছু পেয়েছে। তাঁদের পরে আমরা তো পৃথিবীতে একেবারে মিশে গিয়েছি। (তাবারী ষষ্ঠ খণ্ড ১৮৬ পৃঃ দ্রঃ)

এই সমস্ত ব্যক্তিগত গুণাবলী ছাড়াও প্রকৃত পক্ষে তিনি সময়ের সঙিন ও ঘোলাটে পরিস্থিতিতে মুসলমানদের রাজনৈতিক শক্তিকে মজবুত এবং সংরক্ষণের ব্যাপারে যে রাজনৈতিক দক্ষতা, দূরদর্শিতা এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন সে জন্য তিনি মান মর্যাদার তালিকা সূচীর শীর্ষ স্থানে থাকার উপযোগী।

উত্তর আফ্রিকার এক বিরাট অংশ খেলাফতে রাশেদার সময়েই বিজয় হয়েছিল। আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) তাতে আর ও কিছু বর্দ্ধিত করলেন। এখানকার 'বার্বার জাতিরা বিদ্রোহ করে' একটা বিরাট গণ্ডগোলের সূত্রপাত করলে আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণ রূপে দমন

করেন। শাম মিশর ও রোম সাগরের কারণে রোমীদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ ছিলনা। সুদক্ষ আমীর এ সব দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় সেনা চৌকি স্থাপন করলেন। সামুদ্রিক বাঁধ নির্মাণ করে রোমীদেরকে রোম সাগর উপকূলে পরাস্ত করেন। 'কাবরাস' অন্য ক'টি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ অধিকার করার পর তথায় সেনা ছাওনী স্থাপন করেন এবং দুর্গ নির্মাণ করেন। যার ফলে মিশর ও শামের এলাকা শত্রুদের আক্রমণ হতে নিরাপদ হয়ে গেল। ক্রিট ও 'সিসিলি' দ্বীপে ও আক্রমণ করা হ'ল। কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত সেখানে বিজয় লাভ সম্ভব হয়নি। অতঃপর দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দল সমূহ নিজেদের বিপ্লবী প্রচেষ্টা দ্বারা ইসলামের কেন্দ্রীয় শক্তিকে ধ্বংস ও নির্মূল করতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি তাদেরকেই সমূলে ধ্বংস করেছেন। এই সমস্ত বিজয় ছাড়াও তিনি অনেক নির্মাণ কার্য সম্পাদন করেন যা সে সময়ে খুবই প্রয়োজন ছিল।

এতে সন্দেহ নেই যে, হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) র রাজত্বকালে অত্যাচার ও কঠোরতার দৃষ্টান্ত কম মিলবে না। কিন্তু তাঁর এই কঠোরতা একজন অপারেশনকারী ডাক্তারের কঠোরতা সদৃশ, যিনি কোন ক্ষত অঙ্গকে অপারেশনের মাধ্যমে কাটা ছিঁড়া করেন; এর ফলে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো ক্ষত অঙ্গে'র বিভিন্ন রোগ থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপারেশনকৃত অঙ্গের দুঃখ কষ্টের কারণে ভাল অঙ্গ'ও 'খারাপ অঙ্গ' সবই কষ্টানুভব করে। কোন ব্যক্তি ঐ সময়ের সার্বিক অবস্থার উপর নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিপেক্ষ করলে সে এ কথা মানতে বাধ্য হবে যে, এরূপ বিশৃংখলা পূর্ণ মারাত্মক অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে যবর দস্তি ও কঠোরতার প্রয়োজন ছিল যা আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময়ে ইসলামের খেদমতের সবচেয়ে বড় চাহিদা এই ছিল যে, যেভাবেই হউক না কেন ইসলামের রাজনৈতিক অবস্থাকে বিপদ মুক্ত করা এবং আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশের বিপদ থেকে সংরক্ষণ করা।

মনে হয় যে, আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) র সামনে এই চিন্তাধারাই কার্যকরী ছিল। সুতরাং তিনি অনেক অসহনীয় অবস্থা ও বরদাশ্‌ত করলেন। কিন্তু তাঁর এই উদ্দেশ্য পূরণে তিনি কোন ত্রুটি করেন নি।

ফলে ইসলাম যে গতিতে বিস্তার লাভ করছিল এবং যেভাবে তা প্রসার লাভ করতে ছিল তা'তে কোন বৃদ্ধি বৈ কমতি হয়নি।

সামগ্রিক অবস্থা দৃষ্টে অনুভব করা যায় না যে, এটা ইসলামের পতন মুখ কিংবা তার উন্নতির ভাটা।

হাফিয ইবনে তাইমিয়া (রঃ) মিনহাজুস্ সুন্নাহ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণনা করেছেন যে, "খেলাফত যখন খুবই দুর্বল হয়ে গেল তখন উহা রাজতন্ত্রের আকারে পরিবর্তিত হ'ল। হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) তাকে স্বীয় অনুগ্রহ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার দ্বারা কায়েম রাখলেন। ইসলামে আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) থেকে উত্তম কোন বাদশাহ দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি নিঃসন্দেহে সমস্ত মুসলমান বাদশাহদের মধ্যে উত্তম ছিলেন। তার চরিত্র পরবর্তীতে আগমনকারী বাদশাহদের চরিত্র থেকে অনেক গুণে উন্নত ছিল।"

রাজতন্ত্রের প্রভাব সমূহ

উল্লিখিত গুনাগুণ থাকা সত্বেও বিশুদ্ধ ইসলামী দৃষ্টি কোণ থেকে পরিমাপ করলে আমীর মুয়াবিয়ার কার্য পদ্ধতিতে যে প্রকার শাসনতন্ত্রের কাঠামো তৈরী হ'ল তাতে ইসলামের সামগ্রিক আইন কানুনের জীবনী শক্তির খুবই ক্ষতি হ'ল। শাসনতন্ত্র—গণতন্ত্রের পরিবর্তে ব্যক্তি কেন্দ্রিক হয়ে গেল। আর ইসলামের যে সার্বিক কল্যাণ ঐ সর্বোত্তম শাসনতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল এখন উহার সম্পর্ক বাদশাহর ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তি কেন্দ্রিক হয়ে গেল। আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) ব্যক্তিগতভাবে খুবই কল্যাণকামী ছিলেন। এই জন্য শাসন পদ্ধতির এই পরিবর্তন প্রথমতঃ জনগণ অনুভব করতে পারেনি। কিন্তু দূরদর্শী জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিগণ বিষয়টির গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে অনুভব করতেন ঠিকই, তবে মুখে কিছু বলতে পারতেন না, আর বলা সমীচীন ও ছিল না। কেননা বললে এর অর্থ দাঁড়াবে উম্মতকে আবার এক বিপদে নিপতিত করা। কিন্তু অন্তরে এর ব্যথা অনুভব করতেন। আর সুযোগ মিললে কোন না কোন ভাবে সেটার প্রকাশও ঘটতো। সুতরাং একদা কাদেসীয়া বিজয়ী সা'দ

ইবনে আবি ওক্কাছ (রাঃ) আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)র রাজ দরবারে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি এমনভাবে তাকে অভিবাদন করলেন যেভাবে একজন আজমী (অনারব) বাদশাহকে অভিবাদন করা হয়। আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) এটা দেখে মুসকি হেসে বললেন, "আপনি যদি আমাকে আমীরুল মুমেনীন বলে সম্বোধন করতেন, তা'হলে আপনার কি ক্ষতি হত''? কাদেসীয়া বিজয়ী সেনাপতি উত্তরে বললেন, যেভাবে আপনি খেলাফত অর্জন করেছেন যদি আমার এমন সুযোগ মিলতো তা'হলে আমি কখনও উহা গ্রহণ করতাম না।

বনু উমাইয়ার সবচেয়ে বড় বিরোধ ছিল বনু হাশেমের সঙ্গে। কিন্তু আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) ব্যক্তিগত ভাবে ধৈর্যশীল হওয়ার কারণে রাজসিংহাসনে আরোহণ করার পর এ বংশের সঙ্গে কঠোরতা এবং অত্যাচার মূলক কোন ব্যবহার করেননি। বরং উপঢৌকন এবং পুরস্কার দ্বারা তাদের অন্তর জয় করার চেষ্টা করতেন। তা' সত্ত্বেও শাসনতন্ত্রের কাঠামো রাজতন্ত্রই ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা ফিক্‌র ও ধ্যান ধারণায় যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার পরিমাপ সাধারণ একটি ঘটনার দ্বারাই করা যায়। যেমন—কুফার গভর্ণর যিয়াদ আরবের 'সুমাইয়া'নাম্নী এক নিকৃষ্ট চরিত্রের মহিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। আরবের প্রথানুসারে তাকে "যিয়াদ ইবনে আবিহ" (زياد ابن ابيه) বলা হত। এই উপনাম তাঁর সম্মান জনক পোশাকের একটি কাল দাগ সদৃশ ছিল। ময়ূর যেমন তার কুৎসিত পা দেখে পেখম ছেড়ে দেয় ঠিক তাঁর অবস্থাও ছিল তেমন।

আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) যিয়াদের প্রতিভার দ্বারা যে স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করতেন, যিয়াদের দুর্গম এই পথের একটি ভারী পাথর হিসেবে প্রতিবন্ধক ছিল। তাই তিনি নবীর নির্দেশ الولد للفراش وللعاهر الحجر "সন্তানের বংশ নির্দ্ধারিত হবে বৈধ বিবাহের দ্বারা আর ব্যভিচারীর শাস্তি হ'ল পাথর নিক্ষেপ''। এর প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না করে' এক সাধারণ ফরমান জারী করলেন যে, আগামীতে যিয়াদকে ইবনে আবিহ্ বলার স্থলে যিয়াদ ইবনে আবি সুফিয়ান' বলে ডাকতে হবে। 'ফতহুল বুলদান বালাযুরী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, একদা উম্মুল মুমেনীন হযরত

আয়েশা (রাঃ) যিয়াদকে একটি চিঠিতে আমীর মুয়াবিয়ার নির্দেশ মত যিয়াদ ইবনে আবি সুফিয়ান বলে সম্বোধন করলেন। এতে যিয়াদ খুবই খুশী হলেন এবং উম্মুল মুমেনীনের চিঠিটি জনগণকে দেখায়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করতেন।

ইয়াযিদের জন্য বা'য়াত গ্রহণ

ঘটনাটি যথাস্থানে সাধারণই বটে, কিন্তু এতে বুঝা যায় যে, ইসলামের সামগ্রিক আইন কানুনকে তার প্রকৃত কাঠামো থেকে পরিবর্তন করে' অন্য কোন অস্বাভাবিক কাঠামোতে রূপান্তরিত করার ফলে ক্রমে ক্রমে-মন মানসিকতায়, চিন্তা-ফিকর ও ধ্যান-ধারণায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। আর ক্রমে ক্রমে উহার ভিত্তিমূলকেই লণ্ড ভণ্ড করে দেয়ার কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং এই শাসন পদ্ধতির কারণে সবচেয়ে মারাত্মক ফল হ'ল এই যে, মুসলমানগণ সর্বকালের জন্য খেলাফতের প্রকৃত ধারণা থেকেই বঞ্চিত হ'ল। জনগণের অধিকার আছে খেলাফতের মত একটি সম্মানজনক গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিকে নির্বাচন করার। কিন্তু এসব কথা এমন স্বপ্নে পরিণত হ'ল যে, আজ পর্যন্তও ইসলামের আশা পুনরায় সেই বাস্তব ও জীবন্ত রূপে দেখার স্বপ্ন যেন নার্গিস সদৃশ। কিন্তু সেই দৃশ্য আর ফিরে আসবেনা। বৎসর নয়, বরং যুগের পর যুগ ধরে এমন কাল পর্দার মাঝে তা' আড়াল হয়ে গেছে যে, উৎসুক দৃষ্টি থেমে থেমে অতীতের মহত্ব ও সৌন্দর্যের কারুকার্যের প্রতি তাকিয়ে থাকে, কিন্তু দেখতে পায় না সে সৌন্দর্য।

আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) নিজের জীবদ্দশাতেই স্বীয় পুত্র ইয়াযীদের জন্য খেলাফতের বা'য়াত গ্রহণ করে এই শাসন পদ্ধতিকে এমন কঠিন করে দিয়েছিলেন যে, আজ পর্যন্তও এর ভিত্তি কায়েম আছে। সেই সময়ও সাহাবাদের মাঝে এবং তাবেঈনদের মাঝে এমন কিছু সংখ্যক মহান ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন যদি আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) র ন্যায় কতক ব্যক্তিকে কিংবা হযরত আবুবকর (রাঃ) র ন্যায়

কোন একজনকে নির্বাচন করে' 'অসিয়ত হিসেবে খেলাফতের সুপারিশ করতেন, তা' হলে নিশ্চয় এমন বিশৃংখলা বা ঝগড়ার সৃষ্টি হত না যা ইয়াযীদকে খলিফা নির্বাচনের ফলে হয়েছে। সুতরাং এখন রাজত্ব শুধু এক বংশের উত্তরাধিকার হিসেবেই রয়ে গেল। 'খলিফা' শব্দটিতে ধর্মীয় অনুভূতির অর্থ সংযুক্ত আছে। এ জন্য বনু উমাইয়া খলিফা উপাধিটি পরিত্যাগ করেন নি। প্রকৃত পক্ষে খেলাফতের সময় কাল তো শেষ হয়ে গেছে। আর যা' কিছু তখন নামে মাত্র বাকী ছিল তা'তে প্রচলিত অর্থে ধোকা ব্যতীত অন্য কোন গুরুত্ব নেই।

"বনু উমাইয়ার রাজত্ব কালের পর্যালোচনা"

আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) যেভাবে জোর পূর্বক রাজত্ব অর্জন করেছিলেন ঠিক সে ভাবেই ইয়াযীদের জন্যে ও জোর করে খেলাফতের 'বা'য়াত' গ্রহণ করেছিলেন। যাঁরা আন্তরিক ভাবে তা পছন্দ করতেন না তাঁদেরকেও বা'য়াতের জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল। রাজতন্ত্র কিংবা একনায়ক-তন্ত্র শাসনের সবচেয়ে খারাপ ফল হ'ল এতে জনগণের স্বাধীন চিন্তাধারা ও স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার হরণ করা হয় এবং যবরদস্তি, প্রাধান্য বিস্তার, আত্মম্ভরিতা ও কঠোরতার আধিক্য বেড়ে যায়। বনু উমাইয়ার রাজত্ব-কালে রাজতন্ত্রের এ সমস্ত অপরাধ সমূহই বিদ্যমান ছিল।

আমীর মুয়াবিয়ার পর তাঁর ছেলে ইয়াযীদের শাসনামলে যা কিছু হয়েছে বিশ্ব বাসীর কাছে তা অজানা নয়। রাসূলে কারীম (সা)র কলিজার টুকরা হোসাইন (রাঃ) স্বীয় ত্যাগের দ্বারা এই আত্মম্ভরিতা খতম করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা শেষ হ'ল না। আবদুল্লাহ্‌ইবনে যুবায়র (রাঃ)-র মত পবিত্র সাহাবী নিজের রক্তের বিনিময়ে ইসলামের কা'বার ঐ দাগ সমূহ বিধৌত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। এখন রাজতন্ত্রের অধিকার শুধু ঐ ব্যক্তির জন্যই রয়ে গেল যে জোর পূর্বক নিজের জন্য রাজ সিংহাসন অর্জন করতে পারেন। তিনি কাজ কর্মে যতই অনুপযুক্ত এবং রাজ্য শাসনের জন্য যত অযোগ্যই হউন না কেন। ইয়াযীদ থেকে শুরু করে উমাইয়া বংশের শেষ খলিফা মারওয়ান পর্যন্ত দু'একজন ব্যতীত সকল উমাইয়া খলিফাদের মধ্যেই একথা সমভাবে পাওয়া যায় যে, তারা বিবেক

বিরুদ্ধ কথার উপর অনর্থক কঠোরতা এবং অত্যাচার দ্বারা কার্য সিদ্ধি করতেন। হিশাম ইবনে আবদুল মালিক তুলনা মূলক ভাবে ভাল ছিলেন। বনু উমাইয়াদের প্রথম পর্যায়ের খলিফাদের সময়ে মিম্বরের উপর খোৎবায় প্রকাশ্য ভাবে আলী (রাঃ) র বিরুদ্ধে গালি গালাজ করা হত, তিনিই তা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তা সত্বেও পক্ষপাতিত্বের অবস্থা ছিল এমন যে, আলী (রাঃ) র বংশের কারও প্রশংসা শুনতে পারতেন না।

অতএব একদা ইমাম যয়নুল আবেদীন (রাঃ) (ইমাম হোসাইনের পুত্র) কা'বা ঘর তাওয়াফ করছিলেন, যখন 'হাজর আসওয়াদ'কে চুম্বন করার জন্যে অগ্রসর হলেন তখন জনগণ তাঁর সম্মানার্থে সরে গিয়ে তাঁকে জায়গা দিলেন এবং ভিড় কমায়ে দিলেন। কিন্তু হিশাম ইবনে আবদুল মালিক যখন চুম্বনের জন্যে অগ্রসর হলেন, তখন জনতার কেহই তাঁর জন্য একটু রাস্তাও ছেড়ে দিলেন না। এ অবস্থা দেখে একজন শামী ইমাম যয়নুল আবেদীনের দিকে ইশারা করে বললেন, مــن هــذا ইনি কে ? হিশাম ইমামকে ভাল করে চিনলেও তখন না চেনার ভান করে বললেন, আমি তাঁকে চিনি না। আরবের বিখ্যাত কবি 'ফারাযদাক' তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইমাম সম্পর্কে হিশামের অসৌজন্য মূলক আচরণ সহ্য করতে না পেরে তাঁর সম্পর্কে একটি প্রশংসা মূলক কবিতা পাঠ করলেন। তাঁর এই কবিতাটি কম-বেশী আরবী সাহিত্য ও ইতিহাসের সকল গ্রন্থেই উল্লেখ আছে। আহ্‌লে বায়ত (নবী পরিবার) র প্রতি আন্তরিকতা ও ভালবাসার এমন পবিত্র অনুপ্রেরণা সবার অন্তরেই পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান। আগ্রহী পাঠকগণ আজও তা পড়ে মাতোয়ারা হন। কবিতাটি দীর্ঘ। কিন্তু এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছন্দ আলোচিত হ'ল। এটা পাঠে পাঠকের অন্তর উপকার পেতে পারে।

কবিতাংশটি নিম্নে বর্ণিত হ'ল —

(١) هذا سهيل حسين و ابن فاطمة ـ
بنت الـرسول من انجابت بـه الظلم ـ
(٢) هذا الـذی تعـرف البطحاء و طأتـه ـ
و البيت يعـرفه و الحل و الحرم ـ

(٣) اذا رأته قريش قال قائلهم ـ
الى مكارم هذا ينتهي الكرم
(٤) هذا ابن خيرعباد الله كلهم ـ
هذا التقى النقى الطاهر العلم ـ
(٥) ينشق نور الضحى من نور غرته ـ
كالشمس تنجاب اشراقها القتم ـ
(٦) يكاد يمسكه عرفان راحته ـ
ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم ـ
(٧) مشتقة من رسول الله نبعته ـ
طابت عناصره والخيم والشيم ـ
(٨) هو ابن فاطمة ان كنت جاهله ـ
بجده انبياء الله قد ختموا ـ
(٩) وليس قولك " من هذا "؟ بضائره ـ
العرب تعرف من انكرت والعجم ـ
(١٠) من معشر حبهم دين وبغضهم ـ
كفر وقربهم منجى ومعتصم ـ
(١١) ان عد اهل التقى كانوا ائمتهم ـ
او قيل من خير اهل الارض قيل هم ـ
(٢١) لا يقبض العدم بطان اكفهم ـ
سيان ذلك اذا ثروا وان عدموا ـ
(٣١) من يعرف الله يعرف اوليه ذا ـ
والدين من بيت هذا ناله الامم

কবিতাটির ধারাবাহিক ছন্দের অনুবাদ—

(১) ইনি (ইমাম যয়নুল আবেদীন) হোসাইনের (রাঃ) প্রিয় সন্তান এবং রাসূলের কন্যা ফাতিমা (রাঃ) র কলিজার টুকরা। যার সৌন্দর্যের আলোতে আঁধার বিদূরিত হয়।

(২) ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁর পদচিহ্ন পবিত্র মক্কার বিস্তৃত ভূমি ও চেনে। বায়তুল্লাহ এবং হেরেম শরীফ ও যাঁকে জানে।

(৩) কুরায়শগণ যখন তাঁকে দেখে তখন তাঁদের মধ্য থেকেই বলে উঠে তাঁর সচ্চরিত্রের উপর ভদ্রতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

(৪) তিনি আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে সর্বোত্তম। তিনি খোদাভীরু, পবিত্র ও বিশ্ব নেতা।

(৫) তাঁর ললাটের স্বর্গীয় জ্যোতি প্রথম প্রহরের সূর্যালোক হতেও আলোকিত। যাঁর আলোকে গোধূলীর আঁধার ও বিদূরিত হয়।

(৬) তিনি যখন বায়তুল্লাহর যিয়ারত কালে রুক্‌নে হাতীম' (কাল পাথর স্থল) চুম্বনের জন্যে হাত বাড়ান, তখন 'রুক্‌নে হাতীম ও তাঁর হস্ত চিনে' তা ধরে' রাখতে চায়।

(৭) তাঁর শারীরিক গঠন প্রণালীর উপকরণ আল্লাহর রাসূলের শারীরিক গঠন প্রণালীর অংশ বিশেষ। সুতরাং তাঁর দেহ ও আকৃতি প্রকৃতি সবই পবিত্র।

(৮) তিনি ফাতিমার পুত্র সন্তান। যদি তুমি তাঁকে না চিনে থাক তা'হলে জেনে রাখ যে, তিনি হলেন শেষ নবীর নাতি, যাঁর দ্বারা নবুওতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

(৯) তোমার এই জিজ্ঞাসা 'তিনি কে'? তা'তে তাঁর কি ক্ষতি হবে? তুমি তাঁকে চিনতে অস্বীকার করলেও আরব ও আজমের সকলেই তাঁকে চেনে।

(১০) তিনি এমন বংশের সন্তান, যার প্রতি ভালবাসা রাখা ধর্মীয় পুণ্যকাজ এবং যাঁর প্রতি হিংসা করা কুফরের অন্তর্গত। তাঁদের নৈকট্য লাভ মুক্তির উপায় ও আশ্রয়স্থলের ঠিকানা।

(১১) যদি তুমি খোদাভীরুদের সংখ্যা নির্ণয় করতে চাও, তা'হলে দেখবে যে, তিনি হলেন সকলের ইমাম বা নেতা। কিংবা যদি বলা হয় যে, জগদ্বাসীর মধ্যে উত্তম কে? উত্তরে বলা হবে তাঁরাই।

(১২) দরিদ্র ও তাদের প্রসারিত হস্তের প্রতিবন্ধক নয়। তাঁরা সম্পদশালী হউন বা নাই হউন, তাঁদের জন্য উভয় অবস্থাই সমান।

(১৩) যে আল্লাহকে চেনে সে তাঁর (ইমাম যয়নুল আবেদীনের) প্রাধান্য ও সম্মান সম্বন্ধেও জানে। কেননা সকল জাতিই সত্য ধর্মের সন্ধান তাঁদের দ্বারাই তো পেয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, কবি ফারাযদাক' তাঁর কবিতায় বনু উমাইয়ার প্রতি কোন বিদ্রূপ করেননি এবং তাঁদের ভাল মন্দও কিছু বলেননি। বরং কবি তার সুললিত ছন্দে শুধু মনের ভাব ও বিশ্বাসটুকুই প্রকাশ করেছেন। যা' মুসলমান হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তিই এই বংশের লোকের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে চাইবে। তার পরও হিশাম তা' সহ্য করতে পারলো না। কোন কোন বর্ণনা মতে তিনি এই অপরাধে কবি ফারাযদাক-কে বন্দী করেন। অন্য বর্ণনা মতে উল্লেখ আছে যে, বায়তুল মাল থেকে কবি ফারাযদাক' কে যে ভাতা দে'য়া হত তা' তিনি বন্ধ করে দেন।

(‘শায্‌রাতুয্‌যাহাব' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ১৪৪ পৃঃ দ্রঃ)

এটা কতই না আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এক দিকে বনু উমাইয়ার খলিফাগণ নবী বংশের সঙ্গে পক্ষপাতিত্ব ও শত্রুতা মূলক আচরণ করেন এবং অন্যদিকে তাঁদের উদারতা ও প্রশস্ত অন্তকরণের অবস্থা এমন ছিল যে, আখ্‌তাল'-র মত খৃষ্টান কবিগণ অনায়াসে তাঁদের রাজ দরবারে আসা যাওয়া করতো, খলিফাদের সাথে আনন্দ উল্লাস ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো এবং অনৈসলামিক কাজকর্মে লিপ্ত হত। খলিফাগণ নির্বিবাদে তা' সহ্য কয়তেন। এতে স্পষ্ট ধারনা করা যায় যে, আমীর মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর থেকেই রাজতন্ত্রের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম প্রকাশিত হ'তে লাগলো। অর্থাৎ খলিফাদের আসল উদ্দেশ্য নিজের এবং স্বীয় বংশের সম্মান ও পদমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা। ব্যক্তি স্বার্থকে জাতীয় ও দলগত স্বার্থের উপর প্রাধান্য দেয়া শুরু হ'ল।

কর্মচারীদের অত্যাচার

খলিফাদের মাঝে যদি কঠোরতা, আত্মম্ভরিতা এবং স্বার্থপরতা প্রাধান্য লাভ করে তবে কর্মচারী এবং সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার লাগামহীন কার্যকলাপ সৃষ্টি হতে বাধ্য। সুতরাং বনু উমাইয়ার কর্মচারীরাও ইসলামের রূহ বা জীবনী শক্তি ভুলে গিয়ে অবৈধ কাজকর্ম এবং সীমাহীন অবিচারও অত্যাচারে নিমগ্ন হ'ল। যিয়াদ এবং তাঁর ছেলে উবায়দুল্লাহ মদীনা ও ইরাকে যা' কিছু করেছেন, তা' শুনলে শরীর শিহরে উঠে।

মাসউদীর বর্ণনা মতে, এক হাজ্জাযই প্রায় সোয়া লাখ নিরপরাধ মানুষের লাশ' ধরাশায়ী করেছেন। কিন্তু এতদসত্বেও আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের মত চিন্তাশীল ও সচেতন উমাইয়া খলিফা ও হাজ্জাযের কর্মসমূহ দেখেও না দেখার ভান করার মত আচরণ করতেন এবং তাঁকে স্বীয় রাজত্বের শক্তি বর্দ্ধনের একটা মস্তবড় উপায় মনে করতেন।

বনু উমাইয়াদের পক্ষপাতিত্ব

বনু উমাইয়াদের রাজত্বকালের সবচেয়ে ক্ষতিকারক বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁদের মাঝে বংশগত পক্ষপাতিত্ব ছাড়াও আরবীয় ও অনারবীয়ের পক্ষপাতিত্ব ও বিদ্যমান ছিল। অনারবীয় যে সব লোক মুসলমান হয়ে আরবীয়দের সঙ্গে জীবন যাপন করছিল, বনু উমাইয়াদের দৃষ্টিতে তারা খুবই নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হত। আর মাঝে মাঝে তাদের উপর অস্বাভাবিক অত্যাচার ও করা হত। হাজ্জায সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ কথা এই যে, তিনি অনারবীয় নওমুসলিমদের এক বিরাট দলকে দেশের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করে দেশের নির্জন প্রান্তরে গ্রামের আনাচে কানাচে বিক্ষিপ্তভাবে শুধু এই উদ্দেশ্য ছড়ায়ে রাখতেন যে, তারা আরবদের সাথে মিলে মিশে বসবাস করা সত্বেও বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতে সক্ষম নয়। এই রূপ অনর্থক অনৈসলামিক কঠোরতার ফল:এই হ'ল যে, অনারবীয়গণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষের বীজ বপন করতে শুরু করলেন। আর এখান থেকেই একটা বিরাট আঞ্চলিক বিদ্রোহের সূত্রপাত হ'ল। এর ফলে ভবিষ্যতে ভাল ভাল মুসলমানদেরকে ও তাদের দলে ভিড়ালো।

রাজকোষের অনিয়ম ও বিশৃংখলা

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে রাজকোষ সম্পূর্ণ ভাবে জাতির একটি গচ্ছিত ধনাগার ছিল। এর প্রতিটি পয়সা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যয় করা হত। খলিফাদের সময়ে তা থেকে নিজের জন্য এবং স্বীয় পরিবার পরিজনের জন্য আবশ্যকীয় কিছু নেওয়া হত বটে, তবে এর পরিমাণ শুধু এতটুকু ছিল যা দ্বারা সাধারণ ভাবে কোন ক্রমে জীবন যাপন করা যায়।

কিন্তু তার বিপরীত বনু উমাইয়াগণ মুসলমানদের এই গচ্ছিত ধনকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ বলে মনে করতো। তা হতে যা মন চায় তাই খরচ করতো। খলিফা নিজে অনারবীয় বাদশাহ্দের শান শওকতের ন্যায় জীবন যাপন করতেন এবং যা কিছু খরচের প্রয়োজন হতো উহাই রাজকোষ থেকে পূর্ণ করতেন। নিজেদের বিলাসপূর্ণ খরচাদি ছাড়াও কর্মচারীদের-কেও উচ্চ বেতন প্রদান করতেন। আর তাঁরাও খলিফাদের ন্যায় বিলাস বহুল জীবন যাপন করতেন। এটা ছাড়াও যাঁরা বনু উমাইয়াদের প্রশংসা কীর্তনে মত্ত থাকতো কিংবা যাদের দ্বারা রাষ্ট্রের কোন প্রকার পারস্পরিক স্বার্থ ও শক্তি পেঁছার সম্ভাবনা থাকতো, তাদের উপর জাতির গচ্ছিত সম্পদ অকাতরে খরচ হতো। আর এর বিপরীত যে সব লোক স্বাধীন চিন্তাধারা নিয়ে থাকতে চাইতেন, তাঁদের অধিকার থাকা সত্বেও তাঁদের নির্দ্ধারিত ভাতা বন্ধ করে দে'য়া হতো। সুতরাং ইয়াযীদ (ا قد حرصى) মক্কা ও মদীনার অধিবাসীদের প্রচলিত ভাতা বন্ধ করে দেন। আনসারদের নির্দ্ধারিত বেতনও শুধু এই অজুহাতে কয়েক বারই বন্ধ করে দেন যে, তাঁরা নবী পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সাহায্যকারী ছিল। এরূপ অতিরিক্ত ও ভারসাম্যহীন অনর্থক খরচের কারণে রাজকোষের অবৈধ ব্যয়ের ফলে যখন ঘাট্‌তি দেখা দিত তখন তা পূরণ করার জন্যে খলিফাগণ নিজেও তাদের কর্মচারীগণ টেক্‌স্‌, জিযিয়া ও খাজনা আদায়ে অস্বাভাবিক কঠোরতার সাথে কার্য সিদ্ধি করতো। আর এতে বৈধ ও অবৈধের পার্থক্যের প্রতি ও কোন দৃষ্টি রাখা হত না। এ ব্যাপারে এর চেয়ে অধিক অত্যাচার আর কি হতে পারে ?

অনেক প্রদেশে যেসব 'যিম্মি' মুসলমান হয়ে গেছেন, তাঁদের নিকট হ'তে ও 'জিযিয়া' কর কাদায় করা হতো। কর্মচারীদের এরূপ যবরদস্তি ও অত্যাচারের মূল কারণ, পানির মত টাকা পয়সা খরচের উপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে আফ্রিকা ও খোরাসানের সাধারণ নও মুসলিমদের মধ্যে ইসলামের প্রতি খারাপ ধারণার সৃষ্টি হ'ল।

বিভেদ ও অনৈক্য :

যে রাষ্ট্রীয় বিধানের বুনিয়াদ ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়, তাতে কদাচিৎ আশা করা যায় যে, তা কোন ব্যাপারে ব্যক্তি স্বার্থ

কুরবানী করে দলীয় স্বার্থ হাসিল করতে পারে। বনু উমাইয়াগণ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পটু। তবে কতইনা উত্তম হতো! যদি তাদের এই রাজনৈতিক দক্ষতা ইসলামিক পদ্ধতিতে রাজ্য শাসনের ধারায় ব্যয়িত হত। কিন্তু এখানে ব্যাপারটি বিপরীত দৃষ্টি গোচর হচ্ছে। তাঁরা সদা সর্বদা চেষ্টা করতেন, যেন রাজ্য শাসন তাদের বংশ থেকে পরিবর্তিত হয়ে অন্য কোন বংশে চলে না যায়। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাঁরা আরবের বিভিন্ন বংশের মাঝে জাহেলী যুগের বিলুপ্ত পক্ষপাতিত্বকে উত্তেজিত করে একজনকে অন্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত করাতে ও কুন্ঠা বোধ করতেন না। এমনি ভাবে মুসলমানদের মাঝে সার্বিক ঐক্য ও সংহতি যেন স্থায়ী না থাকে সে প্রচেষ্টা চল্‌লো। সুতরাং আরবে 'মুযরী' এবং 'ইয়ামানী' বংশের যে সব লোক বসবাস করতো, তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন শত্রুতা চলে আসছিল। ইসলাম তাদেরকে তাওহীদের বন্ধুত্বে আবদ্ধ করে পরস্পর ভাই বানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন বনু উমাইয়াগণ স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে মাটিতে মিশে যাওয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গকে আবার বিশৃংখলা ও ঝগড়া ফাসাদের আঁচলে বাতাস দিয়ে প্রজ্জ্বলিত করে দিল। আর এর ফল খুবই দুঃখজনক রক্তক্ষয়ের আকারে প্রকাশ পেল। পরিণামে কয়েকজন বিখ্যাত তাবেঈন পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

উল্লিখিত ঘটনাবলী ও অবস্থা সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, বনু উমাইয়াদের রাজত্ব ব্যক্তি কেন্দ্রিক এবং আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ ছিল। এতে ঐ রূহ' বা সঞ্জীবনী শক্তি বর্তমান ছিল না, অথচ তা ইসলামের সার্বিক আইন কানুনের মূল ভিত্তি'। তা' সত্বেও তাদের জাহেলী যুগের পাশা-পাশি তাদের আলোকিত অংশের উপর আলোকপাত করা না হয়, তবে তাহলে চরম অবিচার।

عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو

আমার দোষ ত্রুটি যদি কিছু বল তবে গুণের কথাও প্রকাশ কর। অর্থাৎ "আমার নিন্দা করে যারা, গুণের কথাও বলে তারা।"

বিশ্বাসের সথর্তিতা

বনু উমাইয়াদের রাজত্ব কালের একটা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব এই যে, এ বংশের প্রতিটি সদস্য ব্যক্তিগতভাবে তিনি যেমন হউন না, কিন্তু যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাসের সম্পর্ক আছে, সেখানে সকল খলিফাই সঠিক আকিদার অনুসারী ছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা বাতিল পন্থীদের আস্তানা ধ্বংস করতে অসাধারণ বীরত্ব ও দূরদর্শিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তারা নিঃসন্দেহে এ ব্যাপারে প্রশংসার অধিকারী।

আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান

এ প্রসংগে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নাম তালিকার শীর্ষে হওয়া উচিত। আবদুল মালিক হিঃ ৬৫ সাল থেকে হিঃ ৮৬ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। তাঁর এই দীর্ঘ সময়ের রাজত্বের ইতিহাস বিশৃংখলা এবং ষড়যন্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল।

খারেজীদের মূলোৎ পাটন

'নাহ্‌রোয়ান' এর যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার পর খারেজীগণ পারস্য এবং ইরাকে নিজেদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করতে আরম্ভ করলো এবং এমন জোরে শোরে নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রচার শুরু করলো যে, অনেক ভাল ভাল দৃঢ় বিশ্বাসী মুসলমানগণ ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই পথভ্রষ্ট দল ইসলামের জন্য একটা খুবই দৃঢ়তার সাথে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের মুকাবিলা করেন এবং পরিশেষে তাদের সমস্ত আশা আকাংখা খতম করে' নিশ্বাস ফেলেন।

মুখ্‌তারের ফিত্‌না

এ ছাড়া মুখতার ইবনে আবি উবাইদ ছাকাফীর (ফিত্‌না) হাঙ্গামা ও খারেজীদের অনিষ্ট থেকে কোন ক্রমেই কম ধ্বংসাত্মক ছিল না। সে বিভিন্ন দলের মানুষদেরকে নিজেদের সঙ্গে মিলায়ে বনু উমাইয়াদের রাজত্বের ভিত্তির মূলোৎ পাটন করতে মনস্থ করেছিল। মুখতার নিজে খুবই ভ্রান্ত বিশ্বাসের লোক ছিল। যদি সে সময় আরবে তার

রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেত তা'হলে আল্লাহ জানেন— উম্মতে মারহুমার (অনুগ্রহ প্রাপ্ত লোকদের) অধিকাংশ লোক পথ ভ্রষ্টতার কোন পর্যায়ে নিপতিত হতো ?

তাওয়াবীন

অতঃপর তাওয়াবীন (তওবাকারী) দের দল শুধু কথাতেই তাওবাকারী ছিল। তাদের অবস্থা এ কবিতাংশেরই অনুরূপ। যথাঃ

تغافل سے جو باز آیا جفا کی ۔
تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی ۔

"অলসতার কারণে যে অত্যাচার থেকে বিরত রইল, আর যে অত্যাচারী ধ্বংসাত্মক কাজ করলো, তাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

প্রকাশ থাকে যে, যে সব কাপুরুষেরা ইমাম হোসাইনকে কুফায় ডেকে নিয়ে তাঁর শাহাদাতের রক্তে গোসল করার জন্যে তাঁকে একাকী ছেড়ে দিল যদি-তারা বনু উমাইয়ার রাজ সিংহাসন উল্টিয়ে দিয়ে এবং শহীদ ইমামের হত্যাকারীদের প্রতিশোধ নিয়ে নিজেদের অপরাধ সমূহের কাফ্ফারা ও আদায় করে, তবে ও কি আরবের বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং শক্তিশালী দল সমূহের উপর নিজেদের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারতো ? এই দল নিজেদেরকে তাওয়াবীন (তাওবাকারী) বলে ইমাম হোসাইনের সাথে নিজেদের অঙ্গিকার ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু মহান ইমামের বিজয়ী আত্মা তাদেরকে লক্ষ্য করে যেন বলছিল—

کی مرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ۔
ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا ۔

'করলো সে তওবা আমার হত্যার পর।'
আক্ষেপকারীর ও লজ্জিত হওয়া চাই অতঃপর

অর্থাৎ আমার হত্যার পর সে অত্যাচার থেকে তাওবা (অনুশোচনা) করলো হায় ! এ হত্যা কাণ্ডের আক্ষেপকারীর ও লজ্জিত হওয়া চাই এখন তা ছাড়া আর উপায় ই-বা কি ছিল যে, যুদ্ধ থেকে ফিরার পর আক্ষেপ করে নিজেই তাদের মাথায় আঘাত করে।

ইরাকীদের ষড়যন্ত্র

ইরাকীরা স্বভাবতঃ খুবই ষড়যন্ত্র প্রিয় ছিল। যখন তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল তখন তারা আবদুর রহমান ইবনে 'আশআছ'কে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির অস্ত্র হিসেবে ধরে নিয়ে একটা বিরাট গণ্ডগোল শুরু করে দিল। কিন্তু আবদুল মালিক তাদেরকে শাস্তি দিয়ে ছাড়লেন। হাজ্জাযের তত্ত্বাবধানে একদল বীর সৈনিক প্রেরণ করে তাদের বিদ্রোহ দমন করলেন। এই সব অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র এবং ঝগড়া ফাসাদ দমন করা ছাড়াও আবদুল মালিক উত্তর আফ্রিকার বার্বারিদের' এবং সাফ্‌লিয়া' ও কারতাজনা' দ্বীপের রোমীদেরকে এমন কঠিন শাস্তি দিলেন যে, এই এলাকা সমূহ মুসলমানদের জন্য দ্বিতীয় বারের মত শান্তি এলাকায় পরিণত হ'ল। মোট কথা আবদুর রহমান ইবনে মারওয়ান এই হাঙ্গামাপূর্ণ যুগেও সঠিক বিশ্বাসী মুসলমানদের রাজনৈতিক কেন্দ্রীয় শক্তি প্রতিষ্ঠার পথে যে অসাধারণ ধৈর্য-সহিষ্ণুতা ও বীরত্ব পূর্ণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, এতে তিনি নিঃসন্দেহে প্রশংসার অধিকারী।

ইতিহাসে আবদুল মালিককে উমাইয়া রাজত্বের সংস্কারক কিংবা প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। কিন্তু সত্য কথা এই যে, আবদুল মালিকের সদয় ব্যবহার ও উত্তম কার্যক্রম শুধু বনু উমাইয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ইসলামের কেন্দ্রীয় শক্তির স্থিতি এবং বাতিল পন্থীদের মুকাবিলায় সঠিক বিশ্বাসী মুসলমানদের বিজয় ও তাঁর কৃতকর্মের কাছে ঋণী। এ কারণেই অনেকে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে আমীর মুয়াবিয়ার সমকক্ষ বলেছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি পরিপূর্ণ রাজনৈতিক জ্ঞান এবং বীরত্ব ও হিম্মতের সঠিক অধিকারী ছিলেন।

মাসউদী একটি ঘটনা লিখেছেন, যা'তে আবদুল মালিকের এই বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত হয়। তিনি বর্ণনা করেন, হিঃ ৬৬ সালে আবদুল মালিক কুফায় মুখ্‌তারের সঙ্গে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শামী সেনাদেরকে নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়ে যাত্রা করলেন। পথে রাত্রি বেলায় উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের হত্যা এবং তার সেনাদলের পরাস্ত হওয়ার সংবাদ

পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরো সংবাদ পেলেন, যে সেনাদল আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মদীনায় গিয়েছিল, এর সেনাপতি নিহত হয়েছেন। এই সংবাদের পর তৎক্ষণাৎই জানা গেল যে, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ)-এর সেনাদল ফিলিস্তীনের সীমান্তে প্রবেশ করেছে এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাই মাসআ'ব ইবনে যুবায়র ও মিলিত হয়েছেন। এর পরই আবার সংবাদ এল যে, রোম সম্রাট শাম-আক্রমণের উদ্দেশ্য যাত্রা করেছেন। বর্তমানে মাসিসা'-নামক স্থানে বিরাট বাহিনী নিয়ে অবস্থান করছেন। এই সংবাদের পরই আর একজন সংবাদ দাতা সংবাদ দিলেন যে, দামিশকের বিদ্রোহীরা তথায় এক বিরাট হাঙ্গামা শুরু করে দিয়েছে এবং শহর বাসীদের উপর নানা ধরণের অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। এমন কি কয়েদীরা ও জেলা খানা হ'তে প্রাচীর ভেঙ্গে পলায়ন করছে। আবার শুনা গেল যে, যাযাবরদের একটি দল 'হাম্‌স্‌' এবং বা'লাবাক্কু' ইত্যাদি শহরে লুটতরাজ শুরু করেছে।

যদি অন্য কোন লোক হতো, তবে ক্রমান্বয়ে একই সময়ে এমন অশান্তি মূলক সংবাদ শ্রবণে নিশ্চয়ই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তো। কিন্তু উল্লিখিত ঘটনাবলীতে আব্দুল মালিকের অসাধারণ বীরত্ব ও হিম্মতের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই সমস্ত দুঃসংবাদ শুনেও ক্ষণিকের জন্য বিচলিত হননি। বরং সারা রাত আনন্দ স্ফূর্তিতে কাটান। তাঁর প্রতি পদক্ষেপই স্থিরতা ও দৃঢ়তা এবং প্রশস্ত অন্তঃকরণ ও চিন্তাধারার প্রকাশ পেতো। এই যুগের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে ভাবেই হউক না কেন বাতিল পন্থীদের শক্তি বিনষ্ট করা হতো এবং বিদ্রোহীদের পরাস্ত করে' তাদেরকে পুনরায় আর বিদ্রোহের সুযোগ দে'য়া হতো না। যা'তে তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করার জন্য কতক সরল সোজা-মুসলমানদের ছত্র ছায়ার ইসলামের মধ্যে কেন্দ্র হীন অবস্থার সৃষ্টি করে, সফলকাম-হ'তে না পারে। এমনি ভাবে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা শক্তিশালী হওয়ার কারণে প্রতিবেশী শক্তি সমূহের মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার যেন হিম্মত না হয়। অতএব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সবাই এ কথা মানতে বাধ্য যে, আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান সময়ের চাহিদা পূরণ করতে কোন

ত্রুটি করেননি। এক দিকে তিনি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং ষড়যন্ত্র সমূহ খুবই সাহসিকতা, বীরত্ব এবং কৌশলে-দমন করেন। অপর দিকে রোমীদের এবং বার্বারিদের বিদ্রোহ খতম করে' ইসলামের রাজনৈতিক কেন্দ্রীয় শক্তিকে এমন শক্তিশালী করেন যে, তার বিস্তৃতির আঁচল গুটার পরিবর্তে বিস্তৃত হ'তে লাগলো, এবং তার ক্রমাগত উন্নতি হতে লাগলো।

আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ইসলামের শুধু রাজনৈতিক পরিচর্যা-ই করেননি বরং তিনি বিভিন্ন নির্মাণ কার্য ও সম্পাদন করেন। তিনি নিজেই একজন জ্ঞানী ও পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন। কুরআন শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। স্থানে স্থানে 'মকতব প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল ফারসী-এবং রোমী তিনি তাকে আরবী ভাষায় পরিবর্তিত করেন। যার ফলে আরবী ভাষার গুরুত্ব বহু পরিমাণে বেড়ে গেল এবং তাঁর শ্রী বৃদ্ধি পেল। বহু নুতন শহর গড়ে তোলেন এবং অনেক মসজিদ গড়ে উঠে।

ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালিক

আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের পর তাঁর ছেলে 'ওয়ালীদ' খেলাফতের সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি যদিও পিতার ন্যায় জ্ঞানী-গুণী ছিলেন না, কিন্তু রাজ্য শাসন ও পরিচালনা পদ্ধতিতে খুবই পটু ছিলেন। তাঁর ধর্মীয় জীবন-যাপন ও অনেকের জন্য শিক্ষণীয় ছিল। আবদুল মালিক তাঁর রাজত্ব কালে আরবের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং ষড়যন্ত্র সমূহ সমূলে খতম করে দিয়েছিলেন। ওয়ালীদ এই অবসর সময় থেকে স্বার্থ উদ্ধার করলেন। সৌভাগ্য ক্রমে তাঁর সময় 'মুহাম্মদ ইবনে কাসিম' মুসা ইবনে নাসির এবং 'কুতাইবা-ইবনে মুসলিম' এর মত মহাবীর ও কৌশুলী সেনাপতি মিলেছিল। যারা তাঁদের গৌরবোজ্জল কৃতিত্বের দ্বারা ইসলামের ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করে ছিলেন। কুতাইবা ইবনে মুসলিম খুরাসান, খাওয়ারযিম এবং চীনা তুর্কীস্থান বিজয় করেন। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম সিন্ধু আক্রমণ করলেন এবং ভীষণ যুদ্ধের পর তা জয় করেন। মুসা ইবনে নাসির স্পেনের ভূমিতে পেঁাছে ইসলামী রাষ্ট্রের ঝান্ডা উত্তোলন

করলেন। এমনি ভাবে চীন থেকে স্পেন পর্যন্ত বিশাল ভূ-খণ্ড মুসলমানদের দখলে আসলো। এই সমস্ত বিজয় ছাড়াও ওয়ালীদ নির্মাণ কার্যের প্রতি ও দৃষ্টি দেন। তিনি খুবই উত্তম ও সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেন। সেনাদলকে যথা নিয়মে শৃংখলাবদ্ধ করেন। প্রচার দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। কুরআন শিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে বহু 'মকতব' প্রতিষ্ঠা করেন। জ্ঞানী-গুণী এবং শিক্ষার্থীদের জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। তাঁদেরকে জীবন যাপনের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করেন। ভিক্ষা বৃত্তির পথ বন্ধ করে' মুসলমানদেরকে নবীর শিক্ষা السوال ذل "কারো কাছে কিছু প্রার্থনা করা অপমান"— এই কথার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেন।

কনষ্টান্টিনোপলের উপর ক্রমাগত ব্যর্থ-হামলা

স্পেন বিজয় 'ইসলামী বিজয় সমূহের ইতিহাসে নূতন গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের সংযোজন হ'ল। এ হচ্ছে মুসলমানদের রাজনৈতিক উন্নতির একটি উজ্জল প্রমাণ। এমনি ভাবে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী স্পেনের যুদ্ধে মুসলমানদের অকৃতকার্যসমূহ নিজেদের জন্যে শিক্ষা ও দূরদৃষ্টির অনেক কাহিনীর জন্ম দিয়েছে। বিজয়ের সাথে এই অকৃতকার্যতার ইতিহাস পড়ে ধারণা জন্মিবে যে, এ যুগে কিভাবে ইসলামী বিজয় সমূহের বিস্তৃতি সত্বেও সঙ্গে সঙ্গে চলতে ছিল অধঃপতন ও অবনতি। যেন বাহ্যিক ভাবে শরীর খুবই সুস্থ ও তাজা মনে হয়, অথচ অভ্যন্তরে ক্ষয়রোগ বিদ্যমান। এ জন্য কখনও জাতীয় অকৃতকার্যতার আকৃতিতে তার প্রকাশ ঘটতে ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে এখানে কনষ্টান্টিনোপল অবরোধ এবং উহার অকৃতকার্যতার অবস্থা কিছু বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।

কনষ্টান্টিনোপল ছিল পূর্ব ইউরোপের প্রবেশ দ্বার। মুসলমানগণ এর গুরুত্ব অনুধাবন করে তা বিজয়ের প্রয়োজনীয়তা খুব ভাল করেই অনুধাবন করেছিলেন। অতএব সর্ব প্রথম হযরত উসমান (রাঃ)-এর খেলাফত কালে হিঃ ৩২ সাল মুতাবিক ৬৬৩ খৃষ্টাব্দে আমীর মুয়াবিয়া

(রাঃ) এক বিরাট বাহিনী নিয়ে তথায় যাত্রা শুরু করলেন এবং এশিয়া হয়ে 'আবুনায়েবাস্‌ফোরস' এর প্রান্তে উপনীত হলেন। সে সময় 'বাশার ইবনে আরতাত ফোনিক্‌স্‌ (Phoenix) পাহাড়ের সম্মুখে রোমীয় বাহিনীকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধের পরিচালনা করছিলেন দ্বিতীয় শাহানশাহ কাওনষ্টিন্। এ যুদ্ধে প্রায় বিশ হাজার রোমী সৈন্য নিহত হলো। কিন্তু মুসলমান সৈন্যদের ক্ষয়-ক্ষতি ও কিছু কম হয় নাই। এই ক্ষয়-ক্ষতির কারণে মুসলমানগণ তা আর জয় করতে না পেরে দেশে ফিরে এলেন।

অতঃপর হিঃ ৪৪ সালে যখন আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফত সর্বজন স্বীকৃত হ'ল এবং দামিশ্‌ক্‌ বণু উমাইয়ার রাজধানী স্থাপিত হল তখন কনষ্টান্টিনোপলের জলে স্থলে ও উভয় দিক দিয়ে আক্রমণ হল। স্থল বাহিনীর প্রধান কমান্ডার ছিলেন আবদুর রহমান ইবনে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ। আর নৌবাহিনীর কমান্ডার পূর্ববৎ 'বাশার ইবনে আরতাত'ই ছিলেন। এই বাহিনী মারমোরা সাগর পর্যন্ত পেঁছেছিলো। কিন্তু শীত কালে ভীষণ শীতের কারণে তথায় কোন কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেননি। মুসলমানগণ শীতকাল কাটায় আনাতোলিয়াতে।

অতঃপর হিঃ ৪৮ সালে হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) পুণরায় অনেক যুদ্ধসামগ্রী সহ আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করেন। শাম ও মিশরের বন্দর সমূহে 'ফজিলাহ' ইবনে উবায়দুল আনসারীর তত্বাবধানে এক বিরাট নৌবাহিনী গঠন করেন। সেনাদল 'আনাতোলিয়া অতিক্রম করে 'ক্লাসিডোন' পর্যন্ত বিজয় করে পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ হিঃ ৪৯ সালে 'সুফিয়ান ইবনে আউফুল আযদীর' তত্বাবধানে এক বিরাট নৌবাহিনী স্পেন বিজয়ের উদ্দেশ্যে পাঠানো হ'ল। তা ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ) এবং হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ)-এর মত মহামতি সাহাবাগণ ও এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই স্থল বাহিনী ছাড়াও নৌবাহিনী প্রস্তুত হ'ল যার প্রধান কমান্ডার ছিলেন 'বাশার ইবনে আরতাত'। 'রোদবারদানিয়ালের' বিশাল জলরাশির তরঙ্গমালার মধ্য দিয়ে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানীর কয়েক মাইল দূরে ইউরোপের

সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। বলা যায় যে, এখন মুসলমানগণ কনষ্টান্টিনোপলের সীমান্তবর্তী প্রাচীরের প্রায় নীচে উপস্থিত। মুসলমানদের এই বিরাট যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ পূর্বাঞ্চলীয় রোম সাম্রাজ্যের শাহান-শাহ্‌র পূর্বেই জানা ছিল। আর এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনিও মুসলমানদের মুকাবিলায় বিরাট প্রস্তুতি নিলেন। তাঁর কাছে একটা নূতন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র ছিল, যাকে 'ইউনানী অগ্নি' (greek fire) বলা হত। ইহা 'তারপিডু'র (Torpedo) (সমুদ্র তলে জাহাজ বিধ্বংসী অগ্নি বোমার) কাজ করতো। মুসলমানগণ অনেক দিন পর্যন্ত স্থল বাহিনী ও নৌবাহিনী নিয়ে অবরোধ করলেন এবং সকাল-সন্ধ্যা সারাক্ষণ চললো আক্রমণ। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) এবং আবদুল আযীয ইবনে যেরারাহ কালবী এই যুদ্ধে শহীদ হলেন। কিন্তু এবার ও বিজয় হ'ল না। মুসলমানদের ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হ'ল। পরিশেষে তাঁরা কনষ্টান্টিনোপল থেকে ৮০ মাইল দূরে তাঁবু ফেললেন এবং কয়েক বৎসর পর্যন্ত তাদের ভূমিকা ছিল শীতকালে এখানে আগমন করতেন এবং গ্রীষ্মকালে আবার অবরোধ করে তা জয় করার চেষ্টা করতেন। ক্রমাগত ব্যর্থতার ফল হ'ল এই যে, জাহাজের, জন সম্পদের এবং অন্যান্য যুদ্ধ সামগ্রীর ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হলো। অবশেষে হিঃ ৫৮ সালে এই সেনাদল স্বদেশ ফিরে এলেন। অনুমান করা হয় যে, এই সব যুদ্ধে মুসলমানদের প্রায় ত্রিশ হাজার মুজাহিদ শহীদ হন। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুসলমানদের ক্রমাগত পরাজয়ে রোমীদের শক্তি সাহস বহুগুণে বেড়ে গেল। আর এতে মুসলমানদের মহত্ব ও গৌরবের ক্ষতি হয় যথেষ্ট। পরিশেষে আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) রোমীদের সঙ্গে ৪০ বৎসরের জন্য এক শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন।

কনষ্টান্টিনোপল অবরোধে মুসলমানদের যে ক্রমাগত ব্যর্থতার গ্লানী বহন করতে হলো; তা কোন সাধারণ আঘাত ছিল না যে, কালের চক্রে তা বিলীন হয়ে যাবে বরং তাতে ইসলামী সেনাদলের অন্তর ও কলিজার উপর এমন দাগ কাটলো, যা থেমে-থেমে তাঁদেরকে উত্তেজিত ও অস্থির করে তুলতো। সুতরাং ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালিক-এর খেলাফত কালে যখন মুসা ইবনে নাসির সফলতার সাথে স্পেন জয় করলেন তখন তিনি চাইলেন যে, তাঁর বিজয়ের

গতি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পরিচালিত করবেন এবং কনষ্টান্টিনোপল হয়ে দামিশ্‌ক্‌ পর্যন্ত পৌঁছবেন যেন খৃষ্ট ধর্ম এবং খৃষ্টান রাজত্ব উভয়ের শক্তি একই সাথে বিনষ্ট হয়। কিন্তু রাজ দরবার থেকে মুসার অনুমতি মিললোনা। এর ফলে ইসলামী বিজয়ের গতি ফ্রান্সের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে গেল।

সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিকের রাজত্বকাল

ওয়ালীদের মৃত্যুর পর তাঁর আপন ভাই সুলায়মান হিঃ ৯৬ সাল মুতাবিক ৭১৫ খৃষ্টাব্দে খেলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় বণু উমাইয়াদের রাজত্ব অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ ছিল। তৎকালের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তাঁদের শক্তি সাহস-ও আশা আকাঙ্খা-সুদৃঢ় করে দিয়েছিল। উচ্চতর রণকৌশলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ ও সুশৃংখল সেনাবাহিনী বিদ্যমান ছিল। যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধের অন্যান্য সাজ সরঞ্জামের কোন কমতি ছিল না। অন্যদিকে 'বাজেণ্টাইনী, রাজত্বে অনিয়ম ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছিল। বিশ বছরের স্বল্প সময়ের মধ্যে ছয়জন 'কায়ছার' (রোম সম্রাটের উপাধি) রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন ও অপসারিত হন। বুলগারী-এবং সালাফীগণ (selavonians,) উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ ধ্বংস করে রাজধানীর দ্বার প্রান্তে পেঁাছে গিয়েছিল। অন্যদিকে আরবরা 'এশিয়া' অতিক্রম করে বিজয়ের সীমারেখা আব্‌নায়ে বাস্‌ফোরস্‌ এর সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল। দেশের অভ্যন্তরে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ বিদ্যমান ছিল। এইরূপ অবস্থাকে নিজের অনুকূল দেখে সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিক কনষ্টান্টিনোপলের উপর নূতন করে আক্রমণ করার ইচ্ছা করলেন। এই উদ্দেশ্যে সুলায়মান বিরাট পদাতিক বাহিনী-এবং নৌবাহিনী গঠন করেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র ও সাজ সরঞ্জাম দিয়ে সেনা বাহিনীকে সুসজ্জিত করে নিজের ভাই মুসলিম ইবনে আবদুল মালিকের তত্বাবধানে পাঠালেন। আর নিজে ওয়াবেক নামক স্থানে অবস্থান করলেন এবং ভাইকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, হয়তঃ কনষ্টান্টিনোপল জয় করবে, অন্যথায় সেখানে অবস্থান করে আমার পরবর্তী নির্দেশ ও উপদেশের অপেক্ষা করবে।

হিঃ ৯৮ সালের শুরুতে অর্থাৎ ৭১৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে-মুসলিম আনাতুলিয়ার উঁচু ভূমির এলাকা সমূহ দখল করেন এবং 'বাইজেন্টাইনের কয়েকটি বিরাট দুর্গ ও শহর জয় করেন। অতঃপর আনাতোলিয়ার রাজধানী উমোরীয়া-এর দিকে ধাবিত হন এবং তা অবরোধ করেন। উমোরীয়ার গভর্ণর ছিলেন-লিউ (Leo)। তিনি মুসলিমের সঙ্গে সন্ধি করলেন। কিন্তু পরে কায়সারকে অপসারিত করে নিজেই কনষ্টান্টি-নোপল রাজ সিংহাসনের অধিকারী হলেন। মুসলিম-খুবই হিম্মত ও বীরত্বের সাথে এক বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে কনষ্টান্টিনোপলের দিকে ধাবিত হলেন। বাইজেন্টাইনের ঐতিহাসিকগণের ধারনা যে, সে সময় পদাতিক ও নৌবাহিনীর যে সেনাদল কনষ্টান্টিনোপলের একেবারে প্রাচীরের কাছে একত্রিত হয়েছিল, তাদের সংখ্যা প্রায় এক লাখ আশি হাজার ছিল। সুলায়মান 'ওয়াবেক' নামক স্থানে বসে সব সময় সাহায্যকারী সৈন্য সামন্ত এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় যুদ্ধের সামগ্রী ও রসদপত্র প্রেরণ করতেছিলেন। মুসলমানগণ উদ্যমের সাথে কনষ্টান্টিনোপল বিজয়ের আশায় বীর-বিক্রমের সাথে যুদ্ধ করতেছিলেন। মুসলিম বাহুরে মামোরা'র সমুদ্র উপকূল বেয়ে বেয়ে স্থল বাহিনী ও নৌবাহিনী নিয়ে এক যোগে কনষ্টান্টিনোপল অবরোধ করে ফেলেন এবং চতুর্দিক থেকে কামানের গোলা বারুদ ছাড়তে আরম্ভ করলেন। এই অবরোধ দীর্ঘদিন পর্যন্ত চললো। কিন্তু এই সময় ও মহা প্রভুর ইচ্ছা ছিলনা যে, মুসলমানগণ বিজয়ী ও সফলকাম হয়ে প্রত্যাবর্তন করে। পরিণামে মুসলমানদের এই অবরোধে বিরাট ক্ষতি হলো। অতঃপর সেই বছর এত তীব্র শীত পড়েছিল যে, আরবীয়রা তা সহ্য করতে পারলনা। হাজারো সৈন্য নিহত হলো এবং হাজার হাজার সৈন্য কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে যুদ্ধের অনুপযোগী হয়ে গেল। এদিকে যুদ্ধের রসদ পত্র ফুরিয়ে এলো। ইতিমধ্যে সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালিকের ইনতিকাল হলো। অতঃপর হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয খলিফা হলেন। তিনি যুদ্ধের অবস্থা অবগত হয়ে মুসলিম-কে কনষ্টান্টি-নোপল অবরোধ উঠায়ে সৈন্যদেরকে নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তনের ফরমান পাঠালেন। সৈন্য নিয়ে প্রত্যাবর্তনের পথে আর এক বিপদ দেখা দিল। গ্রীকগণ-'ইডরইয়ানোপল এর মুসলিম সেনাদলের অবশিষ্ট নৌবাহিনীর

উপর আক্রমণ করলো। এতে অনেক জাহাজ ডুবে গেল। অবশিষ্ট যে কয়টি রক্ষা পেল সে গুলো কোন ক্রমে শামের বন্দরে গিয়ে ভিড়লো।

এই বারে চরম ব্যর্থতা তাদের শক্তি সাহস একেবারে ভেঙ্গে দিল। অতঃপর হিজরী ৯০ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ পর্যন্ত এই সমস্যার আর সমাধান হলো না। পরিশেষে ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ উল্লিখিত যুদ্ধের প্রায় পূর্ণ আটশত বৎসর পর তুর্কীগণ উহা জয় করেন। এতে সন্দেহ নেই যে, যদি মুসলমানগণ সে সময় কনষ্টান্টিনোপল বিজয়ে সফলকাম হতেন, তবে আজ ইউরোপের মানচিত্র হয়তঃ অন্য কিছু হতো। কে বলতে পারত যে, মিশর, শাম ও ইরাকের মত এলাকার অধিবাসীদের অধিকাংশই যে তাওহীদ বিশ্বাসীদের সন্তানে পরিপূর্ণ না হতো ?

কিন্তু –

يريد المرء ان يعطى مناه -
ويابى الله الا ما يشاء

(অর্থাৎ) মানুষ চায়-যে, তার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হউক কিন্তু আল্লাহ যা চান-তাই হয়-। (মানুষের ইচ্ছায় কোন কিছু হয়না।)

ব্যর্থতার কারণসমূহ

ঐতিহাসিকগণ এ সব যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যর্থতার বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন। যথা (১) আরবদের সামুদ্রিক যুদ্ধের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার অভাব। (২) মুসলিম ইবনে আবদুল মালিকের 'উমোরীয়ার' গভর্ণর 'লিউ' (Leo) এর উপর বিশ্বাস করে গোপনীয় তথ্য জানিয়ে দেয়া মারাত্মক ভুল হয়েছিল। (৩) প্রতিকূল আবহাওয়া আরবদের জন্য খুবই অসহনীয় হয়ে গিয়েছিল। (৪) অন্যদিকে রোমীদের শক্তি সামর্থ ছিল অধিক এবং যুদ্ধাস্ত্র ও ছিল নূতন ধরনের।

জাতীয় দৃষ্টি কোণ থেকে মুসলমানদের এই সব ব্যর্থতার কারণ তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু তা ছাড়া ব্যর্থতার সব চেয়ে বড় কারণ ছিল এই যে, মুসলমান বাদশাহগণ যারা ইসলামী সেনাবাহিনী

পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন, আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে তাঁরা মহত্বের অধিকারী ছিলেন না। নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, আত্মম্ভরিতা এবং কঠোরতায় খলিফা থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত সকলই একই ধরণের চরিত্রের লোক ছিলেন। মুসলমান ছাড়াও অমুসলমান পর্যন্ত তাঁদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা অনুভব করতে পারতেন। সুতরাং খ্রীষ্টান বাদশাহ হিজরী ৪র্থ শতাব্দীতে একজন আব্বাসীয় খলিফাকে কবিতাতে যে চিঠি লিখেছিলেন তা, নিম্নরূপ।

(١) الا شمروا يا اهل بغداد ويلكم -
فملككم مستضعف غير دائم -
(٢) فعودوا الى ارض الحجاز اذلة -
وخلوا بلاد الروم اهل المكارم -
(٣) ملكنا عليكم حين جار قويكم -
وصالتم بالمنكرات العظائم -
(٤) قضاتكم باعوا جهارا قضاءهم -
كبيع ابن يعقوب ببخس دراهم -

"হে বাগদাদবাসী! তোমাদের জন্য ধ্বংস, তোমরা পলায়নের জন্য প্রস্তুত হও। কেননা তোমাদের দেশ দুর্বল ও অস্থায়ী। তোমরা অপমানিত হয়ে মক্কার দিকে ফিরে যাও এবং সম্মানিত রোমীদের নগর সমূহ খালী করে দাও। আমরা তোমাদের উপর তখনই প্রবল হলাম, যখন তোমাদের শক্তিশালীরা দুর্বলদের উপর অত্যাচার করেছে এবং তোমরা যখন ঘৃণ্য কার্য করতে আরম্ভ করলে। তোমাদের বিচারকগণ নিজের 'রায়' এমন ভাবে বিক্রি করতে লাগলো—যেমনভাবে ইবনে ইয়াকুব অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আঃ) সামান্য কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় হয়ে ছিলেন।"

আব্বাসীয় খলিফা তখন উল্লিখিত কবিতায় লিখিত পত্রের উত্তর তৎকালীন বিখ্যাত আলিম ও সাহিত্যিক 'কুকাল মারুযী' দ্বারা লেখায়ে ছিলেন। লক্ষ্য করুন, উত্তর পত্রে কত পরিষ্কার ভাষায় সত্য কথার স্বীকারোক্তি হয়েছে।

وقلتم ملكنا بجور قضاتكم
وبيعهم احكامهم بالدراهم -
وفى ذاك اقرار بصحة ديننا -
وانا ظلمنا فابتلينا بظالم -

(হে খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী !) তোমরা বলতেছ, আমরা এই কারণে তোমাদের উপর প্রবল হলাম যে, তোমদের বিচারকগণ অত্যাচার করতে ছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের 'রায়' সমূহ মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করতে ছিল। হ্যাঁ তা ঠিকই বটে। কিন্তু এ'তে তো আমাদের সত্য ধর্মে'রই স্বীকৃতি পাওয়া যায়। আমরা অত্যাচার করেছি বলেই তো আমাদের পরীক্ষা চলছে।

সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিকের শাসনামলে কনষ্টান্টিনোপল অবরোধ করে ব্যর্থ হওয়ার দু'শত বৎসর পর একজন খ্রীষ্টান বাদশাহ মুসলমানদের ব্যর্থতার যে সব কারণ বর্ণনা করেছিলেন, তন্মধ্যে কর্মচারী ও প্রশাসকদের অবিচার ও অত্যাচার এবং সত্যধর্ম থেকে বিমুখতাই ছিল প্রধান। লক্ষ্য করে দেখুন যে, এটা কিভাবে মুসলমানদের পূর্ণ ইতিহাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কার্যকারী ছিল। সম্রাট বাবর হিন্দুস্থানে কয়েকবার আক্রমণ করেছেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত—

نوروز ونوبهار ومى ودلربا خوش است -
بابر بعيش كوش كه عالم دوباره نيست

"নওরোজের উল্লাসে ও নব বসন্তের আনন্দে শরাব ও চিত্তাকর্ষক বস্তুতে এবং বিলাসী জীবন যাপনে মত্ত ছিলেন ও ধরাকে সরা জ্ঞান করছিলেন" ততক্ষণ পর্যন্ত বিজয় অর্জন সম্ভব হচ্ছিল না। অতঃপর যখন তিনি লজ্জাজনক শরাবের পিয়ালা ভেঙ্গে দিয়ে সমস্ত লাগাম হীন নেশাযুক্ত দুষ্কর্ম থেকে তওবা করলেন, তখন বিজয় ও সফলতা তাঁর পদ চুম্বন করলো।

ইনি সেই সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিক, যাঁকে উত্তম চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে মনে করা হতো। কিন্তু এর সঙ্গে তাঁর অত্যাচার, কঠোরতা, আত্মম্ভরিতা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা এমন

প্রবল ছিল যে, তিনি কুতাইবা ইবনে মুসলিম এবং মুহাম্মদ ইবনে কাসিম এর মত ইসলামের বিখ্যাত মহান সেনাপতিকে তাদের উত্তম সেবা সত্বেও হত্যা করালেন। শুধু এই অজুহাতে যে, তাঁর সম্পর্কে সন্দেহ ছিল, তিনি না কি ওয়ালীদ এর পর তাঁর ছেলেকে খলিফা পদে বসতে এবং সুলায়মানকে খেলাফতের আসন থেকে বঞ্চিত করাতে চেয়ে ছিলেন। মুসা ইবনে নাসির নিঃসন্দেহে স্পেন বিজয় করে ইসলামের বিরাট উপকার করেছিলেন। তিনি সবার কাছেই প্রশংসনীয় ও প্রিয় ছিলেন, এই অপরাধে তাকেও রাষ্ট্রীয় অত্যাচার ও অবিচার থেকে রেহাই মিলেনি। পরিণামে তাঁর ছেলে আবদুল আযীযকে তো হত্যাই করা হলো।

ইহা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কতক কর্মচারী এমন ছিলেন, যাঁরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে স্বার্থোদ্ধার করলেন এবং নিজেদেরকে স্বাধীন ঘোষণা করে খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলেন। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, অপরাধটা কার? যখন খলিফাদের মাঝে আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হয়, তখন কর্মচারীদের মধ্যে অনুরূপ স্বভাব বা কর্ম প্রকাশ পাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)

সুলায়মানের পর হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) খলিফা হলেন। তিনি একজন ন্যায় পরায়ণ শাসক এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতিতে খলিফা ছিলেন। সুতরাং তিনি সত্যটাকে খুব ভাল করে অনুভব করলেন যে, প্রকৃত কাজ নিজের আত্মশুদ্ধি ও নিজ কর্মের সংশোধন, রাজ্য জয় প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। বরং উহার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা এই হওয়া চাই যে, সত্যের বাণী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক এবং কোন শক্তিই যেন তার প্রচার কার্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি মুসলিম ইবনে আবদুল মালিককে, যিনি সেই সময় কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, ফরমান পাঠালেন যে, সমস্ত সৈন্যকে নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করুন। তিনি নিজে সকল কর্মচারী, প্রশাসক, আমীর ও গভর্ণরকে চারিত্রিক সংশোধনের দিকে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

তাঁর এই সংশোধনীর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান যেন ঈমান ও আমলের দিক থেকে সত্যিকার ভাবে প্রকৃত মুসলমান হয়ে জীবন যাপন করতে পারে।

এই সংশোধনী তিনি নিজের পরিবার থেকেই প্রথম শুরু করলেন। সুতরাং তিনি সর্ব প্রথম রাজ পরিবারের সকল সদস্যদেরকে একত্রিত করে বললেন, আমার ধারনা উম্মতে মারহুমার (অনুগ্রহ প্রাপ্তদল) অর্ধেক কিংবা তিন ভাগের দু'অংশ সম্পদই তোমাদের করতলগত। তোমরা যাদের কাছ থেকে তা নিয়েছ তাদের কাছে তা ফেরত দিয়ে দাও। মারওয়ানের সন্তানগণ কি তা, মানতে রাজী হবে? না, তারা বললো, আমাদের মাথা কর্তিত হতে পারে, কিন্তু এসব সম্পদ ফেরত দেয়া যেতে পারে না। আমরা আমাদের বাপ দাদাদেরকে না কাফির বানাতে পারি, আর না আমাদের সন্তান সন্ততিদেরকে কাঙ্গাল বানাতে পারি। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ও আত্মসাতের অভিশাপ সমূলে ধ্বংস করার অঙ্গিকার করে বললেন, আল্লাহর শপথ! যদি তোমরা আমার কথা মত প্রকৃত মালিকের নিকট তাদের সম্পদ ফিরিয়ে না দাও, তা'হলে আমি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে ছাড়বো। তাঁর এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এক জনসমাবেশে ভাষণ দিয়ে বললেন, "উমাইয়া খলিফাগণ আমাদেরকে এমন জায়গীর ও জমিদারী প্রদান করেছেন, যা তাদের দেওয়ার এবং আমাদের গ্রহণ করার কোন অধিকার ছিল না। আমি এই সব জায়গীর ও জমিদারীকে প্রকৃত মালিকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে চাই। আর এটা আমি নিজের এবং আমার পরিবারের লোকদের দ্বারাই শুরু করবো। এই ভাষণের পর তিনি নিজের সমস্ত জায়গীর ফেরত দিয়ে দিলেন। এমনকি একটি ছোট পাথর কণাও রাখেননি। অনেক পণ্ডিত তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, আপনার পর আপনার সন্তান সন্ততিদের কি অবস্থা হবে? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাদের সবাইকে আল্লাহর নিকট অর্পণ করলাম। তাঁর বিবি ফাতিমা খলিফা আবদুল মালিকের কন্যা ছিলেন। তাঁকে তাঁর পিতা একটি মূল্যবান 'ইয়াকুত' প্রদান করেছিলেন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) বললেন, তুমি হয়ত এই ইয়াকুত রাজকোষে জমা দিবে; নচেৎ আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য প্রস্তুত হও। তিনি নিজের এবং স্বীয় পরিবারের

জায়গীর প্রত্যর্পণ করার পর সমস্ত কর্মচারী ও প্রশাসকদেরকে ও কঠোর ভাষায় চিঠি পাঠালেন যে, আপনারা যে সমস্ত সম্পদ জোর পূর্বক জুলুম করে জনগণের নিকট থেকে আদায় করেছেন, তা যথার্থ মালিকের নিকট ফেরত দিয়ে দিন এবং ভবিষ্যতে এমন অন্যায় কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকবেন। তাঁর এই পত্রের এমন কার্য হ'ল যে, ধন সম্পদ, স্থাবর ও অস্থাবর এবং নগদ টাকা পয়সা যে যার কাছ থেকে অন্যায় ভাবে আদায় করে ছিলেন, প্রকৃত মালিকের নিকট তা ফেরত দিয়ে দিলেন। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৫ম খণ্ড, ২৫২ পৃঃ দ্রঃ)

বণু উমাইয়ার কর্মচারীরা বিভিন্ন প্রকার অবৈধ টেকস্ ও খেরাজ আদায় করে জনগণের উপর অত্যাচার, অবিচারের দ্বার খুলে দিয়ে ছিল। তিনি কর্মচারীদের অবৈধ আয়ের উৎস একেবারে বন্ধ করে দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কুফার গভর্ণর আবদুল হামিদের নামে যে চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন, এর ভাষা নিম্বরূপ ঃ

"অত্যাচারী কর্মচারীদের দুর্ব্যবহার ও অবৈধ কার্য পদ্ধতি এবং আল্লাহর আইনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করার কারণে কুফা বাসী কঠিন বিপদ ও কষ্টের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। ধর্মের ভিত্তি হল ন্যায় বিচার ও উত্তম ব্যবহার। শস্যহীন অনাবাদী জমির টেক্স আবাদী জমি থেকে আদায় করবেন না এবং আবাদী জমির টেকস অনাবাদী জমি থেকে নিবেন না। অনাবাদী জমিকে ভালভাবে পরিচর্যা করার চেষ্টা করবেন। উহার যে টুকু শস্য উৎপাদনের উপযোগী তা থেকে খাজনা নেবেন। আর অনাবাদী জমি ঠিক ঠাক করে চাষাবাদের উপযোগী করবেন।

অতএব যে টুকু আবাদী জমি থেকে খাজনা আদায় করবেন, তা যেন বিনয়ের সাথে হয়। কৃষকদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে সহজ পদ্ধতিতে খাজনা আদায় করা চাই। নওরোজের উপঢৌকন, কুরআন মজীদের বিনিময় মূল্য, হাউজ টেকস্ এবং বিবাহ পড়ানোর বিনিময়ে কোন টাকা পয়সা গ্রহণ করা অনুচিত। তবে এ কথাটি ভাল করে জেনে রাখুন, যে জমির মালিক মুসলমান হবে, তার উপর খাজনা প্রদান

অত্যাবশ্যক নয়।" (তবরী গ্রন্থের ৮ম খণ্ড, ১৩৯ পৃঃ দ্রঃ) তিনি শুধু কর্মচারীদের নামে ফরমান পাঠিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং যে কোন গভর্ণর অথবা প্রশাসকের কার্যে ত্রুটি দৃষ্টি গোচর হলে সত্যিকার ভাবেই তাকে শায়েস্তা করতেন। এতে কোন পক্ষপাতিত্ব করতেন না। সুতরাং ইয়াযিদ ইবনে মাহলাব আরবের একজন নামী দামী আমীর ছিলেন। যখন তিনি স্বীয় সম্পত্তির আয় ব্যয়ের পরিষ্কার হিসাব দিতে ব্যর্থ হন, তখন উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) তাকে গ্রেফতার করেন এবং বহু মানুষের সুপারিশ সত্বেও তাকে মুক্তি দেননি। (ইবনে আসীরুল জাযরী গ্রন্থের ৫ম খণ্ড, ১৯ পৃঃ দ্রঃ)

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)-র এই সংস্কার শুধু ইসলামের ইতিহাসেই নয়, এবং বিশ্ব ইতিহাসে এক অনুপম দৃষ্টান্ত। এতে বুঝা যায় যে, তিনি উম্মতে মারহুমার (অনুগ্রহ প্রাপ্ত দল) প্রকৃত রোগ চিনতে পেরেছিলেন। আর তিনি ভাল করেই বুঝে ছিলেন যে, সরকারের কর্মচারী গভর্ণর, প্রশাসক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদের সদস্যাবৃন্দ, জনগণের ধন সম্পত্তিতে স্বাধীন ভাবে অপচয় করে অথচ কেউ তাদের বাধা প্রদানকারী হয় না। একটা সরকারের জন্যে এর চাইতে অধিক বিপজ্জনক ও ধ্বংসাত্মক পাপ আর কিছু হতে পারে না। এ কারণেই হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) রাজ্য জয়ের প্রতি খুব বেশী দৃষ্টি দেননি। তিনি আত্মশুদ্ধি, অভ্যন্তরীণ পবিত্রতাকে প্রকৃত পক্ষে খুই অত্যাবশ্যক ও গুরুত্ব পূর্ণ বলে মনে করতেন এবং এ দিকেই তাঁর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ছিল।

বণু উমাইয়াদের খালিফাগণ নিজেদের অত্যাচার ও কঠোরতা এবং খেলাফতে রাশেদার পদ্ধতিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করার জন্য অজুহাত পেশ করতেন যে, বর্তমানের লোকজন খেলাফতে রাশেদার সময়কার লোকদের ন্যায় উত্তম নয়। সুতরাং একদা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান নিজেই পরিষ্কার ভাষায় এ কথা প্রকাশ করেন। কিন্তু হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) এ কথা সমর্থন করতেন না। তিনি বলতেন যে, বাদশাহর দৃষ্টান্ত একটা বাজারের ন্যায়। বাজারে ঐ সব বস্তুই আমদানী করা হয় যা বাজারের চাহিদা থাকে। যদি বাদশাহ নিজে পুণ্যবান

হন, তবে প্রজাগণ ও পুণ্যবান হবেন। আর যদি বাদশাহ পুণ্যবান না হন, তবে জনগণ ও পুণ্যবান হবে না।

একদা ইমাম আওযায়ী (রঃ) আব্বাসীয় খালিফা মনসুরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, বাদশাহ চার প্রকার। (১) প্রথম শ্রেণীর বাদাশাহ হল, যিনি নিজে আত্ম সংযমী হবেন এবং কর্মচারীগণকেও সে নির্দেশ দিবেন। এই ধরনের বাদশাহ প্রকৃত পক্ষেই আল্লাহর পথের মুজাহিদ। তার এক নামায সত্তর হাজার নামাযের পুণ্যের সমতুল্য হবে। আর আল্লাহর অনুগ্রহের হস্ত সর্বদা তার মাথার উপর ছায়া হয়ে থাকবে। (২) দ্বিতীয় প্রকার বাদশাহ হলেন, যিনি প্রজাগণের সম্পদ ভক্ষণকারী হন এবং কর্মচারীদেরকেও এমন কাজ করার স্বাধীনতা দেন। এই প্রকৃতির বাদশাহ কঠিন পাপী। তাঁকে নিজের পাপের বোঝা তো বহন করতেই হবে, তদুপরি কর্মচারীদের পাপের ভাগী ও তাঁকে হতে হবে। (৩) তৃতীয় প্রকার বাদশাহ হলেন, যিনি নিজে অবশ্য আত্ম সংযমী হন, কিন্তু কর্মচারীদেরকে অত্যাচার ও কঠোরতর জন্য স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দেন। এই শ্রেণীর শাসক এমন দুর্ভাগা যে, অন্যের পার্থিব সুযোগ প্রদানের জন্য নিজের পরকাল বিক্রি করে ফেলেন। (৪) চতুর্থ শ্রেণীর শাসক হলেন, যিনি নিজে সকল কাজে গাফেল বা অসতর্ক, কিন্তু কর্মচারীদেরকে যাবতীয় কাজে হুশিয়ার বা সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন। ইমাম আওযায়ী বলেন, ذاک شر اا کیاس তারা অতিশয় বদবখ্‌ত। ইমাম আওযায়ী (রঃ) কর্তৃক বাদশাহদের উল্লিখিত শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী নিঃসন্দেহে উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) ১ম শ্রেণীর শাসকের অন্তর্গত। তিনি নিজে খোদাভীরুতা এবং সতর্কতার ভিত্তিতে খুবই স্বচ্ছ জীবন যাপন করতেন। তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদেরকেও ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী জনগণের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য বাধ্য করতেন। এ কারণেই উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)-এর খেলাফতকে খেলাফতে রাশেদার পদ্ধতির খেলাফত বলা হয়। তাঁর ন্যায় পরায়ণতা, সততা, অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, এমন পরিষ্কার ছিল যে, স্ব-গোত্রীয় লোক ব্যতীত অপরজনেরাও তার এই সব গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় পঞ্চমুখ ছিল।

মাসঊদী বর্ণনা করেন, রোম সম্রাট যখন খবর পেলেন যে, উমর ইবনে আব্দুল আযীয (র) ইন্তিকাল করেছেন, তখন তিনি খুবই ব্যথিত হলেন। বার বার মরহুম খলিফার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য এবং প্রশংসার কথা উল্লেখ করে কাঁদতে লাগলেন। তিনি বললেন, যদি হযরত ঈসা (আঃ) এর পর কেউ মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারতো, তবে আমি উমর ইবনে আব্দুল আযীয (র) সম্পর্কে এই মু'জেযা প্রদর্শনের কথা চিন্তা করতাম। পরিশেষে তিনি বললেন, আমি ঐ শ্রেণীর দরবেশ-বা পাদরীকে পসন্দ করিনা যারা পৃথিবীর সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে' নির্জনে বসে ইবাদত করে। বরং আমি ঐ শ্রেণীর দরবেশ বা পাদ্রীকে (হযরত উমর (রঃ) এর প্রতি ইঙ্গিত করে) দেখে সদা আশ্চর্যান্বিত হই, যাঁরা দুনিয়াটাকে রাখতেন নিজেদের পায়ের নীচে, তবুও সাধুতার বা দরবেশী জীবন-যাপন করেন।

(মুরাওয়াজুয, যাহার গ্রন্থের বরহাশীয়া ইবনে আসীর, ৭ম খন্ড, ১২০/১২১ পৃঃ দ্রঃ)

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (র) চেয়েছিলেন যে, মুসলমানদের রাজ্য শাসন পদ্ধতি সমস্ত অন্যায় ও অপরাধ থেকে পবিত্র হয়ে পুনরায় তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ও কাঠামোতে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, তাঁর খেলাফত কাল ছিল খুবই স্বল্প সময়ের জন্যে।

ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল মালিক

উমর ইবনে আব্দুল আযীযের পর ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল মালিক খলিফা হলেন। কিন্তু তিনি উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রঃ)-এর শাসন পদ্ধতি বহাল রাখতে পারেননি। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করার কিছুদিন পর হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র) কর্তৃক নিয়োগ কৃত-কর্মচারীদেরকে একেবারে অপসারণ করে দিলেন। অতঃপর তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদেরকে স্পষ্ট ভাষায় লিখে দিলেন যে, "উমর ইবনে আব্দুল আযীযের কার্য পদ্ধতি সফলকাম হতে পারে না। কারণ তাঁর শাসন পদ্ধতির ফলে রাজস্ব এবং অন্যান্য টেক্স্ এর পরিমাণ খুবই কমে

গেছে। সুতরাং আপনারা পুনরায় পূর্বের ন্যায় প্রাক্তন পদ্ধতিতে কাজ কর্ম শুরু করুন। তা'তে জনগণ সুখ সাচ্ছন্দে থাকুক-বা অভাব গ্রস্থ হউন, এই পদ্ধতি পসন্দ করুক আর নাই করুক, তা'তে কোন কিছু যায় আসেনা। সর্বাবস্থাতেই আপনারা কোন কিছুর পরওয়া করবেন না।"

ইহা ছাড়া ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল মালিক অপরিসীম বিলাসী ও আরাম প্রিয় ছিলেন। সালামা' এবং" "হুবাবা' নাম্নী তাঁর দু'জন প্রিয়তম দাসী ছিল। তন্মধ্যে 'হুবাবা'র সঙ্গে তার এমন ভালবাসা ছিল যে, একটি সাধারণ ঘটনায় হঠাৎ করে 'হুবাবা'র ইন্তিকাল হয়ে গেল। ইয়াযীদ তিনদিন পর্যন্ত তার লাশ গোর-কাফন ব্যতীত রাজ প্রাসাদে রাখলেন। এমতাবস্থায় তিনি বার বার তার লাশে চুম্বন দিতেনও সোহাগ করতেন। আর বিরহ ব্যথায় উচ্চ স্বরে রোদন করতেন।

অনেক ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন যে, এই বিচ্ছেদ-বা বিরহ-ব্যথা ইয়াযীদের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। মোটকথা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (র) দু'বৎসর কয়েক মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ে খিলাফতের শাসন পদ্ধতির যে সব ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন করেছিলেন, তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় হওয়ার পর পুনরায় ঐ সব দেখা দিতে লাগলো। আর সত্য কথা এই যে, ক্রমাগত অন্যায় কাজ করার ফলে অন্যায়ের 'বিষ'—মুসলমানদের সার্বিক জীবনের শিরা-উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এখন তা' দূরীভূত করা সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়।

হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক

চার বৎসর একমাস রাজত্বের পর-হিঃ ১০৫ সালের শা'বান মাসে ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল মালিকের ইন্তিকাল হলো। তার অছিয়ত অনুযায়ী তার ভাই হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক সিংহাসনে আরোহণ করেন। হিশাম নিজ বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাশীলতা, দূরদর্শিতা ও জ্ঞান গরিমায় এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। এ দিক থেকে তিনি বনী উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে আমীর মুয়াবিয়া এবং আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সমকক্ষ ছিলেন। টাকা পয়সা খরচের ব্যাপারে তিনি খুবই সতর্ক ছিলেন। এজন্য অনেকে তার প্রতি কৃপণতার ভ্রান্ত ধারণা পোষণ

করত। সম্পদ সঞ্চয়ের আগ্রহ অবশ্যই ছিল। কর্মচারীদের সম্পর্কে তার নীতি সম্ভবত তাই ছিল, যা' হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীযের ছিল।

ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন যে, ট্যাক্স ও রাজস্ব এবং অন্যান্য কর আদায় ও বণ্টনের ব্যাপারে যে উত্তম পদ্ধতি হিশাম ইবনে আব্দুল মালিকের রাজত্ব কালে প্রচলিত ছিল, অন্য কোন খলিফার সময়ে তদ্রূপ ছিল না। নির্মাণ কার্য ও প্রশাসনিক দক্ষতা ও শৃংখলা ছাড়াও দেশ জয়ের দিক দিয়ে ও হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের রাজত্বকাল বনী উমাইয়ার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁর রাজত্বকালে পুনরায় খারেজীগণ মাথা চাড়া-দিয়ে উঠলো। তিনি তাদেরকে পরাস্ত করে সমূলে ধ্বংস করেন। মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের হাতে সিন্ধু বিজয় হয়েছিল। কিন্তু এখানকার কতক এলাকায় আবার বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার ঝড় উঠল। হিশাম তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি জুনাদ'কে তথায় প্রেরণ করে বিদ্রোহের মূলোপাটন করেন। আবার এশিয়ায় বিভিন্ন বিজয় অর্জন করেন। স্পেনে শাসনতান্ত্রিক দিক দিয়ে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি চলে আসছিল, তিনি তার সংস্কার করে-তথাকার পরিবেশ ঠিক করেন। উত্তর আফ্রিকার 'বার্বার' জাতি তাদের অভ্যাসানুযায়ী আবার ও বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। তিনি তাদের শক্তি নিশ্চিহ্ন করে দেন। ফ্রান্সের উপর কয়েকবার আক্রমণ হল। মোট কথা, ইসলামের রাজনৈতিক শক্তি ও কেন্দ্রীয় শক্তির উপর যে সব বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ উপস্থিত হল, হিশাম-স্বীয় বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা, স্থিরতা ও দৃঢ়তা এবং হিম্মতের সাথে ঐ সবের মুকাবিলা করেন। যার ফলে মুসলমান একটি জাতি হিসেবে স্বীয় রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সুতরাং হিশাম ব্যবহারিক দিক দিয়ে আত্মম্ভরী ও স্বেচ্ছাচারী লোক ছিলেন না। ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা এবং প্রচার কার্যের ও যথেষ্ট সুব্যবস্থা করেছিলেন। আলিম-উলামাদের প্রতিও খুব সম্মান প্রদর্শন করতেন। ফলে রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সত্য ধর্মের বিশ্বাস ও বিধি নিষেধের যথেষ্ট প্রসার ঘটে।

হিশাম ইসলামের সঠিক বিশ্বাস সমূহের ব্যাপারে কোন প্রকার তোষামদ নীতি গ্রহণ করতেন না। কোন ব্যক্তি যদি এর বিপক্ষে স্বীয় ভ্রান্ত

বিশ্বাসের প্রচার করতো, তবে তাকে রাজ দরবারের পক্ষ হতে কঠোর শাস্তি দে'য়া হতো। যেন অন্যান্য লোকদের জন্য এটা এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। আর তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস সমূহ বিস্তার করে' মুসলমানদের ধ্যান ধারনায় ও যেন বিভ্রান্তি সৃষ্টির সাহস করতে না পারে। خلق قرآن — "কুরআন সৃষ্ট" হওয়ার ভ্রান্ত মতবাদ সর্বপ্রথম হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের শাসনামলে সৃষ্টি হয়েছিল। হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক এর প্রতিকার এভাবে করলেন যে, এই ফিৎনার (অন্যায় কাজের) প্রতিষ্ঠাতা "জা'দ ইবনে দিরহামকে" গ্রেফতার করে' ইরাকের আমীর খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-কাসরীর নিকট পাঠিয়ে দিয়ে তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। কিন্তু খালিদ এ ব্যাপারে শিথিলতা করতে ছিলেন। অতঃপর 'হিশাম' পুনরায় কঠোর ভাষায় লিখলেন যে, অনতিবিলম্বে—'জা'দ-ইবনে-দিরহামে'র হত্যার আদেশ কার্যকরী করা হউক। অতএব তিনি ঈদুল আযহার দিনে নামাযের পর জন সমক্ষে তার গর্দান উড়িয়ে দেন।

(ইবনে আসীরুল জাযরী গ্রন্থের ৫ খণ্ড, ৯৬ পৃঃ দ্রঃ)

এমনিভাবে 'গায়লান ইবনে ইউনুস' নামে-এক ব্যক্তি ছিল। সে উমর ইবনে আবদুল আযীযের খেলাফত কালে 'কাদরীয়া' মতবাদের প্রচার করতো। হযরত উমর (র) তাকে ডেকে এনে তওবা করালেন। কিন্তু হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের রাজত্বকালে ঐ ব্যক্তি পুনরায় স্বীয় ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রচারণা শুরু করলো। হিশামের নির্দেশে তার হাত-পা কেটে দেয়া হল। (ইবনে কাসীর গ্রন্থের ৫ম খণ্ড ৯৭ পৃঃ দ্রঃ)

হিশাম ইবনে আবদুল মালিককেই বনী উমাইয়ার শেষ যোগ্য খলিফা মনে করা হয়। তিনি ইসলামের রাজনৈতিক কেন্দ্রীয় শক্তিকে নিজের রাজনৈতিক দক্ষতা ও দূরদর্শিতার শক্তিশালী হাতে থামিয়ে রেখে ছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৫ বৎসর। তাঁর পর শেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান পর্যন্ত যতজন খলিফা হয়েছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ কিংবা সকলই নিতান্ত অযোগ্য ছিলেন। ব্যক্তিগত গুণের দিক দিয়ে তো পুণ্যবান ছিলেন, কিন্তু তাদের মাঝে রাজনৈতিক দক্ষতা ও শক্তি সাহসের অভাব ছিল। যে কারণে সামরিক গণ্ডগোল ও ষড়যন্ত্রের দ্বার বন্ধ করতে পারেন নি।

অতএব হিশামের পর ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল মালিকের ছেলে ওয়ালীদ খলিফা হন। যাঁকে ইয়াযীদ নিজেই তাঁর জীবদ্দশাতেই উত্তরাধিকার বানিয়েছিলেন। তিনি প্রথম নম্বরের অসৎ, অবাধ্য, অত্যাচারী ও কঠোর ছিলেন। মদ্যপান ও গান বাদ্য ছাড়া তার আর কোন্ কর্মের সাথে সম্পর্ক ছিলনা। 'হিশাম' তার লাগামহীন দুষ্কর্মসমূহ অবলোকন্ করে চিন্তা করেছিলেন যে, তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে নিজের উত্তরাধিকার বানিয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি তা পারলেন না। এর পরিপ্রেক্ষিতেই ওয়ালীদ হিশামের পর তার সন্তান-সন্ততি এবং কর্মচারী ও অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা থেকে কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। অনেক প্রভাবশালী সঙ্গী সাথীকে হত্যা করা হল। 'মুজার' ও 'নায্যারী' বংশের দীর্ঘদিনের পরস্পর কলহ মিটে গিয়েছিল। আবার তা পুনঃর্জীবিত হল। এর ফলে অনেকেই নিহত হল।

অতঃপর হিঃ ১২৬ সালে অর্থাৎ ওয়ালীদের সিংহাসনে আরোহণের এক বৎসর পর ইয়াযীদ ইবনে ওয়ালীদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজে একজন আবেদ ছিলেন। কিন্তু প্রশাসনিক দক্ষতা খুবই কম ছিল এই জন্য তাকে (يزيد الناقص) অযোগ্য ইয়াযীদ বলা হতো। সুতরাং তার· সিংহাসনে আরোহণের পর পরই যেন বিরোধিতা ও বিদ্রোহের আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়ল। আরবের মুজার বংশ তাঁর ঘোর বিরোধী ছিল। তারা গন্ডগোল শুরু করল। এ দিকে 'হেম্স' এবং ফিলিস্তীনে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত হয়ে উঠলো। যদিও বাহ্যিক ভাবে এর প্রতিকার করা হল, কিন্তু তার সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন সম্ভব হল না। বনী উমাইয়ার শেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের রাজত্বকালে এ বিষয়টিই বিন্দু বিন্দু করে একত্রিত হয়ে বিপদের এক বন্যা বয়ে দিল এবং উমাইয়া রাজত্বের প্রভাব প্রতিপত্তিকে খর-কুটার ন্যায় ভাসিয়ে দিল।

ঐতিহাসিক তাবরী বর্ণনা করেন যে, মারওয়ান একজন বয়স্ক এবং পরিপক্ক লোক ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি চতুরতায় ও দূরদর্শিতায় উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনি এমন সময় সিংহাসনে আরোহণ করেন, যখন দেশের মধ্যে বিশৃংখলা এবং ষড়যন্ত্র চলছিল। একদিকে উমাইয়া বংশের মধ্যেই ঐক্যে ফাটল ধরল এবং 'শামের' বিভিন্ন

রাজনৈতিক পার্টিতে পারস্পরিক কলহ চলছিল অন্য দিকে খোরাসানে আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠার দাবী উঠলো। খোরাসান তার কেন্দ্র ভূমিতে পরিণত হল। এই আন্দোলন সম্প্রসারিত হওয়ার আরো সুযোগ হল যখন ইয়ামানের খারেজীরা নিজেদের বিক্ষিপ্ত শক্তি সমূহ একত্রিত করতেছিল। এমতাবস্থায় তারা আরো শক্তি সাহস সঞ্চয় করে ইয়ামান ছেড়ে মক্কা ও মদীনায় গিয়ে স্বীয় আকাইদের (ধর্মীয় বিশ্বাসের) প্রচার শুরু করলো। মারওয়ান তাদের মুকাবিলার জন্যে দুর্ধর্ষ সেনাদল প্রেরণ করলেন। সেনাদল হেজায এবং ইয়ামানে পেঁছে তাদের সাথে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে হাজার হাজার বিদ্রোহীদেরকে হত্যা করলো।

আব্বাসীয় খেলাফতের আহবানের নায়ক এবং প্রধান সেনাপতি ছিলেন আবু মুসলিম খোরাসানী। তিনি যখন দেখলন যে, বনু উমাইয়ার এক বিরাট শক্তি খারেজীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, তখন এক লক্ষ লোকের একটি সুশৃংখল সেনাদল নিয়ে যথা নিয়মে খোরাসান অধিকার করেন। তার বিভিন্ন স্থানের শাসন পরিচালনার ভার নিজেদের বিভিন্ন লোকদের উপর অর্পণ করেন। অতঃপর 'কাহতুবা' নামক এক বীর সেনাপতির অধীনে এক বিরাট সেনাদল দিয়ে ইরাকে আজম জয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তখন উমাইয়া রাজত্বের শক্তি প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। এজন্য 'রাই', ইস্পাহান এবং নাহাত্তয়ান্দ প্রভৃতি স্থান সাধারণ যুদ্ধের পর কাহতুবার সৈন্যদের দখলে আসলো। 'মোসেল' এবং 'আরহাল' এর মধ্যবর্তী 'যাব' নদীর তীরে মারওয়ান নিজেই এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে অবস্থান করছিলেন। তথায় উভয় দলের মাঝে ভীষণ যুদ্ধ হল। মারওয়ান পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। শামের লোকদের প্রতি তাঁর খুবই আশা ভরসা ছিল। কিন্তু তারা তাঁর কোন সাহায্যই করলো না। বরং তাঁর পরাজয়ের অবস্থা দেখে তাদের মাঝে আরো এমন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল যে, যেখানে যেখানে তাঁর রাজত্বের প্রতি সহায়তাকারী ও দরদী ছিল, তাদেরকে হত্যা করা হলো।

সুতরাং মিশরবাসীরা তাদের গভর্ণরকে এবং হেমস বাসীরা হেমসের গভর্ণরকে হত্যা করলো। মদীনাবাসীরা অন্ততঃ এ কাজটুকু ভাল করলো

যে, মারওয়ান কর্তৃক নির্বাচিত কর্মচারীদেরকে হত্যা না করে শুধু মদীনা থেকে বহিষ্কার করে দেন। মোটকথা তাঁর জন্য এই বিশাল ভূ-খন্ড সংকীর্ণ হয়ে গেল। যে 'নাযযারী' সম্প্রদায়ের উপর তাঁর এত ভরসা ছিল, তারাও তাঁর প্রতি রূঢ় ব্যবহার করতে লাগলো। অবশেষে বঞ্চিত ও নিরাশ হয়ে দামেশক এবং 'ফিলিস্তীন' অতিক্রম করে তিনি মিশর উপস্থিত হলেন। এ দিকে আব্বাসীয় সেনাদল পশ্চাদানুসরণ করে আসছিল। তথায় মারওয়ান কয়েকজন সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে মুকাবিলা করলেন বটে কিন্তু ইহা অরণ্যে রোদনের ন্যায় বিফল হল। পরিশেষে তিনি যুদ্ধে নিহত হলেন। তার ইনতিকালের পর উমাইয়া রাজত্বের প্রদীপ হিঃ ১৩২ সালে নিভে গেল।

বনী উমাইয়ার ইতিহাসের উপর একটা হালকা দৃষ্টি দিলে এমন কয়েকটি বিষয় উদ্ভাসিত হয়ে যায়, যাদ্বারা সুষ্ঠু ধারণা জন্মে যে, ইসলামের প্রকৃত রূহ বা সঞ্জিবণী শক্তির অধঃপতনের সাথে সাথে কিভাবে তার উন্নতির উপকরণগুলো ও পরস্পর মিলে গিয়েছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ঈমান ও আমলের ব্যাপারে এই যুগে যদিও সাহাবাদের যুগের সাথে তুলনীয় ছিল না, কিন্তু তা সত্বেও একটা চির স্মরণীয় সত্য কথা এই যে, যদি ঐ যুগের মুসলমানদেরকে শুধু একটি জাতি হিসেবে পৃথিবীর অন্য যে কোন সুসভ্য জাতির সাথে তুলনা করা হয়, তবে সহজেই ধরা পড়বে যে, মুসলমান স্বীয় বিশ্বাস ও চিন্তায়, কাজে ও কর্মে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এবং সামাজিক লেন-দেন ও আচার অনুষ্ঠানে তখনও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল। তাঁদের মাঝে ইসলামের প্রকৃত 'রূহ' বা সঞ্জিবণী শক্তির অধঃপতন এসেছিল সত্য, কিন্তু একেবারে মৃত্যু হয়নি। তাঁদের আশ্চর্যজনক বীরত্বে কিছু না কিছু পার্থিব লোভ লালসার অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও কিন্তু اعلاء كلمة الله সর্ব কাজে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার প্রেরণা থেকে তাদের মন একেবারে উদাসীন ছিল না। খাঁটি কথা এই যে, যদি মুসলমানদের মধ্যে একক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক ঐক্য না থাকতো তা'হলে চীন, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, এবং স্পেনে এমন গৌরবোজ্জল কৃতিত্বের অধিকারী কখনও হতে পারতেন না। আর তাদের এই একক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক শক্তির ভিত্তি কোন গোত্র বা বংশের

আত্মীয়তার উপর নির্ভর করে রচিত হয়নি, বরং ইসলামের আত্মিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল। যার ফলে আফিকা এবং চীন দেশের বিভিন্ন ধরনের মুসলমানদেরকে একই সূত্রে আবদ্ধ করেছিল।

বনী উমাইয়া খলিফাদের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তাঁরা স্বীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বিশুদ্ধ আরবীর সংস্কৃতিতে বহাল রাখতে সক্ষম ছিলেন। ইরানী, ইউনানী, তুর্কী, তাতারী, ভারতীয় এবং চীন দেশীয়— মোট কথা বিভিন্ন জাতি মুসলমান হয়ে আরবদের সাথে বসবাস করতে ছিল। কিন্তু আরবদের সংস্কৃতি নওমুসলমানদেরকে প্রভাবান্বিত করতে পেরেছিল, অথচ আরবরা তাদের সংস্কৃতিতে প্রভাবান্বিত হয়নি। এ কারণেই বিভিন্ন দেশ জয়ের সাথে-সাথে ইসলামী সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করলো। আর যে দেশেই মুসলমানদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছে তথায়ই মসজিদ নির্মাণ হয়েছে এবং আবাদ হয়েছে। সত্যের উচ্চ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়েছে। সমস্ত দেশবাসী ইসলামের সংস্কৃতি ও সভ্যতার রঙ্গে রঙ্গিন হয়েছে। কুরআনে আরবী ভাষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সমস্ত বিজিত দেশে কুরআন-হাদীসের শিক্ষার জন্য ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

আব্বাসীয় বংশের রাজত্বকাল

খোরাসানীদের ধ্বংসকারী হাতুরীর আঘাতে বনী উমাইয়াদের রাজপ্রাসাদের ইটের পর ইট খসে গেল এবং এর ধ্বংসস্তুপের উপর আব্বাসী বংশের খেলাফতের বিশাল অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপিত হল। এই অট্টালিকা সম্ভবতঃ সেই ততক্ষণ শক্তিশালী এবং প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হতে পারেনি যতক্ষণ পর্যন্ত এর ইট বনী উমাইয়াদের রক্তে রঞ্জিত না হয়েছে এবং তারই ভিত্তি অসংখ্য মানুষের মুন্ড ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কর্তিত অংশের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়েছে।

বেদনাদায়ক অত্যাচার

'যাব' নদীর তীরে উমাইয়া এবং খোরাসানী সৈন্যদের মাঝে যুদ্ধে হাজার হাজার লোক মারা গেল। এছাড়া ইরাক ও খোরাসানের বহু স্থানে অত্যাচারের উপর অত্যাচার হয়েও যেন তার শেষ হতে ছিল না। মারওয়ানকে

মিশরের 'বোসিরা' নামক স্থানে হত্যা করা হল। তাঁর নিহত হওয়ার পূর্বেই কুফায়—হিঃ ১৩২ সালের রবিউল আউয়াল মাসে বনু আব্বাসীয় প্রথম খলিফা আবুল আব্বাস সাফ্ফার জন্য 'বায়াত' বা আনুগত্যের শপথ নে'য়া হল। কিন্তু তবুও তাদের প্রতিশোধের অগ্নি ঠাণ্ডা হতে ছিল না। বনী উমাইয়াদের এক একজনকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করা হল। সাফ্ফার চাচা দাউদ ইবনে আলী মক্কা ও মদীনায় এবং শামে উমাইয়া বংশের কিংবা এই বংশের সঙ্গে সহানুভূতিশীল যে কোন ব্যক্তিকে পেয়েছে, নির্বিচারে হত্যা করেছে। ঐতিহাসিক ইবনে আসীরুল জাযরীর বর্ণনা মতে বসরার গভর্ণর সুলায়মান ইবনে আলী উমাইয়া বংশের অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিকে মূল্যবান পোশাকে সজ্জিত অবস্থায় বসরাতে হত্যা করলেন। অতঃপর তাদের পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাদের গোর কাফন' হীন লাশকে প্রকাশ্য রাজপথে ফেলে রাখলেন। সেখানে তাদের শরীর কুকুরের নিমন্ত্রণের সামগ্রী হিসেবে পড়ে রইল। আবদুল্লাহ ইবনে আলীর প্রতিশোধের অগ্নি জীবিত মানুষকে হত্যা করেই নির্বাপিত হয়নি, বরং তিনি বনু উমাইয়াদের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন খলিফা আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ), আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান এবং হিশাম ইবনে আবদুল মালিক, এই তিনজনের কবর খনন করে' লাশ উত্তোলন করলেন। হিশামের লাশটি শুধু নাকের বাঁশি ব্যতীত সমস্ত দেহই অক্ষত ছিল। অতঃপর তাঁদের কঙ্কালের উপর বেত্রাঘাত করে প্রতিশোধ নেয়া হল। ঐতিহাসিক ইবনে আসীর' বনু উমাইয়াদের উপর অত্যাচারের হৃদয় বিদারক কাহিনীর আরো বিস্তারিত ইতিহাস লিখেছেন, যা পাঠ করে মানবতা এবং সভ্যতার অধিকারী মানুষের শরীর শিউরে উঠে। এখানে তা বর্ণনা করার প্রয়োজন মনে করি না।

প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহায় তাদের মস্তিষ্কের ভারসাম্য কি পরিমাণ অসার হয়ে গিয়েছিল তা' এই ঘটনাটি দ্বারাই অনুমান করা যায়। একদা 'সাফ্ফাহ্'র নিকট সুলায়মান ইবনে হিশাম ইবনে আবদুল মালিক বসা ছিলেন এবং সাফ্ফাহ্ তাঁর সাথে সম্মানজনক আচরণ করছিলেন। এমতাবস্থায় 'সাদীফ্' নামী একজন কবি'র তথায় আগমন হল। তিনি নিম্ন লিখিত কবিতাটি পাঠ করেন।

لا يغرنك ما ترى من رجال -
ان تحت الضلوع داء دويا
فضع السيف وارفع السوط حتى -
لا ترى فوق ظهرها امويا -

"হে সাফ্ফাহ! যে লোকটিকে আপনার সামনে দেখছেন, সে যেন আপনাকে ধোকায় নিপতিত না করে। তার পার্শ্বদেশে রোগ লুকায়িত আছে। অর্থাৎ তার অন্তর পরিষ্কার নয়। সুতরাং তলোয়ার কাজে লাগান এবং 'বেত' উত্তোলন করুন। যেন ধরাপৃষ্ঠে কোন উমাইয়া জীবিত না থাকে"।

এ কবিতাটি শ্রবণ করেই সাফ্ফাহ্ অন্দর মহলে চলে গেলেন। অতঃপর সুলায়মানকে গ্রেফতার করে' হত্যা করা হল। এরপরও বনী উমাইয়াদের আর কি ভরসা থাকতে পারে? যেসব লোকের উপর আলী (রাঃ) এর পরিবার বর্গের প্রতি সহানুভূতি ও পক্ষপাতিত্বের সন্দেহ হতো তাদের সাথেই এরূপ ব্যবহার করা হতো। মোট কথা—এমনি ভাবে এই বিশাল সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করা হল। যা'দের রাজত্বকালকে মুসলমানদের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা হয় এবং যার উপর আমাদের ঐতিহাসিকগণ গর্ব করতেও লজ্জা বোধ করেন না।

আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ্র কথাও কাজ

খেলাফতের 'বাইয়াত (শপথ) গ্রহণের পর আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ্ কুফার জামে মস্জিদে যে ভাষণ দেন তা'তে তিনি খুবই গর্ব করে বলেছিলেন যে, "আল্লাহ তা'আলা তাঁর ধর্মকে আমাদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন এবং আমাদেরকে ধর্মের দুর্গ (সংরক্ষক) ও আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন। আমরা ধর্মের সংরক্ষণকারী এবং এর শত্রুদের সাথে যুদ্ধকারী হিসেবে তৈয়ার আছি। আল্লাহ আমাদেরকে খোদাভীরুতা এবং পবিত্রতার অনুসারী করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নৈকট্যের সম্মান প্রদান করে' আমাদেরকে সকল মানুষ-থেকে খেলাফতের অধিকতর যোগ্য প্রতিনিধি বানিয়েছেন। অতঃপর সাফ্ফাহ্ কুরআন মজিদ থেকে কয়েকটি আয়াত

পাঠ করেন, যা'তে নিকটাত্মীয়দের অধিকারের কথা বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর বনু উমাইয়া এবং শামবাসীর উপর গালাগালি করে সুন্দর ভাষণ দ্বারা নিজেকে খেলাফতের অধিকার হরণকারী এবং অপরিসীম অত্যাচারী প্রমাণিত করলেন।

আশ্চার্যের বিষয় যে, সেই কুফাবাসী যারা রাসূলের কলিজার টুকরা ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল এবং যারা তাঁকে নির্মম ভাবে-অত্যাচার করে শহীদ করেছিল, তাদেরকে লক্ষ্য করে সাফ্‌ফাহ ভাষণ দেন যে, তোমরা আমাদের ভালবাসা এবং বন্ধুত্বের কেন্দ্রস্থল। কালের দুর্বিপাকে এবং অত্যাচার ও অবিচারের আধিক্যেও তোমাদেরকে আমাদের থেকে বৈরী ভাবাপন্ন অথবা পৃথক করতে পারে নাই। আমাদের সঙ্গে তোমাদের চিন্তাধারার কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং তোমরা আমাদের কাছে খুবই পুণ্যবান এবং সম্মানী। আমি আজ থেকে তোমাদের জন্য নির্দ্ধারিত বৃত্তির পরিমাণ থেকে আরো একশত দেরহাম বৃদ্ধি করে দিলাম। বক্তৃতার শেষে নিজের প্রশংসা করে বলেন যে فانا السفاح المبيح وانا الثائر المبير "আমি রক্ত প্রবাহকে বৈধ মনে করি এবং কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণকারী"। এ সময় তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং বক্তৃতা শেষ করেন। অতঃপর স্বীয় বাসভবনে চলে গেলেন। তৎপর সাফ্‌ফার চাচা দাউদ ইবনে আলী মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং এক দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। এই ভাষণের কয়েক স্থানেই দাউদ উল্লেখ করলেন যে, খেলাফত আমাদেরই হক বা অধিকার। যা' নবী করীম (সাঃ) থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের প্রাপ্য। আল্লাহর শুকরীয়া যে আামাদের এ অধিকার হরণকারীরা ধ্বংস হয়েছে। আর এ অধিকার আমরা পুনরায় প্রাপ্ত হয়েছি।

দাউদ শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তিনি পূর্ণ বীরত্ব ও ঠাটের সাথে একথা ও বলেন যে, তোমরা খুব ভাল করেই শুনে' রাখ যে, নবী করীম (সাঃ) এর ইনতিকালের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ) এবং আমীরুল মুমিনীন আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ অর্থাৎ আবুল আব্বাস সাফ্‌ফাহ্‌ ব্যতীত সঠিক অর্থে খলিফা—এই মিম্বরে আর আরোহণ করেননি।

অতএব একদিকে সাফ্ফাহ এবং দাউদ ইবনে আলীর বক্তৃতা একটু পড়ুন এবং অন্যদিকে তাদের কর্মের প্রতি ও একটু লক্ষ্য করুন। অতঃপর আপনিই বলুন, ইসলামে ধোকাবাজি, মিথ্যা, প্রতারণা এবং বে-ঈমানীর দৃষ্টান্ত এর চেয়ে অধিক খারাপ ও কি কখনও হ'তে পারে? তাদের দাবী হল আমাদের মত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন খলিফা-ই হয় নাই। এমন কি তাদের দৃষ্টিতে হযরত আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ) এবং উসমান (রাঃ) ও খাঁটি খলিফা ছিলেন না। কিন্তু তাদের কাজকর্ম এই কবিতারই অনুরূপ। যথা—

گلۂ جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے کسی
بتکدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری -

"হেরেম কে ও হেরেমের অধিবাসীদের প্রতি পূর্ণ অত্যাচার প্রদর্শনের অভিযোগ আছে। যদি কোন মন্দিরে গিয়ে উপদেশের কথা বলি—, তবে মন্দিরের মূর্তি'রাও-হরি' হরি' বলতে শুরু করে। অর্থাৎ ভালও মন্দের পার্থক্য করা খুবই কঠিন ব্যাপার। এর কারণ যাই হউক না কেন! কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, মুসলমান সর্বদা নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য ক্রন্দন করবে। নবী করীম (সাঃ) পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার প্রায় সোয়াশ' বৎসর অতিবাহিত হ'তে না হতেই মুসলমানগণ এক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করলো যার ভিত্তি প্রতিশোধ স্পৃহা, আরবদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা এবং স্বার্থপরতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর এর পরিপ্রেক্ষিতে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে এবং শক্তিশালী করতে এমন সব কিছুই করা হল—যা' ইসলামী শরীয়তে অবৈধও অচল ছিল। আরবী একটি দৃষ্টান্ত অনুযায়ী বনী উমাইয়া যদি (نباش اول) প্রথম কবর খননকারী হয়ে থাকে তবে এতে সন্দেহ নেই যে, বনু আব্বাস-দ্বিতীয় কবর খননকারী ছিল। আর এ জন্যেই শেষে উল্লিখিত ব্যক্তির মুকাবিলায় প্রথমে উল্লিখিত ব্যক্তি অর্থাৎ প্রথম কবর খননকারীর উপর আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তির অধিকার বেশী।

সৌভাগ্যবান তাঁরাই—যাঁরা অন্যের কাজ-কর্ম থেকে উপদেশ গ্রহণ করেন। কিন্তু আব্বাসীয়গণ তা' করেনি। তাদের খুব ভাল করেই জানা

ছিল যে, বনী উমাইয়াদের অধঃপতনের মূলে দু'টি কারণই অধিকতর কার্যকরী ছিল। তম্মধ্যে একটি হল সীমাহীন অত্যাচার ও অবিচার, খুনা-খুনী এবং নির্দয় ব্যবহার। আর অপরটি হ'ল খলিফা নিজের জীবদ্দশাতেই একজন নয়, বরং দু'জন, তিনজন করে' নিজের উত্তরাধিকার বানিয়ে যাওয়া। কিন্তু এতদসত্বেও এরাও সেই কার্যপদ্ধতিই প্রচলন রাখলেন এবং এতে কোন পরিবর্ত্তন সৃষ্টি করেননি।

স্থলাভিষিক্ত বানানোর বিপজ্জনক পরিণতি

'মুতাওয়াফেকল বিল্লাহ্‌র' রাজত্বকাল পর্যন্ত খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি এমনই ছিল যে, খলিফা নিজের জীবদ্দশাতেই নিজের সন্তানদের মধ্য হতে কোন একজনকে কিংবা ভাই অথবা ভাতিজাকে কিংবা উভয়কে একের পর এক নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে দিতেন। যার ফলে রাজ প্রাসাদের মধ্যে 'বিষ' খাওয়ানোর ঘটনা ঘটতে লাগলো। পরস্পরের মাঝে ষড়যন্ত্র চলতে লাগলো। এমন কি এ নিয়ে ভীষণ যুদ্ধ পর্যন্ত বেঁধে যেত। আর এমনিভাবে আত্মীয়-স্বজন এবং নিকটতম লোকদের মাঝে মিল মিশাতের পরিবর্তে গরমিল এবং বন্ধুত্বের সাথে জীবন যাপন করার পরিবর্তে একে অন্যের রক্ত পিপাসু হতে লাগল। এতে রাজমহলের জীবন যাপন অশান্তিপূর্ণ এবং খারাপ হওয়ার সাথে সাথে প্রজাগণের জীবনেও এক আশ্চার্যজনক দ্বন্দ্বের অশান্তি নেমে আসতো। পরিণামে এ প্রকার কার্যপদ্ধতিতে অনেক সময় ছেলে ও পিতার মধ্যেও লজ্জাজনক ঘটনা ঘটে যেতো। যা' মুসলমান কেন একজন সাধারণ মানুষ ও এমন চিন্তা ও করতে পারেনা। মুতাওয়াক্কেল বিল্লাহ আব্বাসী সম্পর্কে— 'শায্‌রাতুয্‌যাহার' গ্রন্থের লেখক বর্ণনা করেন, যে, هو الذى احيا السنة و اما ت التهم- "তিনি সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন এবং আশা-আকাঙ্খার মৃত্যু ঘটায়েছেন"। কিন্তু এই মুহিউস্‌ সুন্নাহ বা মুজাদ্দেদের ও এমন অবস্থা ছিল যে, তিনি তো প্রথমে তাঁর তিন ছেলে 'মুনতাসির' 'মুতায'-এবং মোয়াইয়্যেদ'-কে নিজের উত্তরাধিকার নির্বাচিত করেন। কিন্তু যেহেতু মু'তাযের মায়ের পক্ষের 'সাবিহা' নাম্নী এক দাসীর সঙ্গে তাঁর অত্যধিক ভালবাসা ছিল, তাই তিনি পরবর্তী সময়ে

অভিমত প্রকাশ করলেন যে, 'মুনতাসির থেকে উত্তরাধিকারের অধিকার পরিত্যাগের অঙ্গিকার পত্র লেখায়ে নেবেন এবং তার পরিবর্তে মু'তাযকেই নিজের স্থলাভিষিক্ত করবেন। মুনতাসির তা মানতে অস্বীকার করলেন এবং রাগে ও ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে পিতাকে হত্যা করার মনস্থ করলেন। সুতরাং হিঃ ২৪৭ সালে 'মুতাওয়াক্কেল' স্বীয় মন্ত্রী ফতেহ ইবনে খাকানের সঙ্গে বসে ছিলেন, এমন সময় ছেলের ইঙ্গিতে পিতাকে হত্যা করা হলো। যে ছেলের পিতার সঙ্গে এমন ব্যবহার হয়, সে আপন অন্য দু'ভাইয়ের সাথে যা' কিছুই করো--তা' নগণ্যই হবে। পিতাকে হত্যা করার কিছু দিন পর 'মুনতাসির' আপন দু'ভাইকে উত্তরাধিকারের অধিকার থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য বাধ্য করলেন। 'মু'তায'-প্রথমতঃ কিছু বিরোধিতা করেছিলেন।, কিন্তু পরিশেষে-'মোয়াইয়্যেদ' ও 'মুতায' উভয়কেই মুনতাসিরের নির্দেশ মানতে বাধ্য করা হল।

তুর্কী দাসদের আধিপত্য

মুতাওয়াক্কেলের মৃত্যুর পর আব্বাসীয় খেলাফতের পূর্ণ কর্তৃত্ব তুর্কী দাসদের হাতে চলে গেল। তারা যাকে চাইতো খলিফা নির্বাচিত করতো এবং যখন যার প্রতি অসন্তুষ্ট হতো তখন তা'কে সরিয়ে দিতো। বরং অনেক সময় পশুত্ব আচরণ করে' বিভিন্ন প্রকার কষ্ট দিয়ে হত্যা করতো। সুতোরাং 'মুতাওয়াক্কেল' থেকে শুরু করে শেষ খলিফা পর্যন্ত যতজন খলীফা হয়েছেন এবং পরিশেষে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই তুর্কী দাসদের দ্বারা নির্বাসিত হয়েছেন এবং পরিশেষে তাদের হাতেই অতি নির্মম ভাবে নিহত হয়েছেন। 'মুতাওয়াক্কেল' নিজেও স্বীয় পুত্র 'মুন্তাসিরের ইঙ্গিতে তুর্কী দাসদের হাতে নিহত হন।

এমনিভাবে 'মুস্তাঈন বিল্লাহ' (মৃত্যু-হিঃ ২৫২ সাল) কে কিছুদিন বন্দী করে রেখে তৎপর হত্যা করা হয়। অন্য এক বর্ণনা মতে মু'তায কে মাটির নীচে এক অন্ধকার কূপে আবদ্ধ করে উপর দিক দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হল। আর তিনি তথায় দম বন্ধ হয়ে মারা যান। হিঃ ২৫৬ সালে মেহদীকে ঐ নির্দয়েরা অত্যাচার করে থাপ্পর ও লাথি মেরে

জীবন বের করে দিল। হিঃ ২৯২ সালে 'মু'তাযের' ছেলেকে ঐ অত্যাচারীরাই গলা টিপে শহীদ করলো। 'মুক্তাদির বিল্লাহ'কে ও অমানষিক অত্যাচারে জর্জরিত করে' হিংস্র পদ্ধতিতে হত্যা করা হল। প্রথমতঃ তলোয়ার দ্বারা তার মাথা গর্দান হতে পৃথক করা হল। অতঃপর কর্তিত মস্তক বল্লমের অগ্রভাগে বিদ্ধ করে প্রদর্শনী করল এবং সমস্ত দেহ উলঙ্গ করে রাখলো। 'কাহের বিল্লাহ'র চক্ষুর মধ্যে অগ্নিতে উত্তপ্ত লৌহ-সলা ঢুকিয়ে দিল। আর তিনি কাতরাতে কাতরাতে নিহত হলেন। এমনি ভাবে খলিফা 'মুস্তাকফি-বিল্লা'হর' (মৃত্যু-হিঃ ৩৩৪ সাল) রশি বেঁধে মাটির উপর দিয়ে হেছড়িয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হল। পরিশেষে চক্ষুতে উত্তপ্ত লৌহ 'সলা' ঢুকিয়ে দিয়ে হত্যা করা হল। মুত্তাকী বিল্লাহ'র সঙ্গে ও অনুরূপ ব্যবহারই করা হল। খালীফা মুস্তার্শিদ বিল্লাহ'র উপর হঠাৎ করে ১৭ জন লোক অতর্কিতে ছুরি দ্বারা আক্রমণ করলো এবং সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত করেও নাক-কান কেটে পরিশেষে অগ্নিতে জ্বালিয়ে দিল। রাশিদ বিল্লাহ'কে তাঁর ছেলের সঙ্গে বহু দিন পর্যন্ত জেলখানায় বন্দী করে রাখা হল। শেষ পর্যন্ত জেলখানাতেই উভয়ের মৃত্যু হল। অতঃপর সর্বশেষ খলিফা 'মুস্তাসিম বিল্লাহ'র যে নির্মম পরিণত হল তা' শুনলে শরীর শিউরে উঠে। ইবনে আল-কামী মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে তাতারীরা তাঁকে গ্রেফতার করল এবং একটি ছালার থলিতে ভর্ত্তি করে পাঁয়ের আঘাতে নিষ্পেষ্ট করে দিল। আর এখানেই আব্বাসীয় খেলাফতের প্রদীপ—যা' দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রজ্জলিত ছিল, চির দিনের তরে নিভে গেল।

আব্বাসীয় খেলাফতের দু'যুগ

আব্বাসীয় খেলাফতকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে দু'টি যুগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম যুগকে ইতিহাসের সাধারণ ভাষায় এই খেলাফতের স্বর্ণযুগ বলা হয়। যা' ১৩২ হিজরী থেকে শুরু হয়ে মু'তাসিম বিল্লাহর শেষ রাজত্বকাল—২২৭ হিজরী পর্যন্ত দীর্ঘায়িত ছিল। অতঃপর দ্বিতীয় যুগের শুরু হয়। যা' ৬৫৬ হিজরীতে আব্বাসীয় সর্বশেষ খালিফা 'মুস্তাসিম বিল্লাহ'র বাগদাদে নিহত হওয়ার সময় পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

পতনের যুগ

দ্বিতীয় যুগ আব্বাসীয়দের পতনের যুগ। এতে রাজদরবারের প্রভাব প্রতিপত্তি একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে দাসদের এবং স্ত্রীলোকদের কাজ কারবার অত্যধিক বেড়ে গিয়েছিল। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র বিরাজিত ছিল। 'রাযী বিল্লাহ'র রাজত্ব কালে (৩২২ হিজরী হতে ৩২৯ হিজরী পর্যন্ত) ইসলামের খলিফা-নামে মাত্র খলিফা ছিল। বিভিন্ন প্রদেশে সেচ্ছাচারিতার - শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং বসরাতে ইবনে রায়েক, খোরিস্তানে—বারিদী, পারস্যে ইমামুদ্দৌলা ইবনে বোয়ায়হা, কারমানে—আবু আলী ইবনে- ইলিয়াস, রাই, ইস্পাহান এবং জাবালে—রুকনুদ্দৌলা-ইবনে বোয়ায়হা এবং রেশিমগীর ইবনে যিয়াদ, মোসেল, দিয়ারে বকর রবীয়া ও মুযারের মধ্যে বনু হামদান্ মিসর ও শামে-উখ্‌শীদ, পশ্চিম আফ্রিকার—কায়েম উলুববী, স্পেনে আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদুল উমুববী, খুরাসান ও মাওয়ারান্নাহারে-নসির ইবনে আহম্মদ ইবনে-সামান, তিব্‌রিস্তান এবং জুরজানে--দায়লম, বাহ্‌রাইন এবং ইয়ামামায়-আবু তাহেরুল কুরায়তী-নিজ নিজ পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা-করলো। খেলাফত্‌ শুধু একটি ধর্মীয় পদ্ধতি হিসেবে-নামে মাত্র বাকী রইল। এখন বাগদাদের খলিফার অধীনে বাগদাদের আশে পাশের কিছু স্থান ব্যতীত রাজ্যের অন্য কোন অংশ-তাঁর দখলে ছিলনা। প্রকৃত পক্ষে বাগদাদেও তিনি পরিপূর্ণ ভাবে স্বাধীন ছিলেন না। প্রদেশ সমূহের সেচ্ছাচারিতার শাসন মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে রাজ পরিষদের সাথে কিছু না কিছু সম্পর্ক রাখা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। আর যে কোন প্রাদেশিক-সুলতান-বা-বাদ্‌শাহরই বাগদাদের খলিফার নিকট হতে সুল্‌তানীর সনদ (সার্টিফিকেট) অর্জন ব্যতীত বাদশাহী করতে সক্ষম ছিল না। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, খলিফাগণ এইসব সুলতানদেরকে যতটুকু ভয় করতেন, স্বয়ং সুলতানগণ-তাদেরকে তত ভয় করতে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রদেশের স্বঘোষিত গভর্ণর-যা' চাইতেন, তা' স্বীয় প্রভাবে কিংবা খলিফার কোন দাসের দ্বারা-অথবা কোন দাসীর সুপারিশে 'দরবারে খেলাফত' থেকে এর মঞ্জুরী-অর্জন করতেন।

রাষ্ট্রীয় কাজে অনারব দাসদের এইরূপ প্রবেশাধিকার খলীফা মানসুরের সময় থেকেই শুরু হয়েছিলো। এ ব্যাপারে দাসদেরকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদে পবেশাধিকার পর্যন্তই যদি সীমাবদ্ধ থাকতো এবং তাদেরকে সম্মানের সাথে সঠিক ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা থাকতো, তবে খিলাফত তাদের হাতে ধ্বংস হত না এবং এতে আরও দৃঢ়তা সৃষ্টি হতো। আব্বাসী খলীফাদের মত সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী এবং ফিরোজশাহের রাজত্বে ও পঞ্চাশ হাজার দাস ছিল। তারা সেনা বিভাগে এবং রাষ্ট্রীয় অন্যান্য দফতরে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু যেহেতু তারা একটা বিশেষ পরিবেশে-শিক্ষা-প্রাপ্ত ও লালিত-পালিত হয়েছিল। এ জন্য এই দাসদের অস্তিত্ব-রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক হওয়ার পরিবর্তে অনেকগুণে শক্তি বর্ধক ছিল।

'শামসে সিরাজ আফিফ' বর্ণনা করেন যে, ফিরোজ শাহ নিজ দাসদের যোগ্যতা ও উপযুক্ত তানুসারে কার্যসিদ্ধি করতেন। যে দাস-রাজনৈতিক সেবামূলক কাজের যোগ্য ছিল তাকে রাজ্যের বিভিন্ন দফতরে নিয়োগ করা হত। আর যে দাস জ্ঞান-গরিমা এবং শিক্ষামূলক কাজের সাথে সম্পর্ক রাখতো তা'কে স্কুল কলেজে প্রবেশ করায়ে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এবং ধর্মীয় বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলা হতো। কোন কোন দাসকে মক্কায় পাঠিয়ে দেয়া হত, যেন সে পুণ্যভূমিতে পার্থিব সম্পর্ক ত্যাগ করে একাগ্রচিত্তে ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতে পারে"। (তারিখে ফিরোজশাহী গ্রন্থের ২৬৮, ২৭৩ পৃঃ দ্রঃ)

কিন্তু আব্বাসীর খলীফাদের অবস্থা-দিল্লীর সুলতানদের থেকে সম্পূর্ণ উল্টো ছিল। তারা-না-দাসদের চারিত্রিক শিক্ষা ও প্রতিপালনের প্রতি কোন দৃষ্টি দিয়েছেন এবং না তাদের উপর সীমাতিরিক্ত ভরসা করার কারণে তাদের আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ থেকে অবগত হওয়ার চেষ্টা করেছেন? তৎপর মজার ব্যাপার এই যে, একদিকে ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহ এবং দফতর-সমূহ তুর্কী দাসদের করতলগত হতে লাগলো। তাদের অন্তরে তখনও ইসলামী শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে স্থান-দখল করতে পারেনি এবং মস্তিষ্ক থেকে মূর্খ যুগের নীতি নিয়ম ও চলনের চিহ্ন সম্পূর্ণ মিটে যায়নি। আর অন্যদিকে শাহী মহলে বিভিন্ন দেশের দাসী-বাঁদীরা-খলীফাদের এবং শাহযাদাদের অন্তর রাজ্যের মধ্যে নিজেদের শাসন-পরিচালনার মহারাংকিত করতে ছিল। ক্রমানুয়ে

এই উভয় অবস্থাই কার্যকরী ছিল। এমনকি আব্বাসী খিলাফতের দ্বিতীয় যুগে খিলাফত শুধু নামে মাত্র ছিল। খলীফাদের উপাধিটি এমনও শান-শওকত ও গৌরবের অধিকারী ছিল—। কিন্তু অভিজ্ঞ জনেরা জানতেন যে, এই রেশমী পোশাকের নীচে একটি অসুস্থ শরীর লুক্কায়িত আছে। আরবীয় এক কবি-ইবনে আবি-শরফ স্পেনের বাদশাহদের উপাধির উপর অভিযোগ করে একবার একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখেছিলেন ঃ

مما يزهدنى فى ارض اندس
اسماء معتمد فيها , معتضد ـ
القاب مملكة فى غير موضعها ـ
كالهر يحكى انتفاخا صورة الاسد ـ

"যে বিষয় আমাকে স্পেনের প্রতি বিদ্রোহী করে তুলেছে তা'হল সেখানকার বাদশাহদের 'মুতামিদ' **معتضد** ভরসাকারী, এবং 'মু'তাযিদ সাহায্যকারী নামকরণের বাদশাহী উপাধি সম্পূর্ণ অপপ্রয়োগ হয়েছে। তাঁদের দৃষ্টান্ত ঐ বিড়ালের ন্যায়—যে ফুলে-ফেপে বাঘের আকৃতি ধারণ করে"।

এই কবিতাটি আব্বাসী খলীফাদের ঐ সমস্ত পুতুলতুল্য বীর পুরুষদের বেলায় হুবহু প্রযোজ্য। যাদের পরিচালনার রশি শাহী মহলের কোন দাসীর বিষক্ত হাতে কিংবা কোন নিকৃষ্ট দামের লৌহ অঙ্গুলীতে বাঁধা ছিল।

মন্ত্রীত্বের দুরাবস্থা

খিলাফত যখন হাত পা শূন্য হয়ে গেল অর্থাৎ খিলাফতের অবস্থা যখন খুবই সঙিন হয়ে গেল—তখন মন্ত্রীত্বের অবস্থার কথাই উঠে না। তাদের দুরবস্থা এবং অশান্তিময় অবস্থার অনুমান করা যায় এভাবে, যে একটি মন্ত্রীত্বের পদ লাভের জন্য যথেষ্ট ঘুষ দিতে হত। আর এমনিভাবে দরবারে খিলাফত থেকে ঐ ব্যক্তির নামেই মন্ত্রীত্বের শাহী ফরমান মিলত, যে ব্যক্তি অধিক মুদ্রা প্রদান করতে পারতো। যদিও বা এই গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য তাঁর মধ্যে কোন উপযুক্ততাও না থাকে। সুতরাং ইবনুল তাক্তাকী এই মর্মে বর্ণনা করেন যে, হিজরী ৪র্থ শতাব্দীতে ইবনে মাক্লাহ পাঁচ লাখ-দীনার উৎকোচের বিনিময় রাজী-বিল্লাহ থেকে মন্ত্রীত্বের পদ অর্জন করেন। এমনিভাবে ইবনে জাহির ও কায়িম-বি-আমরিল্লাহ্ থেকে ত্রিশ হাজার দীনারের বিনিময়ে মন্ত্রীত্বের পদ খরিদ করেন। (আল-ফাখরী গ্রন্থের পৃঃ ২০৭ এবং পৃঃ ২১৪ দ্রঃ।)

উৎকোচ গ্রহণের একটি লজ্জাজনক এবং আশ্চর্য ঘটনা বর্ণিত আছে। একদা কুফায় জনসাধারণের কাজকর্ম 'পরিদর্শকের' একটি পদ খালি ছিল। মুক্তাদির বিল্লাহ্‌র মন্ত্রী 'খাকানী' সাহেব এই খালি পদের জন্যে উনিশ ব্যক্তির নিকট হতে উৎকোচ নিয়ে প্রত্যেকের নামে একই পদে মনোনয়ন পত্র প্রদান করেন। সুতরাং মনোনয়ন পত্র প্রাপ্ত সকলেই কর্মস্থানে কাজে যোগদানের জন্য যাত্রা করলেন। ঘটনাচক্রে একই স্থানে সকলেরই মিলন হয়ে গেল। তথায় প্রশ্নের আলোচনা পর প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পেল। তখন তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, একই পদে সকলের যোগদান তো সম্ভব নয়, সুতরাং যার মনোনয়ন পত্র সর্বশেষে মিলেছে কুফায় গিয়ে উল্লিখিত পদে যোগদান করুন। কেন না তাঁর পত্রের বাতিলকারী আর কোন পত্র নেই অতএব সর্বশেষ মনোনয়ন প্রাপ্ত ব্যক্তি 'নেযারতের' পদে যোগদানের জন্য কুফায় চলে গেলেন এবং বাকী অন্যান্য মনোনয়ন পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রীর কাছে ফিরে এলেন। মন্ত্রী উপায়ান্তর না দেখে তাদেরকে বিভিন্ন পদে চাকুরী দিয়ে দেন। (আল-ফাখরী গ্রন্থের পৃঃ ১৯৭ দ্রঃ)

উল্লিখিত ঘটনাটি ইবনুল তাক্তাকী বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনাকারী এবং যার থেকে বর্ণিত হয়েছে এর সূত্রের মধ্যে বৈধতার প্রশ্ন উঠা অসম্ভব কিছু নয়। তা সত্ত্বেও ঐ যুগের সাধারণ অবস্থা—যা কম-বেশী বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে উলিখিত ঘটনার বাস্তবতা অসম্ভব না হওয়া দূরের কিছু নয়।

সুতরাং একজন আরবীয় কবি ঐ মন্ত্রীর (খাকানীর) সমালোচনা করে যা বলেছিলেন, তা নিম্ন রূপ—

وزير لا يمل من الرفاعة .
يولى ثم يعزل بعد ساعة .
ويدنى من تعجل منه مال ـ
ـ ويبعد من توسل بالشفاعة ـ
وان اهل الرشا صاروا اليه
فاحظى القوم اوفرهم بضاعة ـ

"তিনি (খাকানী) এমন একজন মন্ত্রী, যিনি-(চাকুরীর মনোনয়ন) পত্র লিখতে কোন দ্বিধাবোধ করতেন না। তিনি একজনকে কর্মচারী নিয়োগ করতেন, অতঃপর এক ঘন্টা পর আবার অপসারিত করতেন। যার নিকট থেকে দ্রুত উৎকোচের টাকা মিলত—তাকে নৈকট্য লাভের সুযোগ দিতেন। আর যে ব্যক্তি সুপারিশের মাধ্যমে (চাকুরীর) চেষ্টা করতো তাকে দূরে নিক্ষেপ করতেন। যদি ঘুষ প্রদানকারীরা তাঁর নিকট গমন করতো, তবে তাদের মধ্যে অধিক অর্থ সরবরাহকারী ব্যক্তিই অধিক সফলকাম হতো"।

এখন আপনারা নিজেরাই একটু চিন্তা করে দেখুন, যে দেশের সরকারী পদ—বা পদমর্যাদা বিক্রি হয়, আর-যেখানে বিলাসিতা এবং অধর্ম ও মদ্যপান করা সাধারণ হয়ে যায় সেখানের খলীফা ও আমীরগণ স্বার্থপর, আরাম প্রিয়, বিলাসী ও অপরিণামদর্শী হয়, তাকে প্রকৃত অর্থে খিলাফত বলা তো দূরের কথা, একটি মুসলিম রাষ্ট্র ও কি বলা চলে ?

খিলাফতের বিভক্তি

সমগ্র ইসলামী জগতের জন্য যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে উহার বিভক্তি শুরু হয়ে গেল। একদিকে উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় ফাতেমীরা নিজেদের খিলাফতের ঘোষণা দিল এবং মিসরের দিকেও তাদের লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত ছিল। অন্য দিকে আবদুর রহমান নামের স্পেনের আমীর, যিনি ৩০০ হিজরীতে সিংহাসনে আরোহণ করে ছিলেন, স্বীয় খিলাফতের ঘোষণা দিলেন। এমনিভাবে খিলাফত তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। রাযীবিল্লাহ্‌র (৩২২ হিজরী থেকে ৩২৯ হিজরী পর্যন্ত) রাজত্বকালে যে সব প্রদেশ বাগদাদের খিলাফতের সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত ছিল, তন্মধ্যেও স্বাধীন রাজত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠা হতে লাগলো। সুতরাং পারস্যে--আলী ইবনে 'বোয়াইহা'র দখল ছিল। রাই, ইস্পাহান এবং 'জাবাল' এর উপর তাঁর ভাই 'হাসান ইবনে বোয়াইহা' স্বীয় প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করে ছিল। মোসেলু, দিয়ারে বকর, 'দিয়ারে রবীয়া' ও 'মযীর' এর উপর বানু হামদানের রাজত্ব কায়েম ছিল। মিসর ও শাম—'মুহাম্মদ ইবনে তাগ্‌জ্‌' এর অধীনে ছিল। অতঃপর তা

ফাতেমীদের কাছে এসে গিয়েছিল। খুরাসান এবং পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা নাসির ইবনে আহ্মাদুস্ সামানীর অধিকারে ছিল। এখন খিলাফত সংকুচিত হয়ে বাগদাদ এবং এর আশে-পাশে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। আর প্রকৃত অবস্থা এই যে, বাগদাদেও খলীফার প্রভাব প্রতিপত্তি শুধু নামে মাত্র ছিল। অন্যদিকে এখানকার সাদা-কালোর প্রকৃত মালিক রাযীবিল্লাহ্র ,ইবনে রায়েক' নামী একজন মন্ত্রী ছিলেন। তিনি 'ওয়াসেতের গভর্নর ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁকে সেনা বিভাগের (কমাণ্ডার ইন-চীফ্) সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং 'আমীরুল উমারা উপাধিতে ভূষিত করেন। বলা হয় যে, পরবর্তী সময়ে খলীফা—নির্দেশ জারী করেছিলেন যে, খুতবায় ও 'ইবনে রায়েকের নাম পাঠ করা হবে। (দায়েরাতুল মা'রেফ গ্রন্থের ১১ খণ্ড, পৃঃ ১২৩ দ্রঃ)

হাম্বলীদের উপর কঠোরতা

অতঃপর বিপদের বিষয় যে, খলীফা, মন্ত্রীবর্গ, কর্মচারীবৃন্দ, রাজ-পরিষদের সদস্যবৃন্দের দুষ্কর্মের কারণে বাগদাদের কেন্দ্রস্থলেই অন্যায় অবিচারের মাত্রা যে ভাবে বেড়ে গিয়েছিল, তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা রাজপরিষদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। আর যদি সত্যপন্থী আলিমগণ এবং উচ্চ পদমর্যাদার ব্যক্তিবর্গের কোন দল এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেনও তবে উল্টো তাদের উপরই কঠোরতা করা হতো। এমনি ভাবে ভয়-ভীতি ও কঠোরতার দ্বারা তাদের মহৎ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা করা হতো। সুতরাং বাগদাদে অন্যায়-অবিচারের আধিক্যের সাধারণ প্রচলন দেখে ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বলের অনুসারিগণ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ পালনের কর্তব্য সম্পাদনের চেষ্টা শুরু করলেন। যে কোন ঘরে 'মদ' দেখেছেন, তা ফেলে দিয়েছেন এবং যেখানেই কোন গায়িকা এবং নর্তকী পেয়েছেন, মারপিট শুরু করে দিয়েছেন। এতে বাগদাদের আনন্দপূর্ণ-বিলাসী জীবন-যাপনে বাধার সৃষ্টি হল। শহরের কোতোয়াল (নগর অধ্যক্ষ) সাধারণ ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, বাগদাদ শহরের কোথায় ও যেন দু'জন 'হাম্বলী' একত্র না হয়ে চলে। সঙ্গে সঙ্গে খলীফা 'রাযীবিল্লাহ' ও হাম্বলীদের প্রতি কঠোর ভাষায় পত্র লেখেন।

যা'তে উল্লেখ ছিল—"যদি তোমরা নিজেদের মন্দ পন্থা ও বক্রপথ থেকে ফিরে না আস, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে লাঠিচার্জ, মারপিঠ এবং বিচ্ছিন্ন করা ও কঠোরতার সকল পন্থাই অবলম্বন করতে বাধ্য হব। জেনে রেখো, তখন তলোয়ার তোমাদের গর্দানে নিপতিত হবে এবং তোমাদের বাড়ী-ঘরে আগুন জ্বলবে। (দায়েরাতুল মারেফ গ্রন্থের ১১ খণ্ড, পৃঃ ১২২ ১২৩ দ্রঃ)

বাগদাদের খিলাফতের শেষ নিঃশ্বাস বা পতনকাল

ইতিহাসের বর্ণনা মতে 'রাযীবিল্লাহ'র রাজত্বকালে খিলাফত কার্যত; বাগদাদ এবং এর আশে পাশের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। হিজরী ৩২৯ সালে তাঁর ইন্তিকাল হল। তাঁর মৃত্যুর পর বাগদাদের খিলাফতের সিংহাসনে ১৬ জন খলীফা আরোহণ করেন। কিন্তু খিলাফতে যে অমাবশ্যা বা-গ্রহণ লেগে ছিল ; তা' দিন দিন বেড়েই চললো। মাঝে মধ্যে কোন কোন খলীফা ব্যক্তিগতভাবে পুণ্যাত্মা ও অনুভূতিশীল ও হয়েছেন। কিন্তু খিলাফতের আইন শৃংখলার এত অবণতি হয়েছিল যে, এককভাবে কোন খলীফার সৎ নিয়ত ও সংস্কার পদ্ধতি এর জন্য যথেষ্ট ছিল না। খলীফা বিভিন্ন রাজ্যের এবং রাজত্বের মধ্যে এমনভাবে আবদ্ধ ছিলেন, যেমনভাবে একটি জিহবা দু'পাটি দাঁতের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর অধিকার ও এমনভাবে সীমাবদ্ধ ছিল যে, তিনি স্বীয় ইচ্ছাধীন কোন কর্ম সম্পাদন করতে পারতেন না। পরিশেষে হিজরী ৬৫৪ সালে এই নামে মাত্র খিলাফত ও শেষ হয়ে গেল। সর্বশেষে খলীফা মুস্তাসিম বিল্লাহ্'র মন্ত্রী ইবনে আলকামীর ষড়যন্ত্রে তাতারীদের হাতে অতি নির্মমভাবে নিহত হন।

এই তো ছিল সেই যুগের অবস্থা ! যা'কে ঐতিহাসিকগণ আব্বাসী খিলাফতের পতন যুগ বলে থাকেন। এখন আসুন ! এই পতন যুগের কিছু আলোচনা করা যাক। সাধারণভাবে একে আব্বাসী খিলাফতের স্বর্ণ যুগ বলা হয় ? কিন্তু এই স্বর্ণযুগ খাঁটি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের জন্য কি পরিমাণ গৌরবের ও সৌভাগ্যের ছিল— তা এভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে যে, মামুনুর রশীদ, যিনি ঐ যুগের

একটি সতেজ ফুল তুল্য ছিলেন, মাওলানা শিবলী নু'মানী তাঁর চাল-চলন ও খানা পিনার কথা এই কবিতার সাথে তুলনা করেছিলেন।

کس کی ملت میں گنوں آپ کو بتلا اے شیخ
تو کہے گبر مجھے گبر مسلماں مجھ کو-

"হে শায়খ্! আপনি বলে দিন, কোন্ জাতির লোক হিসেবে আপনাকে গণনা করবো ? তবে (প্রতি উত্তরে) আমার অগ্নি উপাসনার কারণে আমাকে অগ্নিউপাসক মুসলমান বলা হবে।"

বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি এবং জাতির অধঃপতনে উহার প্রতিক্রিয়া

এই যুগের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, মুসলমানগণ ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের অসংখ্য পুস্তক রচনা করেছেন এবং অন্যান্য ভাষা থেকে বহু 'দর্শন' ও 'বিজ্ঞানে'র পুস্তক দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেছেন। শুধু পুস্তকের অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হন নাই, বরং ঐ সব বিদ্যার বিভিন্ন বিষয় বস্তুর উপর উন্নত চিন্তাধারা গবেষণা করে' তার সমালোচনান্তে সঠিক মূল্যায়ন করেন। তার দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতার দিক প্রকাশ করেন। বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার কল্পে মক্তব, মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেন। জ্ঞানী-গুণীদের জন্য বহু পরিমাণে বৃত্তি ও ভাতা ধার্য করেন। যা'তে তাঁরা নিশ্চিন্তে প্রশান্ত মনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় সারাক্ষণ রত থাকতে পারেন। অতঃপর জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যথা কারিগরী, কৃষি, কলাবিদ্যা, কবিতা ও সাহিত্য ইত্যাদিতে অভূত পূর্ব উন্নতি সাধন করেন। সাহিত্য ইতিহাসের পুস্তকসমূহে যে সব ঘটনার উল্লেখ আছে, তাতে বুঝা যায় যে, শুধু পুরুষ কেন স্ত্রী লোকেরাও এমন কি দাস-দাসীরা পর্যন্ত সে যুগে কবিতা ও সাহিত্য চর্চা এবং রম্য রচনায় খুবই পারদর্শী ছিল। কথায় কথায় কবিতা বল্‌তো। কবিতায়-কথোপকথন ও উপস্থিত উত্তর প্রদানের প্রচলন ছিল অতুলনীয়।

এতে সন্দেহ নেই যে, এরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিতে এবং কবিতা ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা ও প্রসারে মুসলমানদের মস্তিষ্কে উন্নত চিন্তাধারা

ও গবেষণা শক্তির উন্মেষ ঘটেছিল এবং অসাধারণ উন্নতি সাধনের কারণ হয়েছিল। কিন্তু সাথে সাথে এ সত্যটাকে উপলব্ধি না করে উপায় নেই যে, এতে ইসলামী বিশ্বাসসমূহের সরলতা ও দৃঢ় বিশ্বাসে বিরাট আঘাত লেগেছে এবং গ্রীক দেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসারে খাঁটি ইসলামী চিন্তা-ধারায় এমন ব্যাঘাত হয়েছে যে, মুসলমানগণ তাওহীদ বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা থেকে বিচ্যুত হয়ে এক বিপজ্জনক বিক্ষিপ্ত চিন্তা ধারায় লিপ্ত হয়েছে।

খলীফা মামুনার রশীদ একদা কনস্টান্টিনোপলে খৃীস্টান বাদশাহকে চিঠি লেখলেন যে, আপনার নিকট 'দর্শনশাস্ত্র' এবং গ্রীক দেশীয় অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সব উচ্চাঙ্গের পুস্তক রয়েছে সেগুলো আমাদের নিকট পাঠিয়ে দিয়ে বাধিত করুন"। রোম সম্রাট-তো প্রথম প্রথম মানুষের এই আব্দার রক্ষা করতে ইতস্তত করতে ছিলেন, কিন্তু যখন তথাকার বড় পাদরী বললেন যে' "আপনি ঐ সব পুস্তকগুলো অবশ্যই পাঠিয়ে দিন। কেননা এই পুস্তকগুলো যেখানেই থাকবে সেখানেই তাদের ধর্মীয় চিন্তা ধারায় হিল্লোলের সৃষ্টি করবে এবং অধর্মের উন্নতি হবে।" তখন তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ পুস্তকগুলো খলীফার দরবারে উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন। পাদরীর আশা সফলকাম হল।

সুতরাং ঐ সব, পুস্তকের ফল এমন হল যে, শরীয়ত সংক্রান্ত এবং খোদাতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে মুসলমানদের চিন্তাধারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তাঁরা এখন নতুন পদ্ধতিতে ইসলামের আকাঈদ (বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ) ও চিন্তাধারাব উপর গবেষণা শুরু করল। চিন্তা ধারার এই নতুন পদ্ধতি নিঃসন্দেহে ঐ চিন্তাধারার পরিপন্থী ছিল, যে চিন্তা-ধারা কুরআন মজীদ স্বীয় বিশেষ বর্ণনা ভঙ্গিতে এবং প্রামাণিক-ভাবে মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল এবং যার কারণে তাদের মাঝে পরবর্তী সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যসমূহের দৃঢ় বিশ্বাস এমন সুদৃঢ় ও মযবুত ছিল যে, কোন শক্তিই তাকে দোদুল্যমান করতে পারেনি।

কুরআন মজীদ বুঝবার মূলনীতি

কুরআন মজীদের একটি সাধারণ-মূলনীতি হ'ল তা প্রথমত কোন বস্তু সম্পর্কে এক বিশেষ রকম চিন্তাধারার জন্ম দেয়। অতঃপর এই চিন্তাধারাকে সাক্ষ্য প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা দৃঢ় প্রত্যয় দান করে। তৎপর যখন এই দৃঢ় বিশ্বাসই একটা প্রেরণার আকৃতিতে পরিবর্তিত হয় তখন তার উপর সৎ কর্মের এক বিরাট প্রাসাদ গড়ে উঠে, যা ছাড়া কোন নগরী কল্যাণকর নগরী হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। আক্ষেপের বিষয় এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনার অবকাশ নেই।

সামগ্রিকভাবে 'ঈমান বিল্লাহ' (আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস)-এর কথাই ধরা যায় না কেন? কুরআন মানুষের অন্তর ও এর অস্তিত্বকে জাগ্রত করে আল্লাহ্‌র অস্তিত এবং তাঁর গুণাবলীর দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে। আর তাকে দার্শনিক চিন্তাধারায় যুক্তি প্রমাণের বেড়াজালে বিক্ষিপ্ত করে না। অর্থাৎ যে ভাবে একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু নিজের মা-বাপকে চেনে এবং তার মা-বাপ হওয়ার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, কিন্তু তার এইরূপ-দৃঢ় বিশ্বাস তার অনুভূতিশীল সম্পূর্ণের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়। এটা তার মা-বাপের তার প্রতি অসাধারণ ভালবাসা ও অনুগ্রহ এবং অন্যান্য আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করার জন্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ ছাড়া তার পিতা মাতার বাস্তব মিলনের বিশেষ সম্পর্কের ব্যাপারে সে তখন অজ্ঞ থাকে; আর সম্ভবত এ কারণেই শিশুকে তার আপন পিতা মাতার সঙ্গে যে, অন্তরঙ্গতা ও একাগ্রতা এবং তাঁদের আদেশ নিষেধ বাস্তবায়নের প্রবণতা শিশুকালে থাকে, যৌবনকালে যখন যে তার পিতা- মাতার -প্রকৃত মিলন مباشرت এর অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়, তখন তার মাঝে শিশু কালের সেই অবস্থা আর বাকী থাকে না।

ঠিক তেমনিভাবে অনুধাবন করুন যে, কুরআন মজীদ মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং তাঁর গুণাবলীর যে, দৃঢ় বিশ্বাস প্রদান করে; এতে দলীল প্রমাণের সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করে যা' দ্বারা একটি শিশু আপন মা-বাপের মা-বাপ হওয়ার বিশ্বাস রাখে। এটা প্রাকৃতিক পদ্ধতি

এবং এ পথে মানুষ যে বস্তুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করবে তার উপরই সৎ কাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কারণেই কুরআন মজীদ যেখানেই নাস্তিকদের মূর্খতার কথা উল্লেখ করেছে, তাদের সম্পর্কে বলেন যে, তাদের (কাফিরদের) মস্তিষ্কে বুদ্ধি নেই, এবং অন্তরে সীলমোহর হওয়ার প্রতি আক্ষেপ করেছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে لهم قلوب لا يفقهون بها "তাদের অন্তরসমূহ রয়েছে, অথচ তারা তা দিয়ে (সত্য) অনুধাবন করতে পারে না"। কিংবা ختم الله على قلوبهم আল্লাহ্ তাদের অন্তর সমূহের উপর সীলমোহর লাগিয়ে দিয়েছেন'। আবার অন্য জায়গায় বর্ণিত হয়েছে—ام على قلوب اقفالها "তাদের অন্তরসমূহের উপর কি তালা লাগানো হয়েছে"? যাই হোক চিন্তা-ফিকিরের ঐ পদ্ধতি যা' কুরআন মজীদ মুসলমানদের মাঝে সৃষ্টি করেছে এবং যা' দ্বারা তাদের ঈমান ও আমলের দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। এর ফলে সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে মুসলমানগণ আল্লাহ্ সম্পর্কে শুধু এইটুকু জানতো ও বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টি জগতের সৃষ্টিকর্তা। তিনি অনাদি ও অনন্ত। তাঁর সত্তায় যাবতীয় সুন্দর গুণাবলী সমাবেশ রয়েছে।

দর্শন শাস্ত্রের দলীল গ্রহণ পদ্ধতি

আব্বাসীর বংশের রাজত্বকালে যখন গ্রীক দর্শনের প্রভাবে বেড়ে গেল তখন মুসলমানগণ আল্লাহ্ সম্পর্কেও অন্যদৃষ্টিতে চিন্তা-ফিকির ও গবেষণা করতে শুরু করলো। যেমন একদিকে তারা আল্লাহ্কে علت تامة (সৃষ্টির) পূর্ণ কারণ কিংবা علت اولى 'প্রথম কারণ' বললো আর অন্য দিকে গ্রীক দর্শনের الواحد لا يصدر الا الواحد একের উৎপত্তি এক ব্যতীত হয় না"। তাদের নিকট এটা অগ্রহণযোগ্য ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে عقول عشرة "উকুলে আশারা" (দশজন ফিরিশতা যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন) মানতে হল। এই উভয় প্রকার গ্রহণযোগ্য আল্লাহ্ বাক্য থেকে পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পেল যে, ইসলাম আল্লাহ্ সম্পর্কে যে দৃঢ় বিশ্বাস প্রদান করেছে, তা' তার প্রকৃত অবস্থায় স্থায়ী থাকতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ কুরআনে

ঘোষিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কোন مشيت ইচ্ছা শক্তি আছে। আর তার নিকট হতে যে কার্য প্রকাশ পায় তা অনিচ্ছায় নয়, বরং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রকাশ পায়। তিনি যা’ চান, তাই করেন এবং যা’ তিনি চান না তা’ কখনও হতে পারে না। কিন্তু গ্রীক দর্শনের প্রচলিত মর্মানুযায়ী যদি আল্লাহ্‌কে জগতসমূহের জন্য علت تامه পূর্ণ কারণ’ হিসেবে মনে করা হয়, তাহলে এটা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ্‌র কোন مشيت ইচ্ছা শক্তি নেই কোন اراده ইচ্ছাও নেই। আর তাঁর পক্ষ হ’তে যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে, তাতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কোন দখল নেই, বরং তা’ তার অনিচ্ছায় হয়েছে। কেননা علت تامه সাধারণ কারণ থেকে معلول উপকরণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা ইচ্ছাধীন নয়। অতঃপর যেহেতু علت تامه সাধার কারণ, এবং معلول উপকরণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বস্তুর মধ্যে زمانه কাল হিসেবে কোন অগ্র-পশ্চাৎ হয় না, সেই হেতু দর্শনিকগণকে একথা মানতে হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র মত عقل اول প্রথম বুদ্ধি’ ও قديم بالذات সৃষ্টিগতভাবে পুরাতন।

এখন আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন যে, আল্লাহ্‌র জগতসমূহের علت اولى ‘প্রথম কারণ’ সাব্যস্ত করে যদি যাঁকে مشيت ইচ্ছাশক্তি ও اراده মনস্থ করা থেকে বঞ্চিত করার কথা মেনে নেওয়া হয়, তবে ইসলাম তো-দূরে থাকুক কোন একটি مذهب মায্‌হাবের ভিত্তিও স্থায়ী থাকতে পারে না। আল্লাহ্‌র ذات সত্তার অস্তিত্বের মত আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কেও তর্কবিতর্ক হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আশ্চর্যজনক বিরাট বিতর্কের সৃষ্টি রয়েছে। যেমন—প্রথম বিতর্কের ছিল যে, আল্লাহ্‌র ذات সত্তার সঙ্গে صفات গুণাবলীর সম্পর্কে কি? অর্থাৎ যদি (علم) বিদ্যা ব্যতীত معلوم জ্ঞাত বস্তুর প্রকাশ না ঘটে, তবে যখন এককালে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন কিছুই ছিল না, তখন আল্লাহ্‌ কিভাবে عليم সব বিষয়ে জ্ঞানী হবেন। অতঃপর আল্লাহর ذات সত্তা ও صفات গুণাবলী থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্যান্য বিষয়ে ও এমনিভাবে আলোচনা সমালোচানা শুরু হল। যথা বান্দা (আল্লাহ্‌র দান) স্বীয় কর্মের خالق সৃষ্টি কর্তা কি না ? মানুষ কাজকর্মে

সম্পূর্ণ পরাধীন না সম্পূর্ণ স্বাধীন কিংবা আংশিক · পরাধীন অথবা অথবা আংশিক স্বাধীন? বুদ্ধির দিক দিয়ে তিনটি সম্ভবনাময় অবস্থার সৃষ্টি হয়। আর এই তিনটি অবস্থাই তিনটি পৃথক পৃথক দলের ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং এর প্রতিক্রিয়া পাপ পুণ্যের বিশ্বাসের উপর হয়েছে।

এমনি ভাবে কুরআন সম্পর্কেও বিতর্ক হয়েছে যে, তা مخلوق সৃষ্ট না غير مخلوق 'সৃষ্ট নয় —আর যদি মানব কর্তৃক সৃষ্ট হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্‌র কালাম হল কি ভাবে তা' যদি অর্থাৎ মানব কর্তৃক সৃষ্ট না হয়ে থাকে তা' হলে তাতে شان حدوث অস্থায়িত্ব কি ভাবে পাওয়া যায়? ওহী কিভাবে অবতীর্ণ হয়? আল্লাহ্‌র কথা বলার প্রকৃত অবস্থা কেমন? তাঁর দর্শন সম্ভব না অসম্ভব? দোযখের শাস্তি অনন্ত না সাময়িক? মোটকথা সেই যুগে ইসলামী শরীয়তের অদৃশ্য বিশ্বাস্য বিষয় কিংবা কার্যকরী এমন কোন বিষয় ছিল না—যা' দর্শন এবং বুদ্ধির কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করার চেষ্টা করা হয়? স্বভাবতই তার ফল যা' হবার তাই হল। পরিণামে মুসলমানদের মন-মানসিকতায় এবং চিন্তাধারায় বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি হয়ে ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা-ফিকির ও গবেষণার স্কুল প্রতিষ্ঠা হল। উমাইয়াদের যুগেও বিভিন্ন কার্যকরী বিষয়ের দুর্বলতা সত্ত্বেও মুসলমানগণ তখন পর্যন্ত আকাঈদ সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণার বিরাট বিপদ থেকে নিরাপদ ছিল। আর এখন তারা বিশ্বাস ও চিন্তাধারার দুর্বলতা ও অধঃপতনে নিপতিত হল। গ্রীক-দর্শনের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার ভয়াবহ পরিণতি দেখি আল্লামা জালাল উদ্দীন 'সুয়ূতী' এই মর্মে একটি পৃথক পুস্তক রচনা করেন যে' فلسفة দর্শন শাস্ত্র এবং منطق তর্কশাস্ত্র পড়া ও পড়ানো উভয়ই হারাম বা অবৈধ। তিনি এই পুস্তকে আরো দাবী করেন যে, অতীত যুগের সকলেই একথার উপর একমত।

কালাম শাস্ত্র

'দর্শন' এবং মায্‌হাবের সংমিশ্রণে কালাম শাস্ত্রের ভিত্তি রচিত হয়। যার অর্থ হল কোন শরীয়ত সম্বন্ধীয় তথ্যের উপর বিশ্বাস করার

জন্য শুধু কুরআন হাদীসের বর্ণনাই যথেষ্ট নয়। বরং ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক তথ্যে উপনীত হওয়া যাবে না—যতক্ষণ পর্যন্ত দর্শন শাস্ত্রের দরবার থেকে এর সঠিক বিবৃতি প্রকাশিত না হয়। এর অর্থ এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম 'ওহী' এবং 'ইলহাম' কে ছেড়ে এর নিকৃষ্ট উপায় 'দর্শন' ও তর্কশাস্ত্রের দলীল প্রমাণকে নিজের আশ্রয় স্থল ও ঠিকানা মনে করে নেয়া—। সুতরাং দৃঢ় বিশ্বাসের একটি প্রশস্ত রাজপথ ছেড়ে স্বীয় মন গড়া চিন্তা-ফিকিরের সংকীর্ণ চলার পথ যে পরিণতির হওয়ার তা' তো একেবারেই শ্রেষ্ঠ। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমত ইসলামের আলেমগণ কালাম শাস্ত্রের কঠোর বিরোধিতা করেন এবং উহা পড়া ও পড়ানোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

ইমাম শাফেঈ (রঃ) তো এ পর্যন্ত বলেছেন যে, 'কালাম' পন্থীদের সম্পর্কে আমার নির্দেশ হল যে, তাদেরকে বেত্রাঘাত এবং জুতো দ্বারা পেটানো হোক এবং বিভিন্ন মহল্লার লোকদের মাঝে অপমানের সাথে ঘুরানো হোক। আর একথাও ঘোষণা করে দেয়া হোক যে, ইহা ঐ ব্যক্তির শাস্তি যে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে ভ্রান্তপন্থীদের তর্কশাস্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করেছে। (শরহে ফিক্‌হুল আকবার গ্রন্থের পৃঃ ৩ দ্রঃ) কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন যে, রাজদরবারে ছত্র-ছায়ার কারণে এর প্রবাহ আসছে না, বরং বেড়েই চলেছে এবং ইসলামী বিশ্বাসসমূহ এবং চিন্তাশক্তির ভিত প্রকম্পিত হচ্ছে, তখন তাঁদেরকে বাধ্য হয়েই ও দিকে মুখ ফেরাতে হল। এই যুগে যে সব লোক ধর্মীয় তথ্যসমূহের সততা যাচাইয়ের জন্য 'বুদ্ধি' কেই একমাত্র উপায় মনে করে, তাদের দৃষ্টান্ত ও নির্বোধের ন্যায়—যে ব্যক্তি কোন গজের মাপ কাঠি দ্বারা সমুদ্রের পানি মাপার চেষ্টা করে এবং পরিশেষে সমুদ্রের বিশালতা ও পানির গভীরতায় স্বীয় পরীক্ষামূলক দৃষ্টি শক্তির সমস্ত উপযুক্ততা ও জ্ঞান হারেয়ে বসে। এ কারণেই আল্লাহ্‌র প্রেমিক মাওলানা রুমী বলেছেন, সত্য ধর্মের মঞ্জিল বাসস্থান তা নয়, যা' এই তৈরী—পা' বা কৃত্রিম পা' দ্বারা পৌঁছা সম্ভব! এ সম্পর্কে আকবার ইলাহাবাদী বলেন যে,

فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں -
ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں

"দার্শনিক-কে তর্কের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্ধান মিলবে না, ইহা এমন এক ডুরি যে, ক্রমাগত ছাড়া হচ্ছে অথচ এর কোন নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রকৃত পক্ষে যদি ইমাম গায্‌যালী (রঃ) ইবনে রুশদ, 'ইমাম রাবী' (রঃ)-এর মত মহামতি শ্রদ্ধেয় আলেমগণ নিজেদের প্রদর্শিত দলীল প্রমাণ দ্বারা এবং অন্যদিকে আব্বাসী খালীফা মুতাওয়াক্কেল বিল্লাহ এর মত বাদশাহগণ যারা দর্শন শাস্ত্রের প্রসারকে সত্য ধর্মের জন্য খুবই ক্ষতি-কারক মনে করতেন, যদি স্বীয় শক্তি -সামর্থ্য এবং প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বারা দর্শনশাস্ত্রে ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়ার প্রতিরোধ না করতেন, তবে কে বলতে পারতো যে, আব্বাসী রাজত্ব কালের সুবর্ণযুগের, এই বিষবৃক্ষর পত্র পল্লব কিভাবে গজিয়ে উঠতো? আর এ কারণে ইসলামী আকাঈদের কি পরিমাণ বিরাট ক্ষতি হতো ?

সার কথা এই যে, মুসলমানদের মধ্যে যে পথভ্রষ্টতা সৃষ্টি হল তার মূল কারণ দু'টি প্রথমত রাজত্ব ও রাজ্যশাসনের ভ্রান্ত পদ্ধতি, যার ভিত্তি বনী উমাইয়াদের হাতে স্থাপিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত বুদ্ধি ভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, যার পৃষ্ঠ পোষকতার ভাগ্য জুটেছিল বনী আব্বাসীদের। আর একে ঐ যুগের সবচেয়ে যোগ্য গৌরবময় কীর্তি বলা হয়।

একটি সন্দেহ ও এর অপনোদন

উপরে যা বর্ণিত হল তাঁতে কারো এরূপ ভ্রান্ত ধারণা হওয়া ঠিক নয় যে, ইসলাম জ্ঞানের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে না - কিংবা জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি ইসলামের শৌর্যবীর্যের পরিপন্থী। বরং বলার উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃত বিষয় তো ইসলামের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। আত্মার মাঝে ইসলামী জ্ঞান সঞ্জীবিত থাকলে—তৎপর যে কোন বিদ্যাই অর্জন করা হউক না কেন—(শর্ত হল—তা কোন সন্দেহ জনক অবস্থায় নিপতিত না-করে) তাতে কোন মুসলমানের ক্ষতি হ'তে পারে না। এ কারণেই যে দর্শন বিদ্যা অধর্ম ও নাস্তিকতাকে সাধারণ করে দিয়ে ছিল, সেই দর্শন বিদ্যার পাঠাগার থেকেই ইমাম গায্‌যালী (রঃ), ইমাম রাবী, ইবনে রুশদ

এবং হাফেজ ইবনে তাইমিয়া(রঃ)-এর মত ইসলামের মহান দার্শনিক সৃষ্টি হয়েছেন। এই সব মনীষী দর্শন বিদ্যা দ্বারা ধর্মের যথেষ্ট উপকার করেছেন। এমন নয় যে, ধর্মের জন্য দর্শন বিদ্যাকে কষ্টি পাথর হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

খলীফা হারুন-অর রশীদ এবং মামুনার রাশীদের রাজত্বকালে গ্রীক দেশীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের যে সমস্ত পুস্তক অনূদিত হয়েছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই অমুসলিমদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। আর মুসলমানদের মধ্যে যাদের কর্তৃত্ব ছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশই ইরানের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল, যাদের অন্তরে তখনও ইসলামের আকাঈদ পরিপূর্ণভাবে স্থিতিশীল ছিল না। কাজেই প্রকৃত ধ্বংসের মূল রহস্য এখানেই, সে বস্তু ধর্মীয় শিক্ষার মূলে ছিল অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস, তাকে দ্বিতীয় স্থান দেয়া হল এবং যে বিষয় পরে হওয়ার কথা তাকে প্রথমে স্থান দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া একথাটি ও ভুলার নয় যে, বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান দু'প্রকার প্রথমত ঐ বিদ্যা যা' জগতের বস্তুসমূহের বৈশিষ্ট, এর লাভ-লোকসান এবং এগুলোর ব্যবহার পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। প্রকাশ থাকে যে, এই প্রকার বিদ্যার সাথে ইসলামে কোন বিরোধ নেই। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের বিদ্যা হল—যা' দ্বারা প্রকৃত সত্য ও প্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসব বিদ্যা সম্পর্কে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এসব অর্জন করা চলে, সত্য কথা এই যে, এসব অর্জন করা কর্তব্য। কিন্তু এতদ্ সঙ্গে আপন বুদ্ধিকে তার স্বীয় সীমা রেখার মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যক। ইলাহী তত্ত্বঃ জ্ঞানসমূহের প্রতি আপনার ধারণা এমন দৃঢ় হওয়া চাই যে, যদি উভয় প্রকার বিদ্যার মধ্যে যদি দ্বন্দ দেখা দেয় তাহলে আপনাকে 'ওহী' ও ইল্‌হামের জ্ঞানের উপর সন্দেহ না করে নিজের কিংবা দার্শনিকদের বুদ্ধির ভুল হওয়ার ব্যাপারে যেন কোন ইতস্ততঃ না করেন। মোট কথা, প্রথমত একটি মুসলমান শিশুর লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা খাঁটি ইসলামী পদ্ধতিতে হওয়া চাই। আর যখন ইসলামের শিক্ষা তার অন্তর ও মান মানসিকতায় বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং ধর্মের উপর তার দৃঢ় আস্থার সৃষ্টি হয় তখন সে যে কোন বিদ্যা অর্জন করতে পারে। তবে শর্ত হল এই বিদ্যাটা উপাদেয় বিদ্যার তালিকাভুক্ত হতে হবে।

ইসলামের উপর ক্রুসেড হামলা

ইসলামের উন্নতি ইউরোপের দৃষ্টিতে সর্বদাই অসহনীয় ছিল। তাই যখনই সুযোগ মিলেছে তারা মুসলমানদের রাজনৈতিক শক্তি সামর্থ্য বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন করে দিতে কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ করত না। আব্বাসী খিলাফতের প্রথম যুগে রোমিগণ কয়েকবার আক্রমণ করেছে, কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়ে পশ্চাৎপদ হ'তে বাধ্য হয়েছে।

পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে আব্বাসী খিলাফতের অপরিসীম দুর্বলতা অধঃপতন এবং বিভিন্ন রাজ্য ইসলামী হুকুমাতা (রাজত্ব) বিভক্ত হওয়ার কারণে ইউরোপীয়দের সাহস সঞ্চয় করে' আবার নতুন পদ্ধতিতে মুসলমানদের অধিকৃত এলাকায় নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু করল। সুতরাং ৪৭৮ হিজরীতে স্পেনের এলাকাসমূহ তালি-তালা এবং অন্যান্য কয়েকটি শহর অধিকার করল। ৪৮৪ হিজরীতে 'সাকালিয়া' দ্বীপের অভিমুখী হল এবং মুসলমানদেরকে সেখান থেকে ক্ষমতাচ্যুত করল। অতঃপর তারা আফ্রিকার প্রতি মনোনিবেশ করল এবং কয়েকটি স্থান দখল করে দিল। ৪৯১ হিজরীতে তাদের শক্তি এত বেড়ে গেল যে, তারা মুসলমানদের শক্তি সামর্থ্যের কেন্দ্র ভূমি শামদেশ আক্রমণ করল। এবং 'এন্তাকিয়া' দখল করে নিল। মুসলমানগণ যুদ্ধের বিপুল আয়োজন ও শৃংখলার সাছে 'কাওয়ামুদ্দৌলা-কার বোকা' এর তত্ত্বাবধানে ইউরোপীয়দের মুকাবিলার জন্যে 'মারজেদাবেক' নামক স্থানে একত্র হলো। এই সেনাদলে তুর্কী ও আরবী উভয় প্রকার সৈন্যরা অংশ গ্রহণ করেছিল। মুসলমানগণ এন্তাকিয়ার উপর আক্রমণ করল। প্রথমত ইউারাপীয়দের অবস্থা খুবই সঙ্গিন ছিল। যুদ্ধ সামগ্রী এবং সৈন্য সংখ্যার সম্পতা ছাড়াও রসদ সামগ্রী পেঁছার উপায় ও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কারণে হঠাৎ করে যুদ্ধের গতি এমনভাবে ঘুরে গেল যে, মুসলমানগণ যুদ্ধে পরাস্ত হল। হাজার হাজার আলেম এবং মুজাহিদ তলোয়ারের নীচে জীবন দান করলেন। অগণিত ও অটাল সম্পদ শত্রুদের দখলে আসল।

খৃীস্টানগণ 'মা'রাতুন নু'মান'-এর দিকে ধাবিত হল। তথাকার অধিবাসিগণ অত্যন্ত সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে শত্রুদের মুকাবিলা করেন। কিন্তু তথায় ও ইউরোপীয়দের রণকৌশল কার্যকরী হল এবং শহর দখল করে তিন দিন পর্যন্ত সাধারণভাবে মুসলমানদেরকে হত্যা করা হল। ঐতিহাসিক 'ইবনে আসীরুল জাযরী' বর্ণনা করেন যে, এই হত্যাকান্ডে একলাখেরও অধিক মুসলমান শহীদ হল এবং অগণিত স্ত্রী-পুরুষ বন্ধী হল। (ইবনে আসীর গ্রন্হের ১০ খন্ড, ৯২ পৃ দ্রঃ)

এই সব বিজয়ের নিশায় আত্মহারা হয়ে ক্রুসেডারগণ এখন বায়তুল মুকাদ্দাস অধিকার করার ইচ্ছা করল। অতঃপর ৪৯২ হিজরীতে তারা বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করল। এই অবরোধ প্রায় ৪০ চল্লিশ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। অবশেষে ২৭শে শাবান তারিখে ইউরোপীয়রা বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করল। তাদের পূর্ব অভ্যাসানুযায়ী এখানেও অমানসিক হত্যাকান্ড সংঘটিত হল। সেখানের আলেমগণ, তরীকত পন্হিগণ, উপাসক বৃন্দ, সাধুপুরুষগণ, যাঁরা স্বদেশ ছেড়ে এই পবিত্র নগরীতে ইবাদত বন্দেগীতে রত ছিলেন, তাঁদেরকে এই পবিত্র মসজিদের পুণ্যভূমিতেই নির্মমভাবে হত্যা করা হল। তাঁদের সংখ্যা ৭০ সত্তর হাজারের ও বেশী।

(ইবনে আসীরুল জাযরী গ্রন্হের ১০ খন্ড, ৯৮ পৃঃ দ্রঃ)

তা ছাড়াও স্বর্ণ ও রৌপ্যের ঝাড় বাতি এবং ফুলের ঝাড়, যেগুলো মসজিদের বিভিন্ন স্থানে লটকানো ছিল, সব কিছুই লুন্ঠণ করল। এতদ্ব্যতীত কত যে 'মালে গনীমত' (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) হস্তগত করল তার কোন ইয়াত্তা নেই।

এখন ইউরোপীয়রা এন্তাকিয়া, রুহা, এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে পৃথক তিনটি রাজ্য স্থাপন করল। এই বছরই ইউরোপীয়রা মিসরের দিকে ধাবিত হল। প্রধান সেনাপতি 'আফজাল' তাদের মুকাবিলায় যুদ্ধের বিরাট আয়োজন করলেন। কিন্তু ইউরোপীয়রা হঠাৎ করে মিসরের উপর আক্রমণ করে বসল। পরিণামে এ যুদ্ধেও মুসলমানদের বিরাট ক্ষতি হল। অবশেষে তাদেরকে পরাজয় বরণ করতে হল। অতঃপর মুসলমান এবং খৃীস্টানদের মাঝে আরো কয়েকটি ছোটখাট যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এই সবের মধ্যে ৫৪২

হিজরীতে ইউরোপীয়রা যে আক্রমণ করেছিল, তা খুবই উল্লেখযোগ্য। এই আক্রমণের কারণ ছিল যে, সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী ক্রুসেডারদের যুদ্ধের উম্মাদনা দেখে তাদের উপর কয়েকটি সফল আক্রমণ চালিয়ে 'রুহা' তাদের শক্তিশালী ঘাঁটি দখল করেন।

'রুহা' পতনের পর পরাজয়ের গ্লানিতে তাদের হিম্মত একেবারে টুটে গেল। তখন তারা রোমের 'পোপ'-এর নিকট আবেদন করল যে তিনি যেন ইউরোপীয়দেরকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত করেন। রোমের 'পোপ' সমগ্র ইউরোপের রাজ্যসমূহে ঘোষণা করে ছিলেন যে, "সমস্ত খৃীস্টানদেরকে পবিত্র গীর্জা ও খৃীস্ট ধর্মের স্থিতি এবং সংরক্ষণের জন্যে একটি ক্ষেত্রে একত্র হওয়া অত্যাবশ্যক"। এর ফলে ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড থেকে দলে দলে সৈন্য আগমন করে একত্র হল। ফান্সের সম্রাট ৭ম 'লুইস' এবং জার্মানের 'কাউনরাড' ও সঙ্গে ছিলেন। মোট কথা সেই সময় পর্তুগাল এবং স্পেন ব্যতীত সমস্ত ইউরোপবাসী রোমের পোপের আহবানে সাড়া দিয়ে একত্র হয়েছিল। পবিত্র গীর্জা রক্ষার নামে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য নিজেদের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ক্রুসেডারদের আক্রমণের দাঁত ভাঙ্গা জবাব

সেই সময় আব্বাসীয় খিলাফত হাত পা-শূন্য অর্থাৎ শক্তি সামর্থ্যহীন হয়ে গেল। বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যে পরস্পর বিরোধী শাসন প্রচলিত ছিল, কিন্তু যেহেতু ইসলাম একটি সত্য ধর্ম এবং কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে টিকে থাকবে, সেইহেতু আল্লাহ্ তা'আলা আব্বাসীয়দেরকে সত্য ধর্মের সাহায্য সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত করে প্রথমে সালজুকীদেরকে এত শক্তি সামর্থ্য দান করেন যে, তারা ক্রুসেডারদের ষড়যন্ত্র এবং তাদের গন্ডগোলের দ্বার বন্ধ করে দিল। ৪৮৯ হিজরীতে ইউরোপ থেকে যে প্রথম ক্রুসেড সৈন্য যাত্রা করেছিল এবং হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়ার অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধ ও লুটতরাজ করতে করতে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত পেঁাছেছিল তখন সেখানে সুলতান কালিজ আর সালান সালজুকী বীরত্বের সাথে তাদের সৈন্যদের মুকাবিলা করে একেবারে ধ্বংস করে দেন।

সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী

অতঃপর যখন সালজুকীরা পরস্পর ঝগড়া কলহে লিপ্ত হল এবং আভ্যন্তরীণ বিভেদের কারণে তাদের রাজ্য অধঃপতন নেমে এল তখন আল্লাহ্ তা'আলা ক্রুসেডারদের শক্তি ধ্বংস করার জন্য সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী এবং সুলতান সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীকে এমন বাহুবল প্রদান করেন যে, তাঁরা ইউরোপীদের নাকের ডগায় দম নিয়ে এলেন এবং তাদের শক্তি সাহস একেবারে ভেঙ্গে দিলেন অতঃপর ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানি, অষ্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড সকলে একত্র হয়ে সম্মিলিত ভাবে কয়েকবারই এশিয়া মাইনর এবং শামের উপর আক্রমণ করেছে, কিন্তু নূরুদ্দীন জঙ্গীর ধারাল তরবারি প্রতিবারেই তাদেরকে পরাস্ত করে পলায়ন করতে বাধ্য করেছে। সুলতান শুধু তাদের প্রতিরোধই করেননি এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি আমক্রণ চালায়ে তাদের নিকট থেকে 'রুহা' (তাদের শক্তিশালী ঘাঁটি) ছিনিয়ে নিয়ে এলেন। নূরুদ্দীন জঙ্গীর যুদ্ধের কৃতিত্ব ও বিজয়ের উপর আলেমগণ পৃথক পৃথক বহু ইতিহাস রচনা করেছেন। এখানে এর বিস্তারিত বর্ণনার সুযোগ নেই।

সুলতান সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবী

সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী ৫৬৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। এখন সুলতান সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ভাগ্য জুটল। মিসর ব্যতীত শাম, হালব, রুহা, সিন্‌জার এবং মোসেল তাঁর দখলে এল। মিসর এবং শামের আভ্যন্তরীণ কলহ দূর করে তথায় শান্তি স্থাপন করার পর মারহুম গাজী তাঁর সমস্ত শক্তি ক্রুসেডারদের ধ্বংসের জন্য ব্যয় করেছিলেন। ৫৭৪ হিজরীতে সুলতান সালাহ্ উদ্দীন ইউরোপীয়দের সাথে জিহাদ শুরু করেন এবং ক্রমাগত ১৪ চৌদ্দ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ করে' একের পর এক এমনিভাবে তাদের নগরের পর নগর দখল করেন। ৫৮৩ হিজরীতে হুতাইন, উকা, তিবরীয়া এবং আসকালান-ও এর সংলগ্ন বহু এলাকা বিজয় করার পর সুলতান বায়তুল মুকাদ্দাসকে ও ক্রুসেডারদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনলেন। এই পবিত্র নগরী পুনরায় মুসলমানদের অধিকারে এল।

বায়তুল মুকাদ্দস হাত ছাড়া হওয়ার ব্যথা সাধারণ ছিল না যে, ক্রুসেডারগণ সহজে তা' ভুলে যাবে। অতএব রোমেরপোপ তৃতীয় আরিয়ান্স'- আবার গণ্ডগোল শুরু করল এবং আর একটি ক্রুসেডের যুদ্ধের জন্য সমস্ত খ্রীস্টানদেরকে প্রস্তুত করল। এই যুদ্ধে ফান্সের সম্রাট ফিলিপ আগ্সিস এবং ইংল্যান্ডের সম্রাট চার্ডশির দল' উভয়েইই নিজেদের বীর সৈনিকদের নিয়ে অগ্রসর হল। অস্ট্রেলিয়ার সম্রাট 'ফেরিডেরাক' ও তাঁর সৈন্য সমস্ত নিয়ে পুনরায় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করল। অতঃপর সমুদ্র পথে তারা ফিলিস্তিন পেঁছিল। কিন্তু সালাহ্উদ্দীনের বিরুদ্ধে আর কি করবে অবশেষে ৫৮৮ হিজরীর শাবান মাসে ক্রুসেডার- গণ অপারগ হয়ে সন্ধির প্রস্তাব করল। সুলতান সালাহ্উদ্দীন স্বীয় বিশিষ্ট উপদেষ্টাগণের সঙ্গে পরামর্শ করার পর সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এই মর্মে একটি অঙ্গীকার পত্র লিখিত হল এবং এর পরিপ্রেক্ষিতেই এই যুদ্ধ সাড়ে তিন বৎসরের জন্য শেষ হল। সুলতান-বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে দামেশ্ক ফিরে এলেন। এখানেই ৫৮৯ হিজরীতে ৫৭ বছর বয়সে তিনি ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী ছেড়ে চির বিদায় নিলেন।[১]

মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে সুলতান সালাহ্উদ্দীন স্বীয় পুত্র আফজাল এবং ভাই 'মালিক আদেল'কে ডেকে বলেন, আমরা এখন ইউরোপীয়দের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়েছি। এখন আমাদেরকে তাদের পক্ষ থেকে কোন বিপদের কারণ নেই। একদিক থেকে নিরাপদ হওয়ার পর গাজী সালাহ্উদ্দীনের ইচ্ছা ছিল যে, রোমের দিকে যাত্রা করলেন যেন ইউরোপীয়রা স্থল পথে ও মুসলমানদের দিকে অগ্রসর হতে না পারে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় মৃত্যু তাঁকে আর সেই সুযোগ দিল না।

সুলতান সালাহ্উদ্দীন এবং সুলতান নুরুদ্দীন উভয়ই সত্যিকারভাবে বড় মুজাহিদ ছিলেন। তাঁরা ইউরোপীয়দের শক্তি সামর্থ্য যে ভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে ইসলামের 'কালেমাকে সর্বোচ্চে স্থানে দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত আল্লাহ্ভীরু, বিনয়ী, অনুগ্রহশীল

---

[১] সুলতান সালাহ্উদ্দীন এবং সুলতান নুরুদ্দীন সম্পর্কে কিছু জানা সত্যিই জাতির জন্য স্বার্থদায়ক এবং আনন্দদায়ক ও বটে।

ন্যায়পরায়ণ, পুণ্যবান, সমাজসেবী ও সহনশীল। ইতিহাসের পাতা তাঁদের গুণকীর্তনে এবং গৌরবময় কীর্তিতে পরিপূর্ণ। সালাহ্ উদ্দীন বাদশাহ হওয়ার পূর্বে মিসরে ‘ফাতেমী’দের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারা ছিলেন ‘শিয়া’ সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই মিসরের শিয়াদের বিশ্বাস ও কার্যকলাপ প্রসার লাভ করেছিল। আল আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসমাঈলী সম্প্রদায় সম্পর্কে পাঠদান করা হতো। এমন কি ‘মুয়ায্যিন আযানে “حى على خير العمل” ‘কল্যাণ কর কর্মের দিকে এসো” বলতে বাধ্য ছিল। সালাহ্ উদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেই এই সমস্ত বিভ্রান্তি-মূলক কাজের সংস্কার করেন। তিনি ইসমাঈলীদের প্রভাব প্রতিপত্তি একেবারে মিটিয়ে দেন। প্রজাদের উপর যে সমস্ত অবৈধ টেক্স্ ধার্য হয়েছিল, তা তিনি রহিত করে দেন। চার-‘মায্হাবে’র শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেন; উলামা ও মাশায়েখদের বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। মাদ্রাসা ও চিকিৎসালয় স্থাপান করেন। দেশের কৃষিকার্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেন। তিনি জনগণের সুখ-শান্তি এবং স্বচ্ছলতারে দিকে সবসময় দৃষ্টি রাখতেন।

সুলতান নূরুদ্দীনের অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। দিবা-রাত্রি ইসলামের উন্নতি ও মঙ্গলের চেষ্টায় লিপ্ত থাকতেন। আল্লাহ্ভীরুতার অবস্থা এমন ছিল নিজের নামে যে সামান্য সম্পত্তি ছিল উহার আয় দিয়েই সংসার পরিচালনা করতেন। রাজকোষের একটি পয়সাও নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করতেন না। ইহাতেই অনুমিত হয় যে. এই বিশৃংলাপূর্ণ সময় আল্লাহ তা'আলা সুলতান নূরুদ্দীন এবং সুলতান সালাহ্ উদ্দীনের দ্বারা ইসলামের কি পরিমাণ সাহায্য সহযোগিতা এবং উন্নতির কাজ আনযাম দিয়ে ছিলেন। (টিকাশেষ)

সুলতান সালাহ উদ্দীনের মৃত্যুর পর রাজ্যের বিভক্তি এবং ইউরোপীয়দের আক্রমণ

সুলতান সালাহ্ উদ্দীনের আমীরগণের পরামর্শনুযায়ী নিজের জীবদ্দশাতেই তিন ছেলের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত করে দেন। মিসরের শাসনভার ইমামুদ্দীন উসমান-কে, দামেশ্কের শাসনভার নূরুদ্দীনকে, যার উপাধি ছিল ‘বাদশাহ আফজাল’ এবং গিয়াস উদ্দীন আবুল ফাতেহ্ গাজী-কে

'মালিক জাহের' উপাধি দিয়ে ইরাকের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তাঁদের ব্যতীত অন্যান্য ছেলেদের ছোট ছোট ভূখন্ড দিয়ে শান্ত করেছিলেন।

মিসরের বাদশাহ ইমামুদ্দীন উসমান খাঁর উপাধি ছিল 'মালিক আযীয'। তিনি অনেক ব্যক্তিগত গুণে গুণান্বিত হয়ে রাষ্টীয় কাজ সম্পাদনে দক্ষতার পরিচয় দেন। ৫৯৫ হিজরীতে তার ইন্তিকাল হল। এখন 'মালিক আযীয'-এর ছেলে মানসুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার বয়স ছিল মাত্র ৮ আট বছর। ইহা দেখে সালাহ্ উদ্দীনের ভাই 'মালিক আদেল এক সৈন্য দল নিয়ে আগমন করলেন এবং নিজে রাজ্য দখল করে করলেন।

এদিকে ইউরোপ যখন সংবাদ পেঁছিল যে, সুলতান সালাহ্ উদ্দীনের ইন্তিকাল হয়েছে এবং তাঁর রাজত্ব তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে, তখন আবার রোমের পোপের আহবানে ইউরোপীয়রা ক্রুসেডের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। এই যুদ্ধে-ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের সম্রাট যদিও অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তথাপি 'ফেরিডেরাক'' এর পুত্র 'হেনরী' যিনি অস্ট্রেলিয়ার সম্রাট ছিলেন, এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে যাত্রা করলেন, কিন্তু তাঁরা 'সিসিলী দ্বীপ' অতিক্রম করে অগ্রসর হতে পারলেন না।

৫৯৯ হিজরীতে রোমের পোপ 'ইনোশান সুয়েম'-এর আহবানে ইউরোপীয়রা পুনরায় ক্রুসেডের ইচ্ছা করল। কিন্তু এই সেনাদল পথে থাকতেই একজন রোমী যিনি কায়সারের বিভাগ ভাজন ছিলেন, ইউরোপীয় সেনাপতি বলিলেন, 'কন্স্টানটিনোপল' বায়তুল মুকাদ্দাসের চাবিকাঠি। যদি ইহা জয় করা যায় তা'হলে অতিসহজেই বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করা যাবে। সেনাপতির কাছে প্রস্তাবটি খুবই পছন্দ হল। আর তখনই তারা জোর পূর্বক 'কন্স্টানটিনোপল প্রবেশ করে রাজ্যটিকে টুকরো টুকরো করে দিল। তিনি মোট কথা-তারা রোমীদের দ্বারাই বিক্ষিপ্ত হয়েছিল তাই মুসলমানদের মুকাবিলায় আসতে পারেনি। 'কালিমা' যখন ইহা জানতে পারলেন' তখন তিনি তাদেরকে খুবই ভৎসনা করলেন।

(ইবনে আসীর গ্রন্থের-১২-খন্ড, ৭৩-৭৪ পৃষ্ঠায় এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।)

'কনস্টানটিনোপল' অধিকারের পর খ্রীস্টানদের জন্য 'শাম প্রবেশের পথ সহজ হয়ে গেল। ৬০০ হিজরীতে বায়তুল মুকাদ্দাম অধিকার করার উদ্দেশ্যে এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে যাত্রা করল। 'উকা' নামক স্থানে এসে তাঁবু ফেললো এবং চার পাশের মুসলিম বসতির উপর লুটতরাজ শুরু করল। সুলতান সালাহ উদ্দীনের ভাই 'মালিক আদেল' তখন দামেশকে ছিলেন। তিনি মিসর ও শামের সৈন্যদেরকে একত্র করে খ্রীস্টানদের মুকাবিলার জন্য অগ্রসর হলেন এবং 'উকা'র নিকট একস্থানে অবস্থান করলেন। আমীরগণ পরামর্শ দিলেন যে, আপনি এই মুহূর্তে খ্রীস্টানদের উপর আক্রমণ করেন। কিন্তু মালিক আদেল সেই সময় এই প্রস্তাবকে অমঙ্গলজনক মনে করে চুপ রইলেন। ৬০১ হিজরীতে মালিক আদেল এবং ক্রুসেডোরদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেল।

৬১৩ হিজরীতে ইউরোপীয়রা পুনরায় আক্রমণ করল। তখন তাদের সৈন্য সংখ্যা অত্যাধিক ছিল এবং যুদ্ধ সামগ্রী ও অধিক পরিমাণে ছিল। এইজন্য তারা শামের অধিকাংশ এলাকা দখল করেছিল। ৬১৫ হিজরীতে মিসরের দিকে ধাবিত হল এবং 'দিমিয়াত' এর উপর অধিকার বিস্তার করল। এই সময় 'মালিক আদেল' এর ইন্তিকাল হল। তাঁর ছেলে 'মালিক কামিল' সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 'দিমিয়াত' থেকে ইউরোপীয়দেরকে বহিষ্কার করে দেন।

৬৩৫ হিজরীতে 'মালিক কামিল' এর মৃত্যুর পর মালিক সাইফুদ্দীন আবুবকর, যার উপাধি ছিল 'মালিক আদেল আসগর' সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি শুধু খেলাধুলা এবং আনন্দ উল্লাসে দিন কাটাতে লাগলেন। তাঁর ভাই মালিক সালেহ নাজমুদ্দীনের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে ৬৩৭ হিজরীতে তাঁকে হত্যা করা হল।

অতঃপর 'মালিক আদেল আসগর' এর ভাই মালিক সালেহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সময়েই ফ্রান্সের বাদশাহ নবম-'লুইস' দিমিয়াতের উপর আক্রমণ করল। মালিক সালেহ তখন অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু এই অবস্থাতে ও যুদ্ধ পরিচালনা করে। পরিশেষে এমতাবস্থাতেই তিনি ইনন্তি-কাল করেন। তাঁর বিবি 'সাজিরাতুদ্দুর' খুবই বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি

বাদশাহর মৃত্যু সংবাদ গোপন রেখে সমস্ত রাষ্ট্রীয় কাগজ পত্রে নিজে তার পক্ষ হতে দস্তখত করতে থাকেন। ,সাজিরাতুদ্দুর' এর ছেলে তোরানশাহ্ 'কুরদ্' শহরে ছিলেন। তিনি এখন ক্রুসেডারদের মুকাবিলার জন্য ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। তোরান শাহ্ এখানে আগমন করে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে শত্রুর মুকাবিলা করলেন এবং নবম 'লুইস'কে গ্রেফতার করেন। কিন্তু পরে তোরান শাহ মারা গেলেন। এখন রাজ্য শাসনের ক্ষমতা 'সাজিরাতুদ্দুর নিজ হাতে নিলেন। বন্ধী নবম 'লুইক'কে বিরাট অংকের নগদ মুদ্রার বিনিময়ে ছেড়ে দিলেন।

উল্লিখিত পৃষ্ঠায় ক্রুসেডারদের সঙ্গে যুদ্ধে যে মোটামুটি বর্ণনা দেয়া হল তাতেই অনুমান করা যায় যে, সেই সময়—যখন সমগ্র ইউরোপ মুসলমানদের শক্তি সামর্থ্য ও প্রভাব প্রতিপত্তি সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তখনকার অবস্থাটা মুসলমানদের জন্য কতই না সঙিন ও ভয়ানক ছিল। এই সময় ইসলামের শত্রুদের প্রতিরোধের দায়িত্বভার প্রথমতঃ আববাসী খলীফাদের উপর অর্পিত হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে শুধু দু'একজনই এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন, তাঁরা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের উপযুক্ত ছিলেন না। বাগদাদের খলীফাদের কথা বাদ দিলে তখন মিসরে প্রতিষ্ঠিত 'ফাতেমী' খিলাফতের অবস্থাও বাগদাদের খিলাফতের চেয়ে আরো অধিক সঙিন ছিল। ফায়েজ-বি-নাস্‌রিল্লাহর (মৃত্যু ৫৫৬ হিঃ) সময় আরো খারাপ হয়ে গিয়েছিল। প্রতি বছরই ইউরোপীয়দেরকে এক বিরাট মুদ্রা নজ্‌রানা দিতে হতো শুধু এই জন্যে যে, তারা মিসর আক্রমণ করবে না।

অতএব এব্যাপরে কোন সন্দেহ নেই যে, এই সঙিন অবস্থায় সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী ও সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী এবং তাদের ভাই ভাতিজা মালিক 'আদেল' ও 'কামিল' যে বীরত্ব, প্রভাব প্রতিপত্তি, স্থিরতা ও ধীরতা, আন্তরিকতা এবং সর্ব কাজে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আন্তরিক ইচ্ছার সাথে ক্রুসেডারদের মুকাবিলা করে ইসলামের সাহায্য সহযোগিতার ব্যাপারে কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, তা ইসলামের ইতিহাসের এক

গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। উহার উপর যতই গর্ববোধ করা হউক না কেন মূলত কমই হবে। অর্থাৎ তাদের গৌরবময় কীর্তির গর্ব করে শেষ করা যাবে না।

সালজুকী সম্প্রদায়

ঐ সমস্ত বাদশাহদের মত সালজুকীরাও রোমীদের শক্তি সামর্থ্য ধ্বংস করে 'সাওনিয়াকে নিজেদের শাসন কার্যের রাজধানী স্থাপন করে ইসলামের মহান সেবাকার্য সম্পাদন করেছেন। এই সুযোগে তাদের সম্পর্কে ও কিছু বলা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি।

সালজুকী বংশের মধ্যে সুলতান আল্প্ আর সালাদের ব্যক্তিত্ব সব চেয়ে বেশী ছিল। সুলতান আল্প্ আরসালান রোমীদের সাথে কয়েকটি যুদ্ধ করেছেন এবং সফলকাম হয়েছেন। পরিশেষে ৪৬৩ হিজরীতে রোমের সম্রাট 'আরমানুস' যুদ্ধের বিরাট প্রস্তুতি নিলেন। দু'লক্ষ সৈন্যের বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে মুসলমানদের নগরসমূহ দখলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। যখন 'কুরদ' শহরে উপনীত হলেন, তখন সুলতান আল্প্ আরসালান ইহার সংবাদ পেলেন। আল্প্ আরসালান সেই সময় আযার বায়জানে ছিলেন। তখন তাঁর কাছে মাত্র পনর ১৫ হাজারের একটি সেনাবাহিনী ছিল। এদিকে শত্রু ও একেবারে নিকটে এসে গিয়েছিল। 'হাল্ব' ও অন্যান্য স্থান থেকে কোন সাহায্য ও আস্তেছিল না। নিরুপায় হয়ে আল্লাহ্র নাম নিয়ে রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্যে অগ্রসর হতে লাগলেন। লক্ষ্যণীয় যে, কোথায় দু'লক্ষের দুর্ধর্ষ বিরাট সেনাবাহিনী ! আর কোথায় ১৫ হাজারের ক্ষুদ্র সেনা দল !

যুদ্ধ শুরু করবার পূর্বে সুলতান আল্প্ আরসালান রোম সম্রাটের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু রোম সম্রাটের স্বীয় বিরাট বাহিনীর উপর অহংকার ছিল। তাই তিনি সন্ধি প্রস্তাবের উত্তরে বললেন, "সন্ধি তো প্রকাশ্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে যথা সময়ে হবে"। এইরূপ উত্তর শুনে সুলতান খুবই উত্তেজিত হলেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন। শাহী সেনাদলের ইমাম এবং বিশিষ্ট ফিক্হ্ শাস্ত্রবিদ আবু বাস্র মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মালেক আল-বুখারী আল্-হানাফী সুলতানকে বললেন যে, "আপনি দীন ইসলামের

সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, তাই এর বিজয় ও সফলতার যিম্মাদার স্বয়ং আল্লাহ্। সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ আপনার নামে বিজয় লিখে ফেলেছেন। আপনি জুম্মার নামাযের পর শত্রুদের মুকাবিলার জন্যে যাত্রা শুরু করবেন, তা'হলে মুসুল্লিগণ নামাযান্তে ইসলামের মুজাহিদদের জন্যে দু'আ করবেন।"

ইমাম সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী সুলতান আল্প আর সালান তাই করলেন। পর দিন জুম্মার দিন ছিল। প্রথমতঃ সকল মুসলমানদেরকে নিয়ে জুম্মার নামায আদায় করেলেন। অতঃপর আল্লাহ্র দরবারে অতি বিনীত-ভাবে এমন কান্না-কাটির সাথে বিজয়ের জন্যে দু'আ করলেন যে কাঁদতে দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সুলতানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুসল্লীরাও এমনিভাবে কান্না-কাটি করলেন। অতঃপর সুলতান বললেন, যে ব্যক্তি ফিরে যেতে চায় সে খুশীতেই চলে যেতে পারে। এখানে এমন কোন বাদশাহ নেই যে, আদেশ নিষেধ করবে। একথা বলেই সুলতান কামান-বন্দুক দূরে রেখে তলোয়ার দ্বারা স্বীয় শরীর সুসজ্জিত করে ঘোড়ার লাগাম নিজের হাতের সঙ্গে বাঁধলেন। অতঃপর সাদা কাপড় পরিধান করে সুগন্ধী লাগালেন এবং বললেন "যদি যুদ্ধে নিহত হই তবে এই সাদা কাপড় দ্বারাই আমার 'কাফন' হবে। রোমীও মুসলমান সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে সামনা-সামনি হয়ে দাঁড়ালেন সুলতান প্রথমেই ঘোড়ায় আরোহণ করে এমন জোরে আক্রমণ চালালেন যে, রোমীদের পা' হটে গেল। অসংখ্য-সৈন্য নিহত হল রোম সম্রাট নিজ ও বন্দী হলেন। সুলতান আল্প আর সালানের সামনে বন্দী সম্রাটকে আনীত হলে কিছু কথোপকথনের পর এক বিরাট অংকের নগদ মুদ্রার বিনিময়ে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে তাকে মুক্তি দেয়া হল।

এই যুদ্ধে অগণিত মাল-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হল। তন্মধ্যে ছিল উন্নতমানের ঘোড়া, অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র এবং অন্যান্য মাল-সামগ্রী। মুসলমানদের এই সফলতার ফলে রোমীদের হিম্মত একেবারে ভেঙ্গে গেল। মুসলমানদের সামরিক শক্তি এমন বেড়ে গেল যে, এরপর তাদের (রোমীদের) কখনও 'আযার বাযজান' এবং 'আরমেনিয়ার' উপর আক্রমণ করার সাহস হয়নি। বিজয় কার্য ছাড়াও সুলতান আল্প আর সালানের কলাবিদ্যার প্রতি

বিশেষ মনোযোগ ছিল। সুতরাং তাঁর সময়েই তাঁর মন্ত্রী নিজামুল মুলক বাগদাদে মিযামিয়া মাদ্রাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ৪৬৫ হিজরীতে চীন বিজয়ের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন এবং ভূ-মধ্য সাগর পাড়ি দিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর ইন্তিকাল হল।

মুসলিম ঐতিহাসিকগণ আলপ আর সালানের রাজত্বকালকে ইসলামের উন্নতি ও গৌরবের এক উজ্জ্বল অধ্যায় বলে বর্ণনা করেছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, চরিত্র ও অভ্যাস, আমলও বিশ্বাস, আকৃতি ও প্রকৃতির দিক দিয়ে সুলতান নিজের উচ্চ পদ মর্যাদার যে চিত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থাপন করেছেন, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, সুলতানের রাজত্ব যেন খিলাফতের আলোক-ছটা দৃষ্টি গোচর হচ্ছিল। সুলতানের রাজত্ব বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইবনে আমীরুল জাহরী বর্ণনা করেন যে,

ودان له العالم وبحق - قيل له سلطان العالم -

"জগৎ সুলতানের অনুগত ছিল, অতএব যথার্থই তাকে জগতের বাদশাহ বলা হত"।

বানু হামদান

৩২০ হিজরীতে বানু হামদানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। এই বংশের সতেজ ফুল হিসেবে ছিলেন, সাইফুদ্দৌলা আবুল হাসান আলী-ইবনে আবিল হিজা। ঐতিহাসিক ইবনে খালফানের বর্ণনা মতে তিনি রোমীদের সাথে চল্লিশবার জিযাদ করিলেন। বর্ণিত আছে যে, ঐ সমস্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রের যে সব ধুলোবালি সাইফুদ্দৌলার গায়ে পতিত হয়েছে, তিনি ঐ গুলো একত্র করে' রেখেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি অসিয়ত করে গিয়ে ছিলেন যে, জমাকৃত ধুলোবালি দিয়ে যেন একটি ইট' তৈয়ার করা হয় এবং আমার কবরে আমার মাথার নীচে রাখা হয়।

আবুত্তাইয়্যের মুতানাব্বী সাইফুদ্দৌলার দরবারের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি তাঁর কবিতায় অধিক পরিমাণে সাইফুদ্দৌলার এবং 'কনষ্টান্টিনোপল' ও রোম সাম্রাজ্যের যুদ্ধের অবস্থা কবিতায় বর্ণনা

করেছেন। রোমীদের মারাত্মক অবস্থা ও পলায়ন পর অবস্থা, কন্‌ষ্টানন্টিনোরলের হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়ে সাইফুদ্দোলার অসাধারণ উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আশ্চর্যজনক বীরত্ব ও বাহাদুরী ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

তাতারীদের আক্রমণ ও তার প্রতিরোধ

ক্রুসেডারদের ন্যায় হিজরী সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেবর্তী সময় থেকে তাতরীরাও ইসলামীদেশ সমূহে বিরাট-বিরাট আক্রমণ শুরু করেছিল। এমন কি পরিশেষ ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদের খিলাফতের পরিসমাপ্তি তাদের হাতেই হয়ে ছিল। বাগদাদ ধ্বংস করার পর তাদের শক্তি সাহস আরো-দ্বিগুণ হয়ে গেল। দামেশ্‌ক এবং শামের সমুদ্রতীরবর্তী এলাকাসমূহ অধিকার করার পর তারা মিসরের দিকে অগ্রসর হলো।

মিসরে আইয়ুবী রাজত্ব শেষ হওয়ার পর ৬৪৮ হিজরীতে উপকূলীয় অঞ্চলে দাসদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় এই বংশের প্রথম শাসক- 'মুহয্‌জাশিংগর কে হত্যার পর তাঁর পাঁচ বছরের নাবালক ছেলে মালিক মানসুর নূরুদ্দীনকে সিংহাসনে বসানো, হয়। সাইফুদ্দীন মাহ্‌মুদ কাতুযী, যিনি পরবর্তী সময়ে মালিক মুজাফ্‌ফর সাইফুদ্দীন উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি একসময় মালিক মানসুরের দাসত্ব করতেন। তাতারীগণ যখন দামেশ্‌ক্‌ এবং শামের উপকূলীয় অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করল,—তখন 'কাতুযী' দেশের বড় বড় আলেম এবং জ্ঞানীগুণী ও আমীরগণকে একত্র করে' বললেন।, 'তাতারীরা খিলাফতের কেন্দ্রীয় শক্তি তো ধ্বংস করেছে, এমন তারা শামের দিকে আগমন করছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এদিক থেকে অবসর হয়ে মিসরের দিকে অগ্রসর হবে। এই সময়টা ইসলামী রাজত্বের জন্য খুবই ভয়ানক অবস্থা। এর পরিপ্রেক্ষিতে এখন সবচেয়ে অধিক প্রয়োজন হল মিসরের সিংহাসনে একজন নাবালক অনভিজ্ঞের পরিবর্তে একজন এমন যোগ্য, চতুর ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বসানো, যিনি সময়ের ঘোলাটে অবস্থাকে সামাল দিতে সক্ষম হবেন। উপস্থিত সকলই একবাক্যে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। পরিশেষে ৬৫৭ হিজরীতে মালিক মানসুরকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে 'কাতুযী-কেই

মিসরের বাদশাহ বানানো হল। যিনি মালিক মুজাফ্‌ফর উপাধি ধারণ করেন। যে বিষয়ের ভয় ছিল, তাই দেখা দিল। হালাকুখান দামেশ্‌ক এবং শামের উপকূলীয় অঞ্চল দখল করার পর মিসরের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু যুদ্ধ শুরুর আগেই মালিক মুজাফ্‌ফরকে চিঠি লেখলেন যে, তোমরা যুদ্ধ ব্যতীতই তোমাদের দেশ আমার হস্তে সমর্পণ কর। অন্যথায় তোমাদের অবস্থা তাই হবে যা' বাগদাদের হয়েছে। মিসরীর সৈন্যরা খুবই বীর পুরুষ ছিল। কয়েকটি যুদ্ধে ক্রুসেডারদের সাথে শক্তি পরীক্ষা করে' তাদেরকে পরাজিত করেছে। এই জন্য তাঁরা হালাকু খাঁর ধুম্‌কিতে কোন ভ্রূক্ষেপ করেনি। তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। ৬৫৮ হিজরীতে শাওয়াল মাসে ফিলিস্তিনীদের অন্তর্গত 'আইনুল জালুতে' ভীষণ যুদ্ধ হল। তাতারীদের সেনাপতি 'কুত্‌বুগা' নিহত হল। তার ছেলে বন্দী হল। মিসরীয়দের বিরাট বিজয় হল। মালিক সাইফুদ্দীনের নির্দেশে রুকুনুদ্দীন বিব্‌রাস বন্দ কারার' তাতারীদের পশ্চাদ গমন করেন এবং পরিশেষে তাদেরকে শামদেশের সীমান্ত পার করে' তাড়িয়ে দেন।

মালিক জাহির বিব্‌রাস

'মালিক মুজাফ্‌ফর সাইফুদ্দীন' 'বিব্‌রাস বন্দ্‌কাদারীর' সাথে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, যদি তিনি তাতারীদেরকে শাম থেকে বহিষ্কার করতে পারেন, তবে তাঁকে হালবে'র গভর্নর বানাবেন। কিন্তু ,বিব্‌রাস' যখন এ ব্যাপারে সফল কাম হয়ে ফিরলেন এবং হালবের গভর্নর হওয়ার শর্ত পরিপূর্ণ করলেন, তখন মালিক মুজাফ্‌ফর স্বীয় অঙ্গীকার থেকে ফিরে গেলেন। 'বিব্‌রাস এতেই অগ্নিশর্মা হয়ে কয়েকজন দাসের সাথে যোগসাজশে লিপ্ত হন। মালিক মুজাফ্‌ফর যখন ভ্রমণে ছিলেন, তখন তাকে হত্যা করা হল। অতঃপর রুকুনুদ্দীন বিব্‌রাস নিজেই ৬৫৮ হিজরীতে সুলতানাতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মন্ত্রী যাইনুদ্দীনের ইঙ্গিতে স্বীয় উপাধি 'মালিক জাহের এর স্থলে 'মালিক জাহের' ধারণ করলেন। (এই সব ঘটনা 'হুসনুল মুহাজিরা ফি আখ্‌বারে মিসর ও কাহেরা' গ্রন্থের খণ্ড' ৩৬ পৃঃ দ্রঃ)

'মালিক জাহের রুকুনুদ্দীন বিবরাস বন্দকাদারী' এর রাজত্বকাল মিসরের ইসলামী ইতিহাসে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি যদিও মালিক মুজাফফর সাইফুদ্দীনের পাহারাদার ছিলেন, কিন্তু খুবই উন্নত ধরনের চরিত্রবান, চিন্তাশীল, একজন উত্তম সেনাপতি, শরীয়তের অনুসারী, ন্যায় পরায়ণ এবং অনুগ্রহশীল ছিলেন। তিনি আভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষা কল্পে ঐ সমস্ত অনিয়ম' কুসংস্কার ও খারাপ অবস্থার সংস্কার করেন, যা' মালিক মুজাফ্ফর সাইফুদ্দীনের রাজত্বকালে সৃষ্টি হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সমস্ত অবৈধ আয়ের উৎস একেবারেই বন্ধ করে দেন, যা' তাঁর সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে চলে আসছিল।

বাতেনীয়া সম্প্রদায়ের মূলোৎপাটন

ফাতেমীয়া রাজত্বকালে বাতেনীয়া সম্প্রদায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। যদি ও হালাকুখান তাদের শক্তি অনেকটা ধ্বংস করে দিয়েছিল, তথাপি তারা কিন্তু একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। মালিক জাহেরের সময়ে তারা আবার ষড়যন্ত্র শুরু করল। মালিক জাহের তাদের অনেক-কেই হত্যা করেন। এবং তাদের দুর্গসমূহ দখল করেন। এইরূপ কঠোরতার ফলে এই পথ ভ্রষ্ট দল সর্বকালের জন্যে ধরা পৃষ্ঠ হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

তাতারীদের উপর ক্রমাগত বিজয়

আভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষার পর সুলতান রুকুনুদ্দীন বিবরাস তাতারীদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাতারীরা ইরাকে আজম, শাম ও ফিলিস্তিন ব্যাপী নিজেদের অরাজকতা বিস্তারের চারণ ভূমি বানিয়ে ছিল। জানা যায় যে, মালিক মুজাফ্ফর সাইফুদ্দীনের সময় যখন তাতারীদেরকে 'আইনুল জালুত' নামক স্থানে পরাজয় বরণ করতে হল; তখন মালিক জাহের বন্দকাদারী তাদের পশ্চাদ গমন করে ছিলেন এবং শামের সীমান্তের বাহিরে তাড়িয়ে দিয়ে ছিলেন। বন্দকাদারীর রাজত্বকালে তাতারীরা আবার শামে বিদ্রোহ শুরু করল। মালিক জাহের তাদের মুকাবিলার জন্যে 'আমীর কালাউন'কে পাঠালেন। তিনি তাতারীদেরকে ক্রমাগত কয়েকবার পরাজিত করে শামের ভূমি থেকে তাদের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেন।

৬৭৫ হিজরীতে তাতারীরা হালাকু খানের ছেলে 'আবাকা খান' এর তত্ত্বাবধানে ইরাকে আজমের উপর বিরাট বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করল। মালিক জাহের নিজেই মুকাবিলার জন্য তথায় পেঁছেন। ভীষণ যুদ্ধ হল। অসংখ্য মানুষ নিহত হল। কিন্তু পরিশেষে মুসলমানদের ভাগ্যেই বিজয় জুটল। তাতারীরা অপমানিত হয়ে পলায়ন করল। ক্রুসেডারগণ যদিও খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাতারীদের মতই ষড়যন্ত্র করতে লাগল। মালিক জাহের ও এ ব্যাপারে গাফেল ছিলেন না। সুতরাং সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর পরে ক্রুসেডারগণ শামের যে সব এলাকা দখল করে নিয়ে ছিল, মালিক জাহের ৬৬৩-৬৬৪ হিজরীতে ক্রমাগত দু'বৎছর যুদ্ধ করে ঐসব এলাকা পুনঃ দখল করেন এবং প্রতিটি নগর থেকেই তাদেরকে বহিষ্কার করেন। অতঃপর তিনি মিসর এলেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন যখন যুদ্ধের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি হল—তখন ৬৬৬ হিজরীতে ফিলিস্তিনের ক্রুসেডারদের উপর আক্রমণ করলেন। এখান থেকে এন্তাকিয়া পর্যন্ত এবং এর চেয়েও কিছু আগে 'মারকীয়া' নামক স্থান পর্যন্ত বিজয় করেন। তৎপর বাগদাদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাতারীদের নিকট হতে উহা ছিনিয়ে আনতে সফলকাম হলেন। 'কিসারীয়া' কোন একসময় সালজুকীদের রাজধানী ছিল। বর্তমানে তা ক্রুসেডারদের দখলে সেখান থেকেই তারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করল। মালিক জাহের বিব্রাস ৬৭৫ হিজরীতে উহা জয় করেন।

মোট কথা এই যে, আভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষা, ন্যায়-পরায়ণতা এবং বিভিন্ন বিজয়ের দিক দিয়ে মালিক জাহের বিব্রাসের রাজত্বকাল মুসলমানদের সৌভাগ্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মিসরের অন্যান্য আব্বাসী খলীফাগণ ও খুতবায় স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, যখন শত্রু (তাতারীরা) আমাদের ঘরে প্রবেশ করেছে এবং বিভিন্ন অত্যাচারে জর্জরিত করতে শুরু করেছে, ঠিক সেই ভয়াবহ অবস্থায় সুলতান রুকুনুদ্দীন বিব্রাস ছোট রাজ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের সাহয্যে সহযোগিতার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন এবং বিধর্মীদের সৈন্যদেরকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। (হুসনুল মহোযিরা গ্রন্থের ২য় খণ্ড, ৪৮ পৃঃ দ্রঃ)

আল্লামা জালাল উদ্দীন সিয়ুতী বলেন, অন্যান্য বড় বড় রাজত্বের মুকাবিলায় মালিক জাহেরের রাজত্বের দৃষ্টান্ত সমুদ্রের সামনে একটি ছোট্ট নদী তুল্য। কিন্তু আল্লাহুর ইচ্ছা ছিল যে, সত্য ধর্মের উপর যে বাধার সৃষ্টি হয়েছিল এবং মুসলমানদের উপর ক্রমাগত যে সব আপদ বিপদ অবতীর্ণ হচ্ছিল এইসবের পথ বন্ধ করে দিলেন একটি ছোট্ট রাজ্যের দ্বারা।

এইসব কৃতিত্ব ছাড়াও মালিক জাহেরের ব্যক্তিগত চরিত্র, দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ যেসব ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন, তাতে প্রতিয়মানন হয় যে, মালিক জাহের একজন দাস হলেও প্রকৃতপক্ষে আব্বাসী বংশের কোন কোন্ প্রভাবশালী খলীফা থেকেও উত্তম ছিলেন।

আল্লামা জালাল উদ্দীন সিয়ুতী ইবনে কাসীর থেকে বর্ণনা করেছে যে, ৯ই রজব ৬৬০ হিজরীতে একটি কূপের ব্যাপারে রুকুনুদ্দীন বিব্রাস কাজী তাজুদ্দীনের আদালতে মুকদ্দমা দায়ের করেন। বাদশাহকে দেখে সকলই তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াল। কাজী সাহেব ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য উঠতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মালিক জাহের হাতের ইশারায় উঠতে নিষেধ করলেন। যথা নিয়মে আদালতে মুকদ্দমা শুরু হল। সুলতান শরীয়তের নির্দেশ মুতাবেক বাদী হওয়ার কারণে ন্যায়সঙ্গতঃ প্রমাণাদি পেশ করলে আদালতের 'রায়' তাঁর পক্ষেই ঘোষিত হল।

৬৬৭ হিজরীতে যখন বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্জ করতে যান, তখন তিনি সমস্ত 'কা'বা' ঘর গোলাপ জল দিয়ে বিধৌত করেন। অতঃপর তিনি পবিত্র মদীনায় গিয়ে নবী (সোঃ) রওজা মুবারক যিয়ারত করেন। তথায় তিনি দেখতে পেলেন যে, জনগণ নবীর রওযার একেবারে নিকটে গিয়ে দাঁড়ায়। ইহা নিঃসন্দেহে বে-আদবী আচরণ। তাই তিনি রওজা মুবারকের চারপার্শে (লোহা অথবা কাঠির) বেড়া নির্মাণ করে ছিলেন, যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে।

তিনি বিচার বিভাগে কিছু অতিরিক্ত কাজ সংযোজ করেন, যথা—চার মাযহারের প্রত্যেক মাযহারের জন্য পৃথক পৃথক বিচারক নির্ধারণ করেন। তিনি খুবই দান-খায়রাত করতেন। রমযান মাসে স্থানে স্থানে ফকির মিসকীনদের জন্যে পাকনো খাবার খাওয়াতেন। সেহরী ও ইফতারের জন্যে

বিভিন্ন প্রকার খাবার তৈয়ার করা হত। এজন্য বড় বড় সম্পত্তি ওয়াক্ফ্ করছিল। এতে গরীব মিসকীন ও অভাবীদের দাফন-কাফনেরও ব্যবস্থা হত। মালিক জাহের 'কিসারীয়া' বিজয়ের পর দামেশ্‌কে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। তথায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৬৭৬ হিজরীতে মুহররম মাসে ইন্তিকাল করেন।

তাতারীদের ইসলাম গ্রহণ

মালিক জাহেরের পরও তাতারীদের বিদ্রোহ থামেনি। ৬৮০ হিজরীতে হালাকু খানের দু'ছেলে 'আবাকা খান' ও 'মঙ্গুতাইমুর' নামে আবারও বীর-বিক্রমে আক্রমণ করল। মঙ্গুতাইমুরের তত্ত্বাবধানে যে সেনাদল ছিল, তাতেই প্রায় হাজার খানেক অশ্বারোহী সৈন্য ছিল।

সমুদ্র উপকূলীয় দাস রাজত্বের পঞ্চম শাসক মালিক মানসুর সাইফুদ্দীন কালাদুন এই সময়ে মিসরের বাদশাহ ছিলেন। তিনি সংবাদ পেয়ে তাতারীদের মুকাবিলার জন্যে বিরাট সেনাদল নিয়ে অগ্রসর হলেন। 'হিমস্' নামক স্থানের নিকট ১৪ই রজব ভীষণ যুদ্ধ হল। যুদ্ধে মঙ্গুতাইমুর' নিহত হল এবং আবাকা-খান পরাজিত হয়ে হামদানের দিকে পলায়ন করল। তথায় তারই ভাই 'নিকুদার উগলান' তাকে বিষ-পানে হত্যা করে নিজেই রাজসিংহাসন অধিকার করে বসে। অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করে স্বীয় নাম পরিবর্তন করে, আহমাদ খান নাম রাখেন। উভয়ের মাঝে একটি পারস্পরিক সহযোগিতামূলক শান্তি চুক্তিও সম্পাদিত হয়। আহমাদ খানের ইসলাম গ্রহণের ফলে তাতারীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। 'কুবিলা-কাআন'-এর পৌত্র যিনি অন্ধ সুলতান নামে পরিচিত এবং 'খাত্তা' নামক স্থানের শাসক ছিলেন, তিনি প্রায় দেড় লক্ষ সৈন্য নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাত্রদিনে ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থেকে জীবন যাপন করতে লাগলেন। والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم — আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে করেন তাঁকেই সরল পথে পরিচালিত করেন।

লক্ষণীয় যে, কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য ইহা কি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নয়? যে তাতারীরা বিগত পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত

ইসলাম ও মুসলমানদের রাষ্ট্র ও জনবহুল নগরী ধ্বংস করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি, আজ তাঁরাই মুসলমানদের দলে শরীক হয়ে নিজেদের সমস্ত সামরিক শক্তি, কৌশলগত সামর্থ্য ও সহযোগিতা, এক কথায় তাদের সর্বশক্তি ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করল। কবি আল্লামা ইকবাল ঠিকই বলেছেন,

ھے عیاں یورش تاتار کے افسانے سی -
پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے -

"তাতারীদের বিদ্রোহ ও ধ্বংসলীলা কাহিনীতে প্রকাশ, মূর্তির ঘর থেকে বেরিয়ে এল কা'বার রক্ষক।

বাগদাদের আব্বাসী খিলাফতের বীর পুরুষ কে ছিলেন?

বাগদাদের আব্বাসী খিলাফতের উপর কথোপকথনের পর একথা বলে দেয়া প্রয়োজন যে, তাদের মধ্যে বীর পুরুষ কে ছিলেন? যেন আপনি সহজেই অনুধাবন করতে পারেন যে, আমরা একজন খলীফা কিংবা সুলতানকে কোন মাপকাঠিতে যাচাই করতে চাই। আর ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কোন্ ব্যক্তি রাষ্ট্র বা খিলাফতের বীর পুরুষ হওয়ার উপযোগী?

সাধারণ ঐতিহাসিকগণ মামুনুর রশীদকেই আব্বাসী খিলাফতের বীর পুরুষ বলে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সম্মানের জামা যদি আব্বাসী খলীফাদের কারো গায়ে শোভা পাওয়ার উপযুক্ত হয়, তবে আমাদের মতে তিনি হবেন খালীফা আবু জাফর মানসুর। যদিও সাফ্ফার মত তার মনমানসিকতায় কঠোরতার মনোভাব প্রবল ছিল, তথাপি তাঁর মস্তিষ্কে ইসলামী ভাবধারার প্রাধান্য ছিল। তিনি মনে করতেন যে, একজন ইসলামী খলীফার দায়িত্ব শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার করাই নয়, বরং এর চেয়ে অধিক কর্তব্য হল—মানুষের কাজকর্ম ও চারিত্রিক সংশোধনের প্রতি মনোনিবেশ করা। অসৎ চিন্তাধারা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে তাদেরকে রক্ষা করা। তাদের উপার্জন ও হালাল খাদ্য গ্রহণের উপায় ও উপকরণের ব্যবস্থা করা। সামাজিক অবস্থাকে কুসংস্কার ও বিভ্রান্তিমূলক আচরণ থেকে সংরক্ষণ করা। দেশের রাজনৈতিক শক্তি সামর্থ্য সুদৃঢ় করা, যাতে বাহিরের শত্রুদের আক্রমণ করার হিম্মত না হয়।

মানসুরের রাজত্বকালে ইসলামী চরিত্রের সংরক্ষণ

এইরূপ কর্তব্যবোধ ও সজাগ দৃষ্টির কারণে খলীফা মানসুর এক দিকে তো 'তারাবুলিসুশ্ শাম' ও অন্যান্য স্থানে রোমীদের সৃষ্ট বিদ্রোহকে দমন করেছেন, দেশের অভ্যন্তরে খুরাসানীদের শক্তিকে কেন্দ্র করে, যারা-স্বীয় ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করছিল তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং অন্যদিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন, যাতে মুসলমানগণ বাহুল্য কাজকর্ম ও চরিত্র বিধ্বংসী স্বভাব থেকে পবিত্র থাকে। খলীফা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, ঐতিহাসিক তাবারীর বর্ণনা মতে. শাহী মহলে একদিন ব্যতীত কোনদিন খেল্ তামাশা ও বাহুল্য কাজ কর্ম কখনও দেখা যায় নাই।

একদা রাজ প্রাসাদে কোথা থেকে যেন সুর-লহরী ভেসে আসছিল। জিজ্ঞাসার পর জানা গেল যে, রাজ মহলের একস্থানে গান-বাদ্য হচ্ছে। তৎক্ষণাৎ তিনি পায়ে জুতা পরে ঐ দিকে যাত্রা করলেন। যথাস্থানে উপনীত হয়ে দেখতে পেলেন যে, একজন দাস তান্‌বুরা বাদ্য যন্ত্র বাজাচ্ছে এবং কয়েকটি দাসী তার চার পাশে চরিত্র বিধ্বংসী উস্‌কানীমূলক কাজে লিপ্ত আছে। খলীফা মানসুরকে দেখা মাত্র তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। গানের আসরও ভেঙ্গে গেল। অতঃপর মানসুর আদেশ করলেন যে, তানবুরা দিয়ে দাসের মাথায় আঘাত করা হউক। সুতরাং তাই করা হল। আঘাতের ফলে 'তানবুরা' ভেঙ্গে গেল। এই ঘটনার পর মানসুর দাসকে তাঁর কাছে রাখা সমীচীন মনে করেননি। তৎক্ষণাৎ শাহী মহল থেকে তাকে তাড়িয়ে দেন।

এতদ্ব্যতীত মানসুর মদ্য পানকে ঘৃণা করতেন এবং নিজেও তা' পান করতেন না। অন্য ধর্মের লোকদেরকেও তাঁর দস্তরখানে মদ্য পানের অনুমতি দিতেন না। একদা একজন খ্রীস্টান ডাক্তার শাহী মহলে অতিথি হলেন। মানসুরের নির্দেশে তার জন্য খানা পিনা আনায়ন করা হল। কিন্তু তাতে মদের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ডাক্তার ছিলেন ঈসায়ী ধর্মের, তাই মদ্যপান তার ধর্মমতে অবৈধ ছিল না। অতএব তিনি দস্তরখানে খাবারের সঙ্গে 'মদ' চাইলেন। তার উত্তরে বলা হল ঃ

ان الشراب لا يشرب على مائدة امير المؤمنين -

"আমীরুল মু'মিনীনের দস্তরখানে 'মদ' পরিবেশন করা হয় না"। ডাক্তার বললেন, তবে আমি খাবার খাব না। মানসুর তা শুনে বললেন, "যদি 'মদ' ব্যতীত খাবার না খেতে চান,—তবে না খাবেন।" ঘটনাটি ঘটেছিল নাস্তা খাওয়ার সময়। রাত্রের খাবারের সময়ও যখন উক্ত ডাক্তার মদ চাইলেন, তখন পূর্বের ন্যায়-ই উত্তর দেয়া হল। অতঃপর তিনি খাবার গ্রহণ করলেন এবং 'দজলা' নদীর পানি পান করে বললেন, আমি ইতিপূর্বে জানতাম না যে, কোন বস্তু মদের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে কি না? কিন্তু সত্যিই 'দজলা' নদীর পানি পান করে আমার আর 'মদ' পানের প্রয়োজন বাকী থাকেনি।

খলীফা মানসুর অন্যান্য আব্বাসী খলীফাদের বিপরীত সীমাতিরিক্ত ও বাহুল্য খরচ করা থেকেও নিজেকে বিরত রাখতেন। কোন কবির কবিতায়ও যদি আনন্দিত হতেন, তবে তাঁকে সাধারণ পুরস্কার দিয়েই ক্ষান্ত হতেন। একদা 'বসরার' ক্বারী 'হাইসুম' খলীফা মানসুরের সামনে কুরআনের আয়াত ولا تبذر تبذيرا (এবং অযথা খরচ করে অপচয় করো না) পাঠ করেন। ইহা শ্রবণ করে তিনি প্রার্থনা করেন যে, 'হে আল্লাহ্! আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে সীমাতিরিক্ত বাহুল্য খরচ করা থেকে রক্ষা করুন। এর ফলে তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যথা খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, লেন-দেন ইত্যাদিতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। তিনি মনে করতেন যে, রাজকোষ জনগণের গচ্ছিত ধন। কোন ব্যক্তিরই অধিকার নেই যে, তিনি এই গচ্ছিত ধনকে নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করে।

খলীফা মানসুর শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি নিজের কোন কাজ-কর্মে কারো সমালোচনায় অস্থির হতেন না। বরং তাঁর প্রতি সমালোচনার বিষয় যদি সত্য হত, তবে তিনি তা' মেনে নিতেন। একদা আফ্রিকার একজন বিচারক তাঁর রাজ দরবারে উপস্থিত হলেন। মানসুর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার রাজত্ব এবং বনু উমাইয়াদের

রাজত্বের মধ্যে কি পার্থক্য দেখলেন। আর আপনার এই দীর্ঘ ভ্রমণে আমার রাজত্বের যে সব এলাকা ঘুরে এসেছেন, তা'তে আইন-শৃংখলার বিষয় কি দেখলেন? বিচারক প্রতি উত্তরে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন। আমি ঐ সব এলাকায় দুষ্কর্ম ও অন্যায় অত্যাচারের আধিক্য দেখতে পেলাম। প্রথমতঃ আমি ভাবলাম যে. ঐ সব এলাকা আপনার রাজধানী থেকে দূরে অবস্থিত বলে হয়ত অন্যায় অবিচারের আধিক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু যতই রাজধানীর নিকটে আসতে লাগলাম—অবস্থা ততই সঙ্গিন মনে হতে লাগল। খলীফা মানসুর তা শুনে মাথা নত করলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা উত্তোলন করে বললেন. কিন্তু মানুষ অন্যায় করলে আমি কি করবো বলুন? বিচারক বললেন, আপনি কি উমর ইবনে আব্দুল ·আযীযের কথা শুনেন নি? তিনি বলতেন, "জনগণ রাজার চরিত্রে রঙিন হয়। দেশের রাজা যদি পুণ্যবান হন, তবে প্রজাগণও পুণ্যবান ও সৎ হতে বাধ্য। আর রাজা যদি খারাপ চরিত্রের হন, তবে প্রজাগণও তদ্রূপ হবে, কখনও তারা পুণ্যবান ও সৎহতে পারে না।"

মানসুরের দূরদর্শিতা ও পরিণামদর্শিতা, রাজনৈতিক পরিপক্কতা এবং সুচিন্তা ও সৎ উদ্দেশ্যের পরিমাপ তাঁর ওসীয়ত (মুমূর্ষ অবস্থায় উপদেশ) নামা থেকে জানা যায়—যা' তিনি তাঁর ছেলে মাহদীকে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে প্রদান করেছিলেন। ঐতিহাসিক 'ইবনে জারীর' তাঁর তাবারী' গ্রন্থে ঐ 'ওসীয়ত' নামার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। শব্দ প্রয়োগে ভিন্নতা থাকলেও উভয়ের বর্ণিত বিষয় এক। নিম্নে এর সারাংশ বর্ণনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"হে বৎস! এমন কোন বস্তু নেই যে, আমি আমার জন্য প্রস্তুত করে রেখে যাইনি। আমি তোমাকে কয়েকটি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করছি, যদিও এ সম্পর্কে আমার ধারণা যে. তুমি এদের কোনটির উপরই আমল করবে না।" এই বলে মানসুর একটি সিন্দুক বের করে নিয়ে এলেন। এতে কয়েকটি রেজিস্টার (খাতাপত্র) ছিল। সিন্দুকটি সদা তালাবদ্ধ থাকত। নিজেদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে উহা খোলার অধিকার ছিল না। মানসুর সিন্দুকটি খুলে মাহদীকে দিয়ে বললেন, তুমি একে অত্যন্ত যত্ন

সহকারে রাখবে। এতে তোমার পিতৃ পুরুষদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিদ্যা সংরক্ষিত আছে। যদি কোন সময়ে কোন ব্যাপারে কঠিন সমস্যা দেখা দেয় তবে ১নং রেজিস্টারটি খুলে তাতে তোমার সমস্যার সমাধান খুঁজবে। যদি তাতে কোন সমস্যার সমাধান খুঁজে না পাও, তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় নম্বর রেজিস্টার খুলে দেখবে। এমনিভাবে সমস্যার সমাধান না হলে সপ্তম রেজিস্টার পর্যন্ত খুঁজে দেখবে। আর যদি উহাদের কোনটিতেই তোমার সমস্যার সমাধান না মিলে তবে ছোট রেজিস্টারটি দেখবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, উহাতে তোমার যে কোন বিষয়ে অবশ্যই সরল পথের সন্ধান মিলবে। অতঃপর মানসুর কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে মাহদীকে বিশেষ উপদেশ প্রদান করলেন এবং এগুলোর উপর আমল করার জন্য তাকীদ করলেন।

তার বিশেষ উপদেশগুলো নিম্নরূপ

১. বাগদাদ শহরের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখবে।

২. আমি রাজকোষে এত পরিমাণ টাকা পয়সা জমা করে রেখেছি যে, যদি দশ বছর পর্যন্ত কোন খাজনা বা টেক্স আদায় না করা হয়—তবুও তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তুমি উহা হতে সৈনিকদের বেতন প্রদান, রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বৃত্তি ও ভাতা প্রদান এবং সীমান্তের শৃংখলা রক্ষার খাতে খরচ করবে।

৩. পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে এবং আত্মীয়তার হক আদায় করবে। এতে তোমার সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

৪. প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌ভীরুতা, পবিত্রতা এবং ন্যায় বিচারের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। যে শাসকের মধ্যে এইসব গুণাগুণ নেই তিনি প্রকৃত শাসক নন।

৫. কোন কাজে স্ত্রী লোকদেরকে উপদেষ্টা বানাবে না এবং কোন কাজ-কর্মে গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির না করে কোন সিদ্ধান্ত নিবে না।

মানসুরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর লিখিত ওসীয়ত তাঁর মৃত্যুর পর যথাযথভাবে কার্যকরী হবে না। তাই তিনি ওসীয়তনামার প্রত্যেক বাক্যের

পরে লিখেছেন যে, وما اظنك تفعل "আমার ধারণা যে, তুমি তা কার্যকরী করবে না।"

মানসুরের পর ১৫৮ হিজরীতে মাহ্‌দী খলীফা হলেন। তিনি তাঁর রাজত্বকালে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নির্মাণ কার্য সম্পাদন করেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় ও উল্লেখযোগ্য তাঁর কীর্তি হল যে, তিনি বিধর্মীদের "সমস্ত ফিত্‌না (বিশৃংখলা পূর্ণ আচরণ)-কে কঠোরতার সাথে মুকাবিলা করেন, যা বিভিন্ন কারণ ও উপকরণ হয়ে মুসলমানদের মাঝে বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছিল। সুতরাং এর প্রতিরোধকল্পে তিনি একটি পৃথক বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন— 'ওমারুল কাল্‌ওয়াযি' নামক এক ব্যক্তি। এই বিভাগের লোকদের দায়িত্ব ছিল বিধর্মী (যিন্দীক) ও কাফিরদেরকে (মুলহেদুন) ধরে নিয়ে আসা। তৎপর তাদের অন্যায়ের প্রকৃত শাস্তি দেয়া। 'বাশ্‌শার ইব্‌নে বুরদ' তৎকালে বিখ্যাত (যিন্দীক) বিধর্মী কবি ছিলেন। একদা মাহ্‌দী বস্‌রায় আগমন করেন। তাঁর সাথে একজন (হামদ্‌যীয়) আল্লাহ্‌ভক্ত লোক ছিলেন। তিনি বিধর্মীদেরকে তালাশ করে তাদের ঠিকানা বের করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। আল্লাহ্‌ভক্ত দলে নির্বাচিত ব্যক্তি 'যিন্দীক বাশ্‌শারের, সন্ধান দিলেন। মাহ্‌দীর সামনে বিষয়টি উত্থাপিত হলে মাহ্‌দী আল্লাহ্‌ভক্ত দলের লোকটিকে নির্দেশ দিলেন যে, তাকে কঠিনতম শাস্তি দেয়া হোক।

কিন্তু মাহ্‌দীর এই পদক্ষেপ সাময়িকভাবে কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে যদিও স্বার্থক ছিল, কিন্তু অধিক সময় পর্যন্ত স্থায়ী ছিল না। ইহার কারণ খুবই স্পষ্ট। অর্থাৎ যে সব কারণে (যিন্দেকাহ্‌) অধর্ম ও (الحاد) কুফ্‌রী সৃষ্টি হতে ছিল উহার মুলোৎপাটনের দিকে কোন দৃষ্টি দেয়া হয়নি। রাজমহলের অন্দরে কিশোর ও কিশোরী দাস-দাসীদের কার্যকরী দখল বৃদ্ধি পাচ্ছিল। রাজদরবারে ভ্রান্ত বিশ্বাসী ও আজমী (অনারব)-দের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সাধারণ জনসভা ও 'দরবারে' আবু নুওয়াস' এবং 'বাশ্‌শার ইবনে বুরদ'-এর মত লাগামহীন (যিন্দীক) বিধর্মী-'কবিরা বেলেল্লাপণার প্রেরণা ও উৎসাহ সৃষ্টি করছিল। মাদ্রাসা ও মক্তবসমূহে কুরআন-হাদীসের শিক্ষার মুকাবিলায় দর্শন

ও বুদ্ধিভিত্তিক বিদ্যার পৃথক পাঠাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিলাসিতার সামগ্রী ও উপকরণের আধিক্যে যৌবনকালের আনন্দ উপভোগের আশা অন্তরে জাগ্রত করে দিত। সংরক্ষক নিজেই যদি মদ্যপায়ী পীরের হাতে বায়আত (আনুগত্যের শপথ) করে, তবে মদের ঘরের দরজায় তালা লাগাবে কে?

اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا -

فلا تلم الاولاد فيه على الرقص

"যখন গৃহের কর্তা নিজেই তবলাবাদক হয়, তখন ঘরের ছেলে-মেয়েদেরকে নাচের জন্যে তিরস্কার করা অনুচিত।"

আল্লামা খতীব বাগদাদী তাঁর নিজের লেখা ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের প্রারম্ভেই বাগদাদের অবস্থা সম্পর্কে অনেক মুহাদ্দিস ও আল্লাহ্‌ভক্ত আলেমের বহু বাণী ও কিতাবগুচ্ছ বর্ণনা করেছেন। এতে স্পষ্ট ধারণা জন্মে যে, খেল্‌-তামাশা ও আনন্দ উল্লাসের রঙ্গিন পরিবেশেও তখনকার দিনে আল্লাহ্‌র অনেক পবিত্র বান্দা তথায় বর্তমান ছিলেন। যাঁরা আল্লাহ্‌ভীরুতা, পবিত্রতা এবং (ثقاهت) নির্ভরযোগ্যতার জীবনযাপন করছিলেন। তৎকালীন বিরাজমান অবস্থার উপর তাঁরা খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন।

মিসরে দ্বিতীয়বার আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠা

তাতারীদের ফিতনার প্রবল হওয়ায় বাগদাদে আব্বাসী খিলাফতের প্রদীপ নিভে গিয়েছিল। সাড়ে তিন বছর অর্থাৎ ১৪ই সফর, ৬৫৬ হিজরী থেকে-রজব, ৬৫৯ হিজরী পর্যন্ত বাগদাদে খিলাফতের আসন সম্পূর্ণ খালি ছিল। আবুল কাসেম আহমদ, জাহের-বি আমরিল্লাহর ছেলে ও খলীফা মুসতান'সিরের চাচা এবং মুসতানসিরের ভাই ছিলেন। তিনি বাগদাদে মুসতা'সিম বিল্লাহর হত্যার সময় বন্দী ছিলেন। কোন ক্রমে মুক্তি পেয়ে কয়েকজন লোকের সঙ্গে ইরাক আসেন। অতঃপর মিসরে গমন করেন। সুলতান রুকনুদ্দীন বিবরাস্‌ কাজী তাজুদ্দীন, মন্ত্রীবর্গ, উলামাবৃন্দ এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে আবুল কাসেম আহমদকে স্বাগতম জানালেন। আনন্দের আতিশয্যে সমস্ত শহরের

বড় বড় মদের পাত্র সুসজ্জিত করা হল। ১৩ই রজব, সোমবার দিন শাহী মিলনায়তনে এক বিরাট জনসমাবেশ হল। এই সমাবেশে সুলতান আবুল কাসেম আহমদ ব্যতীত উলামা, মন্ত্রীবর্গ এবং আমীরগণ নিজ নিজ পদ মর্যাদা অনুযায়ী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই সমাবেশে কাজী তাজুদ্দীনের নিকট যখন সঠিক তথ্য জানা গেল যে, আবুল কাসেম সত্যিকারভাবেই বংশ পরিচয়ের দাবীতে ঠিক এবং প্রধান বিচারপতিও যখন দাঁড়িয়ে উহার সত্য স্বীকার করলেন, তখন সর্বাগ্রে শায়খুল ইসলাম ইযুযুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম আবুল কাসেমের হাতে খিলাফতের বায়আত বা আনুগত্যের শপথ করেন। অতঃপর সুলতান রুকুনুদ্দীন। তৎপর কাজী তাজুদ্দীন এবং সমাবেশে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সকলই "বায়আত" করেন। তিনি তাঁর ভাইয়ের উপাধি অনুসারে স্বীয় উপাধি 'মুস্তান্‌সীর বিল্লাহ' রাখেন। জুমার খুৎবার এবং রাষ্ট্রীয় স্বীয় মোহরে তাঁর নাম প্রচলিত হয়ে গেল। এমনিভাবে মিসরে দ্বিতীয়বারের মত আব্বাসী খিলাফতের প্রতিষ্ঠা হল।

১৭ই রজব, জুমার দিনে এক শান্ত পরিবেশে তিনি জাঁকজমকের সাথে জামে মসজিদে আগমন করেন। নামাযান্তে বনী আব্বাসের সম্মান ও মর্যাদার উল্লেখপূর্বক এক ভাষণ দান করেন। সুলতান রুকুনুদ্দীন বিব্‌রাসের জন্যে দু'আ করা হল। অতঃপর মিম্বর থেকে নেমে নিজেই নামায পড়লেন। উপস্থিতি মুসলমানগণ এই দৃশ্য অবলোকন করে খুবই প্রভাবান্বিত হলেন। পরবর্তী মাস অর্থাৎ ৪ঠা শা'বান, কাহেরা নগরের বাইরে এক মাঠে বিরাট তাঁবু ফেলা হল। খলীফা সুলতান, মন্ত্রীবর্গ, রাজ দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে' এক অভিষেক অনুষ্ঠানে মিলিত হলেন। খলীফা নিজ হাতে সুলতানকে কাল জামা ও কাল পাগড়ী পরিধান করিয়ে দিলেন। অতঃপর সমগ্র ইসলামী রাজ্যের আইন শৃংখলা এবং যাবতীয় কাজকর্মের ভার রুকুনুদ্দীন বিব্‌রাসের উপর ন্যস্ত করে "আমীরুল মু'মিনীন" উপাধিতে ভূষিত করেন। (হুসনুল মুহাবিরা গ্রন্থের ২য় খন্ড, ৪৪-৪৫ পৃঃ দ্রঃ)

এতে সন্দেহ নেই যে, সম্মানিত উলামা ও সুলতান অপরিসীম ধর্মীয় প্রেরণার সাথে খিলাফতকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। তাঁরা এই সত্যটাকে

খুব ভাল করেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিশ্বের মুসলমানদেরকে একই কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে একত্র করার জন্য খিলাফত প্রতিষ্ঠা খুবই প্রয়োজন কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, খিলাফত তো শুধু নামে মাত্র ছিল। এতে ইসলামী খিলাফতের প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনই অর্জিত হতে পারে না—যা উল্লিখিত অভিষেক অনুষ্ঠান থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল। খলীফার প্রভাব প্রতিপত্তি এবং তাঁর রাজনৈতিক শক্তি-সামর্থ্যের কথা ও উল্লিখিত ঘটনা থেকে সহজেই অনুমেয় যে, সুলতান রুকনুদ্দীন বিব্রাসের দয়া-দাক্ষিণ্যেই খিলাফতের সিংহাসন তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল। খলীফা নিজেই রুকনুদ্দীনকে 'আমীরুল মু'মিনীন' উপাধি প্রদান করলেন। অথচ এই উপাধি একমাত্র খলীফা ব্যতীত অন্য কারো জন্যে উপযুক্ত ছিল না। অতঃপর সমগ্র ইসলামী রাজ্যের যাবতীয় কাজকর্ম ও আইন শৃংখলার দায়িত্ব ভার সুলতানের উপর ন্যস্ত করে নিজে দায়িত্বহীন খলীফা রয়ে গেলেন। যেন ভাবখানা এই যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে খলীফার কোন দায়-দায়িত্ব এবং করণীয় কিছুই নেই। মুসতান্সির বিল্লাহ নামে মাত্র খলীফা ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রুকনুদ্দীন বিব্রাসই সমস্ত ক্ষমতার মালিক ছিলেন। খলীফার অবস্থা শুধু 'তাবারুক'-এর ন্যায় ছিল। তাঁর অস্তিত্ব শুধু পুরানো কালের কোন 'রুসমী স্মরণীয় বিষয়ের মত ছিল। ইসলামের অন্যান্য দেশ ও বাদশাহর উপর এমন খলীফার কি প্রভাব থাকতে পারে? খোদ মিসর দেশেই তাঁর কোন প্রভাব ছিল না।

সুলতান রুকনুদ্দীন ব্যক্তিগতভাবে একজন উন্নত চরিত্রের মুসলমান ছিলেন। এইজন্য তিনি তাঁর জীবদ্দশাতে খিলাফতের অস্তিত্বকে প্রকৃতপক্ষেই সম্মান করতেন। কিন্তু একই তলোয়ারের কোষে দু'টি তলোয়ারের স্থান সংকুলান হওয়ার কথা নয়। পরিণামে সুলতান রুকনুদ্দীন বিব্রাসের কয়েক বছর পরেই আব্বাসীয় তৃতীয় খলীফা—প্রথম মুসতাকফি-বিল্লাহকে (৭০১—৮৪০ হিঃ) মিসরের সুলতান 'মুহাম্মদ ইবনে কালাউন' কোন কারণে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হায় ৭৩৬ হিজরীতে برج قصر 'বুরজে কাস্' অর্থাৎ শাহী বালাখানা নজরবন্দী করে জনগণকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করে দেন। অতপর ৭৩৭ হিজরীতে তাঁকে পরিবারবর্গসহ

কাহারা নগর থেকে বহিস্কার করে 'কাওস্' নামক স্থানে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর নির্দেশ জারী হল যে, খুৎবায় খলীফা মুস্তাক্ফির নাম পাঠ করা চলবে না। পরিশেষে ৭৪০ হিজরীতে শা'বান মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

খলীফা মুস্তাক্ফি বিল্লাহ মৃত্যুকালে ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন যে, তাঁর পর তাঁর ছেলে আহমদকে যেন খলীফা নির্বাচন করা হয়। কিন্তু মিসরের সুলতান এর প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। হাকিম-বি-আমরিল্লাহ পৌত্র ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদকে 'ওয়াসিক বিল্লাহ' উপাধি দিয়ে খলীফা বানিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর খিলাফতও নামে মাত্র ছিল। খুৎবায় পর্যন্ত তার নাম নেয়া হত না। মুহম্মদ ইবনে কালাউনের পর তাঁর ছেলে সাইফুদ্দীন আবুবকর মিসরের সুলতান হলেন। তিনি ৭৩১ হিজরীতে সাধারণ পরিষদের এক সভা করলেন এবং প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে ওয়াসিক বি-আমরিল্লাহকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে আহমদ ইবনে মুসতকফীকে খলীফা বানালেন।

মোটকথা মিসরের আব্বাসী খলীফাকে মিসরের সুলতানের অনুগ্রহের উপরই বেঁচে থাকতে হত। তিনি কোন প্রকার রাজনৈতিক ক্ষমতারও মালিক ছিলেন না। খলীফা সুলতানের প্রভাব প্রতিপত্তির সামনে ছেলে-খেলার পুতুল তুল্য ছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সময় হাস্যস্পদ ও লজ্জাজনক অনেক ঘটনার অবতারণা হত। সুতরাং মিসরের আব্বাসী খলীফাদের ৭ম খলীফা মুতায়াক্কেল আলাল্লাহ্র সঙ্গে এইরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। ৭৬৩ হিজরীতে মুতাওয়াক্কেল খলীফা হলেন। কিন্তু মিসরের সুলতান। তাঁর প্রতি একটি খারাপ ধারণা পোষণ করার কারণে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই তিনি খলীফাকে নজরবন্দী করে 'কাওস' নামক স্থানে পাঠিয়েছিলেন। আর তাঁর স্থলে যাকারিয়া ইবনে ওয়াসিককে খলীফা নির্বাচন করে মুতাসিম। উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু এই খিলাফত অনিয়মতান্ত্রিকভাবে এমন আশ্চর্য রকমের ছিল যে, খলীফার হাতে সকলের বায়আতও হয়নি এবং তাঁর প্রতি সর্বসাধারণের কোন সম্মতিও ছিল না। পরিশেষে ১৫ দিন পরেই মুতাওয়াক্কেলকে খলীফা হিসেবে কাহেরায় পুনরায় আহবান করা হল।

অষ্টম খলীফা মুস্তাঈন বিল্লাহ খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং শক্তি সাহসের অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি বীরত্বের সঙ্গে কদম বাড়ালেন

এবং মিসরের সুলতান নাসির 'যায়নুদ্দীন ইবনে বারকোক'কে প্রথমত গ্রেফতার করেন এবং পরে হত্যা করেন। এর ফলে মিসরের সিংহাসনও তাঁর দখলে এসে গেল। যে মুসলমানগণ খিলাফত হারিয়ে অন্তরে ব্যথানুভব ও আক্ষেপ করছিল এতে স্বভাবতই তাদের আনন্দিত হওয়ার কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাদের এই খুশী বেশী দিন স্থায়ী হতে পারেনি। আমীর শায়খ মাহদী তখন খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেন এবং মুস্তাঈন বিল্লাহকে খিলাফতের ও সালতানাতের উভয় আসন থেকে অপসারণ করে এক দুর্গে নজর বন্দী করে রাখেন। তাঁর ভাই দাঊদ ইবনে মুতাওয়াক্কেলকে খলীফা বানিয়ে নিজেই মিসরের সুলতান হয়ে বসলেন। মুস্তাঈন বিল্লাহর পরেও কয়েকজন খলীফা মিসরের রাজসিংহাসন অধিকার করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা সফলকাম হতে পারেন নি। এই প্রচেষ্টা এমনিভাবে চলতে ছিল। পরিশেষে ৯২৩ হিজরীতে সুলতান সালিম আউয়াল মিসর জয় করেন। তখন থেকে বাদশাহীর সাথে সাথে খিলাফতেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি নিজে নিজেই খলীফা বনে গেলেন। সেদিন থেকেই খিলাফত বনী আব্বাসীয়দের হাতছাড়া হয়ে উসমানী বংশে চলে গেল।

বাগদাদ এবং মিসরে আব্বাসী খিলাফতের ইতিহাসের উপর একটু হালকা দৃষ্টি দিলে এই সত্যটি প্রকাশিত হয় যে, ইসলাম যেহেতু একমাত্র দিন বা জীবন ব্যবস্থা—সেইহেতু তা কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যখনই কোন একদিন থেকে দুর্বলতা এবং অধঃপতন সৃষ্টি হয়েছে, তখন স্বল্প সময়েই হউক কিংবা দীর্ঘসময়েই হউক কোন না কোন দিক থেকে এর ক্ষতিপূরণ হয়েছে। অতএব খিলাফত যখনই নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে এবং ইসলামের রাজনৈতিক কেন্দ্রীয় শক্তি রক্ষার কোন উপযুক্ত লোকের অভাব ঘটেছে, তখনই আল্লাহ তা'আলা এর দুর্বলতার প্রতিকারকল্পে খিলাফতের ছত্রছায়ার অন্যান্য রাজত্ব এবং বাদশাহীর সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তাঁরা খিলাফতের দায়িত্ব অতি উত্তমরূপে সম্পন্ন করেছেন। সুতরাং আফ্রিকার 'আগালিবাহ' সম্প্রদায়, যাদের বীর পুরুষ ছিলেন যিয়াদাতুল্লাহ আগলাবী তিনি রোম সাগরের প্রসিদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ 'সাইপ্রাস' বিজয় করেন। সালজুকীরা এশিয়া মাইনরের খৃস্টান শাসকদেরকে পরাজিত করে তথায়

তাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। আইয়ুবী বংশের বীর পুরুষরা ক্রুসেডারদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং শাম থেকে বিতাড়িত করেন। গজনী ও ঘোরী বংশের বীর পুরুষরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের উপর তাদের আধিপত্য ও প্রাধান্য বিস্তার করেন। অতঃপর খিলাফত যখন মিসরে স্থানান্তরিত হয়ে গেল তখন সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের দাস-বংশের শাসকগণ তাতারীদের ফিতনা বা গন্ডগোলকে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়ে অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রায় আড়াই শত বছর পর্যন্ত তাঁরা পাশ্চাত্যের ইসলামী কেন্দ্রদ্বারের অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন।

উসমানী বংশ

সুলতান সালিম আউওয়াল ৯২৩ হিজরী মিসর জয় করেন এবং সেখান থেকে 'খিলাফত' ও 'সালতানাত উভয়েরই পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা উসমানী বংশে নিয়ে এলেন। ৬৯৯ হিজরীতে এই বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তুর্কীস্থানের 'তুগরল' নামী এক আমীরের বড় ছেলে উসমান খান আউয়াল, সালজুকী রাজত্বের রাজধানী কাওনীয়ায় সালজুকী বংশের শেষ সুলতান দ্বিতীয় আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। এমনিভাবে যেন সালজুকী রাজত্বের ধ্বংস স্তুপের উপর উসমানী বংশের রাজত্বের সুউচ্চ প্রাসাদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হল। প্রথমত এই রাজত্ব একটি অতি ছোট আমীর শাসিত রাজ্য ছিল এবং এর আশে-পাশে আরো তেরটি ছোটখাট রাজ্য এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছিল।

প্রথম উসমান খানের চরিত্র

প্রথম উসমান খান খুবই বীর পুরুষ, উচ্চাভিলাসী, সৎকর্মী এবং ইসলামের প্রকৃত দরদী ছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই এশিয়া মাইনরের রোমী আমীরদেরকে ফরমান পাঠালেন যে, আপনারা হয়ত ইসলাম গ্রহণ করুন, অথবা 'জিযিয়া' (বশ্যতাসূচক কর) প্রদান করুন। এতেও রাযী না হলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউন। এর ফলে অনেক আমীর প্রকৃতপক্ষেই ইসলাম গ্রহণ করেন। অনেকে 'জিযিয়া' প্রদান করতে রাযী হল আবার অনেকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। উসমান খান ঐ সব আমীরদের বিরুদ্ধে স্বীয় পুত্র 'আওয়ার খান'-এর তত্ত্বাবধানে এক বীর সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তাতারীদের পক্ষ হতে শত্রুদের অনেক সাহায্য সহযোগিতা মিলল বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পরাজিত হতে লাগল। কিন্তু প্রথম উসমান খানের কীর্তির মাঝে এই সব বিজয় গৌণ ছিল।

তাঁর প্রধান লক্ষ্যস্থল 'বাজেন্টাইন' রাজত্বর দিকে ছিল। বাজেন্টাইনীদের সাথে তাঁর দশ-বার বছর পর্যন্ত যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল। পরিশেষে তিনি বাজেন্টাইনীদের রাজত্বের গুরুত্বপূর্ণ দুর্গে একের পর এক জয় করে কৃষ্ণ সাগরের উপকূলীয় অঞ্চল পর্যন্ত দখল করেন। 'শাহরিনী' অধিকার করে তাকে স্বীয় রাজ্যের রাজধানী করেন। ৭১৭ হিজরীতে এশিয়া মাইনরের মধ্যে বাজেন্টাইনী রাজত্বের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বরোসা নগরী অবরোধ করেন। এই অবরোধ দশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

৭২৭ হিজরীতে দুর্গের অধিবাসীরা রোম সম্রাটের নির্দেশক্রমে এক রাতে সুযোগ পেয়ে দুর্গ থেকে পলায়ন করল। এদিকে তুর্কী সৈন্যরা নগরে প্রবেশ করল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, উসমান খান তখন এই বিজয়ের শুভ সংবাদ মৃত্যু শয্যায় থেকে শুনলেন। আওয়ার খান' বিজয়ের এই শুভ সংবাদ নিয়ে পিতার নিকট উপস্থিত হলেন, তখন পিতা ছেলের রূপ বীরত্ব ও হিম্মত দেখে তাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করলেন। তিনি ওসীয়ত করে গেলেন যে, 'হে বৎসর'! ভিতর ও বাহির সর্বদা একরকম রাখবে। প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌র ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখবে। মানুষের উপর সদা অনুগ্রহ করবে। অধিকার আদয়ের ব্যাপারে শক্তিশালী ও দুর্বল উভয়ের দিকে একই দৃষ্টিতে দেখবে। কিতাব ও সুন্নাহ্‌কে নিজ কর্মের আদর্শ বানাবে। ইসলামের প্রচার ও প্রসার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। শরীয়তের হুকুম থেকে কখনও বিমুখ হবে না। অতঃপর ছেলেকে বললেন, আমার মৃত্যুর পর আমাকে 'বরোসা'তেই দাফন করবে।' সুতরাং তাঁর ওসীয়ত অনুসারে তাঁকে বরোসাতেই দাফন করা হল এবং তাঁর কবর স্থানের উপর এক বিরাট সৌধ নির্মাণ করা হল। উসমানী বংশের রাজত্বকাল ৬৯৬ হিজরী থেকে ১৩৪২ হিজরী পর্যন্ত যখন এই বংশের শেষ শাসক সুলতান দ্বিতীয় আবদুল মাজিদকে অপসারণ করে খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটানো হল, তখন তাদের রাজত্বের বয়স হয়েছিল ৬৪৩ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে ৩৭জন শাসক অতিবাহিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮৮৬ হিজরী থেকে ৯১৮ হিজরী পর্যন্ত সুলতান বায়জীদ দ্বিতীয় সহ আট জন শাসককে সুলতান বলা হত। প্রথম সুলতান সালিম নিজকে খলীফা বলে, ঘোষণা দিলেন। তৎপর তাঁকে এবং পরবর্তী শাসককেই উসমানী খলীফা বলা হতে লাগল।

ক্রমাগত বিজয় এবং ইউরোপে ইসলামের প্রবেশ

উসমান খানের মৃত্যুর পর ও বিজয়ের ধারা থেমে যায়নি। বরং তিনি বাইজেন্টাইনী রাজত্বের খতম করে, ইসলামকে ইউরোপে বিজয়ের বেশে প্রবেশ করানোর যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করেছিলেন, তার যোগ্য উত্তরাধিকারীরা তারপরেও সেই বিজয়ের ধারা প্রচলিত রাখেন। অবশেষে তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলে বিরাট সফলতা অর্জন করেন। অতএব উসমান খানের ওসীয়ত অনুযায়ী তাঁর ছেলে আওয়ার খান' রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অভ্যন্তরীণ শৃংখলা ও সংস্কার সাধন ছাড়াও ইউরোপের দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি রাখেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুযোগ পেয়েই তিনি গিলিপোলীর উপর অধিকার বিস্তার লাভ করেন। ইহা দানিয়ালের উপকূলবর্তী অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিরাট দুর্গ ছিল। বিজয়ের পূর্বে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের কারণে গিলিপোলী নগর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আওয়ার খান নিজের বড় ছেলে সুলায়মান পাশার দ্বারা ঐ নগর পুনরায় গড়ে তুলেন। অতঃপর সেখানে তুর্কী সৈন্যদের এক বিরাট সেনা ছাউনী স্থাপন করেন। তৎপর আরো বিভিন্ন স্থান জয় করেন এবং আরব ও তর্কীদের বহু নাগরিককে এই সব বিজিত স্থানে এনে নতুন বসতি স্থাপন করেন।

উসমানী রাজত্বের সম্মানিত লেখক মুহাম্মদ আযীয সাহেব, (এম, এ,) বলেন যে, 'গিলিপোলীর' বিজয় তুর্কীদের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ৭৫৫ হিজরী মুতাবিক ১৩৫৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা প্রথম বারের মত বিজয়ীর বেশে ইউরোপে প্রবেশ করেন। খ্রীস্টানদের দেশ ইউরোপে ইসলামের এক বিরাট রাজ্য গড়ে তুলেন। দুশো বছরের মধ্যে 'গিলিপোলী' থেকে 'দিয়ানার' প্রাচীর পর্যন্ত এই রাজ্য বিস্তার লাভ করল। প্রথম যুগের মুজাহিদগণ সত্য ধর্মের বাণী দ্বারা পশ্চিম ইউরোপকে ধন্য করেছিল এবং তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোতে তাদের মূর্খতার অন্ধকার দূরীভূত করেছিল কিন্তু পূর্ব ইউরোপে তখনও অজ্ঞতার অন্ধকার বিদ্যমান ছিল। তাই সেখানের ভূমি হিদায়েতের এক উজ্জ্বল আলোক শিখার অপেক্ষায় ছিল। হিদায়েত প্রদানের সৌভাগ্য উসমানীয়দের জন্যেই আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। আরব মুজাহিদগণ পশ্চিম ইউরোপে যেভাবে

হিদায়েতের পরিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে তুর্কী মুজাহিদগণ ও পূর্ব ইউরোপে সেইরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন।

আওয়ার খান বিভিন্ন বিজয় এবং রাষ্ট্রীয় ও সেনা-বিভাগের শৃংখলা রক্ষা করে বাজেন্টাইনী রাজত্বকে এমন প্রভাবান্বিত করেছিলেন যে, কানস্টান্টিনোপলের রাজত্ব—যা হযরত আমীর মুয়াবীয়া (রাঃ)-এর যুগ থেকে তখন পর্যন্ত মুসলমানদের শত্রু ছিল, উহার সম্রাট 'কন্টাকাওযীন' উসমানীয় রাজত্বের সঙ্গে স্বীয় বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করার উদ্দেশে নিজের যুবতী কন্যা থিউডোরাকে আওয়ার খানের সাথে বিবাহ প্রদানের প্রস্তাব করেন। আওয়ার খান এই প্রস্তাব সমর্থন করে তাকে বিয়ে করেন এবং রাজকন্যাকে স্বীয় খ্রীস্টান ধর্মে বহাল থাকতে অনুমতি প্রদান করেন।

আওয়ার খান একজন অসাধারণ বীর পুরুষ, উচ্চাকাংক্ষী ও হিম্মতের অধিকারী হওয়া ছাড়াও তিনি খুবই সৎ চিন্তাশীল এবং শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসারী ছিলেন। তিনি জনস্বার্থে অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, সেতু, লঙরখানা ইত্যাদি নির্মাণ করেন। এই সব ফার্মের সংখ্যা চার হাজারের ও অধিক হবে। ৬৫০ হিজরীতে ৮২ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

সুলতান মুরাদ আউয়াল

আওয়ার খানের বড় ছেলে সুলায়মান পাশা শিকারের সময় ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যু বরণ করেন। অতএব তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই ছোট ছেলে সুলতান মুরাদ আউয়াল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও বাপ-দাদার প্রচলিত কার্যক্রম যথার্থই ঠিক রাখেন। তিনি তাঁর চার-পাশের আমীর যাঁরা আঙ্গুরার আমীর আলাউদ্দীনের উস্কানীতে উসমানী বংশের শক্তিকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করছিল, তাদেরকে পরাস্ত করেন। 'আঙ্গুরার উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। অতঃপর নুমায়েবালকান দ্বীপের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং আওয়ারনা বিজয় করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন।

সেই সময় বাজেণ্টাইনী রাজত্ব এবং অন্যান্য খৃীস্টান রাজ্যের মধ্যে পরস্পর গৃহ-যুদ্ধ চলছিল। সুলতান মুরাদের বিজয় কার্যক্রম এবং সেনা-বিভাগের ও রাষ্ট্রীয় সুদৃঢ়তা দেখে তাদের মাঝে ভয়ের সঞ্চার হল। এই সমস্ত বিধর্মী শক্তি পোপের আহবানে একত্র হল। ক্রুসেড ও খৃীস্টান ধর্মের নামে তাঁরা সুলতান মুরাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল। সুলতান মুরাদ তখন বিজা-নগর অবরোধ করে এশিয়া মাইনরে অবস্থান করছিলেন। বিরোধী মিত্র বাহিনীরা এই সংবাদ পেয়ে কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ ইউরোপের দিকে যাত্রা করল। কিন্তু তাদের সেখানে পৌঁছার পূর্বেই মুরাদের বীর সেনাপতি লালা শাহীন-মুরতাজা-নদীর তীরে উপনীত হয়ে মিত্র বাহিনীর সৈন্যদের উপর যখন তারা-কাবাব ও মদ্য পানে বিভোর ছিল, তখন রাত্রিতে এমন সকল আক্রমণ চালাল যে, মৃতদেহের এক বিরাট স্তুপ হয়ে গেল। আর যারা বেঁচে ছিল তারা কোনক্রমে পলায়ন করল।

৭৮০ হিজরীতে বুলগারীয়ার শাসক শাহ শারদীয়াকে নিজের সঙ্গে একত্র করে পুনরায় সুলতান মুরাদের শক্তি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে আগমন করল। কিন্তু উভয়েই অতিশীঘ্র নিজেদের দুর্বলতা অনুভব করতে পেরে যুদ্ধ না করে বাৎসরিক এক বিরাট অংকের মুদ্রা কর হিসেবে প্রদানের শর্তে সুলতান মুরাদের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হলেন। বুলগারীয়ার সম্রাট বন্ধুত্ব আরো জোরদার করার উদ্দেশ্যে স্বীয় ভগ্নীকে সুলতানের সঙ্গে বিয়ে দেন।

৭৯১ হিজরীতে বিরোধী মিত্র বাহিনীর মধ্যে সারদীয়া. বোসিনা, বুলগারীয়া, আলবেনীয়া, হাঙ্গেরী এবং পোল্যাণ্ড ইত্যাদি রাজ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁরা সকলে একত্র হয়ে দু'লক্ষ সৈন্যের একটি সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে তুর্কীদেরকে ইউরোপ থেকে বহিষ্কারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন। সুলতান মুরাদ তখন খুবই বৃদ্ধ হয়ে পড়ে ছিলেন, তথাপি তাদের মুকাবিলার জন্যে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করলেন। কাসুদা মরুভূমিতে ভীষণ যুদ্ধ হল। কিন্তু বিরোধী মিত্র বাহিনীরা তখনও শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হল। শাহ্ সারদীয়া লাযার গ্রেফতার হয়ে সুলতানের সামনে নীত হলে বার-বার সন্ধি ভঙ্গের অপরাধে তিনি তাকে হত্যা করেন।

এই যুদ্ধের পর থারিস, মাক্‌দুনিয়া এবং পশ্চিম বুলগারিয়ার সমগ্র এলাকা উসমানীয়া রাজত্বের অধিকারে আসল। সারবীয়া এবং সিনাবাজ বিশ্বাসঘাতকের রাজত্বে পরিণত হল।

এখনও কাসুদার যুদ্ধ শেষ হয়নি। এমন সময় খঞ্জরধারী এক দুষ্কৃতি-কারী প্রতারণা করে সুলতান মুরাদের উপর আক্রমণ করে তাঁকে আহত করল। সুলতান কিছুদিন কষ্ট ভোগের পর ইন্তিকাল করেন। এখানেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সুলতান বায়যীদ ইল্‌দেরাম

কাসুদার যুদ্ধে সুলতান মুরাদ-আউয়ালের বড় ছেলে বায়যীদ অসাধারণ বীরত্ব ও বাহাদুরীর পরিচয় প্রদান করেন। এ কারণেই তাঁকে ایلدرم ইল্‌দেরাম’ অর্থাৎ ‘বিদ্যুৎ গতি’ উপাধি প্রদান করা হয়। পিতার ইন্তিকালের পর কাসুদা প্রান্তরেই আমীরগণের এবং রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত রায়ে তিনি রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতান বায়যীদ ইল্‌দেরাম সিংহাসনে আরোহণ করেই প্রথমে আপন ছোট ভাই ইয়াকুব পাশাকে যিনি কাসুদার যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব ও হিম্মতের পরিচয় দিয়েছিলেন, শুধু এই ধারণার বশবর্তী হয়ে হত্যা-করেন যে, সেই শাহ্‌যাদা-নাকি রাজ সিংহাসনে আরোহণের আশা পোষণ করেছিলেন এবং এতে তার সমূহ ক্ষতি হওয়ার আশংকা ছিল। উসমানী বংশ বড় ভাইয়ের হাতে ছোট ভাইকে শুধু রাজ সিংহাসনের জন্যে হত্যার দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম। এই কার্যের বদনাম তাঁর ললাটে কলংক হয়ে থাকবে।

এই একটি মাত্র কলংক ব্যতীত সুলতান ইল্‌দেরাম রাজ্য জয়ের ব্যাপারে যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা-নিঃসন্দেহে ইসলামের বিভিন্ন বিজয়ের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। তিনি সারবীয়ার নিহত বাদশাহর পর তাঁর ছেলেকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন এবং বার্ষিক নির্ধারিত কর প্রদান ব্যতীতও শর্ত আরোপ করেন যে, সারবীয়ার বাদশাহকে পাঁচ হাজারের

একটি সেনা বাহিনীকে নিজ খরচে লালিত-পালিত করে সুলতানের জন্য ওয়াকফ্ করে রাখতে হবে। সারবীয়ার বাদশাহ্ এই শর্তও পূর্ণ করেন। সুলতানের অধিক প্রিয় পাত্র হওয়ার জন্য স্বীয় ভগ্নী শাহ্যাদী ডীস্পীনা কে সুলতানের সঙ্গে বিয়ে দেন। সারবীয়ার সঙ্গে এমনিভাবে সম্পর্ক জোরদার করার পর সুলতান বায়যীদ কনস্টান্টিনোপলের দিকে মনোনিবেশ করেন। পরিশেষে তিনি রোম সম্রাটকে আরো একটি নতুন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরের জন্য বাধ্য করেন। এতে সম্রাটের অবশিষ্ট পদমর্যাদা ও ভূলুণ্ঠিত হল। এশিয়া মাইনের বাজেন্টাইনী রাজত্বের শুধু একটি অধিকৃত দুর্গ ফালাড্লফিয়া বাকী ছিল। সন্ধির ফলে তাও সুলতান বায়যীদের দখলে এসে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতে এটা খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, ফালাডলফিয়া দুর্গ যা সন্ধির ভিত্তিতে বায়যীদের স্বত্বাধিকার হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দুর্গের গ্রীক সর্বাধিনায়ক রোম সম্রাটের নির্দেশ মানতে এবং উহা বায়যীদের দখলে দিয়ে দিতে অস্বীকার করল। সুলতান বায়যীদ সম্রাটকে বললেন, আপনি নিজে আপনার সৈন্য পাঠিয়ে দুর্গ দখল করুন এবং তৎপর উহা আমার হস্তগত করুন। অতএব সম্রাট তাঁর কথামত প্রথমতঃ দুর্গ দখল করে এবং পরে সুলতানের হস্তগত করেন। প্রকাশ থাকে যে, উসমানী রাজত্বের সামনে বাজেন্টাইনী রাজত্বের এমন অসহায় অবস্থার চেয়ে অধিক আর কি হতে পারে? তারপরও এতে যথেষ্ট হয়নি বরং কনস্টান্টিনোপল সম্পর্কে রোম সম্রাটের নিকট হতে এই মর্মে অঙ্গীকার নিলেন যে, কনস্টান্টিনোপলের একটি এলাকা মুসলমানদের বসবাসের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। শহরে একটি জামে মসজিদ নির্মাণের জন্য তাঁকে অনুমতি দিতে হবে এবং তাদের সমস্যা সমাধানের ও বিবাদ মীমাংসার জন্যে পৃথক আদালতে বিচারক নিয়োগ করতে হবে। তা ছাড়াও শহরের বাহিরে আঙ্গুরের বাগান এবং তরি-তরকারীর শস্য ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের ১/১০ উশর উসমানী রাজ ভান্ডারে জমা দিতে হবে। বলা হয় যে, সেই সময় থেকেই উসমানিগণ 'কনস্টান্টিনোপলকে ইস্তাম্বুল বলতে শুরু করল।

বিভিন্ন বিজয়

তখন পর্যন্ত বায়যীদ যুদ্ধ ব্যতীতই সফলতা অর্জন করেছিলেন। অতঃপর যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুক্ত তলোয়ারের খেলা দেখাবার সুযোগ এল। সারবীয়া এবং কনস্টান্টিনোপলের সাথে সন্ধি করার পর বায়যীদ-দিলাচিয়ার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং সেখান থেকেও খেরাজ আদায় করেন। এমতাবস্থায় হাঙ্গেরীর বাদশাহ সাজাসমান্ড সুলতান বায়যীদের উপর আক্রমণ করার জন্য বহু সৈন্য সমাবেশ করছিল। দিলাচিয়া-থেকে অবসর হয়ে সুলতান বায়যীদ হাঙ্গেরীর দিকে ধাবিত হলেন। বোসিনার সৈন্যরাও হাঙ্গেরীর সৈন্যদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলে ভীষণ যুদ্ধ হল। পরিণামে হাঙ্গেরীর বাদশাহ্ পরাজিত হয়ে পলায়ন করল।

৭৯৫ হিজরীতে বায়যীদ-আপন বড় ছেলে সুলায়মান পাশা-বুলগারীয়ার দিকে প্রেরণ করেন। উহার দক্ষিণাঞ্চল সুলতান মুরাদের রাজত্বকালেই উসমানী বংশের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। উহার উত্তরাঞ্চল বিজয়ের বাণী ছিল। অতঃপর সমগ্রদেশই উসমানী রাজত্বের অধিকারে এল। বুলগারীয়ার শাহী খান্দান এবার শেষ হয়ে গেল। প্রধান পাদরীকে দেশত্যাগ করানো হল। সেখানকার যে সব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের ভূমি-তাদেরই দখলে দিয়ে দিলেন। অবশিষ্ট সমগ্র এলাকা সৈন্যদের মাঝে জায়গীর প্রথার মাধ্যমে-তুর্কী সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হল।

ক্রুসেডীয় একতা

বুলগারীয়া বিজয় হওয়ায় তুর্কীদের জন্য হাঙ্গেরীর পথ খুলে গেল। এই জন্য হাঙ্গেরীর বাদশাহ সাজাসমণ্ডের ভীষণ ভয় হল। তিনি ইউরোপের সম্রাটদেরকে উত্তেজিত করলেন। হাঙ্গেরী রোমের গীর্জার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। তাই পোপও ইহার প্রতি সমর্থন দিলেন এবং তুর্কীদের বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত ক্রুসেড যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন। সুলতান মুরাদের রাজত্বকালে-পূর্ব ইউরোপের সমস্ত রাষ্ট্র একতাবদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু

ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ এই যুদ্ধে কোন অংশ নিল না। এবারের অবস্থাটা অন্য রূপ হল। কেননা গ্রীক ও রোমের গীর্জার পোপগণ একতাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর এদিকে ফ্রান্স-এবং ইংলান্ডেরও সন্ধি হয়ে গিয়ে ছিল। তাই তুর্কীদের বিরুদ্ধে এই ক্রুসেডের যুদ্ধে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের সম্রাটগণ একতাবদ্ধ হয়ে গেলেন। এই ক্রুসেডের মিত্র বাহিনীর উদ্দেশ্যছিল যে, তুর্কীদেরকে হাঙ্গেরীর সীমান্ত থেকে বহিষ্কার করার পর কনস্টান্টিনোপলের দিকে ধাবিত হবেন। তৎপর দানিয়াল অতিক্রম করে-শামে-প্রবেশ করবেন এবং পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাস অধিকার করে নিবেন। এমনিভাবে সুলতান সালাহ উদ্দীন এবং সুলতান রুকুনুদ্দীন বিবরাসের প্রতিশোধ নিবেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সম্মিলিত বিরোধী-মিত্র বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় এক লক্ষ। হাঙ্গেরীর বোদাতে সকলই একত্র হল, সেখান থেকে উসমানীদের অধিকৃত স্থানসমূহের দিকে ধাবিত হল। সারবীয়ার সম্রাট সুলতান বায়ষীদকে কর প্রদান করত। তিনি তখনও উসমানী রাজত্বের প্রতি-স্বীয় আনুগত্য বহাল রাখেন। এর ফলে ক্রুসেডারগণ এই গরীব দেশের মধ্যে সীমাহীন হত্যাকান্ড ও লুন্ঠণ চালাল। অতঃপর আরো সামনে অগ্রসর হয়ে বিভিন্ন দুর্গ জয় করে সাজ্জাস্‌মান্ডের সৈন্য নাটকো পোলিসের দিকে অগ্রসর হল এবং উহাকে অবরোধ করে রাখল। কিন্তু সেখানকার বাহাদুর নেতা ইউলানবেক অস্ত্র সমর্পণ করতে অস্বীকার করল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সুলতান বায়যীদ এই শহর থেকে হাত গোটাতে পারেন না। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর সাহায্যার্থে আগমন করবেন। সুতরাং তাই হল।

সুলতান বায়যীদ এই অবরোধের সংবাদ পাওয়া মাত্রই কালবিলম্ব না করে নিজের নির্বাচিত বীর সৈনিকদেরকে নিয়ে, নাটকো পোলিস, যাত্রা করলেন। অবরোধের ১৬তম দিবসে নাটকো পোলিসে শত্রুদের উপর বিদ্যুৎ বেগে আক্রমণ করলেন।

২৩শে যিলকাদ, ৭৯৮ হিজরীতে উভয় সৈন্য দলের মধ্যে মুকাবিলা হল। যুদ্ধে শত্রুদের সম্মিলিত মিত্র বাহিনী পরাস্ত হল। তাদের হাজার হাজার সৈন্যের রক্তে যুদ্ধক্ষেত্র রঞ্জিত হয়ে গেল। প্রায় দশ হাজারের মত সৈন্য

বন্দী হল। হাঙ্গেরীর বাদশাহ্ কয়েকজন নেতার সঙ্গে কোনক্রমে পলায়ন করতে সক্ষম হল। এই যুদ্ধে বায়যীদকে সারবীয়ার সৈন্যদের দ্বারা খুবই সাহায্য পাওয়া গেল। তারা সুলতান বায়যীদের সাহায্যার্থে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করল। এই বিরাট বিজয়ের শুভ সংবাদ যখন সমস্ত ইসলামী দেশে ছড়িয়ে পড়ল, তখন সকলই খুশীর বাদ্য বাজালেন। মিসরের আব্বাসী খলীফা মুতাওয়াক্কেল আলাল্লাহ্‌ ও ইহাতে এমনভাবে আনন্দ প্রকাশ করলেন যে, বায়যীদের নামে সমগ্র বিজিত এলাকার ফরমান প্রেরণ করেন। অতঃপর আষ্ট্রিয়া, দিলাচিয়ার যারা উল্লেখিত যুদ্ধে শত্রুদের সম্মিলিত মিত্র বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে উসমানী রাজত্বের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল, এবং হাঙ্গেরী এই সবের উপর আক্রমণের জন্য বায়যীদ সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা এই সব দেশের আংশিক অধিকার করেন এবং তিনি নিজে গ্রীকের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি অতি সহজেই থাসুলী, ফোসিস, ডোরিস্‌ এবং লোকারিস্‌ অধিকার করেন। অতঃপর তাঁর দু'জন সেনাপতি ইয়াকুব এবং আফ্‌রিনুস থাক্‌নায়ে কোরস্থ অতিক্রম করে দক্ষিণ দিকে ধাবিত হন এবং সমগ্র মোরিয়া বিজয় করেন। মোরিয়ার ত্রিশ হাজার গ্রীক অধিবাসী বায়যীদের নির্দেশে এশিয়া মাইনরে স্থানান্তরিত হল। আর তাদের স্থলে তুর্কীদের নতুন বসতি স্থাপিত হল।

গ্রীকের দিক থেকে অবসর হতে না হতেই বায়যীদ সংবাদ পেলেন যে, রোম সম্রাট কনস্টান্টিনোপলে বসবাসরত মুসলমানদের উপর ভীষণ অত্যাচার শুরু করে দিয়েছেন। এই সংবাদ শুনে বায়যীদ রোম সম্রাটের নিকট দাবী উত্থাপন করলেন যে, তিনি যেন অতিসত্বর রাজ সিংহাসন ছেড়ে দেন। কিন্তু তিনি খ্রীস্টান রাষ্ট্রসমূহের সাহায্যের আশায় বায়যীদের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলেন। ফলে বায়যীদ কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করলেন।

আঙ্গুরার যুদ্ধ

হঠাৎ করে অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়ে গেল। অর্থাৎ বায়যীদ ইন্দেরাম এবং তৈমুরলংগের মাঝে ভীষণ যুদ্ধ হল। যার ফলে উসমানী রাজত্বের ভাগ্য উল্টে গেল। ইসলামের ইতিহাসে এই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের কার্যকারিতা

ইসলাম ও মুসলমানদের মাঝে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হল ? এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ভারতবর্ষের বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাওলানা আকবর শাহ্‌খান নাজীর আবাদীর একটি গ্রহণ যোগ্য প্রবন্ধকে দলীল হিসেবে পেশ করতে পারি যা ১২/১৩ বছর পূর্বে লাহোরের ‘ইনকিলাব’ পত্রিকার বর্ষপূর্তি’’ ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

৮০০ শত হিজরীতে যখন তৈমুরলঙ্গ ভারত বর্ষে আক্রমণ করেন, তখন সেখানে তুগলকদের রাজত্ব মৃতপ্রায় অবস্থায় বিরাজমান ছিল। কিন্তু এতে ইসলাম এবং ইসলামী প্রভাব প্রতিপত্তির কোন বিপদ ছিল না। স্পেনের ইসলামী রাজত্বের রাজধানী গ্রানাডা খ্রীস্টানরা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু কাসুডার বিরাট যুদ্ধ এবং বায়যীদ ইলদেরামের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের ভয়ে ইউরোপের খ্রীস্টানগণ কিছুটা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁদেরকে নিজেদের জীবনের প্রতি হুমকী স্বরূপ মনে করছিল। এর ফলে স্পেনে মুসলমানদের অস্তিত্ব আরো প্রায় দেড়শত বছরের জন্য স্থায়ী হয়ে গেল। তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি দ্বারে উপনীত হয়েছিলেন। দিল্লীর সুলতান এবং কাশ্মীর পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত সাধারণ হত্যাকান্ডে রক্তের নদী-বয়ে-গেল। পরিশেষে ভারতবর্ষে বসবাস রত প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন মুসলমান নেতাদেরকে সেখানের কর্তৃত্ব দিয়ে তৈমুরলঙ্গ স্বদেশ ফিরে গেলেন।

তৈমুরলঙ্গের প্রতিভা-চারদিক ছড়িয়ে পড়ছিল। তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, বায়যীদ ইলদেরাম ইউরোপে বিজয়ের পর বিজয় অর্জন করে চলেছেন। এই সংবাদ পেয়ে রোম সম্রাট অর্থাৎ কনস্টান্টিনোপলের খ্রীস্টান বাদশাহর দূত একটি পত্র নিয়ে তৈমুরের নিকট পৌঁছলেন। পত্রে উল্লেখ ছিল যে, ‘বায়যীদ ইলদেরামের নিকট আপনার কাছ থেকে পলায়নকারী অপরাধী সুলতান আহমাদ এবং কারা ইউছুফ তুর্কী-আরাম আয়েশ এবং শান্তি ও সম্মানের সাথে জীবন যাপন করছেন। এতে আপনার অপমান হচ্ছে। বায়যীদ আমাদের পূর্বেকার রাজ্যসমূহ ধ্বংস করে আমাদের মান-সম্মান বিনষ্ট করেছে। অথচ হারুনুর রশীদ এবং মু’তাসিম বিল্লাহর মত আব্বাসী খলীফাগণ ও আমাদের রাজ্য ধ্বংস করতে

ইচ্ছে করেন। মুসলমানগণ সদাসর্বদা আমাদের রাজ্য ও শাসন ব্যবস্থাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেছেন। উপরন্তু বায়যীদ স্বীয় সেনা বাহিনী দাগিস্থানে সমাবেশ করে রেখেছেন। তিনি অতি শীঘ্রই আজারবাইজান এবং অন্যান্য স্থান দখল করতে চাচ্ছেন। সুতরাং আপনি এদিকে আসুন নিজ দেশের সীমান্ত রক্ষা করুন এবং আমাদেরকেও এই বিপদ থেকে মুক্তি দিন।

তৈমুরলঙ্গ-থেকে আশা ছিল না যে, তিনি রোম সম্রাটের এই আবেদনের এমন নৈরাশ্যজনক উত্তর দিবেন, যেমন সাড়েসাত শত বছর পূর্বে আমীর মুয়াবীয়া (রাঃ) রোম সম্রাটকে চিঠি দিয়ে ছিলেন যে, যদি আপনার মুকাবিলার জন্য হযরত আলী (রাঃ)-কে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হয়—তবে সর্বাগ্রে যে নেতা আলী (রাঃ)-এর ঝাণ্ডতলে থেকে আপনাকে আক্রমণ করবে তিনি হবেন মুয়াবীয়া (রাঃ)। অতএব তৈমুরলঙ্গ বন্ধুত্বের টানে উত্তেজিত হলেন না, কিন্তু সুলতান আহমদ এবং কারা ইউসুফ তুর্কীর বায়যীদের আশ্রয়স্থলে চলে যাওয়াকে কোনক্রমেই সহ্য করতে পারলেন না। সুতরাং তিনি কাল-বিলম্ব না করে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে একলক্ষ ভারতীয় বন্দীকে, যারা ভ্রমণ কালে গলগ্রহের কারণ হয়েছিল তাদেরকে মুক্তির বদলে হত্যা করে ফেলেন। তিনি ভারতবর্ষ থেকে আফগানিস্তান হয়ে সমরকান্দ পেঁছিলেন। সেখান থেকে প্রস্তুতি নিয়ে ইরান হয়ে নিজ দেশের পশ্চিমাঞ্চল এবং বায়যীদের রাজত্বের পূর্ব সীমান্তে উপনীত হয়ে বায়যীদকে কঠোর ভাষায় হুশিয়ারী উচ্চারণ করে একপত্র লেখেন। বায়যীদ তখন কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করে ছিলেন। তৈমুরলঙ্গ পত্রে উল্লেখ করলেন যে, "আমাদের কাছ থেকে পলায়নকারী অপরাধী ব্যক্তিদেরকে অতিসত্বর আমাদের নিকট পাঠিয়ে দিন।" বায়যীদ আশ্রয় প্রার্থীদেরকে ফেরত দিতে পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করেন।

এইরূপ পরস্পর কথা কাটাকাটির পর ৮০৩ হিজরীতে তৈমুরলঙ্গ আরমানিয়ার দিক থেকে বায়যীদের অধিকৃত অঞ্চলসমূহে প্রবেশ করে সিবিয়াস অবরোধ করলেন। সেখানে বায়যীদের বড় ছেলে-আরতুগরল সুবাদার ছিলেন। তিনি খুবই দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি

নিহত হলেন। সিবিয়াস বিজয় হয়ে গেল। তৈমুরলঙ্গ এই যুদ্ধে-বন্দী চার হাজার তুর্কীদের সাথে এমন অমানবিক কার্য করেন যে, তাদের সবাইকে জীবিত দাফন করেছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা এমন পাষাণ্ড পাশবিক এবং বর্বতার ভয়াবহ দৃশ্য ছিল, যা'খোদ তাতারীদের অত্যাচারের কাহিনীকেও ম্লান করে দেয়।

এই সংবাদ শোনা মাত্রই বায়যীদ এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তৈমুরলঙ্গের মুকাবিলার জন্য যাত্রা করলেন। তৈমুর সিবিয়াস এর ময়দান নিজের জন্য সংকীর্ণ দেখে আঙ্গুরায় চলে আসলেন। এই স্থানেই উভয়ের সৈন্য সংখ্যা প্রায় সাত/আট লক্ষ্য ছিল। অর্থাৎ বায়যীদের সৈন্য সংখ্যার সাত গুণেরও অধিক। তৎপর ও বায়যীদ নির্ভিকচিত্তে এবং স্বীয় অসাধারণ বীরত্বের সাথে শত্রুদের মুকাবিলা করলেন। কিন্তু সৈন্য সংখ্যা কম হওয়ার সাথে সাথে আরো মুশকিল হল যে, বায়যীদের কিছু সংখ্যক-সেনাগ্রুপ বিশ্বাস ঘাতকতা করে তৈমুরের সৈন্যদলে গিয়ে মিলন। এজন্যেই এই যুদ্ধে বায়যীদের পরাজয় হল। বায়যীদ স্বীয় পুত্র মোসার সঙ্গে বন্দী হলেন। ৮ মাস তৈমুরের বন্দীশালায় থাকার পর বিনাশ্রম ও স্বশ্রম উভয় প্রকার জেল শাস্তি-থেকে একই সময় মুক্তি পেলেন।

তৈমুরলঙ্গ বায়যীদকে পরাজিত করে এবং বন্দী করেও তার প্রতিশোধের অগ্নি, বিরোধীতার বহ্নি-নির্বাপিত হয়নি। বরং তিনি ঐসব তুর্কী আমীরদেরকে যাদের রাজত্ব উসমানীয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, ঐগুলোকে স্বাধীন করে এশিয়া মাইনর থেকে উসমানীয়া রাজত্বের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে দেন। হায়-আক্ষেপ !

دل کے پھپولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے - اس گھر کو اگ
لگ گئی گھر کے چراغ سے -

বক্ষের ব্যথার মত অন্তরের অজ্ঞতার আগুন জ্বলে উঠেছে, হায় ! ঘরের প্রদীপ থেকেই ঘরে আগুন লেগেছে।''

আঙ্গুরার যুদ্ধে ইসলামের প্রতিক্রিয়া

উসমানী রাজত্বের উপর এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার কারণ ইসলামের উত্থান ও উন্নতিতে এবং ইউরোপে উহার অগ্রযাত্রার যে বিরাট ক্ষতি

হল, সম্ভবত বর্তমান অবস্থায় এর ধারণা করাও দুষ্কর। মাওলানা আকবর শাহ্‌খান নাজীর আবাদী লিখেছেন যে, বায়যীদের পরাজিত ও বন্দী হওয়ার কারণে ইউরোপে ইসলামের দৈনন্দিন উন্নতি ও প্রভাব প্রতিপত্তির খুবই ক্ষতি হল। অপরদিকে যদি তৈমুরলঙ্গ পরাজিত হয়ে বন্দী হতেন, কিংবা নিহত হতেন তবে ইহাতে শুধু তৈমুর লঙ্গের বংশেরই ক্ষতি হত। কিন্তু এশিয়ার বিশাল-ভূখণ্ডে ইসলামের কোন ক্ষতি হত না। এই যুদ্ধে বায়যীদের অপরিণামদর্শী সীমাহীন বীরত্ব এবং কিছু অদূরদর্শিতাকে অবশ্যই অপরাধ মনে করা যায়। তা'ছাড়া উসমানী রাজত্বের উপর আর কোন অভিযোগ আনয়ন করা যায় না। আঙ্গুরার যুদ্ধ সমগ্র ইউরোপকে মুসলমানদের অধীনস্থ ও পরাজিত হওয়ার অপমান থেকে রক্ষা করেছে। যদি আঙ্গুরার যুদ্ধ সংঘটিত না হত, তাহলে জাপান থেকে ইংল্যান্ড পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবী একবার ইসলামী পতাকা তলে এসে যেত।

উসমানী রাজত্বের দ্বিতীয়বার খুশীর ঢেউ

তৈমুরলঙ্গের আক্রমণ ও তার সফলতা, উসমানী রাজত্বের শরীরে এমন ক্ষতের সৃষ্টি করে ছিল যে, দৃশ্যত উহার আরোগ্যের আর কোন আশা ছিল না। এশিয়া-মাইনরে উসমানী রাজত্বের অধঃপতন ও দুরবস্থা দেখে ইউরোপের বিভিন্ন অধিকৃত স্থানসমূহে ও উহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিট্‌কে পড়তে লাগল। কিন্তু তখন ও আল্লাহ্ তা'আলার এই রাজত্ব দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরাট সেবা করানোর ইচ্ছে ছিল। তাই উহার মৃত শরীরে আবার জীবনের সঞ্চার হল। আর তারা ১০/১২ বছরের মধ্যেই স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমে ক্রমে ফিরে পেতে লাগল। সুলতান বায়যীদ ইলেদরামের পাঁচ ছেলে ছিল। তাঁদের মধ্যে একজন আরতুগরল সিবিয়াস যুদ্ধে নিহত হলেন। অবশিষ্ট চার জন পিতার মৃত্যুর পর বিভিন্ন প্রদেশে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ ছিলেন সকলের ছোট এবং সবার চাইতে অধিক বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল এবং বীর পুরুষ। পরিশেষে তিনিই সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করে' ৮১৬ হিজরীতে একাকীই উসমানী রাজত্বের একচ্ছত্র

ক্ষমতার অধিকারী হলেন। বাদশাহ হিসেবে তাঁর রাজত্বকাল ছিল মাত্র আট বছর। (৮১৬-৮২৪ হিঃ পর্যন্ত) তাঁর রাজত্বকালে যদি ও তিনি পূর্ববর্তী বাদশাহদের মত কোন উল্লেখযোগ্য বিজয় অর্জন করতে পারেননি তথাপি তাঁর এই কৃতিত্ব ও কোনক্রমেই কম আশ্চর্যজনক নয় যে, তিনি উসমানী রাজত্বের দুর্বল শরীরে নতুন করে এক সতেজ আত্মা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এশিয়া ও ইউরোপে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি এমন শক্তিশালী হয়েছিল, যেমন তৈমুরের আক্রমণের পূর্বে ছিল।

ব্যক্তিগত গুণাগুণের দিক দিয়েও মুহাম্মদ খুবই দয়াশীল, ন্যায়পরায়ণ এবং সহিষ্ণু ও ধীরস্থির ছিলেন। ৮২৪ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ

সুলতান মুহাম্মদ আউয়ালের ইন্তিকালের পর তাঁর বড় ছেলে দ্বিতীয় মুরাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। উসমানী রাজত্বের দ্বিতীবারের শক্তি সামর্থ্য ও দৃঢ়তা মুহাম্মদ আউয়ালের সময়েই হয়েছিল। এশিয়া মাইনরের কিছু সংখ্যক আমীর যাঁরা তখনও বিদ্রোহ করা থেকে বিরত হয়নি, সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ প্রথমত তাদেরকে অনুগত ও বিশ্বস্ত বানালেন। বাদশাহ তৎপর তিনি ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। হাঙ্গেরীর বাদশাহ ভীত হয়ে ডিনিয়োব এর সমগ্র উত্তরাঞ্চল সুলতানের কাছে সমর্পণ করেন। বাজেন্টাইনী রাজত্বের বিখ্যাত এবং খুবই গুরুত্ব সালুনিফা—যা, বিগত একশত বছরের মধ্যে তিনরার তুর্কীদের দখলে এসেছিল, অতঃপর তাদের হাত ছাড়া হয়ে গ্রীকদের দখলে চলে গিয়েছিল, উহা বিজয় করেন। সারবীয়াকে তৎপর তুর্কী রাজত্বের অনুগত ও বিশ্বস্ত করে তুলেন। কনস্টান্টিনোপল আবারো অবরোধ করেন, কিন্তু এই নগর জয় করার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার অন্য কারো হাতকে শক্তিশালী করার ইচ্ছে ছিল।

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ রাজ্য শাসনের ঝামেলা থেকে পৃথক হয়ে কল্যাণকর নির্জনবাস অবলম্বন পূর্বক জীবনের অনাবিল শান্তি ও আরাম

করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং তিনি স্বীয় পুত্র মুহাম্মদের নিকট রাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে রাজ্যের কোলাহল থেকে মুক্ত হলেন। ক্রুসেডারগণ ভাবলেন মুহাম্মদ অল্পবয়স্ক ও অনভিজ্ঞ। তাই তাঁরা আর একবার একতাবদ্ধ হয়ে উসমানী রাজত্বের প্রভাব প্রতিপত্তিকে ইউরোপ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পাঁয়তারা শুরু করল। ক্রুসেডারদের এই অবস্থা-দেখে সুলতান দ্বিতীয় মুবাদ নির্জনবাস ছেড়ে যুদ্ধের ময়দানে আগমন করতে বাধ্য হলেন। কাসুদা-নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হল। কিন্তু ক্রুসেডারদের সম্মিলিত মিত্র বাহিনীর মধ্যে হাঙ্গেরী, জারমানী, পোল্যান্ড, বোসিনা এবং দিলাচিয়া—অংশ গ্রহণ করে ছিল। যুদ্ধে মিত্র বাহিনী পরাজিত হল এবং নিরাশ ও ব্যর্থ হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করল।

উল্লিখিত শক্তিসমূহ হাঙ্গেরীর সেনাপতি হুনিয়াডে এর উপর খুবই গর্ব করত। তিনি স্বীয় বীরত্ব প্রদর্শন পূর্বক পশ্চিম ইউরোপে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি স্থাপিত করেন। এই সেনাপতি প্রায় বিশ বছর পর্যন্ত তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। কয়েকবার বিজয়ও অর্জন করেছেন। এতে তাঁর ও ক্রুসেডারদের শক্তি সাহস দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরিশেষে ওয়ারেনার যুদ্ধে তাঁকে তুর্কী'দের হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হল। ওয়ারেনার যুদ্ধে কয়েকজন খ্রীস্টান বাদশাহ ও আমীর উমারা-নিহত হল। ১৫ই মুহাররম, ৮৫৫ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ কনস্টান্টিনোপল বিজয়

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের পর তাঁর ছেলে মুহাম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পিতৃপুরুষগণ কনস্টান্টিনোপলের আশে-পাশের যে সব নগর ও শহর বিজয় করেন বাজেনটাইনী রাজত্বের গুরুত্বপূর্ণ রাজধানী অধিকার করার পথ খুলে দিয়েছিল, উহা হতে স্বার্থ উঠায়ে তিনি ইসলামী ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি 'বাস্‌ফোরস্‌' এর ইউরোপীয় সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে এক দুর্গ নির্মাণ করেন। ইহা কনস্টান্টিনোপল থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। অতঃপর উহা অবরোধ করার আয়োজন শুরু করেন। হাঙ্গেরীর

একজন ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা একটি বিরাট কামান তৈয়ার করান। তা ব্যবহার করার সময় ১৪টি ষাড়ের প্রয়োজন হত। যখন সব কিছুর ব্যবস্থা সম্পন্ন হল তখন আওরায়না থেকে নিজে নব্বই হাজার সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন। অপরদিকে একজন আমীরের তত্ত্বাবধানে নৌ-বহর প্রেরণ করলেন। এমনিভাবে স্থলে ও জলে উভয় দিক থেকে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করলেন।

২০শে জামাদিউল, ৮৫৭ হিজরীর তারিখে আক্রমণের দিন ধার্য হল। এর পূর্ববর্তী সারারাত আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা ও ইবাদতে লিপ্ত রইলেন। প্রত্যেক দিক থেকে তাসবীহ ও তাহলীলের আওয়াজ আসতে ছিল। দিনের প্রারম্ভে খুব ভোরে ফজরের নামায আদায় করার পর মুসলমানগণ নগর প্রাচীরের দিকে যাত্রা করলেন। রোমীগণ খুবই বীরত্ব ও হিম্মতের সাথে মুকাবিলা করল। এই যুদ্ধে কনস্টান্টিনোপলের রোম সম্রাট নিহত হলেন। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত যুদ্ধ চলল এবং রোমীরা মুসলমান সৈন্যদের পর্যায়ক্রম আক্রমণের সামনে একটি অনড় প্রাচীরের মত অটল দাঁড়িয়ে রইলেন। এ দিকে মুহাম্মদ বীর বিক্রমে নতুন নতুন কামানের দ্বারা নগর প্রাচীরে গোলা বারুদ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। পরিশেষে তিনি স্বীয় সেনা বাহিনীর একটি বিশেষ দল নিয়ে অগ্রসর হলেন। রোমীরা তখন যুদ্ধ করতে করতে সম্পূর্ণ ক্লান্ত হয়ে গেল। তাদের মধ্যে আর নতুন করে আক্রমণ পরিচালনার কোন শক্তি বাকী রইল না। ক্রমাগত গোলা বারুদ নিক্ষেপের ফলে নগর প্রাচীরে ফাটল ধরল। পরিশেষে একদিকের প্রাচীর ভেঙ্গে গেল। সৈন্যদের একটি বিরাট দল নগরের মধ্যে প্রবেশ করে নগর দখল করে নিল। এমনিভাবে আজ ইসলামের দীর্ঘ দিনের আকাংক্ষা এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভবিষ্যৎ বাণী, উসমানী রাজত্বের ৭ম শাসকের প্রচেষ্টায় বাস্তবরূপ লাভ করল। অর্থাৎ ৮৫৭ হিজরী মুতাবিক ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতন হল।

জোহরের সময় সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ (বিজয়ী) স্বীয় আমীর উমারা এবং অন্যান্য বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে নগরে প্রবেশ করেন। বিখ্যাত গীর্জা 'আবা সুফিয়া' এর দ্বারে উপনীত হয়ে আযান দিতে বলেন, অতঃপর জোহরের নামায পড়েন। এর পর থেকে এই গীর্জা জামে মসজিদে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

এই মহাবিজয়ের আনন্দে সমগ্র ইসলামী জগতের স্থানে স্থানে আনন্দ-উল্লাস করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন বাদশাহ ও সুলতান এবং উলামা ও কবিগণ বিজয়ী বাদশাহর নিকট অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করতে লাগলেন। (بلدة طيبة) পবিত্র নগরী কুরআন মজীদের একটি আয়াতের অংশ বিশেষ। এটা ঐ বিজয়ের ইঙ্গিত বহনকারী ইতিহাস। ঐ দিন থেকেই সুলতানের উপাধি হল (فاتح) বা বিজয়ী। সুলতান তাকেই স্বীয় রাজধানী বানালেন। যে নগর একহাজার পর্যন্ত রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল; আজ সেই প্রথম দিন, যে দিনেতে ইসলামী রাজ্যের রাজধানী হওয়ার গৌরব অর্জন করল। বিজয়ের তিন দিন পরেই হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) এর কবরের নিদর্শন পাওয়া গেল। সুলতান উহার পার্শ্বে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেন, এতে উসমানী রাজত্বের রাজমুকুট পরিধানের অভিষেক অনুষ্ঠান পরিচালিত হত। কনস্টাণ্টিনোপল বিজয়ের সময় সুলতানের বয়স হয়ে ছিল মাত্র ২৬ বছর।

অন্যান্য বিজয়সমূহ

কনস্টাণ্টিনোপলের বিজয়কে ঐতিহাসিকগণ একটি অসাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুতও তাই। কেননা এরই ফলে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যসমূহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যে দেশ খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে তখন পর্যন্ত ইসলামী রাজ্যসমূহের বাহুতে একটি কাঁটার ন্যায় সদা ব্যথা প্রদান করছিল। সুলতান মুহাম্মদ তৎপর ও বিজয়ের ধারা ক্রমাগতভাবে চালু রাখেন। তিনি ৮৮৩ হিজরীতে আলবেনীয়ার বিভিন্ন দুর্গ বিজয় করেন। অতঃপর হাঙ্গেরীর উপর আক্রমণ করা হল। ৮৮৩ হিজরীতে রোম সাগরের বিভিন্ন দ্বীপ বিজয় করেন। রোড্‌স দ্বীপ-এর উপর ও আক্রমণ পরিচালনা করা হল। কিন্তু উহা সেই সময় বিজয় হয়নি। ১৪ই রবিউল আউয়াল, ৮৮৬ হিজরীতে সুলতান মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল বিভিন্ন বিজয় ছাড়াও আভ্যন্তরীণ সুশৃংখলা এবং জনহিতকর বিভিন্ন কাজ কর্মের কারণেও উসমানী রাজত্বের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিল।

সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ্‌র পর তাঁর ছেলে দ্বিতীয় বায়যীদ সিংহাসন

আরোহণ করেন। যদিও তার রাজত্বকাল বিজয়ের দিক দিয়ে খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়, তথাপি তা এজন্যে গুরুত্বপূর্ণ যে, তিনি স্বীয়পিতৃ পুরুষদের উত্তরাধিকারকে সামলাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ৯১৮ হিজরীতে স্বীয় পুত্র সালিমকে সুলতান বানায়ে নিজে নির্জন বাস আরম্ভ করেন। আর তিনি ভ্রমণে থাকা কালীন সময়েই-ইন্তিকাল করেন।

সুলতান সালিম আউয়াল

বায়যীদের পর সুলতান সালিম আউয়াল পৃথকভাবে রাজ্যের শাসনভার নিজ হস্তে নিলেন। সুলতান সালিমের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই ছিল যে, তিনি এক দিকে তো ইরানে শাহ- ইসমাঈল সুফুবীর তোড়জোড়ের সংবাদ পেয়ে আক্রমণ করলেন এবং ৯২০ হিজরীতে চান্দীরান নামক স্থানে শাহ্ ইসমাঈল সুফুবীকে পরাস্থ করে তাব্‌রীয, হাম্‌দান; আজারবাইজান এবং কাককাযের উপর বিজয়ী হন। অতঃপর হঠাৎ করে আরব শহরের দিকে ধাবিত হলেন এবং দিয়ার বকর বিজয় করে যুলকাদরীয়। রাজত্ব—যা-মার আশ এবং বুস্তানের পার্শ্ববর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল, ধ্বংস করতে করতে শামে উপনীত হন। মিসরের সম্রাটগণ কয়েকবার উসমানী রাজত্বের দুর্গসমূহের উপর আক্রমণ করে তার কয়েকটি করেন। আর অনাগত দিনসমূহে ও তাদের কে অস্থির করে রাখার অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। এই জন্য হাল্‌বের সংলগ্ন মরজেদাবেক নামক স্থানে সুলতান সালিম মিসরের চারকানী বাদশাহ ঘোরীর সাথে যুদ্ধে মিলিত হন। ভীষণ যুদ্ধ হল। পরিণামে উসমানী বাদশাহরই বিজয় হল। বাদশাহ ঘোরী ঘোড়া থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। ঘোরীর পর সুলতান তোমানবায় মিসরের বাদশাহ হলেন। ঐদিকে উসমানী সেনাবাহিনী কাহেরায় প্রবেশ করেছিল। তোমানবায় প্রাণপণ যুদ্ধ করে ও ব্যর্থ হলেন এবং পরিশেষে বন্দী হলেন। অতঃপর তাঁকে ফাসীকাষ্ঠে ঝুলান হল। সেদিন থেকেই মিসর ও উসমানী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল।

খিলাফত

সুলতান সালিম ২৪শে রজব, ৯২৪ হিজরীতে ইস্তাম্বুল ফিরে এলেন। মিসরের সর্বশেষ আব্বাসী খলীফা মুতাওয়াক্কেল আলাল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে

এলেন। জামে আবা সুফিয়াতে প্রবেশ করে খলীফা স্বীয় খিলাফতের উপাধি ও প্রতীক এবং তার তাবাররুকাত (تبركات) অর্থাৎ প্রাচুর্যের নির্দেশনাবলী যথা—তলোয়ার, জাতীয় পতাকা, নবী প্রদত্ত চাদর ইত্যাদি সুলতান সালিমের হাতে সমর্পণ করেন। সেই দিন থেকে খিলাফত বনী আব্বাসীদের নিকট হতে পরিবর্তিত হয়ে উসমানী বংশে চলে গেল এবং সুলতান সালিম সমগ্র ইসলামী জগতের খলীফা হয়ে গেলেন।[1]

---

[1] সাধারণতঃ এ কথাটি প্রসিদ্ধ যে, সুলতান সালিম মিসর বিজয়ের পর নিজেকে খলীফা বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু মুহ্‌তারামা খালেদা আদীব খানম নিজের লেখা ইতিহাস **Conflict of East and West in Tuake** "পূর্ব ও পশ্চিম তুরস্কের দ্বন্দ্ব" নামক পুস্তকের ২৫ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, নিম্নে আমরা এর সারাংশ, উল্লেখ করলাম। মুহ্‌তারামা লেখেন যে, "সুলতান সালিমের মিসর বিজয়ে সর্বপ্রথম প্রমাণ পত্র বিজয় নামা" যা সুলতান—১৫১৭ খ্রীস্টাব্দে অনারব রাজ্য (ইরান ও অন্যান্য)-সমূহ প্রেরণ করেছিলেন। ঐ প্রেরিত বিজয় নামার কোথায়ও খিলাফত কথাটির উল্লেখ নাই। অথচ যদি সুলতানের খলীফা উপাধি গ্রহণের ইচ্ছে থাকতো তাহলে তিনি অবশ্যই প্রেরিত বিজয় নামার মাধ্যমে জগতবাসীকে তা অবহিত করতেন। এ সম্পর্কে অন্য আর একটি প্রামাণ্য দলীলে—যা ঐতিহাসিক গুরুত্বে দাবীদার, সম্পর্কে তার লেখা চিঠি। এই চিঠিগুলো আজও বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এর উপর মিসরের ডঃ আদনান গবেষণা করেছেন। ইহার লেখক মিসর বিজয়ের সময় নিজেই বর্তমান ছিলেন। তিনি সমস্ত ঘটনাবলী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে, হুসনে তুলোন যাবতীয় ঘটনাবলীর উল্লেখ করলেন, কিন্তু খিলাফত সম্পর্কে শুধু এতটুকু লেখেই চুপ হয়ে গেলেন যে, সুলতান সালিম মিসরের আলিমগণকে একত্র করে জিজ্ঞেস করলেন যে, কোন সুলতান কি ইসলামের খলীফার অনুমতি ব্যতীত রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে সমালোচনা অধিকারী হতে পারেন না? আলিমগণ উত্তর করলেন যে, না! এ ব্যাপারে খলীফার অনুমতি অনাবশ্যক। সুলতান সালিম

সুলতান সালিম তখনও মিসরেই ছিলেন, একদিন 'শরীফ মক্কা'-এর পুত্র সুলতানের নিকট উপস্থিত হয়ে আপন পিতার পক্ষ থেকে حرمين شريفين (হারমায়ন শারীফায়ন)-এর চাবি ও সুলতান সালিমকে অর্পণ করেন। সেইদিন থেকেই তুরস্ক অধিপতি নিজেকে "খাদেমুল হারামায়নুশ্‌ শারীফায়ন" (মক্কা ও মদীনার সেবক) বলে উল্লেখ করতে লাগলেন।

এর পরিপ্রেক্ষিতে এ ঘটনাটি স্মরণ রাখারযোগ্য যে, একদা জুমার নামাযের খুতবা পড়ার সময় খতীব যখন সালিমকে উদ্দেশ্য করে ما لك الحرمين الشريفين ।

আলিমদের এই উত্তরের পর কথোপকথন সমাপ্ত করেন এবং তৎপর খলীফার সাক্ষাতের জন্যে আর কোন দিন গমন করেননি।

অতঃপর মুহ্‌তারামা উক্ত পুস্তকের ২৬ পৃষ্ঠায় লেখেন সে খলীফাকে ইস্তাম্বুল নিয়ে আমার ঘটনা ও মনগড়া কাহিনী বলে মনে হয়। কেননা সম-সাময়িক ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহই উহার উল্লেখ করেননি। আর যদি সর্বশেষ আব্বাসী খলীফাকে প্রকৃতপক্ষেই ইস্তাম্বুল নিয়ে যাওয়ার হত এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হত, তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, যখন তিনি জীবিত ছিলেন, তখন কোথায় কোথায় ছিলেন ? এবং যখন ইন্তিকাল করলেন, তখন কোথায় দাফন করা হল ? আমাদের কাছে কোন সূত্রেই তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর বাসস্থানের এবং মৃত্যুর পর তাঁর কবরস্থানের ঠিকানা জানা নেই। প্রকৃতপক্ষে তুরস্কের ইতিহাস সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ খলীফা ও খিলাফত সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। ইহাতে বুঝা যায় যে, সুলতান সালিম এবং তার পরবর্তী অন্যান্য উসমানী সুলতানগণ একদীর্ঘ সময় পর্যন্ত নিজেদের নামে খলীফার উপাধি গ্রহণ করেন নাই। শুধু সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের সময়ে খিলাফতের নাম ব্যবহারের কথা জানা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, উল্লিখিত তথ্যের মুকাবিলায় প্রফেসর আরনাল্ড এর বক্তব্য ছল যে, বৃটিশ মিউজিয়ামে উসমানী সুলতানদের যে সব সীলমোহর রক্ষিত আছে উহা হতে জানা যায় যে, উসমানী বংশের সুলতানগণ সুলতান মুরাদ আউয়ালের সময় থেকেই নিজেদেরকে 'খলীফায়ে ইসলাম' বলতে শুরু করছেন।

(মালিকুল হারামায়নুশ্‌ শারীফায়ন) সম্বোধন করেন; সুলতান সালিম তৎক্ষণাৎ স্বীয় স্থান থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং খতীবকে তখন বললেন: আমার এমন উপযুক্ততা নেই যে, আমি "হারামায়ন শারীফায়ন"-এর মালিক হয়। আমার জন্য ইহা কম গৌরবের বিষয় নয় যে, আমি الشريفين خادم الحرمين (খাদিমুল হারামায়নুশ্‌ শারীকায়ন)" বলে পরিচয় দিব। ("আল-ইসলাম ওয়াল হাজারাতুল আরবীয়া" গ্রন্থের ২য় খণ্ড, ৪৯১ পৃঃ দ্রঃ)

মিসর, শাম এবং হিজায অধিকার হওয়ার কারণে উসমানীয়া রাজত্বের গুরুত্ব ও মর্যাদা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। এর ফলে উহার শক্তি এত বৃদ্ধি পেল যে হাঙ্গেরী, স্পেন এবং ইটালীর সম্রাটগণ রাষ্ট্র দূতের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার উপঢৌকন পাঠিয়ে উসমানীয়া রাজত্বের সঙ্গে সন্ধি ও রাজত্বে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। সুলতান প্রেরিত উপঢৌকন সানন্দে গ্রহণ করে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সম্পর্ক স্থাপন করেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সুলতান সালিম সীমাহীন কঠোরতা প্রিয় এবং মন-মানসিকতায় জেদীভাবাপন্ন ছিলেন। মিসর, শাম এবং ইরানের ঘটনাবলী থেকে তা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু তিনি খিলাফতকে উসমানী বংশে স্থানান্তরিত করে যে সজাগ চিন্তাধারা এবং সময়োপযোগী অনুভূতি ও সঠিক কর্তব্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা সকল মুসলমানই স্বীকার করবেন। সুলতান সালিম অনুভব করলেন যে খিলাফতের প্রকৃত কর্তব্য হল—প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং জিহাদ করার শক্তি সঞ্চয় করা তাকে রাজনৈতিক দিক দিয়ে এমন শক্তিশালী করা চাই যাতে তা ইসলামী রাজ্যের সীমান্ত অতি সহজেই সংরক্ষণ করতে পারে এবং ইসলামী জগতের জন্য প্রকৃত অর্থে একটি কেন্দ্রীয় শক্তির কাজ দিতে পারে।

আশ্চর্যের কথা যে মিসর, শাম এবং হিজাযের শক্তি মামলুকদের হাতে ছিল। আর খিলাফত তার ছত্র-ছায়ায় কোনমতে জীবন বাঁচিয়ে চলতে ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই খিলাফত পূর্ববর্তী বুযুর্গদের হাড়ের খোলাস মাত্র। আর তার মুকাবিলায় উসমানী বংশ দেড়শো বছর ধরে ইসলামের সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসারের কর্তব্য করতে ছিলেন। তাদের

তলোয়ার দেখে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন বড় বড় রাজত্ব কম্পমান ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে খিলাফতের পোশাকে সুসজ্জিত হওয়ার অধিকার উসমানীদের ব্যতীত আর কার অধিক হক ছিল ? সত্য কথা এই যে মিসরে খিলাফত এবং রাজতন্ত্র উভয়ের-সহ অবস্থান ইসলামের জন্য একটি কলঙ্ক ছিল। তুর্কিগণ এই আবস্থার পরিবর্তন করে ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিলেন। ইসলামের শিরা-উপশিরায় যেন এক নূতন রক্ত প্রবাহের সঞ্চার হল।

হারামায়নশ্‌ শারীফায়নের সেবা

সুলতান সালিম নিজের জন্য 'খাদিমুল হারামায়নুশ্‌ শারীফায়ন' উপাধি ধারণ করেন। ইহা চারশো বছর পর্যন্ত তুর্কীদের জন্য সম্মান ও গর্বের বিষয় ছিল। এতে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, মহৎ উদ্দেশ্য এবং সৎ নিয়তের পরিচয় মিলে। সালিমের হারামায়নবাসীদের খেদমত করার সৌভাগ্য তিন বছর জুটে ছিল। তা সত্ত্বেও এই স্বল্প সময়ে ও তিনি যা কিছু করেছেন উহার পরিমাপ নিম্নের বিভিন্ন নির্বাচনী বিষয় থেকে বুঝা যায়। যা মুফ্‌তি দাহলান কর্তৃক লিখিত 'উসমানী রাজত্ব' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। মামলুক বাদশাহদের পক্ষ থেকে 'শরীফ মককা'কে যে ভাতা প্রদান করা হত সুলতান সালিম তাতে আরো পাঁচশো দীনার বর্ধিত করে দেন। তিনি একটি পৃথক দফতর খুলেন যাতে হেরেমের আশে-পাশে বসবাসরত লোকদের নাম তালিকাভুক্ত ছিল। তাদের প্রত্যেকের জন্য একশো দীনার ধার্য করেন। তা মিসরের ট্রেজারী থেকে প্রদান করা হত। তিনি ত্রিশ জনের একটি কুরআন পাঠকের দল নির্ধারিণ করেছিলেন, যাঁরা প্রতিদিন কুরআন খতম করতেন। তাঁদের প্রত্যককের বেতন ধার্য করেছিলেন বার দীনার। মিসরের সুলতান প্রতি বছরই বেদুঈন এবং ফকীরদের জন্যে শস্য পাঠাতেন। সুলতান সালিম এ প্রথা প্রচলন রাখেন এবং নির্দেশ জারী করলেন যে, প্রতি বছরই সাত হাজার মণ শস্য হেরেমবাসীদের জন্যে পাঠানো হবে। তন্মধ্যে পাঁচ হাজার মণ শস্য মক্কাবাসীদের জন্যে এবং দু'হাজার মণ মদীনাবাসীদের জন্য নির্ধারিণ করেন।

মুফ্‌তী দাহলান লেখেনঃ সালিমের পর অন্যান্য উসমানী সুলতানগণ শস্যের পরিমাণ আরো বর্ধিত করে দেন। মক্কাবাসীদের জন্য বার

হাজার মণ এবং মদীনাবাসীদের জন্যে সাত হাজার মণ শস্য বরাদ্ধ করা হল। সালিম হেরেমশরীফের 'মাকামে হানাফী'-কে নতুন করে নির্মাণ করেন। মদীনায় আমীর মুসলেহকে প্রেরণ করে অনেক জনহিতকর কার্য সম্পাদন করেন। এই সমস্ত কল্যাণকর কার্যের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই হারামায়ন শারীফায়নের অধিবাসীদের মধ্যে স্বচ্ছল অবস্থা বিরাজ করছিল।

শায়খ কুতুবী মক্কার একজন বিখ্যাত আলিম এবং সুলতান সালিমের সমকালীন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, আমি বাল্যকালে কাবা শরীফের অধিকাংশ তাওয়াফকারীকে খালী পায়ে একাকী তাওয়াফ করতে দেখেছি। বেলা এক প্রহরের সময়ে হাট বাজার জন-মানবহীন অবস্থায় থাকতো। অনেক সময় শস্যাদি বিক্রেতার দল শস্য নিয়ে বাজারে আসতো, কিন্তু ক্রেতার সংখ্যা খুবই নগণ্য দেখা যেতো। কিন্তু উসমানী রাজত্বকালে লোকজনের কোলাহল এবং ভিড় বেড়ে গেল। খাদ্য শস্য অধিক আমদানি হত। মানুষ সুখে ও আরাম-আয়েশে এবং চিন্তামুক্ত অবস্থায় বসবাস করছিল। তাদের রাজত্বকালে জনগণের মাঝে পরিপূর্ণ সুখ-শান্তি বিরাজমান ছিল সকলই যেন প্রাচুর্যের সাগরে নিমজ্জিত ছিল।

ইসলামী শরীয়তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

সুলতান সালিম যদিও মন-মানসিকতায় তেজী ও জেদী ভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও যদি কেহ কোন কাজে তাঁকে সতর্ক করে দিত, তবে তৎক্ষণাৎ-ই তিনি নিজের ভুল-ত্রুটি নিজেই সংশোধন করতেন শরীয়তের আদেশ-নিষেধের সামনে সদা মাথা নত করে দিতেন। সুতরাং ইরানীদের প্রতি তার অপরিসীম শত্রুতা থাকার কারণে একদা তিনি সাধারণ ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, উসমানী রাজত্বের কোন ব্যবসায়ী ইরানীদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে না। কোন কোন ব্যবসায়ী তাঁর আদেশ অমান্য করে ইরানীদের সাথে গোপনে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে শুরু করলে তিনি তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন; কিন্তু শায়খুল ইসলাম মুফতী জামালী যখন বললেন যে, এমন ব্যবহার অবৈধ ও অন্যায়। তৎক্ষণাৎ তিনি পূর্ববর্তী নির্দেশ প্রত্যাহার করেন।

এমনিভাবে একদা তিনি ইসলাম প্রচারের জোশে নির্দেশজারী করলেন যে, "উসমানী রাজত্বের অধীনস্থ সকল দেশে খ্রীস্টানদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করা হবে।" শায়খ ইসলাম এই সংবাদ শুনে তৎক্ষণাৎ সুলতান সালিমের নিকট গমন করেন এবং তাঁকে বুঝালেন যে, যদি কোন অমুসলমান 'জিযিয়া' প্রদান করে ইসলামী রাজত্বে বসবাস করতে চায় তবে তাকে ধর্মান্তরিত করার জন্য বল প্রয়োগ করা চলে না। এ ব্যাপারে কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, لا اكراه فى الدين অর্থাৎ-দ্বীন (গ্রহণের) ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই।'

তুর্কীদের সামুদ্রিক শক্তি বৃদ্ধি

সুলতান সালিম ইচ্ছা করলেন যে, তুর্কীদের স্থল বাহিনী যেমন শক্তিশালী তেমনি নৌবাহিনীকেও শক্তিশালী করা চাই। যাতে রোম সাগরে উসমানী রাজত্বের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিক থেকে ক্রুসেডারদের ভয় ও যেন চিরতরে রহিত হয়ে যায়। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক বিরাট নৌবাহিনী গড়ে তুলেন। উহাতে বিভিন্ন আকারের দেড়শো নতুন জাহাজের বহর ছিল। তা'ছাড়া আরো একশো যুদ্ধ জাহাজ সদাসর্বদা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রেরণের জন্য সমরাস্ত্রসহ সুসজ্জিত থাকতো। সম্ভবতঃ এ দিয়ে সুলতান সালিমের রোড্‌স দ্বীপ আক্রমণের ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তখনও তার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা হতে না হতেই ৯ই শাওয়াল, ৯২৬ হিজরীতে মৃত্যু দূতের আগমন হল। সুলতান সালিম ইন্তিকাল করলেন।

সুলায়মান আজম কানুনী

সুলতান সালিমের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে সুলায়মান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল ৯২৬ হিজরী থেকে ৯৭৪ হিজরী পর্যন্ত ৪৮ বছর ছিল। তাঁর রাজত্বকাল উসমানী রাজত্বের ৮০তম উন্নতির যুগ। তিনি স্বীয় রাজত্বকালে ইয়ামান, হাবশা, ইরাক, তারাবুলিস, বুরকাহ, টিউন্স, আল জাযায়ের, সাহ্‌রায়ে কুব্‌রা-এবং সুদান ইত্যাদি রাজ্য জয় করে উসমানী রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করেন। এমনিভাবে এশিয়া আফ্রিকার আরব দেশসমূহ ও উসমানী রাজত্বের দখলে আসে। অন্যদিকে রোম, হাঙ্গেরী, সারবীয়া,

বুলগারীয়া, বোসিনা, আলবেনীয়া এই সব রাজ্যগুলোও পরিপূর্ণভাবে বিজয় করে নুমায়ে বালকান এর দ্বীপপুঞ্জও অধিকার করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উহা স্থায়ী ছিল। পরবর্তী সময়ে বড়বড় রাজ্যের সাহায্যে তাদের স্বাধীনতা লাভ হল। হাঙ্গেরীর বিখ্যাত দুর্গ বুলাযাদ সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর সময়েও বিজয় হয় নাই। এমনিভাবে রোড্স দ্বীপ ও 'ক্রুসেডারদের একটা বড় ঘাঁটি ছিল। সুলতান সুলায়মান উভয়টিই জয় করেন। ক্রীট এবং কাব্রাস ইতোপূর্বেই বিজয় হয়ে ছিল। রোড্স বিজয় হওয়ার ফলে রোম সাগরের উপর তুর্কীদের পরিপূর্ণ অধিকার স্থাপিত হল। সেই সময় উসমানীয়া রাজত্ব স্থল বাহিনী ও নৌবাহিনী উভয় শক্তির দিক দিয়ে পৃথিবীর সর্বাধিক শক্তিশালী রাজত্বে পরিণত হল। তাঁদের রাজ্য সীমা 'পোডোলীয়া' ও 'বোয়া' থেকে মিসর পর্যন্ত এবং মিসর থেকে জিব্রালটার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোট কথা, সুলায়মান ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ রাজ্যেরই অধিপতি ছিলেন। রোম সাগর এবং লোহিত সাগর এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সাগরের ও অধিপতি ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন যে, সুলায়মানের বিশাল রাজত্বে বিশটি বিভিন্ন গোত্র ও বর্ণের লোকদের বসবাস ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি।

রাজ্যের সুশৃংখলা ও ন্যায় বিচার

উল্লিখিত বিভিন্ন বিজয় এবং রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা ব্যতীত সুলতান সুলায়মান আজম সীমাহীন ন্যায় পরায়ণ ও সুবিচারক ছিলেন। সুতরাং সালিম ছয়শো মিসরবাসীকে জোরপূর্বক মিসর থেকে কনস্টান্টিনোপলে স্থানান্তরিত করেছিলেন। অতঃপর সুলায়মান তাদেরকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেন। এমনিভাবে সালিম ইরানের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রাখার কারণে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীর মাল-পত্র ক্রোক করেছিলেন। সুলায়মান তাদের মাল-পত্র ফেরত দেন। আর যাদের আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল, তাদেরকে নগদ অর্থে ক্ষতিপূরণ দান করেন। যে সব কর্মচারীর প্রতি অবিশ্বাস ও গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হত তাদেরকে তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করে দিতেন। সুলায়মানের এইরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তদারকের ফল এমন হল যে, সমস্ত বিজিত রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান ছিল। তিনি

স্বীয় রাজ্যের উচ্চ পদস্থ সকল কর্মচারীদেরকে সরকারী ফরমানের মাধ্যমে হুশিয়ার করে দেন যে, কোন জনগণের সাথেই যেন অত্যাচারমূলক আচরণ করা না হয়। আমীর ও গরীব সকলকেই একই দৃষ্টিতে দেখতে হবে। শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে মুসলিম ও অমুসলিম সকলের সাথেই একই রকম ব্যবহার করা চাই। আইন কানুনের ব্যাপারে এরূপ কঠোরতা ও সতর্কতা অবলম্বন করার কারণেই সুলায়মানের উপাধি হয়েছিল (قانونی) কানুনী।

সেনাবাহিনীর সুদৃঢ়তা

মুসলমানের রাজত্বকাল ছিল সেই যুগের, যখন-ইউরোপ মধ্য যুগের অন্ধকার থেকে বের হয়ে একটা নতুন আলোর যুগে-প্রবেশ করেছে মাত্র। তখন যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা হতে লাগল। সুতরাং-তার যুদ্ধ বিদ্যায় ও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। নতুন নতুন যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কার করতে লাগল। যুদ্ধ পদ্ধতিতে ও নতুন ধরনের সংস্কার সাধিত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও উসমানী রাজত্বের সেনাবাহিনী স্বীয় শৃংখলা পদ্ধতি এবং যুদ্ধ সামগ্রীর দিক দিয়ে খৃষ্টান সৈন্যদের থেকে অনেক অগ্রগামী ছিল। কামান ও গোলা বারুদের আধিক্য এবং শক্তি ছাড়াও দুর্গ নির্মাণ ও সংরক্ষণ সৈন্যদের কারিগরী-বিদ্যার সমস্ত বিভাগে তুর্কিগণ ইউরোপীয়দের থেকে অনেক গুণে উন্নত ছিল। ঐতিহাসিক 'কারাপুসী' লেখেন যে, সুলায়মান আপন সেনাবাহিনীর সুস্বাস্থ্য এবং চরিত্রের দিকে যেরূপ সজাগ দৃষ্টি রাখতেন, তাতে উদাসীনতার কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হত না।

জনহিতকার কার্য

উল্লিখিত শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব পালন ছাড়াও সুলায়মান জনহিতকার কাজে অমনযোগী ছিলেন না। তিনি কনস্টান্টিনোপলে-একটি বিরাট নদী খনন করান। মক্কা মুয়াজ্জামার পুরাতন নদীগুলোর সংস্কার করান। রাজ্যের বড় বড় শহরগুলোতে হাসপাতাল স্থাপন করেন। নদীর উপর প্রয়োজনীয় পুল নির্মাণ করেন। বাগদাদ বিজয়ের পর তথায় ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এবং শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রঃ)-এর মাযার নির্মাণ

করেছেন। কিছুদিন কারবালা এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানসমূহে অতিবাহিত করেন। হারমায়নের অধিবাসীদের জন্যে উসমানী রাজত্বের পক্ষ হতে যে পরিমাণ বৃত্তি, ভাতা ও শস্যাদি প্রেরণ করা হত, তিনি তা' দ্বিগুণ করেছেন।

মুসলমানের রাজত্বকাল শুধু উসমানী রাজত্বের ইতিহাসেই নয়, বরং সমগ্র ইসলামী জগতের বিজয়, শৃংখলা, জনহিতকর কার্য, দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং সামরিক শক্তির দিক দিয়ে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিল। অবশেষে ৩০ শে সফর, ৯৭৪ হিজরীতে পায়ের ব্যথা-কিংবা 'ছায়াটিকা' রোগে আক্রান্ত হয়ে-৭৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

উসমানী রাজত্বের দু'যুগ

আব্বাসী খিলাফতের মত উসমানী রাজত্বকে-ও দু'টি যুগে বিভক্ত করা যায়। একটি হল উত্থানের যুগ এবং অপরটি হল পতনের যুগ। উন্নতি বা উত্থানের যুগ উসমানী রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা উসমান খান আউয়ালের সময় ৭০০ হিজরীর প্রথম থেকে শুরু করে সুলায়মান আজমের মৃত্যুকাল ৯৭৪ হিজরী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। অর্থাৎ উন্নতির মোট সময় (২৭৪ বছর) প্রায় পোণে তিনশো বছর-ছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মুকাবিলা যদি আব্বাসী খিলাফতের উন্নতির যুগের সাথে করা হয়— তবে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে।

বনু আব্বাস এবং উসমানী বংশের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

এতে সন্দেহ নেই যে, আব্বাসী রাজত্বের যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত উন্নতি হয়েছে, উসমানী রাজত্বকালে অবশ্য তা সত্ত্বেও প্রকৃত সত্য এই যে, উসমানী রাজত্বকালে যে সমস্ত বিজয় হয়েছে তার তুলনায় আব্বাসী যুগ বলতে গেলে একেবারেই খালী। তাদেরকে অধিকাংশ সময় আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও কলহ মিটাতেই অতিবাহিত করতে হয়েছে। কনস্টান্টিনোপল বিজয় করা মুসলমানদের দীর্ঘদিনের আশা—বনু আব্বাসের রাজত্বে বাস্তবায়িত হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা তা বিজয়ের সৌভাগ্য উসমানীদের ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন তৎপর এতেই শুধু শেষ নয়; বরং মধ্য ইউরোপের দিয়ানার, প্রাচীর পর্যন্ত

তাদের পদধূলী পড়েছিল। অতঃপর গ্রীক দেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের কারণে আব্বাসী খিলাফতের যুগে যে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও পথ ভ্রষ্টতা সৃষ্টি হয়েছিল, উসমানী রাজত্বকাল তা থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সংরক্ষিত ছিল। উসমানী সুলতানগণ ফিকাহ্‌শাস্ত্রের - হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তা'ছাড়া তুর্কীগণ ছিলেন মূলত ; বেদুঈন। তাই তারা কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। সুলতানগণ নিজেরাই যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে সৈন্যদের তত্ত্বাবধান করতেন। যুদ্ধের কর্তব্য সম্পাদন করাকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্য মনে করতেন। তাদের কার্যকলাপে-বুঝা-যায় যে, তাদের মাঝে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের আন্তরিকতা খুবই প্রবল ছিল। এমন কি সুলতান সালিম আউয়াল তো একদা খ্রীস্টানদেরকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানোর জন্য নির্দেশেই দিয়েছিলেন। কিন্তু তা পরবর্তীতে শায়খুল ইসলামের পরামর্শ ও দূরদর্শিতার ফলে বাতিল করে দেয়া হয়। আর এতেও সন্দেহ নেই যে, তাদের মধ্যে বংশগত কিংবা-জাতিগত পক্ষপাতিত্বের নাম গন্ধও ছিল না। এর পরিপেক্ষিতে বানু আব্বাসীদের যুগে যে সব আত্মকলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হতে ছিল, উসমানী রাজত্বকালে ঐ সবের কোন আলোচনাই শোনা যায় না। মুসলমান এবং অমসুলমান· তুর্কী কিংবা তুর্কী ছাড়া অন্যান্যদের সাথেও ইসলামী আইন মুতাবিক একই রকম ব্যবহার করা হত। অমুসলিমদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে পরিপূর্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখা হত। এ কারণেই বিজিত দেশসমূহে ও শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান ছিল। এমন-কি 'বাল-কানী' রাজত্বের অনেক অধিবাসীই স্বদেশ ছেড়ে উসমানী রাজ্যে বসবাস করাকে পছন্দ করতো।

তা'ছাড়া বনু আব্বাস এবং উসমানী বংশের উভয়ের চিন্তাধারার পার্থক্য এমনিভাবে করা যেতে পারে যে, বনু আব্বাসীদের যে সব ব্যক্তি রাজসিংহাসনে আরোহণ করতেন, তাঁরা নিজেদের জন্য আপত্তিকর উপাধি গ্রহণ করতেন। যেমন—'মুক্তাদির বিল্লাহ', 'আল-মু'তাসিম বিল্লাহ প্রমুখ। আর নিজেদেরকে খিলাফতে রাশেদার উত্তরাধিকার বানীর আমীরুলমু'মিনীন এবং (ظـل ا لله فى الارض) জিল্লুল্লাহ ফিল্ আরদ্' বলতেন। কিন্তু এর উল্টো উসমানী বংশের সুলতানগণ নিজেদের জন্যে 'খাদেমুল হারামায়নুশ্‌শারীফায়ন' উপাধিকে গৌরব মনে করতেন।

তারপরও তাঁরা নিজেদের জন্যে যে উপাধি পছন্দ করতেন, তাই গ্রহণ করতেন সুতরাং আজো কোন বৃদ্ধ আরবীর সামনে তুর্কীদের কথা উঠলে তাদের চোখের সামনে তুর্কীদের অতীত কাল এবং হারামায়নবাসীদের সাথে তাদের আন্তরিক ভালবাসা ও সদিচ্ছার চিত্র যেন ভেসে উঠে। তাই তাদের কথা স্মরণ হলে আজো তারা অশ্রুজল বিসর্জন করে।

হ্যাঁ তবে একথা সত্য যে, তুর্কীগণ তাঁকে উন্নতির যুগেও বিশ্ব মুসলিমের মস্তিষ্কে চিন্তাধারার উন্নতিকল্পে কিংবা সার্বিক পথ প্রদর্শনের নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য কোন ভুমিকা পালন করেননি এবং তারা বিশ্ব ঐক্যের ও কোনপন্হা উদ্ভাবন করতে পারেননি। তথাপি ইসলামের সার্বিক কেন্দ্রীয় শক্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং উহাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার প্রেক্ষিতে সত্যধর্মের কে সেবাকার্য সম্পাদন করেছেন, তা যথাস্থানে একটি বাস্তব সাক্ষ্য ও কৃতিত্বের অধিকারী। বিশ্ব মুসলিমের উপর তাঁদের এরূপ অনুগ্রহ ও সেবা কার্যের পুরস্কার আল্লাহ্ ব্যতীত আর কে দিতে পারবে? বনু আব্বাসকে কুরায়শী এবং নীরব বংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার সম্মান অবশ্যই প্রাপ্য। এতে উসমানী বংশের অবশ্য কোন অংশ নেই। এ কারণেই অনেক লোকই তাদের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উসমানী খিলাফত যে মনোনিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু যে মযহাবের (পথ-বা-মতের) ভিত্তিমূল "অমুকের পুত্র অমুকের প্রদর্শিত পথ গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত হয় এবং যাদের কাছে ব্যক্তিত্ব ও কর্মফলের গুরুত্ব না হয়ে বংশগত সম্মানেরই প্রাধান্য হয়, তাদের অনুসারীদের কাছে তুর্কীদের খিলাফত মেনে নেযার ব্যাপারে চিন্তিত হওয়া আশ্চর্যজনক বিষয়ই ছিল বটে।

মাওলানা শিবলী নুমানী সুলতান আবদুল হামিদকে লক্ষ্য করে যা বলেছিলেন—তা'হল—

تا زگی بدر وحنین از تو هست -
زیب وطرا ز حرمین از تو هست .
جز تو که هست ای شه انجم پناه -
آنکه بود شرع نبی را پناه -

قرۂ دینی نبوی از تو هست -
بازوئے اسلام قوی از تو هست -
شرع بجاه تو چو شد ارجمند -
باد بفرمان تو چرخ بلند -

"আপনার কার্যক্রম দ্বারা বদর ও হুনায়নের বিজয় গৌরব পুনঃ জীবিত হয়েছে। আপনার দ্বারাই তো হারমায়নের সৌন্দর্য ও শ্রী বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনি ব্যতীত বিশ্ব মুসলিমের সভার-সভাপতি-কি আরো কেউ আছে ? আপনিই তো নবীর শরীয়তের—সাহায্যকারী—ও প্রচারক। আপনার দ্বারাইতো বৃদ্ধি পেয়েছে। শরীয়তের আশা-আকাঙ্ক্ষা-ও মর্যাদা আপনার দ্বারাই তো বাস্তবায়িত হয়েছে। আপনার ফরমানের প্রবাহ তো গগন চুম্বী"।

উল্লেখিত কবিতার মর্ম সুলতান আবদুল হামিদের বেলায় প্রয়োজ্য হউক বা না হউক, কিন্তু তাঁর পরবর্তী দশজন সুলতানের বেলায় তো অবশ্যই প্রয়োজ্য হবে-নিঃসন্দেহে। وكفى بك فخرا গর্ব করার জন্য এটাই যথেষ্ট।

উসমানী রাজত্বের পতনকাল

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মাঝে আবহমান কাল থেকে অদ্যাবধি উত্থান ও পতনে ধারা চলে আসছে। উসমানী রাজত্ব ও এই চিরাচরি নিয়ম থেকে ব্যতিক্রম হবে কি করে ? জাতির উত্থান ও পতনের অবস্থাটা শারীরিক অসুখ-বিসুখের ন্যায় ধারণা করা চলে। যখন কোন সুস্থ্য ও সুঠাম দেহে প্রাথমিক অবস্থায় কোন রোগ সংক্রামিত হয়, তখন হয়ত, তা অনুভূতই হয় না। যদিও বা হয়, তবে এর প্রতি কোন গ্রাহ্যই করা হয় না। পরিশেষে এই সামান্য রোগই ক্রমে ক্রমে রোগীর ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনিভাবে জাতির অধঃপতনের অবস্থাটা ও তদ্রূপ। যখন কোন দুষ্কর্ম কিংবা অলসতার কারণে কোন জাতির কিংবা রাজত্বের দেহে অবনতি ও অধঃপতনের রোগ সংক্রামিত হয়, তখন প্রাকৃতিক নিয়মেই তার উপর দুটি প্রতিফল সংযুক্ত হয়। যদি জাতির অন্তর ও মস্তিষ্ক শক্তি সক্রিয় থাকে তবে স্বীয় দুর্বলতা ও ত্রুটিসমূহ

অনুভূত করে'—তৎক্ষণাৎ এর প্রতিকার কল্পে তৎপর হয়ে উঠে। তখন হয়ত এই অধঃপতন দূর হয়ে যায়। কিন্তু যদি এর উল্টে সেই জাতি স্বীয় ভুল-ত্রুটি অর্থাৎ সঠিক অর্থে স্বীয় গোনাহ্-খাতার প্রতি হুশিয়ার না হয়,—তবে অধঃপতন ঐ জাতি কিংবা রাজত্বের দেহকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। সম্ভবতঃ প্রাথমিক পর্যায়ে এর কোন খোঁজ-খবর থাকে না—বা অনুভূত হয় না, কিন্তু অধঃপতনের এই শিকড় যখন রাজ্য কাঠামোর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন কালক্রমে তাকে ধ্বংস করে ছাড়ে।

অধঃপতনের কারণসমূহ

উল্লিখিত আলোচনায় জানা গেল যে, সুলায়মান আজমের রাজত্বকাল উসমানী রাজত্বের উন্নতির সর্বশেষ কেন্দ্র বিন্দু ছিল। তারপর থেকেই অধঃপতনের যুগ আরম্ভ হল।

لكل شئ ا ذا ما ثم نقصان - فلا يغر بطيب العيش انسان -

"প্রত্যেক বস্তুই যখন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে তখনই এর অধঃপতন শুরু হয়। মানুষের উচিৎ জীবনের সুখ-ভোগ ও সচ্ছলতার উপর অহংকারী কিংবা গর্বিত না হওয়া।"

সঠিক অর্থে সুলায়মান আজমের রাজত্বকালের শেষের দিকেই উসমানী রাজত্বের পতন শুরু হয়েছিল। মুহ্‌তারামা আদীব খানমের বক্তব্য অনুসারে এই অধঃপতনের প্রথম কারণ এই ছিল যে, যদিও সুলায়মান তিনটি মহাদেশ এবং দু'টি মহাসাগরের অধিপতি ছিলেন এবং তাঁর সেনাবাহিনীও এত শক্তিশালী ছিল যে, ইউরোপের রাজ্যসমূহের সম্মিলিত শক্তিসমূহকে স্থলে ও জলে উভয় প্রকার যুদ্ধে একই সময়ে পরাস্ত করতে সক্ষম ছিল, কিন্তু তবুও তিনি নিজেই ছিলেন পর শাসিত। অর্থাৎ তাঁর অন্তর ও চিন্তার রাজ্যে তাঁর "রোশী বেগম যাকে পশ্চিমারা Raxalane "রোকসালীন" বলে ডাকতো তাঁরই রাজত্ব ও বাদশাহীর সীলমোহর চলছিল। ("Conflict of East and West in Turkey. নামক গ্রন্থের ৩৬ পৃঃ দ্রঃ)

এই রোশী বেগমের ঔরসেই সুলায়মান আজমের এক ছেলে সন্তান ছিল। সে খুবই নির্বোধ, অসামাজিক এবং মদ্যপায়ী ছিল। বেগমের ইচ্ছে ছিল যে,

সুলায়মানের পর তাঁর এই ছেলেই সিংহাসনে আরোহণ করবে। কিন্তু মুশকিল ছিল যে, বাদশাহর অন্য এক বিবির ঔরসজাত মুস্তফা নামী আরও এক ছেলে ছিল, যে ইতোপূর্বেই বাদশাহীর উত্তরাধিকার পেয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে মুস্তফা স্বীয় চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণায় এবং সৈন্য পরিচালনা ও রাজ্যের শৃংখলা রক্ষার দিক দিয়ে উপযুক্ত ও ছিলেন। সুতরাং রোশনী বেগম ষড়যন্ত্র করলেন এবং সুলতানকে মুস্তফা সম্পর্কে একটি কুধারণা দিয়ে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হলেন যে, মুস্তফা নিজে সুলতানের জীবদ্দশাতেই রাজসিংহাসনের দাবী করতে চায়। অতএব-১৫১৩ খৃীস্টাব্দে যখন ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মুস্তফা স্বীয় সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তখন সুলায়মান তাকে নিজ তাঁবুতে ডেকে পাঠালেন এবং নিজের সামনেই গলা টিপে হত্যা করানো হল।

মুস্তফার ন্যায় তার অন্য আর এক ভাই ইয়াযীদের পরিণতিও তদ্রূপই হল। মুস্তফার হত্যার পর তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, এখন তার নিজের জীবনেরও কোন নিরাপত্তা নেই। বাদশাহর কয়েকজন হিতাকাংক্ষী পরামর্শ দিলেন যে, নিজের নিরাপত্তার জন্যে সালিমের (রোশনী বেগমের অন্য আর এক ছেলের নাম) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা প্রয়োজন। বায়যীদের কাছে এই পরামর্শ পছন্দ হল। তাই তিনি সালিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। কিন্তু সুলায়মানের শক্তি সালিমের সমপর্যায় ছিল। পরিশেষে বায়যীদ যুদ্ধে পরাস্ত হলেন। বাধ্য হয়ে তাঁকে ইরানের শাহের কাছে আশ্রয় নিতে হল। কিন্তু সুলায়মান যখন ইরানের শাহকে যুদ্ধের হুমকি দিলেন, তখন তিনি বাধ্য হয়ে শাহযাদা বায়যীদ এবং তাঁর চার ছেলেকে সালিমের দূতের কাছে সমর্পণ করে ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের সবাইকে হত্যা ফেলেন করে।

শাহযাদা মুস্তফা এবং বায়যীদের নিহত হওয়ার পর এখন দ্বিতীয় সালিমের জন্য রাস্তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেল। সুতরাং ৯৭৪ হিজরীতে সুলায়মান আজমের ইন্তিকালের পর তিনিই সিংহাসনের অধিকারী হলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় সালিম খুবই অযোগ্য ছিলেন। মদ্যপান এবং বিলাস বহুল জীবন-যাপন ছাড়া অন্য কিছুর সঙ্গে তাঁর আর কোন সম্পর্ক ছিল না। সমস্ত রাষ্ট্রীয় কাজ কর্ম সদর আজমের হাতে ছিল। তিনি সুলায়মান আজমের রাজত্বকাল থেকেই সব কিছুতে

শিক্ষা প্রাপ্ত ছিলেন। এই জন্য দ্বিতীয় সুলায়মানের রাজত্বের প্রাথমিক পর্যায়ে যতক্ষণ পর্যন্ত 'সদর আজমের' প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তার রাজত্ব পতনের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত ছিল না। কিন্তু জ্ঞানী গুণিগণ লক্ষ্য করতে ছিলেন যে তখন থেকেই উসমানী রাজপ্রাসাদের ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়ে গেছে।

অতঃপর মুহ্‌তারামা খালেদা আদীব খানমের লেখা অনুযায়ী, "সুলায়মান অন্দর মহলের প্রভাবে অনুপযুক্ত ও অযোগ্য এক শাহ্‌যাদাহকে স্বীয় উত্তরাধিকার বনালেন। যদি ব্যাপারটি এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে সালিমের বাদশাহ হওয়ার বিষয়টি সম্ভবতঃ এত খারাপ পরিণতির কারণ হতো না। কেননা কোন রাজত্বের আইন শৃংখলা সুদৃঢ় হলে বাদশাহ্‌র অনুপযুক্ততার ক্ষতিপূরণ সুদক্ষ মন্ত্রীর সুন্দর ব্যবস্থাপনার দ্বারাই হয়ে যায়। কিন্তু অন্দর মহলের প্রভাবে সুলায়মান আজমকে বাধ্য করা হ'ল যে শাহ্‌যাদাদেরকে শাহী মহলে আবদ্ধ অবস্থাতেই শিক্ষা-দীক্ষার প্রথা চালু করা হউক। এখান থেকে রাজবংশের পতন শুরু হল। শাহযাদাদের শরীরচর্চা এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের শিক্ষা—প্রচালিত সিলেবাসের বহির্ভূত ছিল। প্রাচীন কালের বিভিন্ন ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা তখনও দেয়া হচ্ছিল বটে, কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ পর্যন্ত শাহযাদাকে রাজ প্রাসাদের বাহিরে পা, ফেলার অধিকার ছিল না। এই নতুন পদ্ধতির ফলে এমন লোকেরা বাদশাহ হতে লাগলো, যারা আবদ্ধ রাজ প্রাসাদে শিক্ষা প্রাপ্ত হতো এবং আনন্দ উল্লাসে বিলাসবহুল জীবন-যাপনে অভ্যস্থ ছিল। তাদের রাজ দরবারের কার্যক্রম সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অযোগ্য বাদশাহদের একটা তালিকা দৃষ্টিগোচর হয়। তাদের মধ্যে কেহ বিলাসী না হলেও প্রথম নম্বরের অত্যাচারী ও অবিচারী এবং অন্দর মহলের রঙে রঙিন ছিলেন, তাঁরা সীমাহীন দুরাচারী ছিলেন। তাঁদের বেগমদের মার্জির উপরেই। রাজ্যের বড় বড় পদ-বিক্রি হতে লাগল। তুর্কী ভাষায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে "মাছের মাথা থেকেই পঁচন শুরু হয়"।

অন্দর মহল এবং বাদশাহদের এইরূপ অবস্থা দেখে উসমানী রাজত্বের কর্মচারীরাও সেই চরিত্রের রঙে রঙিন হতে লাগল। উৎকোচ দিয়ে চাকরি

গ্রহণ তো একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়ে গেল। প্রথম দিকে কর্মচারীর উপযুক্ততা পদোন্নতির একটা মাপকাঠি ছিল, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এর প্রতি কোন লক্ষ্যই রাখা হতো না। মোট কথা যে সমস্ত উসমানী বাদশাহ বীরত্ব ও বাহাদুরীতে প্রাচীন রোম সম্রাটদের চেয়ে ও অধিক বীরত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ছিলেন, এখন তাঁরা বাজেন্টাইনী শাসকদের মত বিলাসিতা ও আরাম-আয়াশের জীবন-যাপন করতে লাগলেন। তৎকালীন উসমানী রাজ প্রাসাদে বাজেন্টাইনী রাজপ্রাসাদের হুবহু মিল ছিল।

এই অধঃপতনের যুগে অল্প সংখ্যক বাদশাহরই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। কেননা সেই শতাব্দীতে সৈন্যদের বিদ্রোহ এবং শাসকদের অপসারণের তৎপরতা ছিল অত্যাধিক। এর পরিপ্রেক্ষিতে অনেককে হত্যা করা হয়েছে। মুহ্‌তারামা খালেদা আদীব খানম এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের এটাই (**Conflict of East and West in Turkey. p. 36 37** দ্রষ্টব্য) নিঃসন্দেহ বলা যায় উসমানী রাজত্বের পতনে সুলমান আজমের পর থেকেই শুরু হয়ে ছিল। কিন্তু আমাদের ধারণা যে, এই অধঃপতনের মূলব্যাধি সুলায়মানের রাজত্বের বহুপূর্ব হতেই শুরু হয়েছিল উসমান খান-গাযী রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, তা বেশী দিন স্থায়ী হতে পারেনি।

স্থলাভিষিক্তকরণ প্রথা

অধঃপতনের প্রথম কারণ হল স্থলাভিষিক্ত করার প্রথা চালু করা। ইসলাম খলীফা কিংবা বাদশাহ নির্বাচনের যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে, তাই রাষ্ট্রকে শক্তিশালী এবং স্থায়ী করার একমাত্র পন্থা ছিল। উত্তরাধিকার প্রথা বনী আববাসীদের যুগ থেকেই ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল। এই প্রথার কুফলের একদিক হল—তৎকালীন বাদশাহদের বড় ছেলের দৃঢ় বিশ্বাস থাকতো যে, পিতার মৃত্যুর পর তার সিংহাসন লাভ অবধারিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে তার বাদশাহী রীতি-নীতি, চাল-চলন এবং চরিত্র গঠনের আবশ্যকতা অনুভব করে নিজেকে এই উচ্চ পদমর্যাদার উপযুক্ত করে গড়ে তুলার প্রতিও দৃষ্টি দিতেন না। কারণ তিনি মনে করতেন যে, রাজ্য শাসনের উপযুক্ততা না থাকলেও তিনি বাদশাহ হতে পারবেন। অন্যদিকে এর প্রতিক্রিয়া এমন হল যে, কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিবর্গ স্থলাভিষিক্ততাকে কেন্দ্র করে এর চার

পাশে ভিড় জমাতো। এই চাটুকারেরা কর্তৃত্বের সূত্রে স্থলাভিষিক্ততার যাবতীয় কাজকর্ম সমাধা কল্পে শাহযাদার হ্যাঁ এর সাথে হ্যাঁ সূচক সুর মিলিয়ে স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির অন্তরে নিজেদের স্থান করে নিত। এর ফলে স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি স্বীয় দুর্বলতা অনুভব করতে ও পারতেন না তিনি জীবন ভর ভুলের মধ্যে কালাতিপাত করতেন। অতঃপর যখন স্থলাভিষিক্ততা থেকে উন্নতি পেয়ে রাজসিংহাসনে আরোহণ করতেন, তখনও স্বার্থান্বেষী মহল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তাকে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতো। এতে রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার বিদ্রোহ ও বিশৃংখল সৃষ্টি হতো।

উল্লিখিত বিশৃংখলা সৃষ্টি ছাড়াও স্থলাভিষিক্ত প্রথার সবচেয়ে ব্যাদনায়ক এবং ধ্বংসাত্মক ফল এমন হতো যে, রাজ প্রাসাদ বিভিন্ন প্রকার অপবিত্র ষড়যন্ত্র এবং প্রবঞ্চনার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হতো। অনেক সময় বেদনায়ক ও নির্মম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটতো। সুতরাং বায়েযীদ ইন্দেরাম তাঁর স্বীয় ভ্রাতা ইয়াকুবকে যিনি বীরত্ব ও বাহাদুরীতে আপন বড় ভাই থেকে কোন অংশে কম ছিলেন না, শুধু এই ভয়ে তাঁকে হত্যা করলেন যে, না জানি কোন সময় রাজসিংহাসনের দাবীদার হয়ে বসে। সুলতান সালিম আউয়াল ও আপন দু'ভাই আহমদ এরং কারকোদকে হত্যা করান। উসমামী রাজত্বের বিখ্যাত বাদশাহ এবং ইসলামী ইতিহাসের বিখ্যাত বীরপুরুষ সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ্ কনস্টান্টিনোপলের-বিজয় গৌরবে যিনি ধন্য, তিনি রাজসিংহাসনে আরোহণ করার পর যে কর্মটি সর্বপ্রথম করলেন, তা খুবই মর্মান্তিক। তিনি সারবীয়ার শাহযাদীর ঔরসে জন্মগ্রহণকারী দীদ্ধপানের আপন শিশু ভাইকে যখন তার মাতা তাকে নিয়ে সুলতানের সিংহাসনে আরোহণের পর তাকে মুবারকবাদ জানানোর জন্যে রাজদরবারে উপস্থিত হলেন, তখন পানির হাউজে ডুবিয়ে এই শিশু ভাইকে হত্যা করেন। অতঃপর মুহাম্মদ ফাতেহ নিজের এই রূপ অপকর্মে লজ্জিত হওয়া ব্যতীত অতিরিক্ত এই করলেন যে, "রাজ্য ও রাজত্বের নিরাপত্তার খাতিরে আপন ভাইদেরকে হত্যা করাও আইনতঃ সিদ্ধ বলে ঘোষণা দিলেন"। এটা ঐতিহাসিকদের ভাষায় "খুনী" বলে স্মরণীয় হয়ে আছে।

এখানে এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই যে, এই নতুন মনগড়া শাসন পদ্ধতিকে কতটুকু শরীয়তী এবং ইসলামী শাসন বলা যেতে পারে শুধু প্রশ্ন এই যে, একটি দুধের বাচ্চা থেকেও কি কনস্টান্টিনোপল বিজয়ী সম্রাটের রাজ্য ধ্বংসের সন্দেহ হতে পারে? প্রকৃত পক্ষে এখন

থেকেই একজন মহাবিজয়ীর আভ্যন্তরীণ চিন্তা-ধারার পর্দা উন্মোচিত হয়ে যায়। আর এতে স্পষ্ট প্রত্যয় জন্মে যে, তাঁর বিভিন্ন রাজ্যজয়ের উদ্দেশ্য কতটুকু খাঁটি ইসলামী ও ধর্মীয় ভাবাপন্ন ছিল। সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ্-এর অবৈধ 'খুনী কানুনের ফলাফল এই হল যে, সুলতান তৃতীয় মুরাদ আপন পাঁচ ভাইকে এবং তাঁর ছেলে তৃতীয় মুহাম্মদ স্বীয় ১৯ ভাইকে ঐ কালা-কানুনের ছত্র-ছায়ায় নির্মমভাবে হত্যা করেন।

মোট কথা-এই সমস্ত বিশৃংখলা এবং স্বার্থপরতামূলক হত্যাকাণ্ডের মূলে উৎসই-হল স্থলাভিষিক্ত করণ প্রথা। অন্যথায় যদি ইসলামী নিয়মানুসারে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের প্রথা চালু থাকতো-তা'হলে বাদশাহীর প্রার্থী ব্যক্তিকে স্বীয় কাজকর্ম ও চরিত্রকে অধিকতর পছন্দনীয় করে গড়ে তুলে জনগণের রায়কে নিজের পক্ষে করার চেষ্টা করতো। অতঃপর যে ব্যক্তিই বাদশাহ্-হতো-জনশক্তি তাঁর পিছনে কাজ করতো। এর ফলে কোন ব্যক্তিকেই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস হতো না।

বিজাতীয় মহিলাদের সাথে বিবাহ-শাদী

অধঃপতনের দ্বিতীয় কারণ হল- উসমানী শাসকগণ প্রথম থেকেই বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে অসতর্ক ছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা অমুসলিম মহিলাদের সাথে বিবাহ করা এবং তাদেরকে শাহী মহলের যাবতীয় ব্যাপারে অধিকার প্রদানকে খারাপ মনে করতেন না। সুতরাং সুলতান আওয়ার খান কন্টাকাউযীনের কন্যা 'থিউডোরা'কে বিয়ে করেন এবং তাকে স্বীয় খৃষ্টান ধর্মের উপর বহাল থেকে জীবন যাপনের অনুমতি দেন। আওয়ার খানের পর সুলতান মুরাদ আউয়াল বালগারীয়ার বাদশাহ-সিস্‌মানের কন্যাকে বিয়ে করেন। অতঃপর সুলায়মান আজম রোশী বেগমকে শাদী করায় তিনি আন্দর মহলের শাসক হয়ে বসেন। এভাবে উসমানী রাজত্বে বিপদের যে ঘনঘটা দেখা দিল তার বাস্তব অবস্থা তো ইতোপূর্বে বর্ণিত পৃষ্ঠাসমূহে পাঠ করলেন। তাঁরা তো শাহযাদী হিসেবে রাজমহলের বেগম সেজে বসে ছিলেন এবং রাজ্যের যাবতীয় কাজ কর্মের কর্তৃত্ব করাকে নিজেদের অধিকার মনে করতেন। তাঁদের ছাড়াও অসংখ্য অমুসলিম দাস-দাসীর শাহী মহলের কর্তৃত্ব ছিল। সুতরাং উস্তাদ কুর্দ আলী সাহেব উসমানী রাজত্বের অধঃপতনের যে সব কারণ লিখেছেন, তা'নিম্নরূপ।

ولعله يعد من الاسباب الجوهرية فى الانحطاط تغيرا
الـدم السلطانى فى آل عثمان تغيرا كبيرا لكثـرة ما اتخذوه من
السرارى والجوارى النصرانيات .

"উসমানী রাজত্বের পতনের মূল কারণ হল—বহু খৃীস্টান-দাস-দাসীদের সাথে মিলনের কারণে বাদশাহের রক্ত বিগড়ে গিয়েছিল।" (আল ইসলাম ওয়াল হাজারাতুল আরবীয়া গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৪৯৯ পৃঃ দ্রঃ)

অতএব সুলতান দ্বিতীয় সালিম অর্ধেক রোশী ছিলেন। কেননা তাঁর মাতা রাশিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তৃতীয় মুহাম্মদ অর্ধেক আতালুবী-ছিলেন। কেননা তার-মাতা 'ভেনিস' (Venice) শহরের অধিবাসী ছিলেন। এমনিভাবে দ্বিতীয় উসমান ও ৪র্থ মুরাদ এবং ইবরাহীম আউয়াল আধা-আধি রোমী ছিলেন। কেননা তাঁদের সবারই মাতা-রোমী মহিলা ছিলেন। বিধর্মী-মহিলাদের অধিক পরিমাণে রাজমহলে-স্থান দখল করার ফল তাই হল—যা বনী আব্বাসীদের রাজত্বকালে হয়েছিল। অর্থাৎ যতক্ষণ বাদশাহগণ বীর পুরুষ, বাহাদুর এবং হুঁশিয়ার ছিলেন, ততক্ষণ অমুসলিম-মহিলাদের প্রভাব ততখানি দৃষ্টি গোচর হত না। কিন্তু যখন থেকে দ্বিতীয়ে সালিম, তৃতীয় মুরাদ এবং মুস্তফা আউয়ালের মত বিলাস প্রিয় ও জাঁকজমক পূর্ণ সুলতানগণ রাজ সিংহাসনে আরোহণ করতে লাগলেন, তখন থেকে রাজ্য শাসনের ডুরী-(রশি) ঐ সমস্ত দাস-দাসীদের হাতে চলে গেল। উসমানী রাজত্ব সম্পর্কে একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের মন্তব্য হল যে, তৃতীয় মুরাদ ৯৮২ হিজরী থেকে-১০০৪ হিজরী পর্যন্ত সময় কালের প্রথম চার বছর 'সোকুলালী পাশার নেতৃত্বাধীন ছিল। তারপরেও সুলতানের উপর অন্দর মহলের প্রভাব দৈনন্দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। অন্দর মহলে বিশেষ করে চার বিবির প্রভাবই তাঁর উপর অধিক ছিল। প্রকৃত পক্ষে রাজ্যের যাবতীয় কাজকর্ম ঐসব বিবিদের মর্জির উপরই নির্ভরশীল ছিল। তন্মধ্যে সুলতানা নূরবানু নাম্নী একজন ছিলেন। সুলতানা সুফিয়া নাম্মী অপর একজন বিবি মুরাদের প্রিয়তমা ছিলেন। তিনি ভেনিস Venice শহরের বিখ্যাত বাফ্‌ফো (Baffo) বংশের এক সর্দারের কন্যা ছিলেন। তিনি স্বীয় সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তার জন্যে মুরাদের উপর সীমাহীন প্রভাবশালিনী ছিলেন সম্রাজ্ঞী সুফিয়া রাজ্যের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ধি ইত্যাদি বিষয়ের নিষ্পত্তির ব্যাপারে বিশেষভাবে পারদর্শিনী ছিলেন। সুতরাং এতদ্ সত্ত্বেও ভেনিস অধিপতি একাধিকবার সুলতানকে যুদ্ধের উস্কানী দেন। কিন্তু শুধু

সুফিয়ার চেষ্টার ফলেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। তৃতীয় সম্রাজ্ঞী হাঙ্গেরীর এক সুন্দরী মহিলা ছিলেন। তিনি কিছু দিনের জন্যে সুফিয়ার প্রতি সুলতানের ভালবাসাকে দূরে সরায়ে দিয়ে নিজে সুলতানের ভালবাসার কেন্দ্র-বিন্দুতে পরিণত হয়ে ছিলেন। ৪র্থ সুন্দরী মহিলা যিনি রাজ্যের অন্দর-মহলে জীবন উৎসর্গকারিণী হিসেবে বিশেষ ব্যবস্থাপক ছিলেন। তিনিও নিজের উপযুক্ততা ও কবিত্বের নিপুণতার দ্বারা বাদশাহ মুরাদের অন্তর রাজ্যে বিশেষ অধিকার বিস্তার লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই চারজন সুন্দরী মহিলাই সুলতানের পরামর্শ দাতা এবং রাজ্যের শৃংখলা রক্ষা ও ব্যবস্থাপনার প্রকৃত তত্ত্বাবধায়িকা ছিলেন। (দাওয়াতে উসমানীয়া গ্রন্থের ১ম খণ্ডে, ২৪০ পৃঃ দ্রঃ)

এতে সন্দেহ নেই যে, আহ্‌লে কিতাব অর্থাৎ খ্রীস্টান ও ইয়াহুদী ধর্মালম্বী মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা ইসলামে অবৈধ নয়, বরং জায়েয আছে। কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, যদি ইসলামী সমাজে কিংবা রাজমহলে ঐ সমস্ত মহিলাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়, তবে তা ধ্বংসাত্মক পরিণতি ও প্রতিক্রিয়ার ও কারণ হয়ে পড়তে পারে। এ জন্যেই একবার হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামানী (রাঃ) মাদায়েন শহরের এক ইয়াহুদী সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করলে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) ইহা শুনে হুযায়ফাকে একটি জরুরী পত্রে উল্লেখ করেন যে, "আপনি এই মহিলাকে পরিত্যাগ করুন।" হুযায়ফা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আমার এ কাজ কি অবৈধ হয়েছে ? হযরত উমর ফারুক (রাঃ) প্রতি উত্তরে আবার লেখলেন, "আমি আপনাকে কসম দিয়ে বলছি যে, আপনি আমার এই পত্র পড়া মাত্রই এবং তা হাত থেকে রাখার পূর্বেই ঐ সুন্দরী মহিলা থেকে সম্পর্ক ছেদ করুন। আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, না জানি কখন যে মুসলমানগণ আপনার অনুসরণ করে যিম্মীদের সুন্দরী মহিলাদের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে তাদের সঙ্গে বিয়ে করতে শুরু করে দেয়। যদি অবস্থা এমনই হয়, তবে মুসলমান মহিলাদের জন্যে ইহা এক ভয়ানক বিপদের কারণ হয়ে দাড়াঁবে"।

(কিতাবুল আসার, ইমাম মুহাম্মদ-নামক গ্রন্থের ৬৪ পৃঃ দ্রঃ)

সৈন্যদের বিদ্রোহ

রাজমহলের এইরূপ অবর্ণনীয় দুরবস্থার অত্যাবশকীয় পরিণতি এই হওয়া উচিত ছিল যে, সৈন্যদের মাঝে আনুগত্য ও বাধ্যতার প্রেরণা আর বাকী না থাকে। বাদশাহর অবাধ্য হওয়া যেন একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আমীর ও মন্ত্রিগণ কোন বিষয়ে চিন্তা-ফিকির ছাড়াই মনে যা চাই তাই করতে শুরু করলেন। সেনা-বিভাগে তুর্কীদের একটি খুবই উত্তম ও বীর সেনাদল ছিল। তাদেরকে রাজ্যের ডানহাত বললেও অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু সুলতান তৃতীয় মুরাদের বিলাস বহুল জীবন-যাপন এবং রাজকর্মে উদাসীনতার ফলে সেনাবাহিনী সুলতানের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে গেল। ১৪৮৯ খৃীস্টাব্দে সৈন্যগণ রাজমহলের সম্মুখে প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু করে দিল। সুলতানকে তখন সৈন্যদের সামনে মাথা নত করতে হল। তাদের যা দাবী ছিল তা পূর্ণ করে দেয়া হল। সুলতানের এইরূপ নমনীয়তার ফলে সৈন্যদের সাহস এত বেড়ে গেল যে, তারা যখন যা চাইত তা আদায়ের লক্ষ্যে বিদ্রোহের ঝান্ডা উত্তোলন করে দিত। এমনকি প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের দাবী দাওয়া ও তাদের ইচ্ছানুযায়ী উত্থাপিত হতে লাগল। ক্রমে ক্রমে অবস্থা এমন মারাত্মক হল যে, শেষ যুগের আব্বাসী খলীফাদের ন্যায় উসমানী সুলতানগণ ও তাদের হাতের পুতুল তুল্য হয়ে গেল। সমগ্র রাজ্যটা ঐসব লোকদের স্বার্থ সিদ্ধির একটা খেলার মাঠে পরিণত হল।

আমীর ও মন্ত্রীদের আত্মসাৎ ও বিশ্বাস ঘাতকতা

উল্লিখিত বিষয়সমূহের একটি সার্বিক প্রভাব ছিল এই যে, ছোট থেকে নিয়ে বড় পর্যন্ত সবারই চরিত্র বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আত্ম-পরায়ণতা ও স্বার্থপরতা প্রত্যেকের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হলো। আমীর ও মন্ত্রীদের আত্মসাৎ করা ও বিশ্বাস ঘাতকতা এমন পর্যায়ে উপনীত হলো যে, তারা উসমানী রাজত্বের ঘোর শত্রুদের সাথেও ষড়যন্ত্র করতে ও কোন দ্বিধাবোধ করতো না। যুদ্ধ ক্ষেত্রেও নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে শত্রুদের সাথে মিলে যেত। উসমানী রাজত্বের সবচেয়ে অধিক ভয়ংকর

শত্রু ছিল রাশিয়া। সুলতান তৃতীয় আহমাদের রাজত্বকালে রাশিয়ার সম্রাট 'পীড় আজম' কন্স্টান্টিনোপল বিজয়কে নিজের জীবনের একটা বড় উদ্দেশ্য মনে করে উসমানী রাজত্বের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করার জন্যে যাত্রা করলেন এবং পার্থ নদী অতিক্রম করে বেলাভূমিতে সেনাছাউনী প্রতিষ্ঠা করেন। এমন সময় তিনি বুঝতে পারলেন যে, তুর্কী সৈন্যদের সর্বাধিনায়ক বুলতাজী মুহাম্মদ পাশা সম্মুখের পাহাড়সমূহে দু'লক্ষ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে অবস্থান করছেন। এমতাবস্থায় রুশ সম্রাট খুবই বিপজ্জনক অবস্থায় নিপতিত হলেন। তাঁর সৈন্য সংখ্যাও তুর্কীদের সৈন্য সংখ্যা থেকে কম ছিল। তদুপরি একদিকে ছিল নদী, অন্যদিকে ছিল বিস্তীর্ণ কদমাক্ত ভূমি এবং সম্মুখে ছিল তুর্কী সৈন্যদের বেড়াজাল। যদি মুহাম্মদ পাশা সেই সময় ইচ্ছে করতেন, তবে রুশ সম্রাট পীড় আজমকে হত্যা-কিংবা-বন্ধী করতে পারতেন। কিন্তু বাদশাহর রুশীর সম্রাজ্ঞী 'কীথরাইন' অসাধারণ সৌন্দের্যের অধিকারিণী হওয়া ছাড়াও বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতায় অদ্বিতীয়া ছিলেন। তিনি ছলনা করে বহু ধন-রত্ন, স্বর্ণ এবং অলংকারাদি বুলতাজী-মুহাম্মদ পাশার নায়েবের কাছে উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেন। এই ধন-রত্ন পেয়ে নায়েব সাহেব সদর আজম মুহাম্মদ পাশাকে অবরোধ উঠায়ে সন্ধি করতে বাধ্য করলেন। পরিশেষে তাই হল। রুশ সৈন্যরা নিরাপদে স্বদেশ চলে গেল।

এমনি আর একটি ঘটনা সুলতাম আবদুল মজিদের সময়ে সংঘটিত হয়েছিল। মুহাম্মদ আলী পাশা মিসর সম্রাটের ছেলে ইবরাহীম পাশা তুর্কীদেরকে নাসিবাইন নামক স্থানে পরাস্ত করে ছিল। এতে ধারণা হয়েছিল যে ইবরাহীমের প্রভাব প্রতিপত্তি এশিয়া মাইনর পর্যন্ত পেঁাছে যাবে। এমন অবস্থায় আহমাদ পাশা কিউদান সমস্ত তুর্কী সৈন্যদেরকে ইস্কান্দারীয়াতে এনে উল্লিখিত মিসর সম্রাটের কাছে সমর্পণ করে দেন। যদি ইংল্যান্ড মধ্যে অবস্থিত না থাকতো, তবে খুবই সম্ভব ছিল যে, মিসর সম্রাটের কাছে সমর্পণ করেছেন। যদি ইংল্যান্ড মধ্যে অবস্থিত না থাকতো তবে খুবই সম্ভব ছিল যে, মিসর সম্রাট কন্স্টান্টিনোপল অধিকার করে নিতেন এবং তুর্কীদের রাজত্ব হয়ত চিরদিনের তরে ধরাপৃষ্ঠে হতে মুছে যেত।

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল মজীদের সময়ে ইংরেজরা সাইপ্রাস দ্বীপ অধিকার করতে চেয়ে ছিল। কিন্তু সুলতান তা হাত ছাড়া করতে প্রস্তুত ছিলেন না। পরিশেষে ১৮৭৮ খৃীস্টাব্দে যখন সফুওত পাশা' সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হলেন, তখন তিনি প্রথমেই উল্লিখিত দ্বীপকে ইংরেজদের কাছে সমর্পণ করছেন। আর সুলতানকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন যে, ইংরেজগণ 'বার্লিন'—কনফারেন্স আমাদেরকে সাহায্য করবে।

অধঃপতনের উল্লিখিত কারণগুলো বাস্তবিকই মৌলিক ছিল। তা'ছাড়া আরো ও যে সব অপকর্ম প্রকাশ পেয়েছিল, যেগুলো সংক্ষিপ্তভাবে পর্যায়ক্রমে নিম্নে বর্ণনা করা হল।

জীবিকা উপার্জন ও বৃত্তিমূলক কাজে অধঃপতন

তুর্কীগণ স্বভাবতঃই খুব কষ্ট সহিষ্ণু এবং পরিশ্রমী জাতি ছিলেন। যান্ত্রিক যুগের পূর্বে তাদের জীবন ধারণের পদ্ধতি বেশ ভাল ছিল। কেননা তাঁরা নিজ হাতে কৃষিকাজ, কারিগরী এবং বৃত্তিমূলক কর্ম সম্পাদনে পটু ছিলেন। তাঁরা পরিশ্রম ও দক্ষতার সাথে ঐ সব কাজ সমাধা করতেন। কিন্তু যখন যান্ত্রিক যুগ শুরু হয়ে গেল এবং হাতের বদলে যন্ত্রের দ্বারা কার্য সমাধা হতে লাগল - তখন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় তুর্কীদের জন্য যন্ত্রের দ্বারা কাজ করার খুব একটা সুবিধা ছিল না। সুতরাং এর ফলে জীবিকা উপার্জনের প্রতিযোগিতায় তুর্কীগণ আপন প্রতিবেশী জাতিদের সমকক্ষ হতে পারেনি। অতএব তাদের আর্থিক অবস্থা দৈনন্দিন খুবই শোচনীয় হতে লাগল।

আলিমগণের স্থবিরতা

জাতীয় অধঃপতনের এই প্রভাব আলিম সমাজের উপর ও পতিত হল, যাঁরা সাধারণ ও অসাধারণ জনগণের উপর এমন কি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ও নিজেদের একটা বিরাট প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁদের অনুভূতিহীন ও স্থবির অবস্থার বর্ণনা দিতে যেয়ে ঐতিহাসিক খালেদা আদীব খানম যে মন্তব্য করেছেন, তা'নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

"যখন পৃথিবীতে তর্কশাস্ত্রের দার্শনিকদের রাজত্ব চলছিল, তখনও এই আলিম সমাজ নিজেদের ধর্মীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। সুলায়মানীয়া মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসায়ে ফাতেহ্ তৎকালে সমস্ত প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল ছিল। কিন্তু যখন পশ্চিমারা তর্কশাস্ত্রের জিঞ্জির ছিড়ে ফেলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করল, তখন তা পার্থিব জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে দিল। তখন তা আলিম সমাজ শিক্ষকতার কর্তব্য সম্পাদনে অনুপযুক্ত হয়ে গেলেন। তাঁরা ভাবতেন যে, তের-শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমারেখা যেখানে ছিল, এখন পর্যন্ত ও এর চেয়ে অধিক অগ্রসর হতে পারেনি। তাদের এই চিন্তা ধারা ঊনবিংশ-শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত (তাঁদের) শিক্ষা পদ্ধতিকে বেষ্টন করে রেখেছিল। তদুপরি তুর্কী এবং অন্যান্য ইসলামী দেশগুলোর আলিমদের চিন্তাধারা ইসলামী প্রেরণার সাথে সম্পর্ক যুক্ত ছিল না।" (পূর্ব ও পশ্চিম তুরস্কের দ্বন্দ্ব" নামক দ্বিতীয় ভাষণ দ্রঃ)

এইসব আলিমগণ প্রাচীন পদ্ধতিরই অনুসারী ছিলেন। কোন নতুন ধরনের সংস্কার গ্রহণ করতে তাঁরা কখনও প্রস্তুত ছিলেন না। অতএব সুলতান তৃতীয় সালিম যখন (১২০৩-১২২২ হিঃ) শিক্ষা সম্বন্ধীয় এবং সৈন্যদের সংস্কারমূলক একটি স্কীম-প্রচলন করতে চাইলেন, যার ফলে তুরস্কে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হতে চললো এবং সৈন্যদেরকে নতুন যুদ্ধ বিদ্যার প্রতি পরিচিত করে নতুন নতুন অস্ত্র এবং যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করার প্রস্তুতি নিলেন ঠিক তখনই এই স্কীমের বিরুদ্ধে ঐসব আলিমদের পক্ষ থেকেই অধিক বিরোধিতা শুরু হল। শায়খুল ইসলাম আতাউল্লাহ আফিন্দী তো ফতোয়া দিয়েই দিলেন যে, সৈন্যদের নতুন ধরনের পোশাক পরিধান করা ইসলামী পদ্ধতির পরিপন্থী। তুরস্কের একজন বিখ্যাত সৈনিক ও সংস্কারের বিপক্ষে গিয়ে উলামাদের পক্ষাবলম্বন করেন। ফলে সৈন্যরা-সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হল। আর যে সমস্ত মন্ত্রীবর্গ এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সংস্কারের ব্যাপারে সুলতানের পক্ষে ছিলেন তাঁদেরকে বেছে বেছে মাঠে নিয়ে আসা হত এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হত। ঐতিহাসিকগণ

বর্ণনা করেন যে, এই হত্যাকাণ্ড দু'দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। সুলতান সালিম সৈন্যদের এইরূপ আত্মকলহ এবং ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ দেখে অবশেষে বাধ্য হয়ে সমস্ত সংস্কারমূলক পরিকল্পনা বাতিল ঘোষণা করেন। কিন্তু এই বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের রোষাগ্নি নির্বাপিত হচ্ছিল না। পরিশেষে ঐসব লোকেরা— প্রধান মুফতী-এবং শায়খুল ইসলামের নিকট থেকে শরীয়ত সম্মত বৈধ সনদগ্রহণ করে সুলতান সালিমকে অপসারণ করেন।

১২৯৩ হিজরীতে যখন সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন-তখন তিনিও রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা শোচনীয় দেখে এবং পার্শ্ববর্তী বৈদেশিকদের উন্নতিতে প্রভাবান্বিত হয়ে রাজ্যের কিছু সংস্কারমূলক স্কীম পরিচালনা করতে চাইলেন। কিন্তু এই বেচারার ও সেই পরিণতি হল। ইসলামী শরীয়তের দোহাই দিয়ে সৈন্যদের কিছু অংশ সংস্কার পদ্ধতির বিরোধিতার জন্যে উঠে দাঁড়াল। পরিশেষে শায়খুল ইসলাম থেকে ফতোয়া-সংগ্রহের পর সুলতানকে রাজসিংহাসন থেকে অপসারণ করে দিল।

তুর্কীদের প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিসমূহের জাগ্রতা

একদিকে তো তুর্কীদেরকে স্থবিরতা, অনুভূতিহীনতা, অলসতা এবং মূর্খতার অন্ধকার আচ্ছন্ন করে রেখেছেন, অন্যদিকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপ-সবেমাত্র মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুল-বাগিচায় নিঃশ্বাস নিতেছিল। তাদের সৈন্যরা নতুন নতুন যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত হচ্ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপীয় জাতিসমূহের অন্তরে স্বভাবতঃই একটা প্রেরণা সৃষ্টি হল যে, কিভাবে তুরস্ককে বিভক্ত করা যায় এবং এই রুগ্ন মানুষটিকে এমন আঘাত হানার প্রয়োজন, যাতে দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটে। ইউরোপীয়দের এইরূপ চিন্তাধারার ফলে ইটালী, গ্রীক, রাশিয়া এবং অন্যান্য বালকানী রাজত্ব—ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তুর্কীদের উপর আক্রমণ শুরু করল। ফলে উসমানীদের অধিকৃত এলাকাসমূহ একের পর এক তুর্কীদের অধিকার থেকে বের হয়ে যেতে

শুরু করল। পেলুনার যুদ্ধের পর বালকান এবং বিশ্বযুদ্ধের কথা আজো-অনেক লোকের অন্তরে স্মরণীয় হয়ে আছে। ফলে রোম সাগরের বিখ্যাত দ্বীপ ক্রীট, কাবরাস এবং মাল্টা তুর্কীদের হাত ছাড়া হল। অতঃপর বাগদাদ, শাম, লেবানন এবং ফিলিস্তিন—থেকে মোসেল পর্যন্ত সমগ্র এলাকা তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হল। যে সব বালকানী রাজত্ব তুর্কীদের শাসনে ছিল তাও স্বাধীন হয়ে গেল। এশিয়া মাইনর ও বিভক্ত হয়ে গেল।

আরবদের বিদ্রোহ

বিশ্ব যুদ্ধের—(১৯১৪ - ১৯১৮) সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হল—তুরস্ক -সুলতান সালিম আউয়ালের থেকে তখন পর্যন্ত বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং রাজনৈতিক শোচনীয় অবস্থা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও নিজেকে 'খাদেমুল হারামায়নুশ্ শারীফায়ন' বলে-গর্ববোধ করছিল। এর সাথে আরবরা বিশেষ করে শরীফ মক্কা খুবই বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রবঞ্চনার কাজ করল। তাদেরকে 'স্বাধীন আরব স্টেইট' এর এমন শস্য-শ্যামল বাগানের স্বপ্ন দেখানো হল যে, তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এবং নিজেদের ধর্মীয় কর্তব্যবোধ থেকে চক্ষুবন্ধ করে তুর্কীদের শত্রুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল এবং যে সমস্ত তুর্কী সৈন্য হিজাযের মধ্যে ছিল তাদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে দিল। (কিন্তু শুকরীয়ার বিষয় যে, পরিশেষে আরবদের মাঝে নিজেদের ভুল বুঝার অনুভূতি সৃষ্টি হতে লাগল এবং তারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হল।

খিলাফতের পরিসমাপ্তি

যাই হউক তুরস্কের 'রুগ্নব্যক্তি'-এর-দুর্বলতা এমন চরমসীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল যে, যদি মুস্তফা কামাল এবং তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মত কিছু সংখ্যক চিন্তাশীল, সাহসী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী নওজোয়ান সৃষ্টি না হতেন, তবে সে (তুরস্ক) জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ফলেই ধরা পৃষ্ঠ হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কিন্তু তুর্কীদেরকে-শত্রুদের নাকের ডগার উপর

দিয়ে এমন পর্যন্ত পৃথিবীতে একটি সজীব জাতি হিসেবে টিকে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল। তাই মুস্তফা কামালের মত বীর পুরুষের মাধ্যমে এই মৃতদেহে আবার এক নতুন জীবনের সঞ্চার হল। আজ সে (তুরস্ক) এমন শক্তিশালী যে, পশ্চিমের বড় বড় রাষ্ট্রের চোখের উপর চোখ রেখে কথা বলার শক্তি সাহস অর্জন করেছে।

তুর্কীরা আজ জীবন্ত। তাদের নিকট হতে যেসব এলাকা গ্রীক দেশীয়রা ছিনিয়ে নিয়ে ছিল, ঐসব এলাকা ও তারা আবার ফিরে পেল। কারিগরী, কৃষি, শিক্ষা, সাংস্কৃতি, সৈন্যদের শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির দিক দিয়ে তারা আজ ইউরোপের কোন জাতি থেকেই পিছিয়ে নেই। কিন্তু তুরস্ক শুধু নিজের জন্যেই জীবনীশক্তি ফিরে পেল। ১৯২৩ খৃীস্টাব্দে যখন সেখানে খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটল, তখন থেকেই ইসলামী জগত থেকে এর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। তবে তুরস্ককে পশ্চিমা জাতিদের সমকক্ষ হওয়ার প্রেরণার মাঝে মুসলমান হওয়ার দিক থেকে (المؤمنون اخوة) 'মুসলমানগণ পরস্পর ভাই' এই শিক্ষা স্মরণ ছিল কিনা এর ফায়সালা এখন নয়, বরং ভবিষ্যতেই হবে।

বর্তমান অবস্থা

আজকাল আমাদের অনেক সুচিন্তিত ব্যক্তিবর্গ বলে থাকেন যে, মুসলমানগণ উন্নতির পথে। তুরস্কের ন্যায় ইরান এবং মিসর ও উন্নতির রাজ পথে চলমান। আফগানিস্তান ও নতুন সভ্যতা এবং কৃষ্টির আলোকে আলোকিত। হ্যাঁ, এই সবই যথার্থ। কিন্তু এই সত্যটাও কখনও ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, যদি ঐসব ইসলামী দেশসমূহের উন্নতি মুসলমান এবং ইসলামের উন্নতির জন্যে হয়ে থাকে, তবে এ বিষয়ে আমাদের চেয়ে আর কারো অধিক আনন্দিত হওয়ার অধিকার নেই। কিন্তু আল্লাহ্ না করুন। যদি প্রকৃত অবস্থা এমন না হয়ে বরং আফগানিস্তানের উন্নতি শুধু আফগানীদের জন্যে, তুরস্কের উন্নতি শুধু তুর্কীদের জন্যে এবং ইরান ও মিসরের উন্নতি শুধু ইরানী ও মিসরীয়দের জন্যে হয়, তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলাম এই সব দেশকে তাদের উন্নতির জন্য মুবারকবাদ দিতে পারে না।

স্পেনে-মুসলমানদের রাজত্ব ও তার পতন।

বনু উমাইয়াগণ বিভিন্ন বিজয়ের দিক দিয়ে যে বিরাট কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, তন্মধ্যে স্পেন বিজয় এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু এই দ্বীপ জয় করা এবং শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করা মুসলমানদের জন্য এক গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি। এমনিভাবে এই দেশকে নিজ হাতেই ধ্বংস করে ফেলা এবং সেখান হতে অপমানিত হয়ে বেরিয়ে আসা তাদের জন্য এক লজ্জাজনক কলংকের দাগ। আমরা নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে এর ইতিহাস বর্ণনা করবো, যেন মুসলমানগণ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এবং নিজেদের অতীত থেকে ভবিষ্যতের জন্যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

স্পেনকেই হাস্পানীয় কিংবা উন্দুলুস বলা হয়ে থাকে এটা ইউরোপের দক্ষিণ ও পশ্চিমে একটি উপদ্বীপ। এর সীমানা দু'লক্ষ বর্গমাইল থেকে ও অধিক। এর জল-বায়ু সমগ্র ইউরোপের রাজ্যসমূহ থেকে উত্তম ও নাতিশীতোষ্ণ এবং আরামদায়ক। 'ওয়াদীউল কাবীর' এবং 'টেগ্সী' দু'টি বিখ্যাত নদী সেখানে প্রবাহমান। এগুলো থেকে আরো কয়েকটি ছোট-ছোট নদী বের হয়ে দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র দেশটিকেই যেন গুলিস্তানে পরিণত করেছে।

মুসলমানদের আক্রমণের পূর্বে এখানে শতাব্দী পর্যন্ত 'গাথ' বংশের রাজত্ব ছিল। সেই বংশের শাসক রাডরকের সময়ে উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালিকের অনুমতিক্রমে উত্তর আফ্রিকার গভর্নর মুসা ইবনে নাসির এই দেশ জয় করার ইচ্ছে করে।[১]

---

১. ইবনে আমীর তাঁর লেখা 'তারিখুল কামিল' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ড ২৬৯ পৃষ্ঠায় (১৩০৯ খ্রীস্টাব্দে ছাপা) এই আক্রমণ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, স্পেনের রাজ বংশের প্রথা ছিল যে, তাঁরা স্বীয় ছেলে মেয়েদেরকে 'তালিতালাহ' এর বাদশাহর কাছে শিষ্টাচার শিক্ষার জন্যে প্রেরণ করতেন। এই প্রথানুযায়ী 'ইউলীন' নামী এক ব্যক্তি ও তাঁর স্বীয় কন্যাকে সম্রাট 'রডারকের' কাছে প্রেরণ করেন, যেন সে শিষ্টচারিতা শিক্ষা করতে পারে। তাঁর কন্যাটি ছিল খুবই সুন্দরী। রডারক তার প্রতি আসক্ত হয়ে জোর পূর্বক ধর্ষণ করেন। মেয়েটি প্রকৃত ঘটনা পিতার কাছে খুলে বলল। পিতা ইহা শ্রবণ করে খুবই উত্তেজিত হন এবং মূসা ইবনে নাসিরকে স্পেন আক্রমণের জন্যে উৎসাহ প্রদান করেন। অতঃপর মূসা ইবনে নাসির যে সেনাদল প্রেরণ করেছিলেন ; 'ইউলীন' ছিলেন উহার পথ প্রদর্শক।

প্রথমতঃ পাঁচশো লোকের একটি গুপ্তচর বাহিনী প্রেরণ করে তথাকার আভ্যন্তরীণ এবং রাজনৈতিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেন। অতঃপর ৯২ হিজরীতে নিজের স্বাধীন কৃতদাস তারিক ইবনে যিয়াদ এর তত্ত্বাবধানে সাত হাজারের একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই 'বারবার' সৈন্য ছিল। এই সেনাদল নৌকাযোগে বার মাইলের দূরত্ব 'প্রণালী' অতিক্রম করে স্পেনে প্রবেশ করেন। আর এখানকার পূর্বাঞ্চলীয় সমুদ্র তীরবর্তী বিস্তীর্ণ পাহাড়ী এলাকা অধিকার করেন। এই পাহাড়ী স্থানকে সেনাপতি তারিকের নামানুসারে 'জাবালে তারিক' এবং ইংরেজীতে 'জিব্রাল্টার' বলা হয়। এবার মুসলমানগণ সেখান থেকে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন এবং পাহাড়ী অঞ্চল ছেড়ে সমতল ভূমির দিকে অগ্রসর হলেন। অতঃপর 'খাযরা-দ্বীপ বিজয় করেন। রাডরক' তখন অন্য এক যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। যখন তিনি মুসলমানদের আক্রমণের সংবাদ পেলেন, তখন তিনি একলক্ষ বীর সেনাবাহিনী নিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলার জন্যে অগ্রসর হলেন। সেনাপতি তারিকের আবেদনের পরিপেক্ষিতে মূসা ইবনে-নাসির আরো পাঁচ হাজার সৈন্য ইসলামী-মুজাহিদদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। এবার মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা সব মিলিয়ে বার হাজার হল। অপর পক্ষের সৈন্য সংখ্যা ছিল একলক্ষ। তা' ছাড়া-মুসলমানগণ ছিলেন সেই দেশে অপরিচিত। আর স্পেনের সৈন্যদের জন্যে তা' তো-ছিল-স্বদেশ। এই অবস্থা দেখে তারিক নিজেদের সমস্ত নৌকা, জাহাজ ধ্বংস করে দিয়ে সৈন্যদেরকে লক্ষ্য করে এক উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ দেন। তিনি বলেন, "হে মুসলমানগণ! সমুদ্র তোমাদের পিছনে এবং শত্রু তোমাদের সামনে। এমন এই দুটির যে কোন এক অবস্থা গ্রহণ কর। (অর্থাৎ পলায়ন করলে সমুদ্রে ডুবে মরতে হবে। আর সামনে অগ্রসর হলে একলক্ষ সেন্যের মুকাবিলা করতে হবে। এমতাবস্থায়-বীর বিক্রমে-যুদ্ধ করে শহীদ অথবা-'গাযী' হওয়ার গৌরব অর্জন করাই (শ্রেয়।) এই ভাষণের এমন প্রতিক্রিয়া হল যে, মুসলমানগণ বীর বিক্রমে-সামনের দিকে পঙ্গ-পালের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতে শত্রু সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এই যুদ্ধ লাকাহ নদীর তীরে হয়েছিল। রাডরক

যুদ্ধে পরাজিত হয়ে খুবই ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং এমনভাবে পলায়ন করলেন যে, তৎপর তাঁর আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

ইবনে আসীরসহ আরো কয়েকজন ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন যে, রাডরক সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ করেন। প্রথমতঃ স্পেনবাসীদের ধারণা ছিল যে, মুসলমান আর আগে বাড়বে না, শুধু ধনরত্ন নিয়ে চলে যাবে। এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই-রাডরক যেহেতু রাজবংশের ছিলেন না, তাই রাজবংশের সদস্যরা এবং অন্যান্য আমীর উমারা ও রাজ্যের বিনষ্ট ব্যক্তিবর্গ আন্তরিকতার সাথে রডারকের সাহায্য করেননি। তাঁরা-চেয়ে ছিলেন যে, রডারক এই যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যাক। আর মুসলমানরা-যদি ধনুরত্ন নিয়ে চলে যায় তো-ভাল। অন্যথায় হয়তঃ রাজবংশের কোন ব্যক্তিকে স্পেনের বাদশাহ ও বানিয়ে দিতে পারে। কিন্তু মুসলমান সৈন্যগণ তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী 'খাজরা' বিজয় করার পর ও তাদের অগ্রযাত্রা চালু রাখেন। আর প্রদেশের পর প্রদেশ জয় করতে করতে পরিশেষে 'পীরিনীয' পর্বত অতিক্রম-করে ঐ স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন, যা' আজ ফ্রান্সের সীমান্তের অন্তর্গত।

সেনাপতি তারিকের ক্রমাগত বিজয়ের সংবাদ শুনে, মুসা ইবনে নাসির ও এক সেনাবাহিনী নিয়ে তথায় উপনীত হলেন। এর ফলে ইসলামী সৈন্যর শক্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে ইসলামী সৈন্যরা ফ্রান্সের সীমানার মধ্যে আর-কোন স্থান জয় করতে পারেননি।

মুসা ইবনে-নাসির এবং তারিক-উভয়ই স্পেনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসায় লিপ্ত ছিলেন। এই কারণেই সেখানকার খবর রাজদবারে যথাশীঘ্র পৌঁছেনি। এতে ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিকের অন্তরে মুসা ইবনে নাসির সম্পর্কে নানা প্রকারের কু-ধারণা ও সন্দেহ সৃষ্টি হতে লাগল। এমনকি ইবনে কুতায়বা বর্ণনা করেন যে ওয়ালীদ শহরের কাযী সাহেবকে নামাযান্তে মুসার প্রতি বদ-দুআ করার নির্দেশ দেন। এমন সময় মুসার দূত বিজয়ের শুভ সংবাদ নিয়ে দামেশ্‌ক্‌ উপস্থিত হলেন এবং সেখানকার মসজিদে তিনি শুনতে পেলেন যে, মুসার প্রতি বদ-দু'আ করা হচ্ছে।

তখন তাঁর খুবই দুঃখ ও আক্ষেপ হল। তিনি বললেন, হে জনগণ! তোমরা মুসার প্রতি বদ-দু'আ করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে-ভয় কর। আমি এই মাত্র তাঁর নিকট হতে চলে এলাম। তিনি খলীফার অবাধ্য ও হননি এবং ইসলামী জামআতকে পরিত্যাগও করেননি। তিনি মুসলমানদের সম্মান রক্ষার জন্যে মুশরিকদের প্রতিরোধ যুদ্ধে সংগ্রামরত আছেন। আল্লাহ্‌তা'আলা তাঁর হাতে মুসলমানদেরকে যে সব বিজয় ও মালে গনীমত (যুদ্ধে শত্রুদের পরিত্যক্ত সম্পদ) প্রদান করেছেন, তোমরা তা শুনলে নিশ্চয়ই অতিশয় আনন্দিত হবে। অতঃপর দূত-ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালিকের রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে স্পেন বিজয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দেন। ইহা শুনে ওয়ালীদ আল্লাহ্‌র দরগায় কৃতজ্ঞতার সিজদায় নিপতিত হন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই অবস্থায় পড়ে থাকেন। (কিতাবুল ইমামাত ওয়াস্‌সিয়াসাত গ্রন্থের ২য় খণ্ড ১১৯-১২০ পৃঃ দ্রঃ)

যা হউক তখনও স্পেনের যাবতীয় বিষয় পরিপূর্ণভাবে মীমাংসা হয় নাই। এমতবস্থায় দরবারে খিলাফত—থেকে মুসার নামে এক জরুরী পত্র এল। তাতে মুসাকে অতিসত্বর রাজ-দরবারে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হল। তিনি যথাশীঘ্র ঐ সব বিষয় থেকে অবসর হয়ে স্বীয় পুত্র আবদুল আযীযকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে ৯৪ হিজরীতে শাম চলে এলেন।

স্পেনে মুসলমানদের কীর্তিসমূহ

(৯৪ হিজরী থেকে) ৮৯৭ হিজরী পর্যন্ত মুসলমানগণ ঐদেশে রাজত্ব করেন। এই দীর্ঘ সময়ে জীবনের বিভিন্ন স্তরে তাঁরা যেসব গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি স্থাপন করেছেন, তা' ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সদা চির-ভাস্বর ও চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়ে বিরাট ইতিহাস রচিত হয়েছে। আমরা নিম্নে স্পেনের কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস থেকে কিছু বিখ্যাত ঘটনার সারাংশ হিসেবে উত্থাপন করতে চাই। যা' পাঠ করে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ঐ সমস্ত কীর্তির একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা পেতে পারেন।

নিম্নের বর্ণনা সম্পর্কে লেখক বলেন যে, মূল গ্রন্থটি আমার সামনে নেই। তাই আমি ইহা-দায়েরাতুল মা'রেফ" নামক গ্রন্থের স্পেন সম্পর্কে বর্ণিত ঘটনা থেকে উদ্ধৃত করেছি।)

আরবরা যেহেতু কৃষি ও ব্যবসায়ের মূলনীতি সম্পর্কে খুবই জ্ঞাত ছিল এবং এ সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতাও ছিল। সুতরাং এর পরিপ্রেক্ষিতেই তারা স্বীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে স্পেনের শহরগুলোকে ফলে ফুলে সুশোভিত করে গুলিস্তানে পরিণত করলো। এক শহরের সাথে অন্য শহরের ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলল। যার ফলে পারস্পারিক বন্ধুত্ব ও আর্থিক সচ্ছলতা সাধারণ হয়ে গেল। আদিকাল থেকেই আরব এবং বারবারদের মাঝে-একে অন্যের প্রতি যে ঘৃণা ভাব ছিল, তা মিটে যেতে লাগল। স্পেনের আরবরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে, কৃষি ও কারিগরি পেশায় চরিত্র ও চাল-চলনে ইউরোপীয়দের থেকে অগ্রগামী ছিল। 'কুসতীলাহ্' এর ইংরেজ সম্রাট ও আরবদের হৃদ্যতা এবং ভদ্রতার প্রতি ধারণা ছিল। কুরআনের উপর বিশ্বাস ও আমল করার কারণে তারা বংশ গৌরবকে প্রাধান্য দিত না; বরং ব্যক্তিগত চরিত্র ও কর্মকেই সম্মানের মাপ কাঠি মনে করতো।

আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষি কারিগরী, খিলাফত ও অন্যান্য সেবা-মূলক কাজকর্মে তাদের হস্তছিল সিদ্ধ। পুরুষ ব্যতীত স্ত্রী লোকরা পর্যন্ত তর্কশাস্ত্র চিকিৎসা-বিদ্যা অলংকার-শাস্ত্র, জ্যামিতি-বিদ্যা বিতর্ক সভা, রসায়ন বিদ্যা এবং ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিল। তাদের পাঠাগারসমূহ গ্রীকদের প্রাচীন আলিমগণের এবং আলেকজান্দ্রিয়ার দার্শনিকদের অনূদিত পুস্তকে পরিপূর্ণ ছিল। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে-রোমের পোপ-'গোবরাট' এই সব পাঠাগার থেকে স্বার্থ উঠায়ে এমন অভূতপূর্ব ও আশ্চর্যজনক জ্ঞানের পরিচয় স্বজাতির সামনে পেশ করেন যে, তারা এতে আশ্চর্যান্বিত হয়ে পোপকে যাদুকরের অপবাদ দিতে লাগল।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়াও কারিগরী, কৃষি এবং হস্তশিল্পে আরবরা ছিল খুবই দক্ষ। তারা রোমী ও ইংরেজদের বিভিন্ন বিদ্যার মূলনীতি সম্পর্কে

জ্ঞান অর্জন করে খনিজ পদার্থের সন্ধানে অভিযান চালাতে লাগল। ফলে অনেক নতুন খনি যেমন পারদ ও ইয়াকুতের খনি আবিষ্কার করল। স্পেনের সমুদ্রতীরের কাছেই 'মারজানের এবং তারা গোনাহ্' এর নিকটে মোতির খনি আবিষ্কার করল। তা ছাড়াও-কাঁচা চামড়া পাকা করার কৌশল, তুলা দিয়ে কাপড় তৈরীর কারিগরী নিপুণতা-ও দক্ষতা অর্জন করল। রেশমী এবং সুতার কাপড় তৈরীর করে হস্তশিল্পের খ্যাতি অর্জন করল। পূর্বাঞ্চলের এবং আফ্রিকার সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের লোকেরা জানতো যে, তীরের ফলক অর্থাৎ উত্তম 'সোফার' তালি তালাহ্তেই তৈরীর হয়। গ্রানাডা-বা গানাতাহ্ এর-রেশেম-জগত বিখ্যাত ছিল। জরির পোশাক এবং চামড়ার পোশাক ইত্যাদির ফ্যাক্টরী-ছিল কর্ডোভা-নগরীতে আরবরা-নিজেদের তৈরী-শিল্পদ্রব্য প্রাচ্যের বিভিন্ন-দেশের বণিকদের কাছে রফতানী করতো—এবং এর বিনিময়ে তারা-আগরবাতি, লং, সুগন্ধি দ্রব্য খুরাসানের মিহি সূক্ষ্ম পশমযুক্ত পশু কিংবা-এর চামড়া, ইরানের গালিচা-ও বিছানা ইত্যাদি আমদানি করতো।

বালিনিশাহ এবং গ্রানাডার বা অনাবাদী ও চারণ ভূমিকে-সেচের মাধ্যমে চাষাবাদের উপযোগী করে তুলতে কঠোর পরিশ্রম শুরু করল। তাঁরা তোনাহ নদীকে—সমুদ্রে পতিত হওয়ার ছয় মাইল পূর্বে-এক বাঁধ দিয়ে পানি আটকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলো। আর সেখান থেকে আরো সাতটি গভীর খাল খনন করায়ে বিভিন্ন স্থানে পানির স্রোত ধারা প্রবাহিত করল। প্রতিটি খাল সপ্তাহে একবার খুলে দেয়া হত, যেন পানির উচ্চতা সমতল ভূমি পর্যন্ত পেঁছিতে পারে। অতঃপর প্রতিটি খালকে বহু-নালা এবং উপনালায় বিভক্ত করে দেয়া হয়, যাতে ছোট বর্গক্ষেত্রের মত ভূমিতে ও পানি সমানভাবে পেঁছিতে পারে। এই সব-খাল নালা এবং উপনালা ব্যতীত ও পানি আটকিয়ে রাখার বড় বড় জলাশয়; হাউজ, পুকুর ইত্যাদির ব্যবস্থা করল। যাতে যথা সময়ে শস্য ক্ষেত্রে পানি সেচন করা যায়। পানি সেচের এইরূপ ব্যবস্থার ফলে-আরবরা-অনাবাদী ও অনুর্বর ভূমিকে ও শস্য-শ্যামল এবং ফলে ফুলে সুশোভিত করে বাস্তবিকই স্পেনকে গুলিস্তানে পরিণত করেছিল।

আরবরা-স্পেনে-কৃষিকার্যের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে কৃষিবিদ্যাকে একটি পৃথক জ্ঞানের শাখায় রূপান্তরিত করল। তারা এত উন্নত করল যে, বছরের একটি দিন ও কোন ভূমি শস্যহীন অবস্থায় পতিত থাকতো না। একটি শস্য কর্তনের পরক্ষণেই আবার অন্য শস্যের বীজ বপন করার ব্যবস্থা করা হত। এমনিভাবে বছরে তিনটি ফসল উৎপন্ন করত। ধান ভূট্টা, যাফরান, খেজুর, পেস্তা, কলা, অড়হর বা-ডাল, বড় তুত আনার, তুলা এবং বিভিন্ন প্রকারের ফল-ফুল এবং তরিতরকারী উৎপন্ন করে স্পেনের প্রত্যন্তরে প্রেরণ করতো এবং সেখান থেকে এইসব উৎপন্ন কৃষি দ্রব্য সমগ্র ইউরোপে রফতানী হত।

তা' ছাড়াও স্পেনের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ব্যাপক প্রচলনের উল্লেখ করে ঐতিহাসিক 'সাদিউ' বর্ণনা করেন যে, "স্পেনের যে অংশের উপর মুসলমানদের রাজত্ব ছিল, উহা ছয়টি প্রদেশ, আশিটি বড় বড় শহর, তিনশোটি ছোট ছোট নগর এবং অসংখ্য গ্রাম ও গঞ্জে বিভক্ত ছিল। শুধু কর্ডোভা নগরীতেই দু'লক্ষ পরিবার, ছয়শো মসজিদ, পঞ্চাশটি হাসপাতাল, আশিটি বে-সরকারী কলেজ এবং নয়শো হাম্মাম খানা ছিল। আর তাই শহরের লোক সংখ্যা ছিল দশলক্ষ। রাজ্যের অন্যান্য আয় ব্যতীত শুধু মালে গনীমত কিংবা-ইয়াহুদী এবং খ্রীস্টানদের নিকট হতে জিযিয়া কর হিসেবে—বাৎসরিক যে আয় হত-এর পরিমাণ ছিল আনুমানিক এক কোটি বিশ লক্ষ-পঁয়তাল্লিশ হাজার-দীনার এতেই সমগ্র দেশের উন্নত ধরনের পাকা ঘরবাড়ি তৈরী করেন-যা' তখনকার পৃথিবীতে-অদ্বিতীয় ছিল। শুধু কর্ডোভার একটি মসজিদের কথাই ধরা যাক না কেন। যা এখন ও বিদ্যমান আছে এবং ইহা বৃহত্তের দিক দিয়ে দামেশকের জামে উমুববী এর সমকক্ষতার দাবীদার। এই মসজিদের দৈর্ঘ্য ছিল-৬০০ গজ এবং প্রস্থ ছিল-২৫০ গজ। এর ডান পার্শ্বে ৩৮ টি এবং বাম পার্শ্বে ছিল-২৯টি প্রশস্ত মাঠ। এক হাজার তিরানব্বইটি ছিল-মর্মর-পাথরের থাম। দক্ষিণ দিকে ছিল-১৯টি দরজা তামার পাতে মোড়ানো। দালানের মধ্যভাগে ছিল স্বর্ণের পাত,— চাদরের আকৃতিতে ঝুলানো। আর ওটার ছিল তিনটি সর্বোচ্চ সোনালী গম্বুজ এবং তার উপরে ছিল হীরার একটি আনার।

এই মসজিদে প্রতি দিনের সন্ধায় চার হাজার সাতশো প্রদীপে আলো জ্বলতো। তন্মধ্যে মেহরাবের নিকট প্রদীপটি-ছিল খাঁটি সোনার। এতে প্রতি বছর ৩৪ হাজার 'রতল' (একরতল (رطل) অর্ধসের) তৈল এবং এবং একশো বিশ রতল সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহৃত-হত।

কর্ডোভার মসজিদ ব্যতীত খলীফা-তৃতীয় আব্দুর রহমান-কর্ডোভা থেকে কয়েক মাইল দূরে নিজের প্রিয়তমা খৃষ্টান বিবি-যহ্‌রার জন্যে যে বিশাল রাজমহল তৈরী করেছিলেন, উহাও ছিল-বিশেষ কারিগরী নিপুণতা-এবং সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এক অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় ইমারত ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন যে, ঐ প্রাসাদটি চার হাজার তিনশো থামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই থামগুলো তৈয়ার করা হয়েছিল রং-বেরঙের মর্মর পাথর দ্বারা। আর তাতে বিভিন্ন প্রকার কারুকার্য দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছিল। ঐ থামগুলোর-কিছু সংখ্যক ফ্রান্স এবং কনস্টান্টিনোপলের বাদশাহগণ—আব্দুর রহমানের নিকট প্রেরণ করেছিলেন উপঢৌকন হিসেবে। আর কতগুলো থাম আফ্রিকা থেকে এনেছিলেন ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে। থামের ন্যায় ইমারতের দেয়াল এবং ছাদও বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান পাথর যেমন-আকীক ইশব, ইয়াকুত এবং লাজোয়ার্দ ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। ছাদে ঐ সব পাথর ছাড়াও স্বর্ণ লাগানো হয়েছিল।

রাজমহলের প্রশস্ততার অনুমান এই একটি কথার দ্বারাই হতে পারে যে, তাকে 'কাসরুয্‌যহ্‌রা' বলার পরিবর্তে সাধারণতঃ 'মাদীনাতুয্‌যহ্‌রা' ও বলা হতো। এই প্রাসাদের প্রশস্ত হল ঘরসমূহের স্থানে স্থানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং মিঠা পানির হাউজ ও ফোয়ারা—নির্মিত হয়েছিল। তন্মধ্যে একটি সবচেয়ে বড় ফোয়ারা যাঁ' স্বর্ণের তৈরী বলে-মনে হচ্ছিল। তাতে মনোহর কারুকার্য খচিত ছিল। তাদের একটি ফোয়ারা আনা হয়েছিল কনস্টান্টিনোপল-থেকে এবং অপর আর একটি সবুজ পাথরের তৈরী আনা হয়েছিল শাম থেকে। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন যে, সবুজ রঙের পাথরে তৈরী ফোয়ারাটিতে লাগানো ছিল কয়েক-ডজন পশু-পাখির মূর্তি, যা বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান পথের এবং স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত ছিল। সেগুলোর মধ্য থেকে প্রতিটি পশু কিংবা পাখীর মুখ দিয়ে পানির ফোয়ারা বের হতো। ঐ প্রাসাদের একটা অংশকে 'কাস্‌রুল খুলাফা' বলা হতো,

ওটার ছাদটি ছিল খাঁটি সোনার দেয়ালগুলো এমন পরিষ্কার মর্মর পাথর দ্বারা তৈরী ছিল যে, একদিকের বস্তু বিপরীত দিকে দৃষ্টিগোচর হতো। প্রাসাদের মধ্যস্থলে ছিল একটি খুবই সুন্দর মূল্যবান পাথরে কারুকার্য খচিত ফোয়ারা। এর উপরিভাগে ছিল একটি মূল্যবান মোতি। এই মূল্যবান মোতিটি গ্রীকের সম্রাট সুলতান আবদুর রহমানকে উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন। তাছাড়াও অন্য আর একটি ফোয়ারা ছিল থালের আকৃতিতে পারদ ভর্তি। প্রাসাদের মধ্যে চার পার্শ্বে ছিল হাতীর দাঁতের উপর চৌকাঠের মধ্যে লাগানো মনোহর দর্পণ। বিভিন্ন প্রকার সুন্দর কাঠের কারুকার্য খচিত দরজাগুলো দণ্ডায়মান ছিল মর্মর পাথর এবং উজ্জ্বল বেলওয়ারী বা জাওহরের চৌকাঠের উপর। যখন দরজাগুলো খোলা হতো এবং সূর্যের আলোতে প্রাসাদ আলোকিত হতো, তখন কারো সাধ্য হতো না যে, সে ছাদ কিংবা দেওয়ালের দিকে দৃষ্টিপাত করে। এমতাবস্থায় যদি কেউ পারদ ভর্তি পাত্রটি হেলাতো তবে মনে হতো যে, সমগ্র প্রাসাদটিই যেন নড়াচড়া করতেছে। যারা এর গোপন রহস্য অবগত নয়, তারা এ অবস্থা দেখে ভীত হয়ে যেতো।

'কাসরুয্‌যহুরা' এর ব্যবস্থাপনা, পরিচর্যা ও তত্ত্বাবধানের জন্যে নিযুক্ত ছিল তের হাজার সাতশো পঞ্চাশজন কর্মচারী। অন্দর মহলে বেগমদের খিদমতে নিয়োজিত থাকতো ছয় হাজার মহিলা। পানির হাউজে অন্যান্য বস্তু ব্যতীত শুধু বার হাজার রুটি দৈনিক রঙ-বেরঙের মাছের খোরাকী দেয়া হত। অনুমান করা হয় যে, এই প্রাসাদটিতে আমাদের দেশের বর্তমান (ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম) মুদ্রার হিসেবে প্রায় বিশ কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা খরচ হয়ে ছিল। উহার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় চার মাইল এবং প্রস্থ ছিল তিন মাইল। ৩২৫ হিজরীতে উহার নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে বিশ বছরে উহা সমাপ্ত হয়।[১]

---

[১] 'কাসরুয যহুরা' সম্পর্কে উল্লিখিত বর্ণনার অধিকাংশই বর্তমান কালের বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাওলানা আকবর শাহ খান নাজিব আবাদীর মাসিক পত্রিকা 'ইবরত' এর পঞ্চম খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যা থেকে গৃহীত হয়ে।

স্পেনে ইসলামী রাজত্বের বিভিন্ন যুগ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমানগণ উমাইয়া খলীফা সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিকের সময়ে ৯২ হিজরীতে স্পেন বিজয় করেন। সেই সময় থেকে ১৩২ হিজরী বনী উমাইয়াদের রাজত্বের শেষ সময় পর্যন্ত তার সম্পর্ক যত সময় উমাইয়াদের রাজধানী দামেস্কের সঙ্গে ছিল। আর এখানকার শাসনকর্তা সেখান থেকেই নির্বাচিত হয়ে আসতো। উমাইয়া খিলাফতের শেষে বনী আব্বাসীদের প্রথম খলীফা সাফ্ফাহ্‌র সময়েও তার সম্পর্ক খিলাফতের সঙ্গে ছিল। কিন্তু সাফ্ফার পরে মানসুর যখন রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি বনী উমাইয়াদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে তাদেরকে বে-পরওয়াভাবে হত্যা করতে শুরু করলো। সৌভাগ্যক্রমে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের বংশের এক সন্তান আবদুর রহমান মানসুরের সাধারণ হত্যালীলা থেকে কোনক্রমে বেঁচে পলায়ন করেন। তিনি ইরাক, শাম, মিসর এবং মারাকাশ হয়ে স্পেনে পৌঁছেন। এখানকার বনী মারওয়ানরা তাঁকে হাত পেতে লোফে নিল। ১৩৮ হিজরীতে তাঁর হাতে সকলেই বয়আত করল। তখন ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান, যিনি স্পেনের তৎকালীন গভর্নর ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু যুদ্ধে আবদুর রহমানেরই বিজয় হল। ১৪১ হিজরীতে তিনি যথা নিয়মে সর্বসম্মতিতে স্পেনের গভর্নর নিযুক্ত হলেন। আবদুর রহমানের সিংহাসনে আরোহণ করেই প্রথমতঃ খুতবা থেকে আব্বাসী খলীফাদের নাম মুছে দেন। কিন্তু বুদ্ধিমত্তার কাজ করলেন যে, তিনি নিজের জন্যে আমীরুল মুমিনীন উপাধি গ্রহণ করেননি। অতঃপর তাঁর পরবর্তী আরো সাতজন শাসক ও তাঁরই পদাংক অনুসরণ করে চললো। অবশ্য অষ্টম শাসক আবদুর রহমান আন্‌নাসের (তাঁর রাজত্ব কাল—৩০০—৩৫০ হিজরী পর্যন্ত) নিজেকে আমীরুল মুমিনীন বলে ঘোষণা করেন।

১৪৬ হিজরীতে আলা ইবনে মুগীস আবুজাফর মানসুরের পক্ষ হতে খিলাফতের আহবায়ক হয়ে আফ্রিকা থেকে স্পেনের দিকে অগ্রসর হন। এদিকে আবদুর রহমান তাঁর মুকাবিলার জন্যে বের হলেন। আশ্‌বিলীয়ার প্রান্তরে যুদ্ধ হল। কয়েক দিন যুদ্ধের পর আলা ইবনে মুগীস যুদ্ধে পরাস্ত

হন এবং তাঁর বহু সৈন্যের সাথে তিনিও নিহত হন। আবদুর রহমান প্রতিশোধমূলক অত্যাচার করে অধিকাংশ নিহত ব্যক্তির মস্তক কেটে কায়রোয়ান এবং মক্কায় পাঠিয়ে দেন। তথায় এই গুলোকে ঐ দু'শহরের বাজারসমূহে রাতের বেলায় গোপনে লুক্কায়িত করে রাখা হয়। এই মস্তকগুলোর সঙ্গে আববাসীদের জাতীয় প্রতীক কাল পতাকা ও ছিল এবং তৎসঙ্গে একটি চিঠিও ছিল, যা মানসুর আলা ইবনে মুগীসকে লিখে ছিলেন। মানসুর যখন এই ঘটনার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি ভীত হয়ে গেলেন এবং বললেন যে, আবদুর রহমান তো শয়তান হয়ে গেছে। আল্লাহ্র শুকরিয়া যে, তিনি তাঁর আমাদের এবং মাঝে সমুদ্র দিয়ে আড়াল করে রেখেছেন।

আবদুর রহমান আন্‌নাসের এর রাজত্বকালে স্পেন-সভ্যতা ও কৃষ্টিতে এবং গৌরবে ও সাধুতায় অনেক উন্নত হয়েছিল। তিনি খুবই চিন্তাশীল বুদ্ধিমান এবং বাহাদুর ছিলেন। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন সমগ্র দেশে বিশৃংখলা, গণ্ডগোল, অবাধ্যতা এবং বিদ্রোহের আগুন জ্বলতেছিল। তিনি শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়েই প্রথমে বিদ্রোহীদেরকে দমন করেন। বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী এবং দুষ্কৃতিকারীদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেশে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লামা ইবনে খালদুন বর্ণনা করেন যে, ঃ

ووجد الاندلس مضطربة بالمخالفين مضطرمة بنيران
المتغلبين فاطفا تلك النيران واستنزل اهل العصيان
واستقامة له الاندلس في سائر جهاتها بعد بضف
وعشرين سنة من ايامه ـ

"আবদুর রহমান আন্‌নাসের যখন স্পেনকে দেখতে পেলেন যে, বিদ্রোহীদের কারণে সেখানের অবস্থা অশান্ত এবং দস্যুদের দ্বারা প্রজ্বলিত অশান্তির আগুন-দাউ-দাউ করে জ্বলছে, তখন তিনি সেই অগ্নি নির্বাপিত করে বিদ্রোহী ও অবাধ্যদেরকে শায়েস্তা করেন। তাঁর বিশ বছরের রাজত্বের কম সময়ের মধ্যে সমগ্র স্পেন তার আপন হয়ে গেল। এর সার্বিক অবস্থাও ঠিক হয়ে গেল। ("নাফহুত্তীব' গ্রন্থের ১ম খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ দ্রঃ)

ইবনে খালদুন অতঃপর বর্ণনা করেন যে, আব্দুর রহমান আন্‌নাসের প্রায় ৫০ বছর রাজত্ব করেন। বনু উমাইয়াদের প্রভাব প্রতিপত্তি পুনরায় সেই দেশে সুদৃঢ় হল। তিনি নিজে জিহাদ করতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। শত্রুদের রাজধানীর দিকে ধাবিত হয়ে পর্যন্ত যুদ্ধ করতেন। তাঁর রাজত্বের ২৩ তেইশতম সালে এক যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার পর নিজে আর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও মুসলমানদের সৈন্যদল সদা প্রেরণ করতেই ছিলেন, যাঁরা ইংরেজদের বিভিন্ন শহরে আক্রমণ চালাতো এবং তাদেরকে পদদলিত করতো। ফলে খৃীস্টানরা তাঁর দিকে আনুগত্য হাত বাড়াল। রোম এবং কনস্টান্টিনোপল হতে বিভিন্ন প্রকার উপঢৌকন আসতে লাগলো। তা ছাড়াও কাশ্‌নালাহ এবং নাবাস বালোনার খৃীস্টান শাসকগণ তখনও রাজদরবারে আগমন করে খেরাজ প্রদান করতেন। ঐ সব বিজয় ছাড়াও জনসাধারণের মধ্যে সুখ-শান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্য তিনি সিংহাসনে আরোহণ করার পরেই প্রথমতঃ জনগণের উপর অর্পিত বিভিন্ন টেক্স কমিয়ে দেন। আবদুর রহমানের এই সবগুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের জন্যে ঐতিহাসিক ইবনে 'আব্দুরাব্বিহি' তাঁর প্রশংসায় বর্ণনা করেন যে,

بدا الهلال جديدا ۔ والارض جديد ۔

"নতুন চন্দ্রের উদয় হয়েছে এবং দেশ নতুন করে শস্য-শ্যামল হয়েছে"।

আব্দুর রহমান আন্‌নাসের ৩৫০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার পরই রাজ্যের অধঃপতন দ্রুত শুরু হল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। অতএব আশ্‌বিলীয়াতে ইবনে ইবাদ, ইবনুল আফ্‌তাস ও ইবনে যিন্নুন তালিতালাহ্‌তে ইবনে আবি আমের বালিনেসিয়াতে, ইবনে হুদ সারকুসতাতে নিজেদেরকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। এ হচ্ছে ৪র্থ শতাব্দীর শেষের ঘটনা। এই সময় আবদুর রহমান আন্‌নাসেরের পৌত্র সুলায়মান, ৬ই শাওয়াল ৩৯৯ হিজরীতে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং নিজের উপাধি المستعين بالله (আল-মুস্তাঈন বিল্লাহ) রাখেন। হিজরী ৪০০ সালে কর্ডোভায় প্রবেশ করেন এবং তাঁর উপাধি উপর الظافر بحول الله (আয্‌যাফের বি-হাওলিল্লা)

অতিরিক্ত সংযোগ করেন। এই বছরের শেষের দিকে কর্ডোভাতে যাত্রা করেন এবং বারবারদেরকে নিজের সঙ্গে নিয়ে তিনি সমগ্র স্পেনে গন্ডগোল ও বিশৃংখলা, লুন্ঠন, মারামারি, হত্যা এবং অরাজকতা সৃষ্টি করেন। ৪০৩ হিজরীতে পুনরায় কার্ডোভাতে প্রবেশ করেন। সেই সময় 'বারবারী' দাসগণ সুলায়মান থেকে পৃথক হয়ে বড় বড় শহরে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে অনেক দুর্গের মালিক হয়ে গেল।

সুলায়মানের সেনাদলে ইমাম হাসান (রাঃ)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে আপন দু'ভাই ছিল। একজনের নাম কাসেম এবং অপরজনে নাম আলী। তাদের পিতার নাম ছিল (حمود) হুমুদ। আলী ইবনে হুমুদ রাজ্যের এইরূপ অধঃপতন দেখে স্পেনের রাজত্বের প্রতি নিজেরই লোভ হয়ে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতে যারা বিভিন্ন স্হানে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করেছিল তাদেরকে 'আলী ইবনে হুমুদ' একটি চিঠি লেখেন যে, "হিশাম ইবনুল হিকাম কর্ডোভা অবরোধের সময় আমাকে লিখিতভাবে উত্তরাধিকার নিযুক্ত করেছিলেন। পত্র পেয়ে সকলই ইহা মেনে নিলেন এবং তাঁর হাতে বয়আত, বা আনুগত্যের শপথ করলেন। এখন আলী ইবনে হুমুদ 'বারবারদেরকে সঙ্গে নিয়ে কর্ডোভার দিকে অগ্রসর হলেন। সুলায়মান তাঁর মুকাবিলা করলেন, কিন্তু পরাস্ত হলেন। পরিশেষে ২১শে মুহাররম, ৪০৭ হিজরীতে আলী ইবনে হুমুদ নিজ হাতে অতি নির্মমভাবে সুলায়মানকে হত্যা করেন। শুধু এই কান্ড করেই ক্ষান্ত হননি, এবং সুলায়মানের বৃদ্ধ পিতা আল-হিকামকে ও ঐদিনই হত্যা করা হল।

পরিশেষে যেমনিভাবে বাগদাদের খিলাফত তুর্কী দাসদের হাতে খেলার পুতুল তুল্য হয়ে গিয়েছিল, তারা যাকে চাইতো, সিংহাসনে বসাতো এবং যার প্রতি অসন্তুষ্ট হতো, তাকে সিংহাসন থেকে অপসারণ করতো। ঠিক তেমনিভাবে স্পেনের বারবারগণও কাজকর্মে স্বাধীন হয়ে গেল। পরস্পরে গৃহযুদ্ধের ফলে রাজ্যের সকল প্রকার সুখ-শান্তি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রাজ্যের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এর পরিপ্রেক্ষিতে আলী ইবনে হুমুদের সঙ্গেও ঐরূপ ব্যবহার করা হল যা, মুসলমানদের সঙ্গে

করা হয়েছিল। অর্থাৎ তাকেও হত্যা করা হল। আলী ইবনে হুমুদ দু'মাস কম দু'বছর রাজত্ব করেন। তিনি আননাসের উপাধি গ্রহণ করেন। তার এই স্বল্পকালীন রাজত্বে তার কঠোরতা ও কর্কশ ব্যবহারে তাঁর দাসগণ তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে গেল। ৪০৮ হিজরীতে হাম্মাম খানায় গোসল করার সময় তাঁকে হত্যা করা হয়। আলীর পুত্র সন্তানদের মধ্যে দু'ছেলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের একজনের নাম ইয়াহ্ইয়া এবং অপরজনের নাম ইদরীস।

কাসেম ইবনে হুমুদ

আলীর পর তার ভাই কাসেম ইবনে হুমুদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খুবই অনুগ্রহশীল এবং প্রজাদের প্রতি সদয় ছিলেন। কাজেই জনসাধারণ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু চার বছর পর ৪১৩ হিজরী সালে কাসেমের ভাতিজা ইয়াহ্ইয়া ইবনে আলী ইবনে হুমুদ 'মালাকাহ্তে চাচার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝান্ডা উত্তোলন করেন এবং যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই কর্ডোভায় প্রবেশ করে নিজেকে খলীফা বলে ঘোষণা করেন। আর নিজে(المعتلى)'আল মুতালী' উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু কিছু দিন পর যখন কাসেমের অবস্থা ঠিক ঠাক হয়ে গেল তখন আবার বারবারদের সাহায্যে কর্ডোভার উপর আক্রমণ করে জয়লাভ করেন। ইয়াহ্ইয়া 'মালাকাহ্র দিকে পলায়ন করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি খাযরা দ্বীপ দখল করেন, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। এখানেই কাসেমের ধনাগার এবং তাঁর সুহৃদয়ের বাসস্থান ছিল। অন্য দিকে ইয়াহ্ইয়ার ভাই ইদরীস ইবনে আলী, যিনি সাবিস্থাহ্ এর গভর্নর ছিলেন তান্জা দখল করেন। অতঃপর কর্ডোভাবাসীদের একদল লোক ও কাসেমের বিরোধী হয়ে গিয়েছিল। কাসেম আশবিলিয়ার দিকে ধাবিত হলেন, সেখানে তার দু'ছেলে (১) মুহাম্মদ ও (২) হাসান ছিল। আশবিলিয়ার অধিবাসিরা এই সংবাদ পেয়ে মুহাম্মদ হাসান এবং তাদের সঙ্গীদেরকে শহর থেকে বহিষ্কার করে দিল। পরিশেষে তারা নগর দখল করে উহার শৃংখলা ও শাসনভার তিন ব্যক্তির উপর ছোড় দিলেন কাসেম এই অবস্থা দেখে শারীশ চলে গেলেন। বারবাররা তখন একত্র হয়ে ইয়াহ্ইয়া

ইবনে আলীকে নিজেদের আমীর নির্বাচিত করলো এবং কাসেমের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। শারীশ পেঁছে কাসেমকে বন্ধী করে ফেলল। প্রথমত তিনি ইয়াহ্ইয়ার এবং পরে ইদরীসের বন্ধীশালায় আবদ্ধ থাকেন। পরিশেষে এই অবস্থাতেই ৪৩১ হিজরীতে তাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়। অতঃপর তার লাশ তার ছেলের মুহাম্মদ ইবনে কাসেমের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হল। কাসেমের সর্বমোট রাজত্বকাল ছিল ছয় বছর এবং বন্ধী জীবন ছিল ১৬ বছর।

কাসেমকে বন্ধী করার পর ইয়াহ্ইয়ার জন্যে ময়দান পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু দেশে সার্বিক অবস্থার যে অধঃপতন ঘটেছিল সে কারণে তাঁর ভাগ্যে শান্তি জুটেনি। তিনি স্বীয় সৈন্যদেরকে নিয়ে ভবঘুরে অবস্থায় ফিরতে লাগলেন। এমতাবস্থায় যখন তিনি আশ্বিলিয়া অবরোধ করেন তখন মাতাল অবস্থায় কয়েকজন আরোহীর মুকাবিলার জন্যে বের হলো। বিদ্রোহীরা সেখানে ফাঁদ পেতে বসেছিল। যখন ইয়াহ্ইয়া সেখানে উপস্থিত হলেন তখন তারা তাকে ধরে নিয়ে হত্যা করলো। এই ঘটনা ৭ই মুহাররম, ৪৩৬ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল।

১৩৮ হিজরী থেকে ৪০৭ হিজরী পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় পৌণে তিনশো বছর বনু উমাইয়ারা স্পেনের রাজত্ব করেছিল। উক্ত বর্ণনায় বুঝা গেল যে, দেশে অস্থিরতা ও বিশৃংখলা বিরাজমান ছিল। বনু উমায়াদের মুকাবিলায় হাসানী বংশের আলী ও কাসেম দাঁড়ালেন। তাদের ও বিরোধী শত্রু সৃষ্টি হলে উভয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। ইয়াহইয়ার ইন্তিকালের পর ক্রমাগত আরো দু'তিনজন বাদশাহ হয়ে ছিলেন। ৪৪৫ হিজরীতে হাসানী বংশের শেষ বাদশাহ ইদরীসের যখন ইন্তিকাল হল তখন এই বংশ সম্পূর্ণ দুর্বল হয়ে গেল। তাদের রাজধানী সালাকার অধিবাসিগণ সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, হাসানীদেরকে স্পেন থেকে বহিষ্কার করে সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দিবে—। আর যে সব এলাকা তাদের দখলে ছিল, তা ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। সুতরাং তাই করা হল। খাযরা দ্বীপ এবং এর আশে-পাশের গ্রাম থেকে নিয়ে তাকরোনাহ, মালাকা এবং উহার সংলগ্ন স্থানসমূহ পর্যন্ত, এদিকে মানুকাব দুর্গ গ্রানাডা

এই সবই বারারদের দখলে ছিল। তাছাড়া তারা আশ্‌বিলিয়ার কিছু অংশের উপর প্রথমতঃ দখল করে রেখেছিল। এমনিভাবে স্পেন থেকে হাসানী বংশের রাজত্ব শেষ হয়ে গেল। খিলাফতে মুওয়াহ্‌হেদীন নামক গ্রন্থের ৬৫ ও ৬৬ পৃঃ দ্রঃ)

স্পেনের বনু উমায়্যাদের শেষ নিঃশ্বাস

কর্ডোভায় যখন কাসেম পরাজিত হলেন তখন কর্ডোভাবাসীরা বনু উমাইয়ার আবদুর রহমান ইবনে হিশাম, যার উপাধি ছিল "আল-মুসতাজ্‌হার বিল্লাহ" কে শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাদের বহুকষ্টে প্রতিষ্ঠিত এই রাজত্ব কয়েক মাস অতিবাহিত হতে না হতেই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। ২৭শে যিলকাদ ৪১৪ হিজরীতে আবদুর রহমানকে হত্যা করা হয়।

তারপর মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার উপাধি ছিল আল মুসতাকফী। কিন্তু তিনি খুবই নির্বোধ ও দুর্বল ছিলেন। তিনি আহমদ ইবনে খালেদ নামী এক জোলা (তাঁতী)-কে স্বীয় মন্ত্রী বানিয়ে দিলেন। তিনি দেশের ও রাজত্বের বিভিন্ন গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। পরিশেষে একদিন কর্ডোভার জন সাধারণ মন্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করে মন্ত্রীকে বেদম প্রহার করল, যার ফলে মন্ত্রী চির-বিদায় নিলেন। মন্ত্রীকে হত্যা করার পর তারা (المستكفى) আল মুস্তাকফী থেকে রাজ্য ক্ষমতা ছিনিয়ে নিল এবং তিনদিন পর্যন্ত তাকে এমনভাবে বন্ধী করে রাখা হলো যে, তার কাছে কোন প্রকার খানা-পিনা পর্যন্ত পৌঁছতে দেয়া হল না। অতঃপর তাকে সীমান্তের দিকে চলে গেলেন এবং পরিশেষে স্বীয় সঙ্গীর হাতে বিষ পান করে নিহত হন।

মুস্তাক্‌ফীর পর ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আলী এখানকার গভর্নর নিযুক্ত হলেন। কিন্তু যখন তার রাজত্বও শেষ হয়ে গেল তখন মন্ত্রী আবু মুহাম্মদ জমহুর ইবনে মুহাম্মদ জমহুর, যিনি কর্ডোভার প্রসিদ্ধ সর্দার ছিলেন, হিশাম ইবনে মুহাম্মদ থেকে বয়আত গ্রহণ করছেন। তিনি নিজে (معتمد) মুতামিদ উপাধি ধারণ করেন। এই রয়আত" ৫১৮ হিজরীতে রবিউল

আউয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে ছিল। বয়আতের পরও হিশাম তিন বছর পর্যন্ত সীমান্তবর্তী এলাকাতে ঘোরাফিরা করেছিল। কোথায়ও নির্দিষ্ট এক স্থানে শান্তিতে বসবাস করা তার ভাগ্যে জুটেনি। এ দিকে সাধারণভাবে রাজ্যে অধঃপতন নেমে এল। প্রভাবশালী নেতৃত্বস্থানীয় লোকেরা একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। সুতবাং এর পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের অভিমত হল যে, হিশাম ইবনে মুহাম্মদের কর্ডোভায় আসা চাই। অতএব ৪২০ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে হিশাম কর্ডোভায় প্রবেশ করলেন। কিন্তু এখানে কিছুদিন অতিবাহিত হতে না হতেই সৈন্যরা বিদ্রোহ করল। পরিশেষে হিশামকে সিংহাসন ছাড়তে হল। অতঃপর হিশাম লারদাহ চলে গেলেন এবং যেখানেই ৪২৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। হিশাম স্পেনের বনী উমাইয়াদের সর্বশেষ শাসক ছিলেন। অতঃপর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সব স্থান থেকেই এই বংশের রাজত্ব শেষ হয়ে গেল।

বনু উমাইয়াদের রাজত্ব শেষ হওয়ার পর সমগ্র দেশে অরাজকতা সৃষ্টি হল। আরবদেশবাসী, বারবার এবং দাসগণ পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে গেল। যার দখলে যে স্থান ছিল তিনি উহারই অধিকারী হয়ে বসলেন। অতঃপর মজার ব্যাপার হল যে, তারা সবাই খিলাফতের উপাধিকেও পরস্পর বন্টন করে নিলেন। সুতরাং কারো উপাধি হল (معتضد) মুতাযিদ কারো হল মামুন, মুস্তাঈন মক্তাদীর, মু'তাসিম, মু'তামিদ, মুসাওয়াকেকল এবং মুতাওয়াকক ইত্যাদি। এ ব্যাপারে একজন কবি বিদ্রূপ করে বলেন,

مما يزهد فی ارض اندلس ۔
سماع مقتدر فيها و معتضد ـ
القاب مملكة فی غير موضعها ـ
كالهر يحكی انتفاخا صورة الاسد

“যে বস্তু স্পেনের প্রতি আমাকে বিদ্রোহী করে তুলেছে এবং তৎপ্রতি আমার ঘৃণার উদ্রেক করেছে, তাহল তথাকথিত মুক্তাদীর এবং মুতাযিদ ইত্যাদি উপাধির নামকরণ। এই উপাধি অপাত্রে এবং অস্থানে হয়েছে। উহার দৃষ্টান্ত এমন বিড়াল যেমন ফুলে ফেপে বাঘের আকৃতি ধারণ করে’। রাজ্যে এইরূপ বিশৃংখলা ও অস্থিরতা দেখে মুসলমানদের প্রতিবেশী খৃষ্টান সম্রাট

গণ খুব স্বার্থ উঠাল। তারা একজন মুসলমান শাসকের সাহায্য করে তাদের শত্রুকে দুর্বল করার নীতি অবলম্বন করল। অতঃপর যখন সুযোগ মিলতো তখন আবার ঐ সাহায্যকৃত ব্যক্তিরই এলাকা দখল করে নিত। মুসলমানগণ পরস্পর গৃহযুদ্ধের কারণে এমন অন্ধ হয়ে গিয়ে ছিল যে, শত্রু-মিত্র, আপন-পর ভুলে গিয়েছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারা দীর্ঘ দিন যাবৎ শত্রুতা করে আসছে, ইসলামের এইসব পুরাতন শত্রুদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতেও মুসলমানগণ লজ্জাবোধ করছিল।

সেই যুগে মুসলমান বাদশাহদের চিন্তাশক্তির কি পরিমাণ যে অধঃপতন হয়েছিল এর পরিমাপ নিম্নের একটি ঘটনা থেকেই করা যায়। তখনকার যুগের স্পেনের সব চেয়ে বড় শাসক ছিলে মুতামিদ ইবনে ইবাদ। একদা তাঁর বিবি ইতেমাদ দেখতে পেলেন যে, আশ্‌বিলিয়াতে কয়েকজন গ্রাম্য মহিলা পানি ও কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাঁটুর নীচের অংশের কাপড় খুলে আছে। এমতাবস্থায় তারা মশক ভর্তি দুধ বিক্রি করতেছে। বেগমের কাছে এই দৃশ্য খুবই পছন্দ হল। তিনি বাদশাহকে বললেন যে, আমার মন চাচ্ছে যে, আমিও আমার কয়েকজন দাসী মিলে ঐ গ্রাম্য মহিলাদের মত কাজ করবো। বাদশাহ্‌ বললেন তা খারাপ কি? অর্থাৎ মন্দ নয়। তৎক্ষণাৎ শাহী ফরমান হল যে, রাজপ্রাসাদে আম্বর, মিশ্‌ক এবং কাফুর গোলাপ জলে মিশ্রিত করে কাদা বানানো হউক। তাই করা হল। তখন বেগম সাহেবা কয়েকজন দাসীসহ ঐ কাদায় দাঁড়ালেন। গ্রাম্য মহিলাদের মত তাদের হাতেও মশক ছিল। কিন্তু শুধু পার্থক্য হল যে, এই মশকগুলোর রশি ছিল রেশেমে তৈরী। (১) 'নাফ্‌হুত্তীব' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের—২০৫

মুরাবেতীন

৪২৮ হিজরী থেকে ৪৮৫ হিজরী পর্যন্ত অর্থাৎ ৫৭ বছরের এই স্বল্প-কালীন সময়ের মধ্যে স্পেনের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে যে সব বংশ রাজত্ব করেন তাদের মধ্যে 'বনুজামহুর' বনু ইবাদ, বনুরাযীন, বনুযামিরী বনুযিন্নুন, বনু হুমুদ একং বনু আফ্‌তাস প্রসিদ্ধ ছিলেন। পরিশেষে তথায় আরো একটি বংশ রাজত্ব করে, যারা মুরাবেতীন' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি

সবার উপরে ছিল। অতএব তাদের দ্বারা দেশের দুরবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই বংশের লোকরা মারাকেশ (আফ্রিকা) এর অধিবাসী ছিল। ৪০০ হিজরীতে তারা তথায় রাজত্ব করতো। এই বংশের সর্বপ্রথম বাদশাহ ইউসুফ ইবনে তাশ্‌ফীন নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। তিনি খুবই প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। সমগ্র আফ্রিকা তাঁর করতলগত ছিল। সেই সময়ের বড় বড় শক্তিশালী বাদশাহরা পর্যন্ত তাঁকে লৌহ মানব বলে মনে করতো।

ইউসুফ ইবনে-তাশ্‌ফীন এবং যুলাকার যুদ্ধ

ইউসুফ ইবনে তাশফীন স্পেনে আগমনের পর মুতামিদ ইবনে ইবাদ (যিনি রাজ্যের অধঃপতনের সময় আশবিলিয়ার বাদশাহ ছিলেন) সমুদ্র অতিক্রম করে ইউসুফ ইবনে তাশফীনের নিকট মারাকেশ উপস্থিত হন। তিনি ইউরোপবাসীদের বিরুদ্ধে ইসলাম এবং মুসলমানদের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে তাকে সাহায্যের জন্যে ইউসুফের নিকট আবেদন করেন। ইউসুফ মুতামিদের সঙ্গে খুবই সম্মানজনক ও ভদ্র-জনোচিত আচরণ করেন। ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করার দৃঢ় অঙ্গীকার করেন। সুতরাং এই বছরই জামাদিউস আউয়াল মাসে বীর সৈন্যদের এক বিরাট বাহিনী তৈরী করেন। তম্মধ্যে সাত হাজার অশ্বারোহী এবং অসংখ্য পদাতিক সৈন্য ছিল। এই বাহিনী নিয়ে তিনি সিবতা শহরের পথধরে' সমুদ্র অতিক্রম করে স্পেনের বিখ্যাত দ্বীপ খাযরা শহরে উপনীত হন। আল-মু'তামিদ সেখানেই ইউসুফের সঙ্গে মিলিত হন। এবং তাঁকে মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করেন। অতঃপর মুতামিদ বললেন যে, আপনি আমার সঙ্গে আশবিলিয়াতে চলুন, সেখানে কিছুদিন আরাম করে' ভ্রমণের ক্লান্তি দূর হলে-ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলা করা যাবে। কিন্তু ইউসুফ সেখানে যেতে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, আমি এখানে শত্রুর সঙ্গে জিহাদ করতে এসেছি। যেখানে শত্রু আছে আমিও সেখানেই যাব।

সেই সময় ষষ্ঠ আল্‌-ফান্‌সো,-যিনি 'কুস্‌তিলাহ' (কিস্টল)-এর বাদশাহ ছিলেন, মুসলমানদের দুর্গ হিসনুল্লাইত অবরোধ করেছিলেন।

তিনি যখন শুনতে পেলেন যে, বারবারগণ সমুদ্র অতিক্রম করে যুদ্ধ করতে এসেছে। তখন তিনি অবরোধ উঠিয়ে নিজ শহরের দিকে যাত্রা করলেন। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের জন্যে তিনি বিরাট বাহিনী গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করেন। অতএব আল্‌-ফান্‌সো একদিকে নিজ সঙ্গী-সাথীদেরকে নির্দেশ দেন যে, "প্রত্যেক ব্যক্তি সাধ্যমত লোক সংগ্রহে করে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হউন। অন্যদিকে খ্রীস্টান পাদরী এবং ধর্মযাজকগণ নিজ দেশের গ্রামে-গঞ্জে পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে ইউরোপীয়দের অন্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগুন জ্বালিয়ে দিল। অপর পক্ষে মুতামিদ এবং ইউসুফের সাহায্যের জন্য স্পেনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলমান সৈন্যরা একত্র হতে লাগলো। রোমের সীমান্ত সংলগ্ন **যুলাকা** নামক স্থানে উভয় সেনাদল ১২ই রমযান বৃহস্পতিবার একত্র হল। আগামীকাল্য যুদ্ধ শুরু হবে। আলফানসো মুসলমানদের কাছে বার্তা পাঠালেন যে, জুমার দিন তোমাদের নিকট পবিত্র দিন। এমভাবে সপ্তাহে রোববার খ্রীস্টান এবং ইহুদীদের নিকট পবিত্র দিন। এর পরিপেক্ষিতে ঐসব দিন ব্যতীত সোমবার দিন থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করা হউক। এতে প্রতারণা করাই ছিল আল্‌ফান্‌সোর প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু মুতামিদ পূর্বেই তা অনুভব করতে পেরেছিলেন। ইউছুফ ইবনে তাশফীন আত্মনির্ভরশীলতার আনন্দে আল্‌-ফান্‌সোর এই প্রস্তাব মেনে নিলেন।

অতএব পরবর্তী দিন জুমা'র দিন যখন ইউসুফ ইবনে তাশ্‌ফীন আপন সৈন্যদেরকে নিয়ে জুমার নামায পড়তে ছিলেন, এমন সময় আল্‌-ফান্‌সের সৈন্যরা অতর্কিতে আক্রমণ করল। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মুতামিদ পূর্বেই এর ব্যবস্থা করে রেখে ছিলেন। আল্‌-মুরাবেতুন ও অস্ত্রধারণ করে স্বীয় ঘোড়ার উপর আরোহণ করে যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করেন। খ্রীস্টান এবং মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা, যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে কি পরিমাণ যে ব্যবধান ছিল, তা 'মিস্টার এস, পি, ইস্কাট' এর ভাষায় শুনুন। মুসলমানদের এবং ইউসুফ ইবনে তাশফীন ও 'বারবারদের ভয়ানক মূর্তির বর্ণনা দিতে যেয়ে তিনি বলেনঃ—"এই যুদ্ধ নিঃসন্দেহে মুসলমানদের ও সমস্ত সেনাদলে একটি মাত্র উদ্দেশ্য এবং চিন্তা

ধারার বিস্তার লাভ করেছিল। তাহল এই যুদ্ধের পরিণতির উপর তাদের জান-মাল এবং স্বাধীনতা ও ধর্মের নিরাপত্তা নির্ভরশীল ছিল। শত্রুদের সৈন্য সংখ্যা, শৃংখলা ও সুব্যবস্থার দিক দিয়ে তুলনা করলে-মুসলমানদের সাথে তাদের বিরাট ব্যবধান ছিল। খ্রীস্টানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ষাট হাজার এবং মুসলমানদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। অর্থাৎ তিন জন খ্রীস্টানের মুকাবিলায় একজন মুসলমান। তদুপরি খ্রীস্টানদের যুদ্ধের ঘোড়াগুলো মুসলমানদের ঘোড়ার চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল। তাদের যুদ্ধাস্ত্র অনেক উন্নত ও ধারাল ছিল। তাদের পক্ষের ফ্রান্সের আমীরগণ ও অধিক যুদ্ধা ছিলেন। তাদের আপাদমস্তক লৌহবর্মে আবৃত্ত ছিল। প্রত্যেক খ্রীস্টান যুদ্ধই ছিলেন অভিজ্ঞ। তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন অসাধারণ তেজস্বী। পাদরীরা প্রতিদিনই তাদেরকে উত্তেজিত করছিল। যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারিগণ এই যুদ্ধকে ক্রুসেডের মত পবিত্র মনে করছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রারম্ভে পাদ্রীগণ ধর্মীয় পোশাক পরে সমস্ত সৈন্যদের সামনে উত্তেজনা পূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছিল। প্রাচীন কালের প্রথানুযায়ী নিজে অস্ত্র ধারণ করে' যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছিল। সৈন্যদের অন্তরে শক্তি-সাহস বর্দ্ধন করে পরকালের পুণ্যের দিকে আশান্বিত করতে ছিল।

প্রকৃতপক্ষে মুসলমানগণ প্রথমতঃ ধারণাই করতে পারে নাই যে, সম্রাট 'আল্‌কান্‌নো-' এই অল্প সময়ে এত সাজ-সরঞ্জাম এবং নিজের সর্বশক্তি একত্র করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হতে পারবে! সুতরাং ইউসুফ ইবনে-তাশ্‌ফীল যখন খ্রীস্টান সৈন্যদের এমন ঢেউ দেখতে পেলেন, তখন তিনি নিজেই অস্থির হয়ে গেলেন। কিন্তু যাই হোক-মুসলমানদের যে পা-একবার ইসলামেব সাহায্যার্থে উঠে গিয়েছে, তা কখনও পিছন দিকে ফিরে যেতে পারে না। খ্রীস্টান সৈন্যদের প্রথম আক্রমণ হল-মুতামিদ এবং তাঁর সৈন্যদের উপর। খ্রীস্টান সৈন্যরা অতর্কিতে স্বল্প সংখ্যক মুসলমানদের উপর হঠাৎ করে যে আক্রমণ করেছিল, এর ফলে মুসলমানগণ ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অতঃপর ও তাঁরা বীরত্ব ও বাহাদুরীর এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যে, ঐতিহাসিক মিস্টার ইস্কাটকে ও

পরিশেষে বাধ্য হয়ে একথা বলতে হল যে, আশ্‌বিলিয়ার বাদশাহ এবং তাদের সৈন্যদের অবস্থা যদিও খুবই বিপজ্জনক ছিল, তথাপি তারা যে অসাধারণ ধীরতার পরিচয় দিলেন এবং খৃষ্টানদের কঠিন আক্রমণের সামনেও তারা যেভাবে স্থির মস্তিষ্কে যুদ্ধ করছিলেন এবং মু'তামিদ যে ধীর-স্থিরভাবে যুদ্ধ করে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে নিজ বংশের সমস্ত বদনামের কালদাগ ধুয়ে মুছে দিয়েছিল। এতে প্রতীচ্যের খিলাফতের বীর পুরুষদের অতীত গৌরব ও কৃতিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভীষণ যুদ্ধের মাঝেও তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে অটল রইলেন। যেন তারা মৃত্যুর সঙ্গে খেলতে ছিলেন-এবং শাহাদাতের জন্য মত্ত ছিলেন। তাঁর শরীরে দু'টি জায়গায় আঘাত পেলেন। তিনটি ঘোড়া তাঁর পায়ের কাছে মরে গেল। গায়ের বর্ম'টি ও টুকরো-টুকরো-হয়ে গেল। তলোয়ার থেকে শত্রুর রক্ত টপকিয়ে পড়ছিল। তাদের শক্তি-সাহস বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ("আখবারুল আন্দুলুন" গ্রন্থের ২য় খণ্ড, ২১২ পৃঃ দ্রঃ),

আশ্‌বিলিয়ার বাদশাহ শত্রু সৈন্যদের মাঝে পাহাড়ের মত অটল থেকে আঘাতের পর আঘাত খেয়ে লাশের স্তুপের উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিলেন। এমন সময় ইউসুফ ইবনে তাশ্‌ফীন ও স্বীয় সেনাদল নিয়ে পেঁছিলেন এবং শত্রুদের পিছন দিক থেকে এমন তীব্র আক্রমণ চালালেন যে, শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালায়ন করতে বাধ্য হল। ঐতিহাসিক মিস্টার এস, পি ইস্কাট' সেই সময় খৃষ্টান সৈনদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, "খৃষ্টানরা সেই সময় অতর্কিতে অস্থির হয়ে গিয়েছিল। তাদের জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে গেল। প্রত্যেক দিক থেকে তারা-তীর ও কামানের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হল। তাদের সৈন্য সংখ্যার আধিক্য তাদের সাহায্যকারী হওয়ার পরিবর্তে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াল। অধিক সংখ্যক ঘোড়াও তাদের অনেক ক্ষতির কারণ হল। অস্থিরতার মাঝে নিজেরাই একে অন্যের উপর অস্ত্র চালালো। তাদের জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্র সংকীর্ণ হওয়ার কারণে অস্ত্র পরিচালনা ও কষ্টকর হয়ে গেল। যে সব সৈন্য বারবারদের'-তাকে-ছিল তারা পলায়ন করতেও পারছিল না-এবং নিজেদের উপর আক্রমণ প্রতিরোধ করতেও অক্ষম ছিল।

······এদিকে ইউসুফের সৈন্যগণ বীর বিক্রমে-যুদ্ধ করছিল। পরিণামে ভাগ্যের পাশা-পরিবর্তন হয়ে গেল। খ্রীস্টানরা আর কতক্ষণ দোদুল্যমান অবস্থায় কালাতিপাত করবে? দেখতে দেখতে তাদের পদস্খলন ঘটল। নিমিষের মধ্যে পলায়ন করতে শুরু করল। পিছন দিক থেকে মার খেয়ে অসংখ্য সৈন্য নিহত হল।

আল্লামা মাকরী কয়েকজন ঐতিহাসিকের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এই যুদ্ধে খ্রীস্টানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন লাখ। তম্মধ্যে কম সংখ্যকই বেঁচে যেতে পেরে ছিল। কিন্তু তা অতিরঞ্জিত মনে হয়। ঐতিহাসিক ইস্কাটের বর্ণনা মতে খ্রীস্টানরা সংখ্যায় ছিল ষাট হাজার। তম্মধ্যে বিশ হাজারের অধিক সংখ্যক নিহত হয়ে ছিল। সম্রাট আল্‌ফান্‌সো ইউসুফ ইবনে তাশফীনের এক আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন। কিন্তু পরিশেষে কয়েকজন সঙ্গীর সাথে কোন ক্রমে পলায়ন করতে সক্ষম হন।

এই যুদ্ধের ফলে একদিকে তো স্পেন থেকে খ্রীস্টানরা ব্যর্থ হলো এবং তাদের যাবতীয় আকাংক্ষা মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে মিশে গেল। অন্যদিকে স্পেনে মুসলমান বাদশাহদের মধ্যে যে সব আত্মকলহ ছিল তা মিটে গেল। এতে সন্দেহ নেই যে, এই সুযোগে মুতামিদ এবং তাঁর সৈন্যরা অসাধারণ বীরত্ব এবং বাহাদুরীর প্রমাণ দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধে বিজয়ের মূলে ইউসুফ ইবনে তাশ্‌ফীন এবং তাঁর 'বারবারী' সৈন্যদের ও বিরাট অবদান ছিল। এই বিরাট সফলতায় স্পেনের উপর ইউসুফের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে গিয়েছিল এবং তিনি আমীরুল মু'মিনীন উপাধিও প্রাপ্ত হলেন।

ইউসুফ ইবনে-তাস্‌ফীনের স্পেনের উপর-আধিপত্য

মিস্টার এস, পি, ইস্কাট এর মত লোক যদি ইউসুফকে ধোঁকাবাজ এবং লুণ্ঠণকারী বলে চিহ্নিত করতো, তবে ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। তবে আশ্চর্যের বিষয় যে, আল্লামা আব্দুল ওয়াহেদ-আল মারাকেশীর মত মুসলমান ঐতিহাসিক ও ইউসুফ ইবনে তাশ্‌ফীনের উদ্দেশ্যকে খুব ভাল বলেননি। তিনি তাঁর লেখা পুস্তক "আল্‌মুজাব"

গ্রন্থের কয়েক স্থানেই লিখছেন যে, প্রকৃত পক্ষে ইউসুফের স্পেন আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ব থেকেই ছিল তা অধিকার করা। কিন্তু বিভিন্ন ঘটনাবলী এর অনুকূলে ছিল না। বরং প্রকৃত কথা এই যে, ইউসুফ 'যুলাকার' যুদ্ধে জয়লাভ করার পর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, স্পেনে মুসলমান বাদশাহদের আত্মকলহ এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে যদি তা শেষ না হয়, তবে খৃষ্টান শক্তিসমূহ মুসলমানদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত করে দিবে: এতে তাদের জীবনায়ু ও সংকীর্ণ হয়ে যাবে।

অতএব ইবনে খালকান এবং আব্দুল ওয়াহেদ আল্‌-মারাকেশী উভয়ই লিখেছেন যে, ইউসুফ ইবনে তাশ্‌ফীন প্রথমতঃ অশ্‌বিলিয়ার বাদশাহ আল্‌-মুতামিদ ইবনে ইবাদ এবং মারসীয়ার' শাসনকর্তা ইবনে রশীক এই উভয়ের মাঝে কিছু বিশেষ শর্তে সন্ধি করায়ে ছিলেন। কিন্তু পরস্পরের শত্রুতা এবং ঘৃণ্য অবস্থা এমন ছিল যে, যদিও যুদ্ধের সময় দৃশ্যতঃ সাময়িকভাবে তা থেমে গিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পুনরায় উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তখন ইউসুফ ইবনে তাশ্‌ফীনের জন্যে নিজেই স্পেন অধিকার করা এবং নিজ বাহুবলে উহা হতে পরস্পরের দ্বন্ধ ও কলহ মিটিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না।

ইউসুফ ইবনে তাশ্‌ফীনের সৎ নিয়াতের প্রমাণ এর চেয়ে অধিক আর কি হতে পারে যে, তিনি শুধু নিজের ইচ্ছাকেই প্রধান্য না দিয়ে বরং উলামা ও ফুকাহাদেরকে ডেকে তাদের নিকট হতে এব্যাপারে ফতোয়া চেয়ে ছিলেন। সকলের সম্মিলিত অভিমতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, ইউসুফকে স্পেনের অধিকারী হওয়া উচিত। অতঃপর তিনি তা অধিকার করেন। এমনিভাবে ৪৮৫ হিজরীতে স্পেন উত্তর আফ্রিকার 'আল-মুরাবেতুন' বংশের অধীনে চলে গেল। সেই সময় রাজ্যের বিশৃংখলা এবং অধঃপতন দূর হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদেরকে স্পেন থেকে বহিষ্কার করার খৃষ্টান শাসকদের বহুদিনের যে স্বপ্ন ছিল, তা এখন অবাস্তবে পরিণত হল।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয়! রাজ্যের এই অবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ৪৮৫ হিজরীতে 'আল মুরাবেতুন'দের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ৫২৩

হিজরী থেকে আবার রাজ্যে বিশৃংখলা এবং অধঃপতন শুরু হল। ৫৪২ হিজরীতে এর পরিসমাপ্তি ঘটল।

আল-মোওয়াহ্‌হেদুন

সেই সময় মোওয়াহ্‌হেদুন আব্দুল মু'মিনের তত্ত্বাবধানে মারাকেশ অধিকার করেন। তাঁকে আমীরুল মু'মিনীন বলা হত। তিনি মুহাম্মদ ইবনে তোমরাত এর সহচর ছিলেন।[১] ৫৪৫ হিজরীতে তিনি স্পেনের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তখন থেকে আল-মুরাবেতুনদের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

আল মোওয়াহ্‌হেদুনের রাজত্ব ৬২০ হিজরী পর্যন্ত ছিল। ৫৯৫ হিজরীতে 'আন্‌নাসের লে দীনিল্লাহ্‌র' রাজত্বকালে কুস্‌তীলা এর সম্রাট 'আলফান্‌সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। এই উদ্দেশ্য তিনি রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ পোপের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার জন্য প্রচারকদল প্রেরণ করেন। পরিশেষে তিনি বিরাট সেনাবাহিনী ও

---

[১] মুহম্মদ ইবনে-তোমরাত "সোস" এর অধিবাসী ছিলেন। তথাকার একগ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তিনি খুবই বড় আলিম ও একজন উপযুক্ত লোক ছিলেন। ইমাম গাযালী (রঃ) এমন একনিষ্ঠ আলিম ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। ৫১৫ হিজরীতে তিনি "সোস" প্রদেশে "আল-আমরু বিল মারুফ ওয়ান্নাহীউ আনিল মুনকার" অর্থাৎ সৎকাজে প্রতিষ্ঠা ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ প্রচারের সূত্রপাত করেন। তিনি তাঁর 'মুরীদ' (অনুগামী) ও "মুতাকেদীন" (বিশ্বাসীদের) নিয়ে এক বিরাট দল সংগঠন করেন। পরিশেষে তিনি ([illegible]) ১২ (বার) ইমামের একজন বলে দাবী করেন। তিনি মুরাবেতুনদের বিরুদ্ধে যথা নিয়মে সৈন্য প্রেরণ করেন। আবদুল মু'মিন তাঁর 'মুরীদ' (অনুগামী) এবং মুতাকেদ বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁকে মুহাম্মদ ইবনে তোমরাত, তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন।

সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে স্পেনের মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেন। সুলতান আন্-নাসের মুকাবিলার জন্যে অগ্রসর হলেন। উভয় সেনাদল যুদ্ধ ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে হতে পলায়ন করেন। আল্‌ফান্‌সো তাদের পশ্চাদগমন করে। যা' কিছু মাল-সম্পদ পেলো লুণ্ঠণ করতে শুরু করে এবং মুসলমানদেরকে বন্ধী করতে লাগল। কিন্তু এই বিজয় গৌরব তাদের ভাগ্যে বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। কিছুদিন অতিবাহিত হতে না হতেই আন্‌নাসের লেদীনিল্লাহর একজন সেনাপতি যাকারীয়া ইবনে আবি হাফ্‌স্‌ ৬০৯ হিজরীতে এক বিরাট সেনাদল গঠন করে স্পেনের উপর আক্রমণ করেন। ইউরোপীয়রা যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে স্বদেশ চলে যেতে বাধ্য হল।

অতঃপর ইয়াকুব আন-নাসের বাদশাহ হলেন! কিন্তু তিনি ছিলেন খুবই খেল্ তামাশা প্রিয়, ফলে পুনরায় ইউরোপীয়রা স্পেন থেকে আক্রমণের ইচ্ছা পোষণ করল। তারা মুসলমানদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ৬১৪ হিজরীতে আক্রমণ করল। সেই সময় স্পেনের মুসলমানদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। খোদ-আল্‌ মোওরাহহেদুন এর রাজত্বের সূর্য ও সন্ধ্যা ঘনিয়ে হলুদ বর্ণ ধারণ করেছিল। এই বংশের রাজত্বের ধ্বংসকাল পর্যন্ত স্পেনের রাজধানী কর্ডোভাতেই ছিল। এটা 'জাবালে তারিক' জিব্রালটার পর্বত এর দুর্গ থেকে সোয়াশো মাইল উত্তরে অবস্থিত। খৃস্টানরা মুসলমানদের তৎকালীন খারাপ অবস্থা ও দুর্বলতার সুযোগে অনেক স্বার্থ উদ্ধার করল। তারা ধীরে ধীরে এককে এলাকার উপর আধিপত্য বিস্তার করে'—তা' মুসলমানদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে লাগল।

ইবনে হুদ

স্পেনের শাসকদের তালিকায় বনী হুদদের নাম পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এই বংশেরই এক ব্যক্তির নাম ছিল মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ। সাধারণতঃ তাঁকে ইবনে হুদ বলা হতো। তিনি রাজ্যের বর্তমান কলহ-দ্বন্দ্ব ও শোচনীয় অবস্থা থেকে স্বার্থ উঠায়ে গ্রানাডা, মালাকা, আলমীরীয়া, কর্ডোভা, জিয়ান ইত্যাদির অধিকাংশ প্রদেশই অধিকাংশ প্রদেশই অধিকার করেন। ফলে এই উপদ্বীপের প্রত্যেক স্থানেই তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি

স্থাপিত হল। তদুপরি ইবনে হুদ প্রজা এবং দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে নিজের প্রভাববৃদ্ধি কল্পে বাগদাদের আব্বাসী বংশের খলীফা আল-মুস্তানসির বিল্লাহ্‌র প্রতি এই মর্মে একখানা আবেদন পত্র পাঠালেন যে, "আমি স্পেনের সমস্ত রাজ্য আমীরুল মু'মিনীদের নামে জয় করেছি। সুতরাং এখন আপনি আমার জন্য আপনার পক্ষ হতে রাজ্য শাসনের দায়িত্বভার পালনের নির্দেশ প্রদান করুন। অতএব, বাগদাদের খলীফার দরবার থেকে ইবনে হুদের নিকট—তাঁর ইচ্ছানুযায়ী একটি পত্রও এসেছিল এটা তিনি ৬৩১ হিজরীতে গ্রানাডায় প্রাপ্ত হন এবং তথাকার জামে-মসজিদে সকলের সামনে পাঠ করে শুনান। এমনিভাবে পাঁচশো বছর পর ধ্বংসের পথে দ্রুত ধাবমান আব্বাসী খিলাফতের দরবারে থেকে স্পেন সম্পর্কে সরকারী ফরমান লেখার সুযোগ মিলার এটাই ছিল প্রথম দিন। কিন্তু তখন বাগদাদের খিলাফতের প্রাসাদে ফাটল ধরে গিয়েছেন এবং তা অদূর ভবিষ্যতকে ধ্বংস হওয়ায় উপক্রম হয়ে গিয়েছেন এর পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্ব পরওয়ানা স্পেনের লোকদের উপর কি-ই বা কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে? ইবনুল আহ্‌মার কিংবা নাসির ইবনে-উমর নামী এক ব্যক্তি ইবনে হুদের শক্তিশালী শত্রু হিসেবে দাঁড়াল। পরিণামে উভয়ই একই সময়ে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হল।

দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় মুসলমানদের স্বার্থপরতা-এবং অদূরদর্শিতার কারণে মুহম্মদ ইবনে ইউসুফ (ইবনে হুদ) এবং ইবনুল আহ্‌মার দু'জন বড় সর্দার (নেতা) ব্যতীত আর ও অনেক সর্দার এমন ছিলেন, যারা বিভিন্ন প্রদেশে নিজ নিজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে বসেছিলেন। আর একে অন্যের উপর শক্তি পরীক্ষায় লিপ্ত ছিলেন যেমন বালিনেছিয়া প্রদেশে মারওয়ান ইবনে আবদুল আযীয, মারসীয়াতে আবু আব্দুল্লাহ, আল্‌মিরিয়াতে ইবনুর রামিমী এবং আশ্‌বিলিয়াতে আবু মারওয়ান, তাঁরা সকলই নিজ নিজ দখলী এলাকাতে স্বাধীন শাসক ছিলেন। তাদের অসহযোগিতার অবস্থা এমন ছিল যে, একজন মুসলমান শত্রুকে পরাজিত করার উদ্দেশ্য খ্রীস্টানদের কাছে নতজানু হয়ে স্বীয় স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হতো এবং তাদের কাছে সাহায্য পাথী হতো। খ্রীস্টানরা এই

সুযোগ তাদের স্বার্থ লুটতো। তারা কখন ও কখন কোন একদল মুসলমানদের পক্ষ হয়ে তাদের সাহায্যের বিনিময়ে এক এক এলাকা নিয়ে নিতো। অতঃপর অন্য আর একদল মুসলমানের পক্ষ হয়ে-তাদের কাছ হতে অন্য আর একটি এলাকা দখল করে নিতো। এমনিভাবে প্রথম 'ফরোল্নাদ' বহু স্বার্থ উদ্ধার করলেন। স্পেনের উত্তরাঞ্চলীয় পাহাড়ী এলাকায় তাঁর রাজত্ব পূর্বে থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এবার তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ এবং নাসির ইবনে উমারের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের সময়ে ইবনে উমার থেকে এই উপদ্বীপের সমস্ত অংশের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ এবং প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষায় শক্তিশালী উত্তরাঞ্চলীয় 'জিয়া' প্রদেশটি সাহায্যের বিনিময়ে নিয়ে নিলেন। অতঃপর ইবনে ইউসুফ 'ফরোলনাদ' কে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাইলেন, তখন তিনি তাঁর নিকট হতে ত্রিশটি দুর্গ প্রার্থনা করলেন। ইবনে ইউসুফ তৎক্ষণাৎ তা দিয়ে দিয়েছিলেন। পরিশেষে ফরোনাদ যখন দেখতে পেলেন, মুসলমানরা দুর্বল হয়ে গেছে, তখন তিনি এমন একটি কার্যকরী কৌশল গ্রহণ করলেন যে প্রথমে একদল মুসলমানের পক্ষ হয়ে অপর দলকে ধ্বংস করে দিতো। তৎপর যে দলের পক্ষ অবলম্বন করেছিল নিজেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতো। এমনিভাবে মুসলমানদেরকে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে তাড়িয়ে নিতে লাগলো। পরিশেষে স্পেনের সোয়া দুলাখ বর্গমাইলের বিশাল সম্রাজ্যের মধ্যে মুসলমানদের ভাগ্যে বাকী রইল মাত্র ৬০ হাজার বর্গ-মাইলের এলাকা।

মুসলমানরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হতে লাগলো এবং নিজ দেশের অংশ বিশেষ নিজেই স্পেনের অধিকৃত এলাকার খৃষ্টান সম্রাটের নিকট হস্তান্তর করে দিত। সুতরাং ৬২৭ হিজরীতে মুরীদা নগর এবং এর সংলগ্ন এলাকাসমূহ খৃষ্টানদের দখলে চলে গেল। ৬২৮ হিজরীতে মিউরোকা দ্বীপ, ৬৩৬ হিজরীর সফর মাসে 'বাল্‌নিসিয়া প্রদেশ এবং ৬৩৬ হিজরীর শাওয়াল মাসে স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা অধিকার করে নিল। ৬৪৫ হিজরীতে ফরোল্নাদ আশ্‌বিলিয়াতে আক্রমণ করলো। অবশেষে দীর্ঘদিন অবরোধ করে রাখার পর উহাকেও

তারা দখল করে নিল। এখন সমস্ত মুসলমান সর্দারগণ এবং স্বাধীন প্রাদেশিক শাসন কর্তাগণ ধ্বংস হয়ে পথের ফকীর হলেন। শুধু নাসির ইবনে-উমার একজন বেঁচে ছিলেন। তাঁর দখলে স্পেনের উত্তরাঞ্চলীয় গ্রানাডা বাকী রয়েছিল। এই এলাকার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ কিংবা ষাট হাজার বর্গমাইল।

মুসলমানদের মধ্যে যখন ইবনে উমরের আর কোন শত্রু কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী বাকী রইল না এবং অন্য পক্ষে তিনি ফরোল্‌নাদের অধিক শক্তির ও পরিমাপ করতে পারলেন, তখন তাঁকে ফরোস্‌নাদের সঙ্গে সন্ধি করা ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না। ফরোলনাদ ও একে সময় উপযোগী মনে করে' সন্ধির প্রস্তাবে রাজী হলেন। উভয়ের মাঝে সন্ধি স্থাপিত হল।

এই ঘটনার পর থেকে স্পেনের মুসলমানদের রাজধানী কর্ডোভার পরিবর্তে গ্রানাডা হয়ে গেল। মুসলমানগণ এখানে প্রায় আড়াইশো বছর অর্থাৎ ৮৯৭ হিজরী পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আর এখানকার বাদশাহগণই অভূতপূর্ব ও আশ্চার্যজনক 'আল-হামরা' প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এটা ছিল তৎকালীন পৃথিবীর আশ্চার্যজনক বস্তুসমূহের একটি।

গ্রানাডার রাজত্ব

কর্ডোভা এবং আশ্‌বিলিয়ার মত গ্রানাডার রাজত্ব ও খুবই জাঁকজমকতা পূর্ণ এবং প্রভাব প্রতিপত্তির ছিল। বানু আহ্‌মার বংশের বাদশাহদের মধ্যে প্রথম যুগের বাদশাহগণ আল-মুরাবেতুন এবং মোওয়াহ্‌হেদুনদের মত খুবই উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসম্পাদন করেন। তাঁরা এই ছোট্ট-রাজ্যটিকে রাজনৈতিক, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং কৃষ্টি ও সভ্যতার দিক দিয়ে তৎকালের একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে সফল চেষ্টা করেন। এর বিস্তৃত বিবরণ যদিও এখানে সম্ভব নয়। তথাপি সংক্ষিপ্তভাবে বলা চলে যে, তাঁরা এখানে বিভিন্ন ধরনের বিশাল অট্টালিকা, মাদ্রাসা এবং মসজিদ নির্মাণ করেন। সেনা বিভাগকে পুনঃ বিন্যাস করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষি, কারিগরি ইত্যাদি বিদ্যার উন্নতি করে জনগণের সার্বিক জীবন ব্যবস্থার উন্নতি করেন। সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের খৃষ্টান

বাদশাহদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেদের বিভিন্ন এলাকা উদ্ধার করেন। কিন্তু পরিশেষে এখানেও ঐ সব অবস্থা দৃষ্টিগোচর হতে লাগলো' যার কারণে কর্ডোভা এবং আশ্‌বিলিয়ার রাজত্ব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

৮৭০ হিজরীতে সুলতান হাসান গ্রানাডার-বা সিংসহানে আরোহণ করেন। তিনি এমন প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন বাদশাহ ছিলেন যে, ৮৮০ হিজরীতে 'কুস্‌তীলা'-বা-কিস্টলের খ্রীস্টান বাদশাহ ফার্ডিনান্ড দাম্ভিকতার কাছে যখন সুলতান হাসানের কাছে খেরাজ তলব করলেন, তখন তিনি প্রতি উত্তরে লিখেছিলেন, গ্রানাডার টাকশালে বর্তমানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা তৈরীর পরিবর্তে খ্রীস্টানদের কলিজা বিদীর্ণ করার জন্যে উন্নতমানের তলোয়ার এবং অস্ত্র তৈয়ার হচ্ছে"।

সুলতানের এইরূপ উত্তর শুধু মৌখিক-জমা-খরচ কিংবা ধমকি ছিল না, বরং তিনি সত্যি-সত্যিই ৮৮৬ হিজরীতে কুস্‌তীলার দুর্গ সাখ্‌রা আক্রমণ করেন। যদিও এটা খুবই মজবুত, কঠিন ও সুউচ্চ দুর্গ ছিল, তথাপি তিনি একরাত্রিতেই তা জয় করে নেন। অতঃপর ব্যাপক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ৮৮৭ হিজরীতে মুসলমানদের আল-হামরা দুর্গ খালী পেয়ে সম্রাট কিস্টাল উহা আক্রমণ করে জয় করে নিলেন। হাজার হাজার নর-নারী ও কিশোরকে বিনা কারণে নির্মমভাবে হত্যা করেন। এই বছরই জমাদিউল আউয়াল মাসে সুলতান হাসান যখন সংবাদ পেলেন যে, কিস্টলের সম্রাট নিজেই এক বিরাট সেনাদলে নিয়ে গ্রানাডার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো সংবাদ পেলেন যে, তিনি লাশা শহর অবরোধ করে ফেলেছেন, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে লোশার দিকে ঘোড়ার লাগমি ফিরালেন। ২৭শে জমাদিউল আউয়াল তারিখে উভয় সেনাদল যুদ্ধের মাঠে একত্র হলেন। কিস্টলের সম্রাট যুদ্ধে পরাস্ত হলেন। মুসলমানগণ তাদের পলায়নকারী সৈন্যদের মাল-সম্পদ দখল করে নিলেন।

কিন্তু একদিকে খ্রীস্টানদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল, অন্যদিকে মুসলমানগণ ভয়ানক গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হল। এর কারণ সুলতান হাসানের একজন খ্রীস্টান দাসী ছিল, যাকে তিনি খুব ভাল বাসতেন। তা ছাড়া সুলতানের

বিবি ছিলেন আপন চাচাতো ভগ্নি আবদুল্লাহ্‌র কন্যা। আপন বিবি এবং দাসী উভয়েরই ঔরসজাত সন্তান ছিল। বিবির ঔরসের দু'জন ছেলে সন্তান ছিল। তাদের একজনের নাম আবদুল্লাহ এবং অপর জনের নাম ইউসুফ। কিন্তু বাদশাহর দাসদাসীর প্রতি অত্যধিক ভালবাসা থাকার কারণে আবদুল্লাহ্ এবং ইউসুফ উভয়েরই ভয় ছিল যে না জানি কখন বাদশাহ তাদেরকে রাজ-সিংহাসন হতে বঞ্চিত করে বৈমাত্রীয় ভাইদেরকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন। এই সন্দেহের কারণে সুলতান যখন লোশাতে সম্রাট কিস্টলের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, ঠিক সেই সময় আবদুল্লাহ্ এবং ইউসুফ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উত্তোলন করল এবং গ্রানাডার কিছু অংশ দখল করে নিল। সুলতান যখন এই সংবাদ পেলেন তখন তিনি মালাকাতে বসে এই বিদ্রোহ দমনের উপায় চিন্তা করতে ছিলেন খ্রীস্টানরা এই সুযোগে মালাকা আক্রমণ করল কিন্তু যুদ্ধে তাদের পরাজয় হল এবং তাদের বড় বড় অভিজ্ঞ সেনাপতিসহ প্রায় দশ হাজার সৈন্য জীবন্ত বন্দী হল।

অতঃপর আবু আবদুল্লাহ্ পিতার বিরুদ্ধে মালাকা আক্রমণ করল। পিতা ও পুত্রের উভয় সেনাদল যুদ্ধ ক্ষেতে একত্র হল। যুদ্ধে আবু আবদুল্লাহ্ পরাস্ত হল এবং গ্রানাডার দিকে পলায়ন করল। তৎপর ৮৮৮ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে 'ইউশীনাহ্ শহরের উপর আক্রমণ করল। এই শহর অধিকার করে ফিরে আসার সময় তারা খ্রীস্টান সৈন্যদের দ্বারা ঘেরাও হল। অতঃপর খ্রীস্টানরা তাদেরকে বন্দী করে কুসতীলার সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দিল। সুলতান হাসান যখন এই ঘটনার খবর পেলেন, তখন তিনি মালাকা থেকে গ্রানাডার চলে গেলেন। কিন্তু ছেলেদের বিদ্রোহী হওয়ার কারণে রাজ্য ও রাজত্বে প্রতি তাঁর এমন বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হল যে তিনি আপন ভাই আবদুল্লাহ্ আয্‌যাগেল। (عبد الله الزغل)-এর উপর রাজ্যের শাসন ভার ছেড়ে দিয়ে অবসর নিলেন।

৮৯০ হিজরীর রবিউস্‌সানী মাসে খ্রীস্টানরা আবার 'মালাকা' প্রদেশেব উপর আক্রমণ করল এবং সীমান্তের কয়েকটি দুর্গ ও দখল করে নিল। সুলতান আবদুল্লাহ্ আয্‌যাগেল গ্রানাডা থেকে যাত্রা করে এক

দুর্গে রাত্রি যাপন করছিলেন। এমন সময় খৃীস্টান সৈন্যরা রাতের আঁধারে হঠাৎ আক্রমণ করে বসল। মুসলমানরা যদিও সেই সময় অসতর্ক অবস্থায় ছিল নিজদেরকে তথাপি তারা সামলাইয়ে নিলে। অতঃপর তারা এমন বিরুক্তের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করল যে, শত্রুরা একেবারেই নিঃশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

মুসলমান সৈন্যদের শক্তি সামর্থ্য দেখে কিস্টলের সম্রাট ফার্ডিনান্ডের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, এখন মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। এজন্য তিনি একটি ফন্দি আটলেন, সুলতান হাসানের বন্ধী পুত্র আবু আব্দুল্লাহ্‌কে তার কাছে ডেকে আনলেন এবং তার চাচা (আবদুল্লাহ্ আয্‌যাগেল)-এর বিরুদ্ধে গানাডায় যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করলেন। অতএব আবু আব্দুল্লাহ্ ফার্ডিনান্ডের সাহায্যের ভরসায় অনেক কিছু অঙ্গীকার করে যাত্রা করল এবং চাচার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। এই যুদ্ধে আব্দুল্লাহ্ রাজ্যের যতটুকু দখল করতো তা পূর্বের অঙ্গীকার অনুযায়ী সম্রাট ফার্ডিনান্ডকে প্রত্যাবর্তন করতে লাগলো।

সুলতান আয্‌যাগেলর এই অবস্থা দেখে গ্রানাডা থেকে মালাকার দিকে যাত্রা করলেন, যেখানে-ফার্ডিনান্ড মুসলমানদেরকে হত্যা করতেছিল। আবু আব্দুল্লাহ্ এই খবর শুনে গ্রানাডা পেঁছিল এবং উহা দখল করে নিল। সুলতান আযযাগেল তখন, গ্রানাডায় প্রত্যাবর্তনকে-সমীচীন মনে করলেন না। 'আশ' উপত্যকায় বসবাস করতে লাগলেন। এদিকে কিস্টলের সম্রাট তো-রাগে একেবারে অগ্নিশর্মা-হয়ে আছেন। তিনি মালাকার হাজার হাজার রক্তে নিজ অস্ত্র রঞ্জিত করলেন এবং হাজার হাজার মুসলমানদেরকে বন্ধী করে দাস-দাসীতে রূপান্তরিত করেন। এই ঘটনা ৮৯২ সালের।

আবু আব্দুল্লাহ্ সম্ভবতঃ এটাই বুঝে ছিল যে, ফার্ডিনান্ড তাকে আয্‌যাগেলের বিরুদ্ধে পরস্পর যে সাহায্য পেঁছেছিল এবং এর পরিপেক্ষিতে তিনি যা কিছু অঙ্গীকার করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। এমনিভাবে গ্রানাডার-স্বাধীন শাসক হওয়ার ব্যাপারে তাঁকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। কিন্তু ৮৯৩ হিজরীতে তিনি একথা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, প্রকৃত পক্ষে এই সবই ছিল ফার্ডিনান্ডের এক ভয়ানক রাজনৈতিক চাল-

মাত্র। ফার্ডিনান্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে-গৃহযুদ্ধে লিপ্ত করায়ে তাদের কেন্দ্রীয় শক্তিকে দুর্বল করা এবং সুযোগ বুঝে' তা-দখল করে নেয়া।

সুতরাং ৮৯৪ হিজরীতে ফার্ডিনান্ড আবু আবদুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলেন। আবু আব্দুল্লাহ্ তার মুকাবিলা করলেন। কিন্তু পরিশেষে এই শর্ত সন্ধি হল যে, 'বাস্তাহ' প্রদেশ ফার্ডিনান্ডকে দিয়ে দিতে হবে। এই সন্ধিপত্রে পরিষ্কারভাবে লেখা ছিল যে, মুসলমানদের জান-মালের নিরাপত্তার কোন বিঘ্ন ঘটাবে না। সন্ধিপত্র অনুযায়ী-'কিস্টলের সম্রাটকে 'বাস্তাহ' প্রদান করা হল। কিন্তু পরিশেষে ফার্ডিনান্ড সন্ধি পত্রের শর্তের প্রতি কোন পরওয়া না করে মুসলমানদের ধন-সম্পদ জোরপূর্বক অধিকার করে নিল।

সুলতান আয্‌যাগেল গ্রানাডার উপর আবু আব্দুল্লাহ্‌র প্রধান্য বিস্তারের সংবাদ শুনে তিনি-আশ' উপত্যকাতেই বসবাস করতে লাগলেন এবং সেখানেরই বাদশাহ সেজে বসলেন। ফার্ডিনান্ড এমনিভাবে প্রবঞ্চনা করে আয্‌যাগেলকে ধোঁকা দিয়ে প্রথমতঃ ইরিলীয়া অতঃপর আশ উপত্যকা-ও অধিকার করে নিল। এখন তার জন্য শুধু গ্রানাডা জয় করাই বাকী ছিল। অতএব তিনি আবু আব্দুল্লাহ্‌র নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, যেভাবে সুলতান আয্‌যাগেল ইরিলীয়া প্রদেশ এবং আশ উপত্যকা স্বেচ্ছায় প্রদান করেছে, গ্রানাডার আল হামরা' দুর্গ ও ও আপনি আমাদের কাছে সমর্পণ করুন। এর বিনিময়ে যত ধন-সম্পদই চাইবেন, তা দিয়ে দিব। ইহা ছাড়াও স্পেনের যে কোন প্রদেশ চাইবেন, তথায় স্বীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দেয়া হবে। নির্লজ্জ আবু আব্দুল্লাহ্ উত্তর দিল যে, আপনার কথামত কাজ করতে আমার তো কোন আপত্তি নেই, কিন্তু মুশকিল হল যে, আমার প্রজাগণ কোন মতেই তা মানতে রাজী হবে না।

এদিকে ফার্ডিনান্ড ও আবু আব্দুল্লাহ্‌র মধ্যে চিঠি-পত্র আদান হচ্ছিল এবং অন্যদিকে আবু আব্দুল্লাহ্ মুসলমানদের উত্তেজনা ও দাবীর পরিপেক্ষিতে বাধ্য হয়ে খ্রীস্টানদের কয়েকটি দুর্গে আক্রমণ করল এবং বিজয় লাভ করল। কিস্টলের সম্রাট তখন সোজাসুজি গ্রানাডা আক্রমণ

করল। কিন্তু গ্রানাডার প্রাচীরের সন্নিকটে মুসলমানগণ অভূতপূর্ব ও আশ্চর্যজনক বীরত্ব প্রদর্শন করল। ফলে কিস্টলের সম্রাট অবরোধ উঠিয়ে নিতে বাধ্য হল। খৃীস্টানদের প্রত্যাবর্তনের পর আবু আবদুল্লাহ্ 'আল্‌বাশারাত' পাহাড়ের উপর অবস্থিত খৃীস্টানদের অবশিষ্ট সৈন্যদের উপর আক্রমণ করল এবং তাদেরকে হত্যা করে সমস্ত এলাকা দখল করল।

এই ঘটনা কতই না দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক যে, মুসলমানদের রাজত্ব সমগ্র স্পেনের উপদ্বীপ থেকে কমতে কমতে এখন শুধু গ্রানাডার একটি ছোট এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। খৃীস্টানরা প্রদেশের পর প্রদেশ এবং নগরের পর নগর দখল করে চললো। এবার মুসলমানরা বুঝতে পারল যে, তাদের এই দুর্দিন তাদের গৃহযুদ্ধ এবং পরষ্পরের কলহ-দ্বন্দ্বের কারণেই হয়েছে। কিন্তু তখনও তাদের চক্ষু খুলেনি। তাদের প্রবল স্বার্থপরতার কারণে নিজেদেরকে গৃহযুদ্ধের বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারল না। অতএব 'আল-বাশারাতের এলাকার উপর যখন আবু আবদুল্লাহ্‌র প্রাধান্য বিস্তার হয়ে গেল তখন তার চাচা আয্‌যাগেল বাশারাতের উপর আবু আবদুল্লাহ্‌র দখল মেনে নিতে পারল না। তিনি তথায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে লাগলেন। চাচা-ভাতিজার মধ্যে আবার গৃহযুদ্ধ এবং দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল।

কিস্টলের সম্রাট এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে—বাশারাতের উপর আক্রমণ করে আরো কয়েকটি দুর্গ জয় করে নিল। এখন তাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী এখানেও মুসলমানদেরকে হত্যা ও লুন্ঠণ করে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করল এবং বহু ধন-সম্পদ জোরপূর্বক দখল করে নিল। এখন তাদের আর সুলতান আযযাগেলকে উদ্দেশ্য হাসিলের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের প্রয়োজন বাকী রইল না। সুলতান তারা পরিষ্কার ভাবায় আয্‌যাগেলকে বলে দিল, "তুমি যদি এখন আফ্রিকায় চলে যেতে চাও, তবে চলে যাও, আমরা এর ব্যবস্থা করে দিব।" আয্‌যাগেল নিরুপায় হয়ে তাই করল। তিনি আফ্রিকায় চলে এলেন। আফ্রিকার তাল্‌মিসানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। অতঃপর সমগ্র নুহ্ দ্বীপে শুধু আবদুল্লাহ্ একাই রয়ে গেলেন।

ফার্ডিনান্ড স্বীয় বুদ্ধিমতী বিবি 'আযুবালা' এর প্রেরণায় ৮৯৬ হিজরীতে গ্রানাডার উপর আক্রমণ করল। এবার তারা খুবই জাঁকজমকতার সাথে আগমন করল। গ্রানাডার সামনে তাঁবু ফেলে সম্রাজ্ঞী আযুবালা একটি নতুন শহরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করল, যা' ইঙ্গিত বহন করে যে, এবার ফার্ডিনান্ডের সৈন্যরা গ্রানাডা বিজয় না করে দেশে ফিরবে না।

এই অবরোধ প্রায় সাত আট মাস চলেছিল। গ্রানাডাবাসীরা খুবই বীরত্ব ও দৃঢ়তার সাথে তাদের মুকাবিলা করছিল। কিন্তু যখন ভীষণ শীত পড়ল এবং তুষারপাতের ফলে রসদ-পত্র আগমনের পাহাড়ী রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল তখন তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমনের এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সুলতান আবু আবদুল্লাহর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল। কিন্তু আবু আবদুল্লাহর হিম্মত তখন একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি ভয় করছিলেন যে আমাদের বিশ হাজারের ও কম সংখ্যক সৈন্য কিভাবে এক লাখ খৃীস্টান সৈন্যর সঙ্গে যুদ্ধ করে বিজয়ী হতে পারবে।

পরিশেষে অবরোধের তীব্রতা থেকে অপারগ হয়ে 'গ্রানাডার গরীব মুসলমানগণ ইসলামের ভ্রাতৃত্বের নামে আফ্রিকা এবং কনস্টান্টিনোপলের ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে সাহায্যের জন্য এমন হৃদয় বিদারক ভাষায় চিঠি লেখলেন যে, মিস্টার ইস্কাটের ভাষায় "ইহা পাষাণ অন্তরকেও মোমের মত গলিয়ে দেবে। কনস্টান্টিনোপলের বাদশাহ দ্বিতীয় বায়যীদকে যে চিঠি লেখা হয়েছিল তাতে লেখা ছিল, "বহুশতাব্দী থেকে খৃীস্টানরা আমাদেরকে দাবিয়ে রাখতে চাচ্ছে। আমরা এখন তাদের মুকাবিলা করতেও অক্ষম। আমাদেরকে সর্বদিক থেকে তারা ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আমাদেরকে বিভিন্ন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে হচ্ছে। আমাদের ভাইদেরকে দাস বানিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। যে সব বিপদ-আপদে আমরা এখন লিপ্ত হয়েছি, এর শেষ পরিণতি হবে এই দেশ থেকে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং এখানে হয়ত কোন মুসলমান ও আর বাকী থাকবে না।

সুলতান দ্বিতীয় বায়যীদ-এর উপর এই চিঠি কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছি তা'এখন মিস্টার ইস্কট এর ভাষায় শুনুন। তিনি লেখেন, "স্বজাতীয়দের এই হৃদয় বিদারক চিঠি দেখে সুলতানের উপর এমন প্রতিক্রিয়া হল যে

তিনি দুজন-ফ্রান্সবাসী পাদরীকে দূত হিসেবে রোম প্রেরণ করেন এবং রোমের পোপকে ধমকির স্বরে বলেন যে, তুরস্কের রাজত্বে সমস্ত খৃষ্টানরা স্বাধীনভাবে চিন্তা-ফিকির ও কাজকর্ম করতে পারছে। যদি স্পেনের মুসলমানদের উপর এমনিভাবে অত্যাচার চলতে থাকে, তবে উহার প্রতিশোধ এখানকার খৃষ্টান প্রজাদের নিকট থেকে নিব। অন্যথায় তিনি যেন স্বীয় প্রভাব খাটিয়ে আপন ক্যাথলিক দাসদেরকে তাদের অন্যায় কর্ম থেকে বিরত রাখেন।

পোপ সুলতান কর্তৃক প্রেরিত দুজন দূতকে নিজের পক্ষ হতে একটি পত্র দিয়ে ফার্ডিনান্ডের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু এতে মুসলমানদের সম্পর্কে কোন সুপারিশের কথা ছিল না, শুধু ঘটনাটির উল্লেখ ছিল; ফার্ডিনান্ড এবং তার স্ত্রী আযবালা সর্বদাই খুব চতুর এবং হুশিয়ার ছিলেন তারা একদিকে তো পোপকে এই উত্তর দিয়ে নরম করলেন যে, "স্পেনের সমগ্র উপদ্বীপ আমাদেরই প্রাপ্য। আমাদের-ই-হক বা অধিকারকে মুসলমানদের পিতৃ পুরুষগণ অন্যায়ভাবে জোরপূর্বক অধিকার করে নিয়ে ছিল। আরা এখন উহাকে নিজেদের স্বত্ব বলে দাবী করছে। এই দেশকে তাদের অতিসত্বরই হাতছাড়া করতে হবে, যেমনিভাবে আমাদের (ফার্ডিনান্ড এবং আযবালার) পিতৃপুরুষদেরকে হাত ছাড়া করতে হয়েছিল। একটু আগে বেড়ে ফাডিনান্ড আরো লেখলেন, "আমার রাজত্বে সমস্ত অখৃষ্টান কর প্রদানকারীদেরকে সেই সব অধিকার মিলবে, যা সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানের মুসুলমানদের রাজত্বে খৃষ্টানদের অধিকার রয়েছে।

অন্যদিকে সেই সময় সুলতান দ্বিতীয় বায়যীদ মিসরের আমীরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ফার্ডিনান্ড ও এই সুযোগের সদব্যবহার করে স্বার্থ উঠানোর চেষ্টা করল। অতএব তিনি দ্বিতীয় বায়যীদের নিকট অঙ্গীকার করলেন যে, "আমি আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে জনশক্তি এবং যুদ্ধে জাহাজ দিয়ে আপনাকে সাহায্য করবো',। ফার্ডিনান্ডের এই ফন্দি কাজে লাগল। তার উল্লিখিত অঙ্গীকারের ফলে বায়যীদের উপর এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল যে, তিনি স্পেনের অসহায় মুসলমানদের আর কোন খোঁজ-খবর নিলেন না। এর পরিপ্রেক্ষিতে মিস্টার ইস্কাট লেখেন

যে, "ইসলামের নামধারীদেরকে তিনি তাদের শোচনীয় অবস্থাতেই তাদের ভাগ্যের উপর উপর ছেড়ে দিলেন"। ("আখবারুল আন্দালুস" গ্রন্থের তৃতীয়-খন্ড, ৬৯২ পৃঃ দ্রঃ)

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

"এই ঘরে আগুন লেগেছে, ঘরেরই প্রদীপ থেকে"।

অবশেষে আবু আব্দুল্লাহ্ আলহামরা প্রাসাদ বা কাসরুল হামরাতে এক পরামর্শ সভা ডাকলেন। ইহাতে গ্রানাডার বড় বড় উলামা, আমীর এবং মন্ত্রীবর্গ অংশ গ্রহণ করে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েক তেজস্বী যুবক নিজেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা পেশ করলেন যে, মুসলমানদের সর্বশেষে রক্ত বিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ করা চাই, পরিণাম যাই হউক না কেন? যাহোক, গ্রানাডাকে এমনিভাবে শত্রুর হাতে তুলে দেয়া খুবই লজ্জার ব্যাপার এবং কাপুরুষতাও বটে। কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের ঘরে অনেকের শোর-গোলের মাঝে একক তোতা পাখীর আওয়ায কি-ই বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে? পরিশেষে আবু আব্দুল্লাহ স্বীয় মন্ত্রী আবুল কাসেম আব্দুল মালেকের মাধ্যমে ফার্ডিনান্ডের সাথে সন্ধির কথা বার্তা শুরু করলেন। অবশেষে একটি সন্ধি পত্র তৈরী হল। তাতে কিস্টলের বাদশাহ এবং আবু আব্দুল্লাহ্ উভয়েরই দস্তখত দেয়া হল। এতে মুসলমানদের রাজত্ব, যা' প্রায় আটশো বছর ধরে' স্থায়ী ছিল, এখানেই এর পরিসমাপ্তি ঘটল।

এই সন্ধি পত্র প্রকৃত পক্ষে স্পেনের মুসলমানদের জন্য দুর্ভাগ্যের সর্বশেষ দলীল। এটা খুবই দীর্ঘ ছিল। আমীর শাকীব আরসালান নিজের লেখা (اخر نبی سراج) "আখের নবী সিরাজ" গ্রন্থের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এতে পঞ্চান্নটি দফা ছিল। তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দফার সারাংশ নিম্নে বর্ণিত হল।

'.সকল ছোট বড় মুসলমানকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। তাদের মাল-সম্পদ, সম্পত্তি ও জায়গীর সব কিছুই সংরক্ষিত থাকবে। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি এবং মসজিদসমূহ স্বাধীন থাকবে। তাদের ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা মুসলমান বিচারকগণই নিষ্পত্তি করেন। যুদ্ধে যেসব মালে গনীমত" মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে উহা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়া হবে না।

নির্দিষ্ট 'কর' ব্যতীত অন্য কোন অতিরিক্ত কর তাদের উপর ধার্য করা হবে না। যে সব খ্রীস্টান মুসলমান রানী আয্‌বালা অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তাঁরা উভয়েই এই সন্ধি-পত্রের প্রতিটি শব্দ এবং প্রতিটি অক্ষরের বাস্তবায়ন করবেন। যেমনিভাবে এই অঙ্গীকার পত্রের বাস্তবায়ন তাদের উভয়ের সমস্ত কর্মচারীদের এবং আমীর-উমরাদের সকলের জন্য একান্ত কর্তব্য, তেমনিভাবে তাদের প্রতিনিধিদের, সন্তান-সন্তুতিদের এবং নাতি-পুতিদের জন্য উহা মেনেচলা একান্তভাবে কর্তব্য। কেউই তা অস্বীকার করতে পারবে না।"

এই অঙ্গীকার-পত্রটি তো ছিল সাধারণ মুসলমানদের স্বার্থে! তা'ছাড়া আরো একটি অঙ্গীকার পত্র-সম্পাদিত হয়েছিল, যা' শুধু আবদুল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। এই অঙ্গীকার-পত্রে ছিল চৌদ্দ দফা। এর সারাংশ ছিল এই যে, বাদশাহ ফার্ডিনাণ্ড এবং তাঁর সম্রাজ্ঞী আযবালা'—উভয়ে মিলে দেশের কিছু ভূমি ও শহর সুলতান আবদুল্লাহ্‌র জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে ছিল আল্‌বাশারাতের পার্বত্য এলাকা; যার বর্ণনা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত এই কথারও অঙ্গীকার করা হয়েছিল যে, আবু আবদুল্লাহ্‌কে-তথাকার মুদ্রার-হিসেবে যা'কে-"ইউরাবিদ" বলা হয়, এককোটি চল্লিশ লাখ-পাঁচশো মুদ্রা দেয়া হবে। কিন্তু শর্ত এই যে' এই মুদ্রা তখনই অর্পন করা হবে, যখন ফার্ডিনাণ্ড এবং সাম্রাজ্ঞী আযবালা—'আলহামরা' দুর্গে প্রবেশ করেন। তৎপর আবদুল্লাহ্‌র সঙ্গে বিশেষভাবে অঙ্গীকার করা হয়েছিল যে, যতদিন পর্যন্ত তিনি স্পেনে বসবাস করবেন ততদিন পর্যন্ত তাঁর নিকট হতে কোন টেক্‌স্‌ আদায় করা হবে না। আর যদি তিনি কখনও দেশ ছেড়ে অন্য কোথায় ও স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান, তবে তাঁর এই ভূমির এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের উপযুক্ত মূল্য দিয়ে খরিদ করে রাখা হবে। আর যদি তিনি এই সব বিক্রি করতে না চান, তবে তিনি তাঁর কোন প্রতিনিধিকে এখানে তা' দেখা শুনার জন্য রেখে যেতে পারবেন, তিনি এই সব জায়গীর এবং সম্পত্তির বাৎসরিক আয় আদায় করে আবু আবদুল্লাহ্‌র নিকট পাঠিয়ে দিবেন। অতঃপর আবদুল্লাহ্‌ যদি কোন সময় জল পথে ভ্রমণ করতে চান,

তবে তাঁর জন্যে এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী সকলের জন্যে নৌযান-বা-অন্যান্য ব্যববস্থাপনা ফার্ডিনান্ড সরকারের পক্ষ হতে করা হবে। ঐতিহাসিক আমীর শাকীব আর সালানের তথ্য অনুসারে এই দ্বিতীয় অঙ্গীকার পত্রটি ২৫শে ডিসেম্বর, ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে হয়েছিল। (হাযেরুল আলম-আল-ইসলামী গ্রন্থের-২য় খণ্ড, ৭ম—পৃঃ দ্রঃ)

স্মরণ রাখার বিষয় যে, আবু আব্দুল্লাহ্ স্বীয় মন্ত্রীর মাধ্যমে-যে সন্ধি করেছিলেন, তা ছিল গোপনীয় গ্রানাডাবাসীর কাছে যখন এই গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গেল তখন তারা খুবই রাগান্বিত ও অস্থির হয়ে গেলেন। "হামেদ ইবনে-যাররাহ" নামী একজন দরবেশ কর্তৃক প্রেরণা ও উত্তেজনা প্রদান করায় বিশ হাজার গ্রানাডাবাসী অস্ত্রধারণ করে'যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে এল। কিন্তু কোন দৈবদুর্বিপাকের কারণে তাদের এই ইচ্ছে আর পূর্ণ হল না। এই ঘটনায় পরের দিন আবু আব্দুল্লাহ্ শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের একটি দলের সঙ্গে 'আল-হামরা'—দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে এক ভাষণ দেন। হে মুসলমানগণ! আমি বিশ্বাস করি যে, এই অপমান এবং লাঞ্ছনার জন্যে কারো কোন অপরাধ নেই। অপরাধী শুধু আমি নিজেই। আমি আমার পিতার সঙ্গে অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ করেছি। শত্রুদেরকে দেশের উপর আক্রমণের জন্যে আমিই ডেকে এনেছি। যা হউক, আল্লাহ্ তা'আলা আমার অপরাধের জন্যে আমাকে শাস্তি দিয়েছেন। তা' সত্ত্বেও একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, আমি এই সময় এই সন্ধিতে সম্মত হয়েছি শুধু তোমাদের জন্যে এবং তোমাদের ভবিষ্যত সন্তান-সন্তুতিদের কল্যাণের জন্যে, যাতে বৃথা রক্তপাত না হয়। তোমাদের মহিলাদেরকে যেন দাসীরূপে ব্যবহার করতে না পারে এবং তোমাদের শরীয়ত ও ধন-সম্পদ যাতে এই বাদশাহদের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত থাকে। ইহা সর্বাবস্থায় হতভাগা আব্দুল্লাহ্র ব্যবস্থাপনা থেকে উত্তম হবে।

আল-হামরা-দুর্গ হস্তান্তরের জন্য ফার্ডিনান্ডের পক্ষ হ'তে আব্দুল্লাহ্কে দু'মাস দশ দিনের সময় দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আব্দুল্লাহ্ এত অস্থির ও ব্যস্ত হয়ে গেলেন যে, দুর্গ হস্তান্তরের উল্লিখিত সময়সীমার পূর্বেই উল্লিখিত ভাষণের পরের দিনই ফার্ডিনান্ডকে সংবাদ দিলেন যে, আপনি

শহর দখল করে নিন। ফার্ডিনান্ড একজন পাদরীকে একদল লোকের সঙ্গে গ্রানাডা প্রেরণ করলেন, যেন-তিনি আল-হামরা দুর্গের সর্বোচ্চ ও সর্ববৃহৎ গম্বুজের উপর উড্ডীন ইসলামী চিহ্নযুক্ত পতাকা নামিয়ে তৎস্থানে ক্রস্‌+চিহ্নযুক্ত খ্রীস্টাদের পতাকা-স্থাপন করেন। যাতে তা দেখে বাদশাহ এবং তাঁর সম্রাজ্ঞী-শহরে প্রবেশ করতে পারে! এই সিদ্ধান্তের পরিপেক্ষিতে এক পক্ষের গ্রানাডা পরিত্যাগের এবং অপর পক্ষের প্রবেশের প্রস্তুতি হতে লাগল। এক পক্ষে হতভাগা আব্দুল্লাহ্‌ এবং তাঁর সমস্ত পরিবারবর্গ রাত ভর আসবাব-পত্র ও সাজ-সরঞ্জাম গুছায়ে গ্রানাডা পরিত্যাগের মর্মব্যথায় কাতর হয়ে শেষ বারের মত আলহামরা প্রাসাদের প্রতিটি দেয়াল, তাক্‌চা, মেহ্‌রাব ইত্যাদি অশ্রু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দেখছিল এবং আক্ষেপ করতে করতে নীরবে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিল। আর অপর পক্ষে কিস্টলের বাদশাহ্‌র ক্যাম্পে-খুশীর বাদ্য বাজাতেছিল। সকলই আনন্দে বিভোর। শুধু অপেক্ষা করছিল-কখন রাতের আঁধার কেটে শুভ প্রভাত হবে এবং বহু-আকাংক্ষিত গ্রানাডার আল-হামরা প্রাসাদ অধিকার করবে।

অতএব-প্রভাতে আব্দুল্লাহ্‌ তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে আল-হামরা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। অল্প দূরেই ফার্ডিনান্ডের প্রেরিত পাদরী সদল-বলে অপেক্ষা করছিল। আর আব্দুল্লাহ্‌ পাদরীর কাছে দুর্গের চাবি হস্তান্তরের সময় করুণ কণ্ঠে বললেন, "যাও—দুর্গ দখল কর গিয়ে। আমাদের অপকর্মের কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা-তাকে আমাদের হাত ছাড়া করে তোমাদের দখলে দিয়ে দিয়েছেন"। পাদরী দুর্গে প্রবেশ করে শাহী নির্দেশমত-ইসলামী চিহ্নযুক্ত পতাকা নামিয়ে তৎস্থানে খ্রীস্টানদের ক্রস-চিহ্নযুক্ত পতাকা উড্ডীন করলেন। ফার্ডিনান্ড আযবালা এবং খ্রীস্টান সৈন্যেরা তা দেখে—তাদের আনন্দের আর সীমা রইল না। তৎক্ষণাৎ বাদশাহ এবং সম্রাজ্ঞী অর্ধনমিত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। সমস্ত-সৈন্যরা ও তাদের অনুকরণ করল। এথেকে অবসর হয়ে তারা গ্রানাডা প্রবেশের জন্যে যাত্রা করল। নদীর তীরে একটি ছোট মসজিদ ছিল। সেখানে পৌঁছতেই তারা আব্দুল্লাহ্‌র সাক্ষাত পেল। আব্দুল্লাহ্‌ ফার্ডিনান্ডকে দেখেই চেয়ে ছিলেন যে, যানবাহন থেকে নেমে

তাঁকে অভিবাদন জানাবেন, কিন্তু বাদশাহ এবং সম্রাজ্ঞী তা' করতে নিষেধ করলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ্ চাইলেন বাদশাহ্‌র হস্ত চুম্বন করবেন, কিন্তু ইহাতেও বাদশাহ অসম্মতি প্রদান করলেন।

ঐতিহাসিক আমীর সাকীব আরসালানের এক বর্ণনা মতে—আবু আবদুল্লাহ্ তৎপর সম্রাজ্ঞী আয্‌বালার হাতে চুম্বন দিতে চাইলে সম্রাজ্ঞী হাত বাড়ালেন না এবং আবদুল্লাহর অস্থির ভাব দেখে তাকে সান্ত্বনা দিলেন। আবু আবদুল্লাহ্‌র যে এক ছেলে 'যামানাত, হিসেবে বন্দী ছিল বাদশাহ তাকে মুক্তি দিয়ে পিতার নিকট অর্পণ করে দিলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ্ নগরের চাবি বাদশাহকে হস্তান্তরের সময় বললেন "এই চাবিগুচ্ছ স্পেনের আরবদের প্রভাব প্রতিপত্তির সর্বশেষ নিদর্শন। কেননা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই আমাদের দেশ, মাল-সম্পদ এবং আমাদের জনগণ সবই আপনার অধিকারে এসেছে। আমি আশা করি যে, আপনি যেমন অঙ্গীকার করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে মুসলমানদের সঙ্গে অনুগ্রহ ও দয়া এবং নম্রতা ও সহানুভূতিশীল আচরণ করবেন। অঙ্গীকার করেছি তা যথাযথভাবে পালন করবো। এইরূপ কথোপকথনের পর ফার্ডিনান্ড চাবিগুচ্ছটি সম্রাজ্ঞী আযবালার হাতে অর্পণ করলেন। তিনি তা স্বীয় পুত্র প্রিন্স 'জোন' কে দিলেন এবং 'জোন' উহা "কাউন্ট-টেণ্ডস"-কে প্রদান করলেন, যাকে গ্রানাডার সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল।

অতঃপর ফার্ডিনান্ড ও তাঁর সম্রাজ্ঞী ইসাবেল-বা আয্‌বালা এবং সকল সৈন্য-সামন্ত গ্রনাডার দিকে উহা অধিকারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন এদিকে হতভাগা আবু-আবদুল্লাহ্ বারশানার উপত্যকার দিকে যাত্রা করলো যা তাঁর বসবাসের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিছুদূর চলার পর পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান হয়ে পিছন ফিরে গ্রানাডার জনবহুল এলাকা এবং আল-হামরা প্রাসাদের মিনারা ও উহার গম্বুজের দিকে দৃষ্টিতে তাকিয়ে অতীত স্মৃতি মন্থন করছিল। তাঁর সঙ্গী-সাথীরা ও সেই সময় তাঁর সঙ্গে গ্রানাডার দিকে স্বজল নয়নে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল। কিন্তু তাদের ভাষা ছিল নির্বাক। মুখে একটি কথাও বলতে পারছিল না। এখনও তিনি আক্ষেপ ও বেদনাদায়ক দৃষ্টির

মাঝে নিমগ্ন ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ করে আল হামরা দুর্গের উপর থেকে তোপধ্বনি শুনা গেল। প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল বিজয়ের তোপধ্বনি। এটা সেই ঘোষণা যে. এখন গ্রানাডা থেকে মুসলমানদের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং খ্রীস্টানদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছে। আবু আব্দুল্লাহ্ সেই সময় নিজেকে আর সামলাতে পারল না, আপনাতেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। আবু আব্দুল্লাহ্‌র মাতা আয়েশা খুবই বুদ্ধিমতী ও হুশিয়ার মহিলা ছিলেন। তিনি ছেলেকে এমনভাবে কাঁদতে দেখে বললেন, এখন তুমি মেয়েদের মত কাঁদছ' কিন্তু তোমা-হতে-যাতে একাজ সংঘটিত না হয়—তা ভেবে পূর্বেই পুরুষের ন্যায় গ্রানাডা প্রতিরোধ করা উচিত ছিল। আবু আব্দুল্লাহর মন্ত্রী ইউসুফও তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর অশ্রুজলের যেন বন্যা বয়ে গেছে, কোনক্রমেই তা' থাকতে ছিল না। আল বাশরাতের পাহাড়ী অঞ্চলের দন্ডায়মানে হয়ে আবু আব্দুল্লাহ্ এবং তাঁর সাথীগণ পিছন ফিরে গ্রানাডার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন, তা دم واپسین عرب ("দমে ওয়াপুসিনে আরব") আরবদের শেষ নিঃশ্বাস-নামে খ্যাত হয়ে গিয়েছিল। এখন ও সেই নামেই স্থানটি স্মরণীয় হয়ে আছে। আমীর শাকীব আরসালান লিখেছেন যে, তিনি স্পেন ভ্রমণের সময় সেই স্থানটি দেখে এসেছেন।

আবু আব্দুল্লাহ্‌র ইন্তিকাল

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফার্ডিনান্ড-আল বাশারাতের পার্বত্য অঞ্চল আব্দুল্লাহ্‌র এবং তাঁর বংশের লোকদের বসবাসের জন্যে নির্ধারণ করে, দিয়েছেন। এর পরিপেক্ষিতে তিনি যা কিছু অঙ্গীকার করেছিলেন —তা' 'গ্রানাডা দখল করার পর তিনি সমস্ত অঙ্গীকার একেবারে ভুলে গেলেন। অতএব আবু আবদুল্লাহ্ এর-জন্যে-স্পেনের প্রশস্ত ভূমি অতি সংকীর্ণ হয়ে গেল:এবং তিনি স্পেনকে চিরদিনের জন্যে الوداع বিদায় জানিয়ে আফ্রিকায় চলে এলেন এখানে তিনি মারাকেশের বাদশাহর কর্মচারী নিযুক্ত হন। এমতাবস্থাতেই তিনি ৯৪০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

আবু আব্দুল্লাহ্‌ -ইউসুফ ও আহমদ নামে তাঁর দু'ছেলে রেখে-যান। 'ফাস' শহরের যেখানে আবু আব্দুল্লাহ্‌র ইন্তিকাল হয়েছিল, তথায় এখনও তাঁর বংশধরগণ বর্তমান আছেন। ঐতিহাসিক আমীর শাকীব আরসালান তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। এসম্পর্কে তিনি লেখেন যে, তাঁরা খুবই অসহায় অবস্থাতে-দারিদ্র্যের জীবন-যাপন করছে। যে সব লঙ্গরখানায়-ফকীর-মিসকীনদের জন্য খাদ্য বিতরণ করা হয়,-সেখানে তাদের আনাগোনা। لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
(মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত কারো কোন শক্তি সামর্থ্য নেই)

গ্রানাডার মুসলমান অধিবাসীদের প্রতি অত্যাচার

স্পেনে মুসলমানদের রাজত্ব-প্রায় আটশো বছর চলার পর গ্রানাডার পতনের ফলে সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু সরকারের পক্ষ হতে অত্যাচার-অবিচার এবং জোর-জুলুমের এমন কোন দিক বাকী ছিল না-যা' এই গরীব মুসলমানদের উপর পতিত হয়নি। একদিকে উল্লেখিত অঙ্গীকার পত্র পড়ে দেখুন এবং অপরদিকে তাওহিদী জনতার উপর যে সব অত্যাচার চালানো হয়েছে এর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পড়ে দেখুন, তাহলে নিশ্চয়ই আপনার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিবে যে, পৃথিবীতে যে জাতি নিজের সংরক্ষণ নিজে করতে পারে না, সে পরাজিত ও শাসিত হয়ে অন্য কোন বিজয়ী-জাতির নিকট হতে কখনও অনুগ্রহ, দয়া এবং বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির আশা করতে পারে না।

অতএব ফার্ডিনান্ড ও 'আযবালা' গ্রানাডার প্রবেশ করে, প্রথমেই গ্রানাডার সবচেয়ে বড় জামে মসজিদটি গীর্জায় রূপান্তরিত করল এবং সেখানে কৃতজ্ঞতাসূচক প্রার্থনা করল। অতঃপর রাষ্ট্রের পক্ষহতে চেষ্টা চলল কিভাবে মুসলমানদেরকে স্বেচ্ছায় খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করায়ে বিধর্মী করা যায়। এরিপ্রেক্ষিতে প্রথমতঃ তাদের সঙ্গে বিনয় ও সহানুভূতিশীল আচরণ করা হল। কিন্তু যখন খ্রীস্টানদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে. মুসলমারা তো কখন ও স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করবে না, তখন তারা প্রকাশ্য অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রদর্শনের পর্দা উন্মোচন করে' তাদের সাথে অত্যাচার ও কঠোরতা-মূলক আচরণ শুরু করে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পদক্ষেপ নিল,

যে কোন খ্রীস্টানের জন্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা আইনতঃ নিষিদ্ধ। অপরদিকে যে সকল মুসলমান খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে চায় তাদের জন্য টাকা কড়ির তৈল মর্দন করা হতে লাগল। অতঃপর ১৪৯৯ খ্রীস্টাব্দে শাহী নির্দেশ জারি হল "যেসব মুসলমান খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করবে না তাহারকে স্পেন ছেড়ে চলে যেতে হবে"। এর প্রতিক্রিয়া এমন হল যে, বহু গরীব এবং দুর্বল প্রকৃতির মুসলমান যদিও তারা খাঁটি ঈমানদার ছিল, কিন্তু সরকারী শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য প্রকাশ্যভাবে গীর্জায় আনাগোনা করত এবং নিয়ম-নীতি পালন করতো। ইহা ছাড়া যে সব মুসলমান বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় দিক দিয়ে মুসলমান হিসেবে চলা-ফেরা করতো, তাদেরকে বিভিন্ন কঠোরতা ও বাড়াবাড়ির শিকার হতে হতো। আর যে সব মুসলমান শিশুর উপর তারা 'কাবু' পেতো তাদেরকে Baptism ('বাপ্‌টিসম') নীতিতে খ্রীস্টান বানিয়ে ফেলত।

১৫২৪ খ্রীস্টাব্দে মুসলমানরা যখন রাজদরবারে এই সব অত্যাচারের অভিযোগ করল, তখন তাদের বিষয়টি ধর্মীয় বিষয়ের আদালতে ন্যস্ত করা হয়। এই আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বহু মুসলমানকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। অতঃপর এই আদালতের প্রধান বিচারপতি 'লর্ডবিশপ' (Bishop) প্রধান পাদরী সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বছরে একবারও মুসলমানরা (প্রকাশ্যে) তাদের ধর্মীয় 'অযীফা' বা 'তাসবীহ' আদায় করতে পারবে না এবং বিশেষ ধরনের ধর্মীয় পোশাক ও পরিধান করতে পারবে না। নিজের ধর্মীয় ভাবাপন্ন কথাও বলতে পারবে না। সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের সময়ে গ্রানাডার 'লর্ড-বিশাল' সম্রাটের অনুমতিক্রমে সাধারণ ঘোষণা দিলেন যে, মুসলমানরা 'নাজাসাতে সুগরা' (ছোট নাপাকি) এবং 'নাজাসাতে কুবরা' (বড় নাপাকি) উভয় প্রকার অপবিত্র অবস্থাতে ও গোসল করতে পারবে না। এতদ্ব্যতীত তাদেরকে পাশ্চাত্যের নাচ-গানের আসরে অংশ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক করে দেয়া হল। আরবী ভাষায় কথা বলা ও লেখা-পড়া করা, স্ত্রী লোকদের বোরকা পরিধান করা, এই সবই আইনতঃ নিষিদ্ধ করে দেয়া হ'ল।

এখানেই শেষ নয়। মুসলমানদেরকে বাধ্য করা হল তাদের আরবী নাম পরিবর্তন করার জন্যে। অতএব আমীর শাকীব আরসালান "হাযেরুল

আলম-আল্‌ইসলামী" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভেই স্পেনের বহু মহল্লা ও স্থানের স্পেনীয় নাম বর্ণনা করার পর লিখেছেন যে, ঐ নাম-গুলো মূলে আরবী ছিল। কেননা দেখা যায় যে, ঐ নামগুলো আরবের বড় বড় সর্দারের নামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কিন্তু যেহেতু তাদেরকে জোরপূর্বক খৃষ্টান বানানো হয়েছে কিংবা তাদের আসল নাম পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে, তাই তাদের মূল আরবী নামের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে।

মুসলমান ঐতিহাসিক ছাড়াও খোদ ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিকগণ ও এই সব অত্যাচারের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। আরব 'কৃষ্টির' বিখ্যাত লেখক 'মোসোলিয়ান' বলেন যে, স্পেনের গরীব মুসলমানদের উপর যে সব অত্যাচার অবিচার হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এর কোন দৃষ্টান্ত নেই। অথচ এই মুসলমানগণ তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং রাজত্বের সময়ে খৃষ্টানদের উপর কখনও এরূপ অত্যাচার করেনি। যদি এমন করতো তবে আজ স্পেনের সমগ্র উপ-দ্বীপে কোন খৃষ্টানের নাম নিশানাও থাকতো না।

পনের শতাব্দীর শেষে স্পেনের 'লর্ডবিশাব মিন্ডোরা-এর মৃত্যুর পর 'ফান্সকো-শিমনাস-ডি-সিযার' এই পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি যে কি পরিমাণ পক্ষপাতিত্বকারী ব্যক্তি ছিলেন—সে সম্পর্কে মিস্টার ইস্কাট লেখেন যে, এই ব্যক্তির জীবন, তার পরিবেশ ও শিক্ষায় তাকে তৎকালের সংকীর্ণ-মনা, পক্ষপাতিত্ব এবং রুক্ষ স্বভাবের মডেল বানিয়ে রেখেছিলেন। .... তার মাঝে না ছিল সহিষ্ণুতা ও নম্রতা, না ছিল মানবীয় সমবেদনা। তিনি শুধু জানতেন যে, মানুষের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হল গীর্জার প্রতি অনুগত হওয়া। কিন্তু তার চরিত্র কেমন ছিল ? সে সম্পর্কে মিস্টার ইস্কাট লেখেন যে, তার দৃষ্টিতে মেয়েরা ছিল রাজ্যের গৃহবধূ তুল্য। আমীরদের কন্যারা কিংবা সমাজ্ঞীর বিশেষ সহচারীদের প্রতি ছিল অবাধ মিলা-মিশা। অষ্টম পোপ-ইনোসেন্টস১১৮৬ খৃষ্টাব্দে এবং সম্রাজ্ঞী আযবালা-১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে তার (শিমনাসের) তিনটি অবৈধ সন্তানকে বৈধ সন্তান বলে সাব্যস্ত করেন। কঠোর পক্ষপাতিত্ব এবং চারিত্রিক অবক্ষয়ে গুণান্বিত তৎকালের রাজত্বের আইন-শৃংখলা এবং নিয়মনীতি সবই যেন গীর্জার পাদরী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত

ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিম্‌নাসেরও রষ্ট্রীয় কাজ-কর্মে এমন দখল ছিল যে, তিনিই যেন স্পেনের বাদশাহ ছিলেন। এই অবস্থায় মুসলমানদের উপর যত অত্যাচারই হউক, তা' যেন কমই ছিল। অতএব এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি গীর্জা সম্পর্কিত আদালত থেকে একটি নির্দেশ প্রাপ্ত হন, ইহার ফলে নিজেই ইচ্ছামত মুসলমানদের ধর্মীয় ত্রুটি অন্বেষণ করতেন এবং তাদেরকে শাস্তি দিতেন। মিস্টার ইস্কাট এই ব্যক্তির অত্যাচারের বিষাক্ত বিবরণের কাহিনী বিস্তারিত লিখেছেন। এখানে এর হুবাহু উত্থাপন সম্ভব নয়, এই জন্য নিম্নে আমরা এর সারাংশ উল্লেখ করলাম।

স্পেনের রাজত্ব থেকে মুসলমানগণ সম্পূর্ণ বে-দখল হওয়ার পর বহু মুসলমান মসজিদুল বাইয়্যেনের আশে-পাশের এলাকায় যেতে লাগলেন। তাদের মধ্যে চার হাজার মুসলমানকে এই বলে 'বাপতিসম' (ب-پ-تسمہ) **Baptism** নীতির জালে আটকে' খৃস্টান বানানো হল যে, তারা স্বীয় ধর্ম (ইসলাম) অসন্তুষ্ট ছিল। এই মসজিদটিকে পরে গীর্জা বানানো হল। আর যাদেরকে জোর জুলুম করে খৃস্টান বানানো হয়েছিল তাদের প্রতি এত খবরদারী করতো যে, তারা অনিচ্ছায় ও খ্রীষ্ট ধর্মের বিপক্ষে কোন কাজ করতে পারতো না। গ্রানাডার যে সমস্ত মুসলমান তাদের আপন ভাইদের ইসলাম ত্যাগের কারণে সমালোচনা করতো, তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার করে' জেল হাজতে নিয়ে কষ্ট দিত।

পুস্তকে অগ্নি সংযোগ

এখন তিনি মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্প-কলার কীর্তিসমূহ নিঃশ্চিহ্ন করার কাজে মনোনিবেশ করলেন। সুতরাং এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি গ্রানাডার প্রতিটি ঘরে ঘরে তল্লাশী চালিয়ে আরবী ভাষায় যত পুস্তক যেখানেই পেয়েছেন, সবগুলোকে জবর দখল করেছেন। এইভাবে প্রায় দশলাখ কিতাব (পুস্তক) সংগৃহীত হল। এর মধ্যে শুধু কুরআন শরীফের অমূল্য কপিই ছিল না' বরং-বনী উমাইয়াদের রাজত্বকালের ঐ সমস্ত অমূল্য পুস্তক ও ছিল যা' রাজধানী কর্ডোভার গর্বের বস্তু ছিল এবং যেগুলোকে বংশানুক্রমে অমূল্য সম্পদ বলে মনে করা হতো। সাধারণ (পাবলিক) লাইব্রেরীতে এমন সব পুস্তক ছিল, যার সংরক্ষণ ও সংবর্ধন গ্রানাডার বাদশাহগণ তাদের প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করতেন। এগুলোর মধ্যে ইতিহাস

ও বিজ্ঞানের বহু পুস্তক ছিল যা'তে সমস্ত কিছু সংযোজিত ছিল এবং যা'কে মুসলমানদের চিন্তা শক্তির দিক-দর্শন মনে করা হতো। তা'ছাড়া সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা এবং চিকিৎসা-বিদ্যা ইত্যাদির অসংখ্য পুস্তক ছিল। এই সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক সংগ্রহ করতে স্পেনের মুসলমানগণ বহু পরিশ্রম ও সাধনা করেছেন। এতে সন্দেহ নেই যে, ঐসব পুস্তকের মধ্যে প্রাচীন যুগের অনেক অনুবাদ পুস্তক ও ছিল, যা' এককালে বাদশাহ আলেকজান্ডার সেকান্দরের গ্রীক লাইব্রেরীসমূহের শ্রীবর্ধক ছিল। এই অনুবাদ পুস্তকগুলো নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চল থেকে সুদূর স্পেনের উপদ্বীপের প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এইগুলো সাহিত্যের নিপুণতা ও সৌন্দর্যের দিক দিয়ে মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও জাঁকজমকতার উজ্জ্বল নিদর্শন ছিল। স্বর্ণ; রৌপ্য এবং রং-বে-রঙ্গের কারুকার্যে এগুলোর প্রতিটি পৃষ্ঠা সৌন্দর্য মণ্ডিত ছিল। অধিকাংশ পুস্তকের মলাট ছিল চামড়ার। অনেক পুস্তকের উপর বিভিন্ন রঙ্গের কারুকার্য ছিল। আবার কোন কোন পুস্তকের মলাটের উপর ঝিনুক, হাতীর দাঁত এবং মূল্যবান পদার্থের কারুকার্য খচিত ছিল এবং এর চার পার্শে খাঁটি সোনা দিয়ে শোভা বর্ধন করা হয়েছিল।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই অফুরন্ত ভাণ্ডার 'বাবুর-রাহেলার' চত্বরে একত্র করে' আগুন লাগিয়ে দিল এবং মুহূর্তের মধ্যে সব ছাই হয়ে গেল। মিস্টার এস, পি, ইস্কাট এই ঘটনার উল্লেখ করার পর লেখেন:—"এইরূপ ধর্মীয় উগ্রতা ও পশুত্বাচরণের ফলে জগতবাসীর অপূরণীয় ক্ষতি হত। সম্ভবত' পৃথিবীর আর কোথায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন ভাণ্ডার ছিল না, যা' 'সিম্‌নাস ঐতিহাসিক ঐ অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়ে ছাই করলো। এই পৈশাচিক কর্মকাণ্ডে আর্থিক ক্ষতি তো হলই, তদুপরি সমাজের উপর এই ধ্বংসাত্মক কাজের যে কি প্রতিক্রিয়া হল তা' অবর্ণনীয় এতে বিশ্বের জ্ঞান অন্বেষণকারীদের ঐ স্মরণ স্থলটি ধ্বংস হয়ে গেল, যার স্থলাভিষিক্ত হওয়া অসম্ভব। মুহূর্তের মধ্যে তিনি বহু শতাব্দীর সঞ্চয় করা অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার পুড়িয়ে ছাই করলেন, যা' দ্বারা বর্তমান কালের ঐতিহাসিকগণ স্পেনের মুসলমানদের সভ্যতাও কৃষ্টি সম্পর্কে এমন সব তথ্য সংগ্রহ করতে পারতেন, যে জ্ঞানের জগতে বর্তমানে তার সন্ধান লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

("আখবারুল আন্দালুস" গ্রন্থের তৃতীয় খন্ড দ্রষ্টব্য)

খোদ ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেছেন যে, সিমনাসের নির্দেশ শুধু গ্রানাডাতে যে সব পুস্তক জ্বালিয়ে ছাই করা হয়েছে এর সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার। ("আল-ইসলাম ওয়াল হাযারাতুল আরাবীয়া" গ্রন্থের ১ম-খণ্ড, ২৫২, ২৫৩ পৃঃ দ্রঃ) এতেই অনুমান করা যায় যে, স্পেনের নগরসমূহে যে সব পুস্তক পুড়ানো হয়েছে এর সংখ্যা কত হবে ?

জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ

অতঃপর মিস্টার ইস্কাট লেখেন যে, উল্লিখিত 'বাবুর রাহেলা'তে যেখানে হাজার হাজার বীরদের বীরত্বের খেলা হতো এবং যেখানে সিমনাস' মুসলমানদের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে অগ্নিদগ্ধ করেছিল, সেখানে হাজার হাজার অভিযুক্ত মুসলমানকে এনে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা হল।

সাধারণ হত্যা কাণ্ড

উস্তাদ কুরদ, আলী পশ্চাত্যের কয়েকজন ঐতিহাসিককের বরাত দিয়ে লেখেন যে, "১৪৯৯ খৃীস্টাব্দ থেকে জোর-জুলুম ও সাধারণ অত্যাচারের যুগ শুরু হয়ে গেল। স্পেনের অধিবাসীরা আরবদের সন্তানদেরকে ধরে নিয়ে জোরপূর্বক খৃীস্টান বানাতো এবং এর পিছনে যুক্তি দিত যে, এরা প্রথমতঃ খৃীস্টানই ছিল। অতঃপর তাদেরকে ধর্মীয় আদালতে উপস্থিত করা হতো এবং সেখান থেকে এই হতভাগার প্রতি রায় হতো তাদেরকে জ্বালিয়ে মারার জন্য। কিন্তু কয়েক লক্ষ মুসলমানকে অগ্নিদগ্ধ করা সহজ কাজ ছিল না। তাই লর্ডবিশাপ (পারদী) স্পেনের ভূমি থেকে আরবদেরকে খালী করার উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিল, "যেসব আরব খৃীস্ট ধর্ম গ্রহণ করবে না তারা পুরুষ হউক কিংবা মেয়ে হউক অথবা শিশু হউক, সর্বাবস্থায় তাদেরকে হত্যা করা হবে।"

ফ্রান্সের বিখ্যাত বিপ্লবী লেখক 'ডেলিটর' বলেন যে, আরবরা যখন স্পেন জয় করল তখন তারা একটি খৃীস্টানকে ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য জবরদস্তি করে নাই। কিন্তু খুবই অক্ষেপের বিষয় যে, খৃীস্টানরা যখন এই দেশ অধিকার করল তখন 'জিমনাস' সকল আরবদেরকেই খৃীস্টান বানাতে চাইলেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পঞ্চাশ হাজার মুসলমানকে

খৃষ্টানদের প্রতীক 'ক্রস'+চিহ্ন লাগানোর জন্য বাধ্য করলেন, যা' তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল।

১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে সরকারী নির্দেশ জারি হল মুসলমানরা আরবী ভাষা এবং তাদের আরবীয় পোশাক পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করতে হবে"। এই সব অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমানরা গ্রানাডা এবং আল-বাশারাতে বিদ্রোহ করল। কয়েক বছর পর্যন্ত সংগ্রাম চল্‌ল। পরিশেষে মুসলমানরা পরাস্ত হল। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে সাধারণ ঘোষণা দেয়া হল, যে, "মুসলমানদেরকে স্পেনের ভূমি সম্পূর্ণরূপে খালী করে দিতে হবে। অতএব দু'বছর সময়ের মধ্যে প্রায় পাঁচ লাখ মুসলমান স্পেন থেকে হিজরত করল। তাদের অধিকাংশই আফ্রিকায় এবং অন্য যে কোন দেশে যেখানেই আশ্রয় পেয়েছে সেখানেই চলে গেল। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, ফার্ডিনান্ডের গানাডার উপর অধিকারী হওয়ার সময় থেকে নিয়ে দেশত্যাগের সর্বশেষ নির্দেশ পর্যন্ত যারা স্পেন পরিত্যাগ করল, তাদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ লাখ। কিন্তু একজন ঐতিহাসিকের বর্ণনা হল যে, আফ্রিকার দিকে হিজরতকারী মুসলমানদের ভাগ ¾ মুসলমানকে পথেই হত্যা করা হয়। এই অসহায় মুসলমানরা তাদের গন্তব্যস্থলেও আর পৌঁছতে পারল না। যা'হউক, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই মুসলমানরা স্পেন থেকে নিঃশেষ হয়ে গেল। (আল্-ইসলাম ওয়াল হাযারাতুল আরাবীয়া" গ্রন্থে ১ম-খন্ড, ২৫২, ২৫৩ পৃঃ দ্রঃ)[১]

ভারতবর্ষে মুসলমানদের রাজত্ব এবং উহার পতন

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানগণ যে সব রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, তন্মধ্যে ভারতবর্ষে ইসলামী রাজত্বের ইতিহাস ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আশ্চর্যজনক। মুসলমানগণ এই ভূমিতে প্রায় আটশো বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। কিন্তু অতঃপর বিপ্লবের প্রবল বাতাসের এমন এক ঝাপটা এল, যা' উন্নতির এই প্রদীপকে এ দেশে সম্পূর্ণ নীরব করে দিয়েছে এবং আজ-পর্যন্তও সেই অবস্থাই বিদ্যমান। এর পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের উত্থান ও

---

[১] "চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে শুধু আল্লাহর নাম"

পতনের একটা সাধারণ হিসাবে নিতে গেলে ভারতবর্ষের মুসলমানদের উত্থান ও পতনের উপর একটু হালকা দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে মুসলমানদের সামুদ্রিক আক্রমণ হযরত উমর (রাঃ)-এর সময়-কাল থেকেই শুরু হয়েছিল। সুতরাং বাহরায়নের গভর্নর উস্‌মান ইবনে আবিল আ'স (রাঃ) আম্মানের পথে ভারতবর্ষের সমুদ্র উপকূলের দিকে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন, যাঁরা বোম্বাইয়ের এলাকার 'থানা' পর্যন্ত এসেছিলেন। কিন্তু পরে হযরত উমর (রাঃ) যখন এই সংবাদ পেলেন, তখন তিনি ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং উসমানকে লেখলেন যে, যদি এই ক্ষণে সমুদ্র উপকূলে মুসলমানদের কোন ক্ষতি হতো তবে আমি এর প্রতিকার তোমার স্বজাতির কাছে থেকে নিতাম। তা ছাড়াও উসমান তাঁর আপন ভাই আল-হাকিমকে 'বাহ্‌রোঞ্চে' এবং অন্য ভাই মুগীরাকে 'দীবল' প্রেরণ করেছিলেন। সেখানে তাঁর শত্রুর সঙ্গে মুকাবিলা হল এবং তিনি সফলকাম হন। অতঃপর হযরত উসমান (রাঃ) যখন খলীফা হলেন এবং আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আমেরকে ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করলেন, তখন তিনি তাঁকে লেখলেন যে, ভারতবর্ষে এমন একজন লোক প্রেরণ করুন—যিনি তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তথাকার ভাল-মন্দ খবরা-খবরও নিয়ে আসতে পারেন। আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আমের এই কাজের জন্যে হাকিম ইবনে জাবালা আল আদববীকে-নির্বাচন করেন। অতএব তিনি যখন ভারতবর্ষ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তাকে খলীফার দরবারে প্রেরণ করা হ'ল। হাকীম ইবনে জাবালা হযরত উসমান (রাঃ)-এর নিকট ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ অবস্থা বর্ণনা করলে তিনি সেখানে কোন সৈন্যদল প্রেরণ করাকে সমীচীন মনে করলেন না।

("ফতুহুল বুলদান বেলাযরী" গ্রন্থের 'সিন্ধুবিজয়' অধ্যায়—দ্রঃ)

অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আমীরে মুআবীয়া (রাঃ)-এর খিলাফত কালেও সিন্ধুর সীমান্তবর্তী এলাকা 'মাকরান' এবং 'কাবকান' এমন কি লাহোর পর্যন্ত ইসলামী সেনাদলের আগমন এবং যুদ্ধ করার ঘটনা উল্লেখ আছে। কিন্তু একে শুধু এক প্রকার ছোট খাঁট যুদ্ধ বা বিতর্ক বলা যেতে পারে। তবে যথা নিয়মে যুদ্ধ এবং বিজয় খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিকের সময়ে বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের তত্ত্বাবধানে হয়েছিল।

মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের সিন্ধু আক্রমণ

এই আক্রমণের অবস্থা এবং কারণসমূহের বিবরণে প্রকাশ যে, সিন্ধুর রাজা দাহির প্রথম থেকেই মুসলমান বিদ্বেষী ছিল। অতএব যে সব আরব দেশী লোক মাকরানের গভর্নর সাঈদ ইবনে আসলামকে হত্যা করেছিল, রাজা দাহির তাদেরকে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়ে শত্রুতার আরো প্রমাণ দিল। এই ঘটনার কয়েক বছর পর লংকার (সিংহলের) রাজা-মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্য ইরাকের বিখ্যাত উমাইয়া গভর্নর হাজ্জাজ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফুস্-সাকিফী-এর জন্যে কয়েকটি জাহাজে করে বহু উপঢৌকন সামগ্রী ভর্তিকরে প্রেরণ করেন। এতে অনেক মুসলমান হাজী ছাড়াও ঐসমস্ত আরব বণিকদের মেয়েরা এবং শিশুরাও আরোহী ছিল, যারা লংকায় (সিংহল) ইন্তিকাল করেছিল। হঠাৎ করে জাহাজগুলো-রাজা দাহিরের রার্জ্যসীমার 'দীবল' বন্দরে উপস্থিত হলে তথাকার জলদস্যুরা এই জাহাজগুলোর সমস্ত মাল-সম্পদ লুন্ঠণ করল এবং মহিলা শিশুদেরকে বন্ধী করল। হাজ্জাজ এই সংবাদ পেয়ে খুবই রাগান্বিত হলেন। তিনি রাজা দাহিরকে লেখলেন যে, গ্রেফতার কৃত মহিলা শিশু এবং অন্যান্য পুরুষদেরকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দিন এবং আমাদের যে সব মাল-সম্পদ জলদস্যু কর্তৃক লুন্ঠিত হয়েছে তা' তাদের কাছ থেকে ফেরত এনে আমাদের নিকট পাঠিয়ে দাও। রাজা দাহির উত্তর দিলেন যে, "এই সব জলদস্যুদের কাজ। তাদের উপর আমার কোন আধিপত্য নেই"। দাহিরের ইসলাম বিদ্বেষী হওয়ার ঘটনা প্রথম থেকেই প্রকাশ পেয়েছিল। এবার তার এই দুষ্টাতাপূর্ণ উত্তর হাজ্জাজকে আরো উত্তেজিত করে তুলল। তাই তিনি দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করলেন যে, সিন্ধু বিজয় করে রাজা দাহিরকে সমুচিত শাস্তি দিবেন।

অতএব তিনি খলীফার দরবার থেকে অনুমতি নিয়ে উবায়দুল্লাহ ইবনে বানামকে এক সেনাদল দিয়ে 'দীবল' প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি সফলকাম হতে পারেননি এবং পরিণামে নিহত হলেন। অতঃপর হাজ্জাজ বাদিল ইবনে তুহ্ফাতুল বাজলীকে 'দীবল প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে তাঁর ঘোড়া ভীত হয়ে উল্টা পালায়ন করলে শত্রুরা তাকে ঘেরাও

করে ফেলে এবং হত্যা করে। অতঃপর হাজ্জাজ আপন তরুণ ভাতিজা এবং জামাতা মুহাম্মদ ইবনে কাসিমকে এই কাজের জন্য নির্বাচন করেন তাঁকে এক বিরাট সৈন্য বাহিনী এবং বহু যুদ্ধ সামগ্রী দিয়ে সিন্ধু বিজয়ের জন্যে প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে ছিল ছয় হাজার শামী এবং অন্যান্য বীর যুদ্ধা। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম যাত্রা করে প্রথমে মাকরান এলেন। কয়েকদিন এখানে অবস্থান করার পর আবার যাত্রা করলেন এবং 'কাতরাবোর' পৌঁছেন। অতঃপর উহা জয় করে সম্মুখে অগ্রসর হন এবং 'আরমায়েল' পৌঁছেন। উহা জয় করে দীবলের দিকে যাত্রা করেন, ইহা রাজা দাহিরের রাজত্বের একটি সামুদ্রিক বন্দর। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম নিজে স্থল পথে আগমন করেন। কিন্তু একটি বিরাট সৈন্যদল সমুদ্র পথে আগমন করছিল। দীবলের এই উভয় সেনাদলের সাক্ষাত হল। এখানে আগমন করেই মুসলিম সেনাদল নিজেদের ইসলামী পাতাকা উড্ডীন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন। দীবলে একটি বড় মন্দির ছিল। এর উপরে একটি উঁচু 'চরখী'তে লাল রঙ্গের পতাকা বাঁধা ছিল। এই 'চরখী' (ফরকারি)টি এত বিরাট ছিল যে, ঐতিহাসিক বালাযুরী বর্ণনা করেন যে, যখন বায়ু প্রবাহিত হত-তখন উহা ঘোরাতে আরম্ভ করতো এবং সমস্ত শহর উজ্জাড় করে ফেলতো। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম এই চরখীটিকে এমন ভাবে ধ্বংস করলেন যে, একটি বিরাট কামান যা' পরিচালনার জন্যে পাঁচশো লোকের প্রয়োজন হতো,-তা' উহার দিকে নিশানা করে ছাড়া হল। কামানের গোলা যথাযথ লক্ষ্য স্থলে গিয়ে পৌঁছল এবং 'চরখী' একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এই ঘটনায় রাজা দাহির এবং তার সমস্ত সঙ্গী-সাথীকে খুবই রাগান্বিত ও উত্তেজিত করে তুলল। অতএব তারা যুদ্ধে ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে খুবই বীরত্বের পরিচয় দিলেন বটে, কিন্তু পরিণামে পরাজিত হলেন। 'দীবল' অস্ত্রের জোরে-বিজয় হয়ে গেল। বিজয়ের পর মুসলিম সেনাদল ইসলামের নির্ধারিত আইন-কানুন এবং নিয়ম-নীতির প্রতি খুব একটা খেয়াল রাখেন নাই। বালাযুরীতে উল্লেখ আছে যে, বিজয়ের পর মুহাম্মদ ইবনে কাসিম তিনদিন পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন এবং সাধারণ হত্যা-কান্ড চালান। পরিশেষে মন্দিরের লোকেরাও তা থেকে নিষ্কৃতি পায়নি।

'দীবল' বিজয় শত্রুদের শক্তি সাহস এত সংকীর্ণ করে দিল যে, অতঃপর মুহাম্মদ ইবনে কাসিম-'নীরুন' ও সাহওয়ান ইত্যাদি দুর্গ বিনা যুদ্ধেই জয় করে ফেলেন। তৎপর যখন তিনি 'মাহরান' পেঁৗছেন তখন রাজা দাহির যুদ্ধের বিরাট প্রস্তুতি শুরু করেন। এদিকে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম মুহাম্মদ ইবনে মাসআবের তত্ত্বাবধানে 'সাদোসান' এর দিকে এক সেনাদল প্রেরণ করেন। তথাকার জনগণ এত ভীরু ছিল যে কয়েকজন পূজারীর মাধ্যমে তারা মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করে ফেলল। এমনিভাবে এই এলাকাও বিনা যুদ্ধেই বিজয় হয়ে গেল। মুহাম্মদ ইবনে মাসআর যখন এই যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে চার হাজার জাট (বিদ্রোহী রাজপুত) ছিল। তাদের সকলই মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের সেনাদলে ভর্তি হয়েছিল। ইসলামী সেনাদলের প্রধান সেনাপতি মুহাম্মদ ইবনে কাসিম 'তালহাট' এর নিকট হয়ে সিন্ধুনদ অতিক্রম করে রাজধানীর দিকে যাত্রা করলেন। এ দিকে রাজা দাহির এই সংবাদ পেয়ে এক বিরাট সুসজ্জিত সেনাদল প্রেরণ করেন। 'কোলাব গীচরী' নামক স্থানে উভয় সেনাদল একত্র হল। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম তখন 'আলোর' শহর জয়ের ইচ্ছা করলেন, যেখানে রাজা দাহির দুর্গের ভেতর জীবন-যাপন কর ছিলেন। সেখানে পেঁৗছেই দুর্গ অবরোধ করে ফেলেন। এই অবরোধ প্রায় দশদিন স্থায়ী ছিল। এই সময়ের মধ্যে দশবার যুদ্ধ হল। প্রতিবারেই মুসলমানদের বিরাট সফলতা অর্জন হল। পরিশেষে ১০ই রমযান, ৯৩ হিজরীতে রাজা দাহির নিজে দুর্গ থেকে এমন জাঁকজমকতার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন যে, তাঁর সঙ্গে দশ হাজার এমন সৈন্য ছিল যাদের বাহুতে বাজুবন্দ ছিল এবং ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। তা ছাড়া সৈন্য দলে পাহাড়ের ন্যায় হাতীর একটি দল ছিল যেগুলো মাতালের মত হেলে-দোলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলাফেরা করতো তখন মাটি কম্পিত হয়ে যেত। একটি হাতি বিশেষভাবে সুসজ্জিত ছিল, যার উপর দাহির আরোহণ করেছিলেন। বলা হয় যে, দাহির যে হাতীটিতে আরোহণ করেছিলেন, এর একটি হাওদাতে দাহিরের পাশে দুজন সুন্দরী কিশোরী ছিল, তাদের একজন দাহিরকে মদপান করাতো এবং অপরজন তাকে পানের খিলি বানিয়ে দিত। ("তারিখে মাসুমী" ২৪ পৃঃ দ্রঃ)

উভয় পক্ষের সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে একত্র হল। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সারাদিন ভীষণ যুদ্ধ চলল। দাহিরের সৈন্যরা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য এবং অধিকযুদ্ধ সামগ্রী ও যুদ্ধাস্ত্রের গর্বে গর্বিত হয়ে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় আগে বেড়ে আক্রমণ করতে লাগল। কিন্তু তাদের মুকাবিলায় মুসলিম সেনাবাহিনী পাহাড়ের মত অটল দাঁড়িয়ে থেকে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করছিল। পরিশেষে যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল তখন মুহাম্মদ ইবনে কাসিম নিজে একদল সৈন্য নিয়ে দাহিরের হস্তীবাহিনীর দিকে ধাবিত হন। এমন সময় মুসলমানদের একদল সৈন্য আতশবাজি শুরু করলো। এতে হস্তীগুলো ভীত হয়ে পলায়ন করতে লাগলো এমনিভাবে শত্রু সৈন্যদের মধ্যে বিক্ষিপ্ততা, অস্থিরতা এবং এলোমেলো ভাব সৃষ্টি হল। এই হট্টগোলের মধ্যে মুসলমানদের পক্ষ হতে দাহিরের কণ্ঠে এমন এক তীর এসে বিদ্ধ হল যে, দাহিরের প্রাণ বায়ু উড়ে গেল (তারিখে মাসুমী গ্রন্থের ২৩ পৃঃ দ্রঃ)

দাহিরের নিহত হওয়ার পর পরাজিত সৈন্যরা 'ব্রাম্মানাবাদে' পলায়ন করেলো। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম সেখানে পর্যন্ত তাদের পশ্চাদগমন করেন। অবশেষে যুদ্ধের পর তাও জয় করেন। অবার সমগ্র সিন্ধুই মুসলমানদের অধীনে এল।

এই যুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম মুলতান জয়ের ইচ্ছা করলেন। একে তৎকালে ধন-সম্পদের আধিক্যের কারণে 'সোনার ঘর বলা হতো। এখানে একটি বিরাট মন্দিরও ছিল। মুসলমানদেরকে এই যুদ্ধে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। তাদের খাদ্য-দ্রব্য শেষ হয়ে যাওয়ায় গাধার মাংস খেয়ে খেয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছে। কিন্তু তবুও ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করে বিজয়ী হন।

মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের শেষ পরিণতি

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম সিন্ধু এবং মুলতান জয় করে যে বিরাট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা কোনক্রমেই মুসা ইবনে নাসির ও

তারিকের স্পেন বিজয়ের গুরুত্ব থেকে কম ছিল না। এটা এমন এক ঘটনা যে, যদি সেই সময় খিলাফতের সিংহাসনে কোন খলীফা রাশেদ অধিষ্ঠিত হতেন এবং মুসলমানগণ বংশগত পক্ষপাতিত্বের শিকার না হতেন, তবে কে বলতে পারতো যে, আজ সমগ্র ভারতবর্ষ ও মিসর, শাম এবং ইরাক ও ফিলিস্তিনের মত ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত না হতো? মুহাম্মদ ইবনে কাসিম-এর ভারতবর্ষ আগমনের চার বছর অতিবাহিত হতে না হতেই ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালিকের ৯৬ হিজরীতে ইন্তিকাল হল। ওয়ালীদের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই সুলায়মান খলীফা হন। সুলায়মান কোন কোন ব্যাপারে হাজ্জাজের বিরোধী ছিলেন। এবার তিনি সিংহাসনে আরোহণ করতেই তাঁর বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজন তাঁকে অস্থির করে তুলল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুহাম্মদ ইবনে কাসিম হাজ্জাজের ভাতিজা এবং জামাতা ছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুলায়মান প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা থেকে মুক্তি পেলেন না। সুতরাং তিনি ইয়াযিদ ইবনে কাবাশাকে সিন্ধুর গভর্ণর নিযুক্ত করেন এবং মুহাম্মদ ইবনে কাসিমকে শুধু তাঁর গভর্নরের পদ থেকে অপসারণই করেন নাই, বরং নির্দেশ দিলেন যে, তাঁকে হাত পায়ে জিঞ্জির দিয়ে বেঁধে হাজ্জাজের দরবারে প্রেরণ করা হউক। ইরাকে পোঁছলে এখানকার গভর্ণর সালেহ ইবনে আবদুর রহমান রাজ দরবারের ইঙ্গিতে তাঁকে 'ওয়াসেত' শহরে বন্দী করেন এবং পরিশেষে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট দেয়ার পর ইবনে আকীল বংশের একদল লোকের সঙ্গে সিন্ধুবিজয়ী এই মহাবীরকেও হত্যা করা হল।

(ফতুহুল বুলদান গ্রন্থের ৪২৭ পৃঃ দ্রঃ)

সাধারণ ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম সিন্ধু ও মুলতান জয়ের পর শত্রুর সঙ্গে কঠোরতা ও অত্যাচারমূলক কিছু কাজ করে দিলেন। যুদ্ধশেষে এবং বিজয় অর্জনের পরেও তিনি কয়েকদিন পর্যন্ত হত্যা কান্ড চালু রেখেছিলেন। তিনি কিছু কিছু মন্দির ও ধ্বংস করেছেন এবং পূজারী পুরোহিতদেরকেও হত্যা করেছেন বটে, কিন্তু এই সব কাজ সাময়িক ও গোলমালের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। ইহা সেই সময়ের ঘটনা যখন যথাবিহিত শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপিত হয়নি।

অতঃপর তিনি বিজিত জাতির সঙ্গে যে সব ব্যবহার করেছেন, তার পরিমাপ এ থেকেই হতে পারে যে, সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালিকের নির্দেশ যখন তাকে হাত-পা বেধে সিন্ধু থেকে ফেরত নেয়া হল তখন সেখানকার জনগণ কাদতে কাদতে নিজেদের বিশ্বাস ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ তারা মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের প্রতিকৃতি বানিয়ে সযত্নে রেখেছিলেন।

ডঃ তারা চান্দ সিন্ধুর রাজা "চাচ্চ" এবং মুহাম্মদ ইবনে কাসিম' উভয়ের রাষ্ট্রীয় শৃংখলা এবং শাসন পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করে লেখেন যে চাচ্চ (রাজা দাহিরের পিতা) পক্ষপাতিত্বকারী শাসক ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের জন্যে খুবই অত্যাচারমূলক নিয়মনীতি প্রচলন করেছিলেন। তাদের জন্য অস্ত্রধারণ করা, রেশমী কাপড় পরিধান করা, ঘোড়ার উপর গদি লাগায়ে আরোহণ করার অনুমতি ছিল না। ইহা ছাড়াও তিনি নির্দেশ জারি করে ছিলেন যে, তাদেরকে খালি পায়ে এবং খালি মাথায় ঘর থেকে বের হতে হবে"।

তাঁর বিপরীত মুহামদ ইবনে কাসিম সম্পর্কে লেখেন যে, "মুসলমান বিজয়িগণ বিজিতদের সঙ্গে সতর্কতা এবং অনুগ্রহ পূর্ণ ব্যবহার করতেন। টেক্স আদায়ের পুরোনো পদ্ধতি বহাল রাখেন। প্রাক্তন কর্মচারীদেরকে তাদের স্থানে ঠিক রাখেন। হিন্দু পূজারী এবং ব্রাহ্মণদেরকে মন্দিরে পূজা-পার্বনের সাধারণ অনুমতি ছিল। তাদেরকে তাদের সাধ্যমত মামুলী ধরনের টেক্স আদায় করতে হতো। মুসলমানদের মুকাদ্দমার নিষ্পত্তি কাজী করতেন। কিন্তু হিন্দুদের জন্য তাদের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পৃথক রাখা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় বড় বড় পদে হিন্দুরা অধিষ্ঠিত ছিল। এমন কি প্রধান মন্ত্রীর পদে রাজা দাহিরের মন্ত্রীই বহাল ছিল।

সিন্ধুর রাজাদের ইসলাম গ্রহণ

মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের পর ইয়াজিদ ইবনে কাবাশাহ সিন্ধুর গভর্নর নিযুক্ত হন। কিন্তু এখানে আগমনের ১৮ দিনের মধ্যেই তিনি ইন্তিকাল করেন। অতঃপর হাবীব হবনুল মাহলাবকে সিন্ধুর গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তাঁর সিন্ধু আগমনের পূর্বেই এখানকার রাজা মহারাজাগণ নিজ

নিজ এলাকা পুনঃ দখল করে বসেন। অতএব দাহিরের ছেলে 'জিশাহ' ব্রাহ্মণবাদ ফিরে এলেন। এমন সময় মুসলমান ইবনে আবদুল মালিকের ইন্তিকাল হল। অতঃপর উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) (৯৯—১০১ হিঃ) খিলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের খিলাফত ছিল খিলাফতে রাশেদার পদ্ধতিতে। কাজেই বিজয়ের জন্যে রাজ্য দখল কিংবা সম্পদ আহোরণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাই তিনি সিন্ধুর রাজাদের কাছে ইসলামের প্রচারমূলক পত্র লেখেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান জানান। তাঁরা (রাজাগণ) খলীফার চরিত্র এবং আচার-ব্যবহার সম্পর্কে পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজা, তন্মধ্যে রাজা দাহিরের ছেলে "জিশাহ" ও ছিলেন, খলীফার ইসলাম গ্রহণের আহবানে সাড়া দিয়ে লাববায়েক (আমিও হাযির) বলেন। অর্থাৎ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং আরবীতে নিজের নাম ও রাখেন।

হযরত উমর ইবনে আবদুল অযীযের ইন্তিকালের পর বনী উমাইয়াদের অন্যান্য খলীফার পক্ষ হতেও গভর্নর নিযুক্ত হয়ে সিন্ধুতে আগমন করতে ছিল। কিন্তু তাদের সময়ে অসাধারণ কিংবা উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা সংঘটিত হয়নি। অবশ্য হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের (১০৫—১২৫ হিঃ) রাজত্বকালে "জুনাইদ ইবনে আবদুর রহমান মারবী" সিন্ধুর গভর্নর হলেন। তিনি খুবই সৎসাহসী, চিন্তাশীল এবং দানশীল ছিলেন। তিনি সিন্ধুর উপযুক্ত শাসন ব্যবস্থা কার্যকরী করে অন্যান্য এলাকা ও জয় করার ইচ্ছা পোষণ করেন। অতএব তিনি বিরাট এক সেনা বাহিনী ,আজীন' এবং অপর আর একটি সেনাদল আহ্‌বীর ইবনে মুররাহ এবং তত্ত্বাবধানে 'মালোহ' এর দিকে প্রেরণ করেন। আল্লামা বালাযুরীর বর্ণনা মতে উল্লিখিত স্থান দু'টি থেকে কিছু 'মালে-গানীমাত' (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) অবশ্য অর্জিত হয়ে ছিল, কিন্তু সম্ভবতঃ উহা জয় করতে পারেননি। উমাইয়া বংশের সর্বশেষ গভর্নর ছিলেন মানসুর ইবনে জামহুরুল কালবী। তিনি মারওয়াপুল হিমার (১২৭—১৩২ হিঃ)-এর রাজত্বকালে সিন্ধু আগমন করেন। বলা হয় যে এখানকার বিখ্যাত শহর 'মানসুরা' তাঁর প্রতিষ্ঠিত। মানসুরের গভর্নরীর আমলে উমাইয়া খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৩২ হিজরীতে যখন নতুন

করে আব্বাসীয়দের প্রভাব প্রতিপত্তি স্থাপিত হল, তখন তাদের পক্ষ হতেই সিন্ধুতে গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসছিল।

আব্বাসী খিলাফতের সময়ে সিন্ধু

উল্লিখিত গভর্নরদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক সাহসী এবং শক্তিশালী ছিলেন 'হিশাম ইবনে উমরুত্তালবী'। তিনি আবুজা'ফর মানসুরের (১৩৬—১৫৮ হিঃ) রাজত্বকালে সিন্ধুর গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি এখানে পৌঁছেই প্রথমে বিদ্রোহীদর অরাজকতার কারণে যেসব এলাকা মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, সেগুলোকে পুনঃ দখল করেন। অতঃপর এক বিরাট নৌবহর নিয়ে 'বাহরোচের নিকটবর্তী কান্দাহার আক্রমণ করেন। অতঃপর সেখান থেকে যখন উত্তর দিকে গমন করেন, তখন কাশ্মীরের উপরও আক্রমণ করেন এবং এখান থেকে বহু মালে-গানীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) লাভ করেন। (ফতুহুল বুলদান গ্রন্থের—৪০১ পৃঃ দ্রঃ)

মামুনুর রশীদের রাজত্বকাল পর্যন্ত সিন্ধুতে আরব মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাকী ছিল। মু'তাসিম বিল্লাহ্‌র রাজত্বকালে তাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ-দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। নায্‌যারী এবং ইয়ামানীদের মধ্যে মূর্খযুগের পক্ষপাতিত্বের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। সেই সময় ইমরান ইবনে মূসা সিন্ধুর গভর্নর হলেন। ইমরান ইয়ামানী আরবদের পক্ষ অবলম্বন করতেন। সুতরাং নায্‌যারীরা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। অতএব এখানকার আদি অধিবাসী 'হুবারী' গোত্র পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠার সুযোগ পেল। অতএব একদিন "উমর ইবনে আবদুল আযীয 'হুবারী" সুযোগ বুঝে ইমরানকে হত্যা করল। ইহার পর ওয়াসিক বিল্লাহ্ এবং মুতাওয়াক্কেলের রাজত্বকালেও খলীফার দরবার থেকে সিন্ধুর গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসছিল। কিন্তু তখন এই দূর দেশের সঙ্গে খিলাফতের সম্পর্ক শুধু নামে মাত্র ছিল। ২৪০ হিজরীতে হুবারী বংশের রাজত্ব শুরু হল। ২৯০ হিজরীতে মুলতানের বনু সামা গোত্র নিজেদেরকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করল। অতএব 'মুলতান' এবং 'মানসুরা' দু'টি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেল।

যা হউক হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুর ভূমিতে বিজয়ের যে চারা গাছ লাগিয়ে ছিলেন, উহার শাখা-প্রশাখা মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। আর এসব পরস্পরের অনৈক্য ও বিশৃংখলার বিষাক্ত বায়ু উহাকে শুষ্ক করে দিয়েছে। অবশ্য খাইবার গিরিপথ দিয়ে ইসলামের যে প্রস্রবণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল; উহা বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে প্লাবিত করেছিল এবং উহার প্রভাব প্রায় ৮ শো বছর পর্যন্ত স্থায়ীছিল।

আমীর সবুক্তগীন

ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমের পথদিয়ে ইসলামের যে দল—৯৮০ খৃষ্টাব্দে সংলগ্ন সময়ে এই দেশে সর্বপ্রথম প্রবেশ করেছিল, উহার অগ্রযাত্রার আমীর হওয়ার গৌরব—গযনীর রাজত্বের আমীর সবুক্তগীনের ভাগ্যে লেখা ছিল। পাঞ্জাব, কাবুল এবং পেশাওয়ারের শাসনকর্তা রাজা জয়পালের কার্যকলাপের কারণেই হয়তঃ এই আগমনের কারণ ঘটেছিল। আমীর সবুক্তগীনের জিহাদী প্রেরণা থেকে ভীত হয়েই হয়তঃ দূরদর্শী জয়পাল পাহাড়ের মত একটি হস্তীবাহিনী ও বীর সেনা বাহিনী নিয়ে ৩৬৯ হিজরী মুতাবিক ৯৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে ইসলামী রাজত্বের দিকে পা বাড়ালেন। আমীর সবুক্তগীন যখন এই আক্রমণের সংবাদ পেলেন, তখন তিনিও এক বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে তার মুকাবিলার জন্যে যাত্রা করলেন। ঐতিহাসিক 'বারাগাষের' তথ্য অনুসারে 'তাগান' নামক স্থানে যুদ্ধ হল। কয়েক দিন ক্রমাগত ভীষণ যুদ্ধের পর জয়পাল সন্ধির প্রস্তাব পেশ করলেন। এই যুদ্ধের আমীর সবুক্তগীনের সঙ্গে তাঁর ছেলে মাহমুদ ও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পরবর্তী সময়ে সুলতান মাহমুদ গযনবী নামে খ্যাত হয়। তিনি (মাহমুদ) প্রথমতঃ সন্ধির প্রস্তাব না মঞ্জুর করার অভিমত প্রদান করেন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে, রাজপুতগণ খুবই জিদী এবং কর্তব্য পরায়ণ যখন তারা দেখে যে, যুদ্ধে পরাজিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তখন তারা নিজের হাতেই নিজের স্ত্রী-পুত্রদেরকে হত্যা করে ও স্বীয় মাল-সম্পদে আগুন লাগিয়ে দেয়। তখন তিনি সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হন। কিন্তু

সন্ধির শর্তানুসারে যে সমস্ত বস্তু গযনীতে প্রেরণের কথা সাব্যস্ত হয়েছিল, জয়পাল লাহোর পৌঁছে উহা সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করেন। শুধু তাই নয়, বরং আমীর সবুক্তগীনের যে সব লোক জয়পালের সঙ্গে ঐ সমস্ত বস্তু নিতে এসে ছিল, জয়পাল তাদেরকে বন্দী করল এবং প্যাচ তুলল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার যে সমস্ত লোক যামানত হিসেবে রেখে এসেছি, তাদেরকে মুক্তি না দেয়া হবে, ততক্ষণ আমি সন্ধি পত্রের শর্ত সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত করবো না। আমীর সবুক্তগীন যেমন এই ঘটনা জানতে পারলে তখন এতে তিনি খুবই রাগান্বিত হলেন এবং বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষে দিকে যাত্রা করলেন। এদিকে জয়পাল ও অন্যান্য রাজাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় এক বিরাট সৈন্য বাহিনী তৈরী করলো। দিল্লী, আজমীর এবং কানোজের রাজগণ বিশেষভাবে সৈন্য ও টাকা পয়সা দিয়ে একেবারে অন্তর খুলে জয়পালকে সাহায্য করলো। পেশাওয়ারের নিকটে উভয় পক্ষের সেনাদল একত্র হলো। এটাই ছিল প্রথম যুদ্ধ, যাতে উত্তর ভারতের রাজাদের সমস্ত সেনাবাহিনীর সম্মিলিত শক্তি এক ইসলামী সেনা দলের বিরুদ্ধে একই কেন্দ্রীয় প্লাটফর্মে একত্র হয়ে যুদ্ধ করেছিল। বলা হয় যে রাজা জয়পালের সঙ্গে এক হাজার অশ্বারোহী এবং অসংখ্য পদাতিক সৈন্য ছিল। (তারিখে ফিরিশতার উর্দু অনুবাদ গ্রন্থের ১ম খন্ড, ৫৬ পৃঃ দ্রঃ)

আমীর সবুক্তগীন একটি পাহাড়ে উঠে বিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা যখন পর্যবেক্ষণ করলেন। তখন তিনি তাদের অসংখ্য সৈন্যের দৃশ্য এবং যুদ্ধ সামগ্রী ও অসাধারণ জাঁকজমক দেখেও ভগ্নোৎসাহ হয়নি। বরং নীচে নেমে সেনাপতিদের সামনে এমন তেজস্বী উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ দিলেন যে, সমস্ত সৈন্যদের মাঝে যেন আগুন লেগে গেল। অতঃপর তারা এমন বীর বিক্রমে আক্রমণ শুরু করলো যে, শত্রুদের পা হটে গেল, তারা নিরাশ হয়ে পলায়ন করতে লাগল। এর পর জয়পালের সঙ্গে আরো দু'একটি ছোট খাট যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু ঐ গুলোতেও জয়পাল ব্যর্থ হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হলো। পরিশেষে কাবুল এবং পেশাওয়ারের সমগ্র এলাকা ইসলামী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আমীর সবুক্তগীন নিজের একদল প্রতিনিধিকে দু'হাজারের একটি বিরাট সেনাদল সঙ্গে দিয়ে পেশাওয়ারে রেখে

গেলেন। পেশাওয়ারের সংলগ্ন অঞ্চলের আফগানী ও খালজী বেদুইনদেরকে নিজের বশে এনে তিনি গযনীতে ফিরে গেলেন।

ইতিহাসে-আমীর সবুক্তগীনের পুত্র সুলতান মাহমুদের নাম যত প্রসিদ্ধ, তাঁর নাম কিন্তু তত প্রসিদ্ধ নয়। অথচ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও তথ্যানুসারে জানা যায় যে, পিতার কর্যাবলী স্বীয় বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে পুত্রের কার্যাবলীর গুরুত্ব থেকে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমীর সুবুক্তগীনই প্রথম শাসক, যিনি উত্তর ভারতবর্ষের সৈন্যদেরকে সুশৃংখলা বদ্ধ করে এখনকার সম্মিলিত বিরোধী শক্তিসমূহকে পরাজিত করে মুসলমানদের জন্য এই পথে আগমনের রাস্তা খুলে দিয়েছিল। তা ছাড়া মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ফেরেশ্তা-বিভিন্ন ঘটনাবলী লিখেছেন, যা'তে প্রত্যয়জন্মে যে, চরিত্র ও মন-মানসিকতার-দিক দিয়ে-আমীর সবুক্তগীন খুবই পুণ্যবান, আল্লাহ্‌ভীরু, এবং ন্যায় পরায়ণ ছিলেন।

সবুক্তগীনের ইন্তিকাল

আমীর নাসিরুদ্দীন সবুক্তগীন-ছাপ্পান্ন বছর বয়সে বাল্খের নিকটবর্তী 'তিরমিষ' নামক স্থানে ৩৮৭ হিজরী, মুতাবিক ৯৯৭ খৃীস্টাব্দে ইন্তিকাল-করেন। তাঁকে গযনীতে দাফন করা হয়। আমীরের রাজত্বকাল প্রায় বিশ বছর ছিল

সুলতান মাহ্মুদ গযনবী

আমীর সবুক্তগীনের মৃত্যুর সময়-তাঁর ছেলে সুলতান মাহমুদ নিশাপুরে ছিলেন। তাই মরহুমের অসীয়ত অনুযায়ী তাঁর ছোট ছেলে আমীর ইসমাঈল-বাল্খে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। আমীর ইসমাঈল জনগণের অন্তর-জয়ের অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেনাবাহিনী- এবং জনগণ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি হল না। নিশাপুর থেকে সুলতান মাহমুদ যখন এই সব ঘটনাবলী জানতে পারলেন, তখন আপন ছোট ভাইকে একটি পত্র লিখলেন। "পিতার ইন্তিকালের পর এখন পৃথিবীতে আমার কাছে তোমা-হতে অধিক প্রিয় আর কেউই নয়। কিন্তু রাজ্যের স্থিতি ও শৃংখলা

রক্ষার জন্য শাসককে-বয়স্ক, অভিজ্ঞ এবং রাজনীতিবিদ হওয়া কর্তব্য। যদি তোমার মধ্যে এই সব গুণাবলী-বিদ্যমান থাকতো, তবে আমি তোমার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার ছাড়া-অন্যকারো আনুগত্যে সম্মত হতাম না। পিতাজান-তোমাকে-তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছেন, শুধু সেই সময়ের সঙিন অবস্থায়-মঙ্গলের চিন্তা করে এবং রাজ্যের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে যা, আমার দূর দেশে থাকার কারণে আরো-গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন সময়োপযোগী কল্যাণের কথা চিন্তা করে ভাল ও মন্দ পৃথক করে দেখার সময় হয়েছে। ন্যায় কাজ থেকে বিমুখ হয়ো না। পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির শরীয়ত সম্মত উপায়ে বন্টন করে নাও। 'গযনী' হল আমাদের রাজত্বে কেন্দ্রস্থল। অতএব ইহা আমারই প্রাপ্য। যদি তুমি ইহা আমাকে দিয়ে দাও তবে আমি 'বাল্‌খ্‌' ও 'খুরাসান' তোমাকে দিয়ে দিব।" ('তারিখে ফিরিশ্‌তা' গ্রন্থের ১ম খন্ড, উর্দু অনুবাদ—৬৩, ৬৪ পৃঃ দ্রঃ)

আমীর ইসমাঈলের উপর এই পত্রের কোন প্রতিক্রিয়াই হল না। তদুপরি তিনি ভাইয়ের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে দিলেন। সুলতান মাহমুদ বাধ্য হয়েই ভাইয়ের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলেন। উভয় ভাইয়ের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হল। পরিশেষে ইসমাঈলের সৈন্যরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করল এবং গযনীর এক দুর্গে বন্ধী হল। সুলতান মাহমুদ-তার কাছ হতে অঙ্গীকার নিয়ে দুর্গ থেকে মুক্তি দিলেন। অতঃপর রাজকোষ অধিকার করলেন এবং নিজের বিশ্বস্ত লোকদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করে-নিজে বাল্‌খ-চলে গেলেন। কিছুদিন পর আমীর ইসমাঈলকে জুরজানের দুর্গে নযরবন্ধী করে রাখা হল।

পাঞ্জাব আক্রমণ

সুলতান মাহমুদ বাল্যকাল থেকেই ভারতবর্ষ জয়ের পোষণ করছিলেন। সুতরাং তিনি তুর্কিস্তান ও খুরাসানের যুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে ভারতবর্ষে সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা করলেন। ১০০৯ খৃষ্টাব্দে গযনী থেকে দশহাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যের একটি সেনাদল নিয়ে পেওশোয়ার পৌঁছলেন

জয়পাল ও অসতর্ক ছিলেন না। তিনিও এক বিরাট সেনাদল নিয়ে অগ্রসর হলেন। তাদের মধ্যে বার হাজার পদাতিক এবং তিন শতের একটি হস্তী বাহিনী ছিল। 'আটক' اٹک নদীর তীরে ভীষণ যুদ্ধ হল। পরিশেষে সুলতান মাহমুদেরই বিজয় হল। জয়পাল তাঁর কিছুসংখ্যক বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনসহ বন্দী হলো। পরিশেষে সুলতান 'মুক্তিপণ' নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দিলো। জয়পাল মুসলিম সেনা বাহিনীর হাতে দুবার পরাজিত হলো। তাই তিনি তৎকালীন ভারতীয়দের বিশ্বাস অনুযায়ী রাজত্ব করার উপযুক্ত থাকলো না এবং তাঁর জন্যে জলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু বরণ ছাড়া অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত থাকলো না। অতএব তিনি স্বীয় ছেলে আনন্দপালকে রাজসিংহাসনের মালিক বানিয়ে নিজে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরলেন।

সুলতানের সৈন্য প্রেরণ

সুলতানের নিকটবর্তী 'ভাটিয়া' এক হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল। এখানকার শাসক 'রায়' কিংবা বিড়ারায় নামী একজন হিংসুক এবং অহংকারী রাজা ছিলেন। তিনি সবুক্তগীনের প্রতিনিধিদেরকেও গ্রাহ্য করতেন না এবং জয়পালের ও পূর্ণ আনুগত্য করতেন না। ৩৯৫ হিজরীতে সুলতান 'ভাটিয়া'তে আক্রমণ করলেন। কয়েকদিন ক্রমাগত যুদ্ধের পর রাজা পরাজিত ও পরে নিহত হলেন। পরের বছর সুলতান মুলতানের গভর্ণর আবুল ফাতাহর বিদ্রোহ এবং অবাধ্যতার শাস্তিদানের জন্য মুলতানে সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা করলেন। আবুল ফাতাহ যখন এই সংবাদ পেলেন তখন তিনি আনন্দপালের কাছে সাহায্যের আবেদন করলেন। আনন্দপালের সুলতানের গতিরোধ করার জন্য লাহোর থেকে পেশোওয়ার আগমন করলেন। সুলতানের এখন আনন্দপালের সঙ্গে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অতএব আনন্দপালের সঙ্গে প্রথমে যুদ্ধ শুরু হয়। আনন্দপাল যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কাশ্মীরের দিকে পলায়ান করলেন। এই যুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে সুলতান পুনরায় মুলতানের দিকে ধাবিত হন এবং আবুল ফাতাহকে তার কৃতকর্মের শাস্তি প্রদান করে গযনীতে ফিরে গেলেন।

পেশোওয়ার যুদ্ধ ও নগরকোট বিজয়

৩৯৯ হিজরীতে সুলতান মাহমুদ পুনর্বার এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। সেই সময় আনন্দপাল নিজেদের বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত শক্তিসমূহ একত্র করেন। তিনি সুলতানের মুকাবিলার জন্যে বিরাট প্রস্তুতি শুরু করলেন। তাছাড়া তিনি অন্যান্য রাজা-মহারাজাদের কাছে ও সাহায্যের আবেদন করেন। সুতরাং আজীন, গোয়ালিয়ার, কালিঞ্জর, কানুজ, দিল্লী এবং আজমীরের রাজাগণ অস্ত্র খুলে তাঁকে সাহায্য করলেন। পেশোওয়ারের সন্নিকটে উভয় পক্ষের সৈন্যরা একত্র হল। হিন্দু জন-সাধারণ ও এই যুদ্ধে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সাহায্য ও সহযোগিতা করল। মেয়েরা পর্যন্ত নিজেদের অলংকার বিক্রি করে সৈন্যদের সাহায্য করল। যারা গরীব ছিল তারা পর্যন্ত কাজকর্ম করে অর্থ বাচায়ে সৈন্যদের সাহায্যার্থে প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ক্রয় করে, প্রেরণ করল।

সুলতান মাহমুদ যখন হিন্দুদের বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা এবং যুদ্ধের বিরাট আয়োজনের সংবাদ পেলেন তখন তিনি যুদ্ধ শুরু করার আগে খুবই সতর্কতা এবং দূরদর্শিতার সাথে কাজ করতে লাগলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, সৈন্যদের অবস্থাদের দু'দিক দিয়ে পরিখা খনন করা হউক, যাতে কোন দিক দিয়েই হিন্দুরা কাবু করতে না পারে। অতঃপর যুদ্ধ শুরু হলে প্রায় এক হাজার গজ অগ্রসর হয়ে শত্রুদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করলে শত্রু সৈন্য তাদের নিকটে এসে গেল। মুসলমান-গণ যখন এই সৈন্যদের মুকাবিলা করতে এল তখন এত সতর্ক থাকা সত্ত্বেও বিশ হাজার সৈন্য ভীষণ যুদ্ধের মাঝে দুদিক থেকে তাড়া খেয়ে পরিখার মধ্যে আটকে গেল এবং মুসলিম সৈন্যদের মাঝে ঢুকে গেল। ফলে তিন চার হাজার মুসলমান সেন্য তথায়ই শেষ হয়ে গেল। মুসলিম সেনা বাহিনী এইরূপ হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিত আক্রমণে ঘাবাড়িয়ে-গেল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আনন্দপালের হাতী কামানের গোলা বারুদের শব্দে ভীত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন করল। তাঁর সেন্যরা মনে করল যে, রাজা মুসলমানদের আক্রমণে ভীত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করেছেন।

এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মাঝে ভগোৎসাহ সৃষ্টি হল এবং তারা ও পলায়ন করতে শুরু করল। মুসলমান সেন্যগণ দুদিন দু'রাত পর্যন্ত তাদের পচাদ্ধাবন করেন এবং প্রায় আট হাজার শত্রু সৈন্যকে হত্যা করেন। সুলতান এই এই বিজয়ের পর আরো অগ্রসর হতে চাইলেন এবং নগতকোট (কাঙ্গড়া জেলা)-এর 'বাহীন' দুর্গ বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এই দুর্গটি রাজ-ভীমের সময়ে একটি প্রাহাড়ের শৃংঙ্গের উপর তৈরী করা হয়েছিল। এই দুর্গটি 'মূর্তিদের ধনাগার' নামে খ্যাতছিল। প্রত্যেক হিন্দু রাজাই নগদ টাকা পয়সা, স্বর্ণমুদ্রা, মণিমুক্তা, এবং বিভিন্ন প্রকার উত্তম ও মূল্যবান বস্তু উপঢৌকন হিসেবে তথায় প্রেরণ করতেন। এজন্যে এর ধন-দৌলতের কোন হিসাব-নিকাশ ছিল না। সুলতান তথায় পেঁাছে দুর্গ অবরোধ করে ফেলেন। দুর্গের অধিবাসিরা তৃতীয় দিনে দুর্গের দিনে দুর্গের দ্বার খুলে দিল। সুলতান মাহমুদ সকল কেই মুক্তি দিয়ে দিলেন এবং দুর্গেব সমস্ত ধন-দৌলত, যা' রাজা ভীমের সময় থেকে সেই সময় পর্যন্ত সঞ্চিত ছিল; তা' অধিকার করে গযনীতে ফিরে গেলেন। 'কাঙ্গড়ার' এই বিজয় ৪০১ হিজরী, মুতাবিক ১০১০ খৃীস্টাদের ঘটনা।

থানেশ্বর বিজয়

৪০৫ হিজরী, মুতাবিক ১০১৪ খৃীস্টাব্দে সুলতান থানেশ্বর আক্রমণ করেন এবং এখানকার মন্দিরসমূহ ও মূর্তিগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে' অনেক ধনরত্ন নিয়ে গযনীতে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর সুলতান দিল্লী অধিকার করার সমস্ত করলেন। কিন্তু মন্ত্রী পরিষদের উপদেষ্টাগণ পরামর্শ দিলেন যে, দিল্লী-জয়ের পূর্বে সমগ্র পাঞ্জাব অধিকার করা অত্যাবশক। কিন্তু সেই সময় আনন্দপালের সঙ্গে পূর্বের অঙ্গীকার অনুযায়ী-তা' সমীচীন মনে করলেন না। সুতরাং সুলতান এই ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন। বর্ণিত আছে যে, থানেশ্বরের যুদ্ধ শেষে সুলতান যখন গযনীতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁর সঙ্গে প্রায় দুলক্ষ (বন্দী) দাস-দাসী-ছিল।

কাশ্মীর আক্রমণ

৪০৬ হিজরীতে সুলতান কাশ্মীর জয়ের ইচ্ছা করলেন এবং কাশ্মীরের সীমান্ত সংলগ্ন সুউচ্চ ও মজবুত 'লোহকোট' বিখ্যাত দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু শীত কালের ভীষণ তুষারপাতের ফলে সৈন্যরা সেখানে বেশী দিন অবস্থান করতে পারল না। আর এ দিকে দুর্গের অধিবাসীদের জন্যে কাশ্মীরের রাজধানীর দিক থেকে ও সাহায্যকারী সৈন্যের আগমন হচ্ছিল। তাই সুলতান অবরোধ উঠায়ে গযনীর দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। প্রত্যাবর্তনের সময় মূল পথ হারিয়ে বিপদে যাওয়ার কারণে সৈন্যদেরকে খুবই কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়-এবং একারণে বহু সৈন্য মারা যায়।

কান্নুজ বিজয়

৪০৯ হিজরীতে কানুজের উপর আক্রমণ করেন। এখানকার দুর্গ খুবই উঁচু এবং মজবুত ছিল। তথাকার রাজা-'রাজ্যপাল' কে সেই সময় লৌহ মানব বলা হতো। (আল্লামা ইবনে আসীর ও কানুজের রাজার এই নামই লিখেছেন, তারিখুল কামেল-৯ম-খণ্ড ১০৬ পৃঃ দ্রঃ) তথাপি তিনি মুসলমানদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করতে সাহস করেননি। তিনি সুলতানের নিকট দূত পাঠিয়ে আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারের অঙ্গীকার করলেন। এক বর্ণনা মতে-রাজা মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু এই কথায় কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কানুজে তিন দিন অবস্থানের পর সুলতান দু'একটি যুদ্ধ করেই বিজয়ী হন। সেই সময় তিনি মথুরার সুখ্যাতি শুনে' সেই দিকেই যাত্রা করেন এবং বিনা যুদ্ধে উহা জয় করেন।

সোমনাথ মন্দির বিজয়

মথুরা বিজয়ের পর তিনি আরো দু'একটি দুর্গ যেমন 'কালেঞ্জর' ইত্যাদি জয় করতে ব্যস্ত থাকেন। অতঃপর ৪১৬ হিজরীতে সোমনাথ মন্দিরের খ্যাতি শুনে তা জয়ের উদ্দেশ্য বিরাট সাজ-সরঞ্জাম ও সৈন্য সামন্ত নিয়ে যাত্রা করলেন। (মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশ্তা-সোমনাথ বিজয়ের

সন-৪১৫ ইবনে আসীর ৪১৬ সাল লিখেছেন। তারিখুল কামেল, ৯ম খণ্ড, ১১৮ পৃঃ দ্রঃ) পথিমধ্যে আজমীর, পাটনা ও গুজরাটের উপর আক্রমণ চালিয়ে বহু ধন-দৌলত ও মাল-সম্পদ অর্জন করেন। সোমনাথের দুর্গটি খুবই উঁচু এবং মজবুত ছিল। নদীর পানি উহার দেয়ালে এসে লাগতো। কিন্তু মুসলমান সৈন্যগণ কোন ক্রমে সিঁড়ি লাগিয়ে দুর্গের উপর উঠে গেলেন এবং দুর্গবাসীদেরকে-চার দিক থেকেই ঘেরাও করলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর সুলতান মাহমুদেরই বিরাট জয় হল। বহু মূল্যবান ধনরত্ন হস্তগত হল। অনেক ঐতিহাসিকগণ-অবশ্য অনেক সুন্দর সুন্দর কাহিনী ও বর্ণনা দিয়ে এবং অভূতপূর্ব ও আশ্চর্যজনক ব্যাখ্যা দিয়ে একে খুবই রমালু ইতিহাস বানিয়েছেন। ইতিহাস এখানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক। হাকীম-'ছানাঈ' সোমনাথ বিজয় সম্পর্কে একটি কবিতা লিখেছেন, এর দু'টি ছন্দ এখানে উদ্ধৃত হল ঃ—

کعبه و سومنات چون افلاک -

شد ز محمود و ز محمد پاک

این ز کعبه بتان برون انداخت

آن ز کفن سومنات را پرداخت -

"কাবা-ও সোমনাথ দ'টিই জগতবিখ্যাত উপাসনালয়, তন্মধ্যে একটি পবিত্র হয়েছে সুলতান মাহমুদ দ্বারা এবং অপরটি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা একজন কা'বা-থেকে এবং অপরজন সোমনাথ থেকে মূর্তি অপসারণ-করেছেন"।

সুলতান মাহমুদের রাজদরবারের কবি 'আসজিদী' ও এ সম্পর্কে একটি কাসীদাহ্ লিখেছেন, এর দু'টি ছন্দ এইঃ—

تا شاه خسروان سفر سومنات کرد

کردار خویش را علم معجزات کرد -

"পারস্যের বাদশাহ সোমনাথ পরিভ্রমণ করে' বলেছেন যে, স্বীয় কারুকার্যের গুণে উহা জগতের মধ্যে আশ্চয্যজনক হয়ে আছে-"।

যখন সুলতান-সোমনাথ জয় করেন তখন বাগদাদের খলীফা ছিলেন-আল-কাদির বিল্লাহ-। বাগদাদের খলীফা সোমনাথ বিজয়ের সুসংবাদ শুনে' অতিশয় আনন্দিত হয়ে সুলতান মাহমুদের নিকট একটি উপাধিপত্র' প্রেরণ করেন এবং খুরাসান, ভারতবর্ষ, নিমরোয এবং খাওয়ারযেম-রাজত্বের পতাকা ও প্রদান করেন। ঐ পত্রে খলীফা-মাহমুদ,কে তাঁর ছেলে এবং তাঁর ভাইকে পর্যন্ত খিতাব প্রদান করেছিলেন। সুতরাং সুলতানকে 'খিতাব' দেন-كهف الدولة و الاسلام "কাহফুদাও লাতি-ওয়াল ইসলাম-" (অগাধ ধন বস্ত এবং ইসলামের মালিক)

['তারিখে ফিরিশতা' গ্রন্থের ১ম-খণ্ড, ১১৬ পৃঃ দ্রঃ]

ইন্তিকাল

রারিউস্‌সানী, ৪২১ হিযরীতে সুলতান মাহমুদ-ডায়রীয়া রোগে-আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হন এবং পরিশেষে ইন্তিকাল করেন। ৩৬০ হিজরীতে তাঁর জন্ম। এই হিসেবে তাঁর বয়স হয়ে ছিল প্রায় প্রায় ৬০ বছর। তিনি ৩৫ বছর রাজত্ব করেন। গযনীর 'কাস্‌রেফিরোযে' তাঁকে সমাহিত করা হয়।

চরিত্র ও ব্যবহার

চরিত্র ও ব্যবহারের দিক দিয়ে সুলতান মাহমুদের ব্যক্তিত্ব ছিল খুবই বিক্ষিপ্ত ও উশৃংখল। অনেক ঐতিহাসিক, তন্মধ্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাবশালী অধ্যাপক ও আছেন তাঁদের মতে "সুলতান খুবই লোভী ছিলেন। তিনি যতগুলো যুদ্ধ করেছেন, উহাদের উদ্দেশ্য ইসলামের প্রচার ও প্রসার নয়, বরং পৃথিবীর টাকা পয়সা ও ধনরত্ন অর্জন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল"। তার উল্টো সাধারণ ঐতিহাসিকের অভিমত হল 'গাযী' উপাধিটি যেন মূর্তি ভাঙ্গার চিন্তা ধারা মস্তিষ্কে জাগ্রত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আমাদের অভিমত হল উভয় দলই কেহ অধিক বলেছেন এবং কেহ কম বলেছেন। বাস্তবে তারা সুলতানের চরিত্র, আচার-ব্যবহার চিন্তাধারা ইত্যাদি সম্পর্কিত ঐতিহাহাসিক বর্ণনার আলোকে নিরপেক্ষতা বজায় রাখেননি। সুলতানের টাকা

পয়সা এবং ধনরত্নের প্রতি লিপ্সা থাকা সম্পর্কে অভিযোগ দিয়ে তাঁকে মন্দ বলা যায় না। আল্লামা ইবনে আসীর সুলতানের বীরত্বপূর্ণ কাজ কর্মের ভূয়সী প্রসংশা করে লিখেছেন যে,

ولم يكن فيه ما يعاب الا انه كان يتوصل الى اخذ
الاموال بكل طريق -

“সুলতানের মাঝে এমন কোন বদগুণ ছিল না; যা’ দ্বারা তাঁকে মন্দ বলা যায়। কিন্তু তিনি প্রত্যেক পন্থায়েই মাল-সম্পদ আহরণ করতেন। অতঃপর এই ঘটনাটি লিখেছেন যে, একদা সুলতান শুনতে পেলেন যে, নিশাপুরে একজন ধনী লোক বসবাস করেন। সুলতান তাঁকে গযনীতে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর তাঁকে বললেন, আমি খবর পেলাম যে, আপনি নাকি قرامطه “কারামাতাহ্’, সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত,’? এই ব্যক্তি বাদশাহর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বললো আমিতো কারামাতাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত নই’ আমার কাছে অবশ্য অনেক ধনরত্ন আছে, আপনি তা থেকে যা ইচ্ছে তাই নিতে পারেন। সুলতান তখন তার সমস্ত সম্পদ হস্তগত করলেন এবং তাকে ৪ صحة عقيده শুদ্ধ বিশ্বাসের সনদপত্র প্রদান করলেম। (“তারিখুল কামিল” গ্রন্থের-৯ম-খন্ড, ১৩৯ পৃঃ দ্রঃ)

কিন্তু তা’ সত্ত্বেও এটা বলা ভুল হবে যে, সুলতান একজন ডাকাত কিংবা বক্র পথের পথিক ছিলেন এবং তাঁর যুদ্ধের উদ্দেশ্য শুধু টাকা পয়সা ও ধনরত্ন আহরণ ছাড়া আর কিছু ছিল না। ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, সুলতান মাহমুদের রাজত্বকালে রাজপুত্রগণ পরস্পর একে অন্যের প্রতি যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। পাঞ্জাবের ‘হিন্দু শাহিয়া’ বংশ সাধারণতঃ নিজেদের নির্যাতনমূলক নীতি এবং অত্যাচারমূলক শাসন দ্বারা জনগণের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করে ছিল। সুতরাং এই কারণেই খোদ সুলতানের সেনাবাহিনীতে অধিক পরিমাণে হিন্দু সৈন্য ছিল। সুলতান তাদের প্রতি এত বিশ্বাস করতেন যে, একদা একজন মুসলমান সেনাপতিকে তার বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার শাস্তি প্রদানের জন্য স্বীয় সেনাদলের হিন্দু কমান্ডারকে প্রেরণ করেছিলেন। (‘তারিখুল কামেল’ গ্রন্থের ৯ম-খন্ড. ১১৮ পৃঃ দ্রঃ)

সুলতান মাহমুদের ভারতবর্ষ আক্রমণের কারণ কিছুতো ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অস্থিরতা ও অশান্তির কারণে এবং আর কিছু তো হিন্দুদের এই চিন্তাধারা বাতিল করার উদ্দেশ্য যে, "পৃথিবীতে যা, কিছু হয় তা এই সব মূর্তিদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে এবং ভাল-মন্দ ও লাভ-লোকসানের চাবি-কাঠি তাদেরই হাতে"। সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষে বার বার আক্রমণ করেছেন। এই সব আক্রমণের অধিকাংশ লক্ষ্যস্থল ছিল বড় বড় মন্দির এবং পূজার ঘর। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুলতান মাহমুদের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব হল সোমনাথ মন্দির বিজয়। সুলতান এই আক্রমণ কেন করলেন ? এই আক্রমণের উদ্দেশ্য কি ছিল ? আল্লামা ইবনে আসীর-এর যে সব কারণ লিখেছেন, তা, আমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে। তিনি লেখেন ঃ

وكان يمين الدولة كلما فتح من الهند فتحا وكسر
صنما يقول الهنود ان هذه الاصنام قد سخط عليها سومنات
ولو انه راض عنها لاهلك من قصدها بسوء فلما بلغ ذالك
يمين الدولة عزم على غزوه واهلاكه ظنا منه ان الهنود
اذا فقدوه وراوا اكذب ادعائهم الباطل دخلوا فى
الاسلام -

"ইয়ামীনুদ্দৌলা মাহমুদ যখনই ভারতবর্ষে কোন বিজয় অর্জন করেছেন এবং মূর্তিসমূহ ভেঙেছেন, তখন হিন্দুরা বলতো যে, সোমনাথ এসব মূর্তি প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছে। কেননা সে যদি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতো তাহলে যারা মূর্তির সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে, তাদেরকে নিশ্চয়ই ধ্বংস করে দিত"। সুলতান মাহমুদ যখন তাদের এইরূপ বিশ্বাসের কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি সোমনাথ ধ্বংস করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। কেননা তাঁর ধারণা ছিল যে, হিন্দুরা যখন (তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) সোমনাথ থেকে নিরাশ হয়ে যাবে এবং নিজেদের মিথ্যাবাদীর অসারতা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করবে তখন হয়তঃ তারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবে"। (তারিখুল কামেল" নবম-খণ্ড, ২১৮ পৃঃ দ্রঃ)

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সুলতানের যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধের পর বে-পরওয়াভাবে লুণ্ঠণ, সাধারণ হত্যাকান্ড এবং উপাসনালয় ধ্বংস করা কোনক্রমেই ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্মানজনক কাজ নয়। ইসলাম ইহাকে অনুমোদনও করে না। কিন্তু এইরূপ দাবী করাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, তাঁর কার্যকলাপে ইসলামী প্রেরণার কোন স্থান ছিল না এবং তাঁর যুদ্ধের উদ্দেশ্য শুধু লুণ্ঠণ ও ধ্বংসসাধন ছিল। সুলতান একজন মুসলমান হিসেবে নিজের কথাবার্তা ও অঙ্গীকার রক্ষার ব্যাপারে কতটুকু ভারসাম্যপূর্ণ ছিলেন তা এই একটি ঘটনা থেকেই বুঝা যায় যে, থানেশ্বর বিজয়ের পর যখন তিনি দিল্লী আক্রমণ করতে চাইলেন, তখন মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ পরামর্শ দিলেন যে, দিল্লী জয়ের পূর্বে সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করা প্রয়োজন। তখন আনন্দপালের পক্ষ হইতে আর কোন বিপদের আশংকা থাকবে না। কিন্তু যেহেতু আনন্দপালের সঙ্গে সেই সময় সন্ধির অঙ্গীকার পত্র ছিল, তাই তিনি সন্ধি পত্রের বিরুদ্ধে কোন কথাই বললেন না। অতএব তিনি দিল্লী জয়ের উদ্দেশ্যে আনন্দপালের উপর আক্রমণ করা সমীচীন মনে করেন নি। ইহা ছাড়াও সুলতানের অবস্থা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ স্থানে স্থানে লিখেছেন যে, তিনি কঠিন যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদায় নিপতিত হতেন এবং নিজের বিজয়ের জন্যে প্রার্থনা করতেন। তাঁর স্বীয় ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা নিঃসন্দেহে ধর্মপরায়ণতার লক্ষণ ছিল। তিনি তোস নগরে আলী ইবনে মূসা আররেযার কবরস্থান দ্বিতীয়বার নির্মাণ করেন যা তাঁর পিতা নাসিরুদ্দীন সবুক্তগীন ধ্বংস করেছিলেন।

('তারিখুল কামিল' গ্রন্থের ৯ম-খন্ড, ১৩৯ পৃঃ দ্রঃ)

কোন কোন ঐতিহাসিক এও লিখেছেন যে, সুলতান বাগদাদের খলীফার রাজত্বের একটি এলাকা দখল করতে চেয়েছিলেন। (১। মুহাম্মদ আকরাম আই, সি, এস. সাহেবের লেখা 'চশ্‌মায়ে কাউছার' নামক গ্রন্থের পঞ্চম পৃষ্ঠায় এই আক্রমণ সম্পর্কে ডাঃ তারা চান্দের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আপেক্ষের বিষয় যে, ডাঃ সাহেবের পুস্তক Influance of Islam on Hinduism-এর মধ্যে এই আক্রমণের বিষয় আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। এই অভিযোগের সত্যতা এতটুকু হতে পারে যে, সুলতান মাহমুদ বাগদাদের

আব্বাসী খলীফা আল-কাদির বিল্লাহ এর নিকট আবেদন করছিলেন যে, সমরকন্দের এলাকাটা আমাকে দিয়ে দিন। খলীফা এই আবেদন নাচক করে দেন এবং প্রতি উত্তরে খুবই কঠোর ভাষায় একটি পত্র দেন। সুলতান মাহমুদ রাগান্বিত হয়ে দূতের মাধ্যমে সংবাদ পাঠালেন যে, "আপনি সম্ভবতঃ চাচ্ছেন যে, আমি পাহাড়ের মত হাজার হাজার হাতী নিয়ে আপনার রাজধানী নিঃশ্চিহ্ন করে দিব এবং হাতীর পিঠে করে দরবারে খিলাফতের মাটির গযনীতে নিয়ে আসবো ? সম্ভবতঃ ঐতিহাসিকগণ মাহমুদের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি আব্বাসী খলীফার একটি এলাকা (সমরকন্দ) জয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে ঘটনায় এরও উল্লেখ আছে যে, মাহমুদের উক্তির প্রতিউত্তরে বাগদাদের খলীফা দূতের মাধ্যমে একটি অভূতপূর্ব ও আশ্চর্যজনক পত্র লিখেছিলেন, যাতে হস্তী বাহিনীর দিকে ইঙ্গিত করে মাহমুদকে হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছিল যে, যদি আপনি প্রকৃত পক্ষে আব্বাসী খিলাফতের উপর হস্তী নিয়ে আক্রমণ করার দুঃসাহস করেন, তবে এর পরিণতি তাই হবে যা কুরআনের বর্ণনা মতে মক্কার উপর হস্তী বাহিনীর আক্রমণের পরিণতি যা হয়েছিল। সুলতান মাহমুদের উপর তখন এই চিঠির প্রতিক্রিয়া এমন হল যে, তিনি পত্র পাঠ করে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। যখন সংজ্ঞা ফিরে পেলেন তখন বহু কাদলেন। দূতের কাছে নিজের অতীত কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাকে বহু মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে বাগদাদ পাঠিয়ে দেন। (তারিখে ফিরিশ্তা' গ্রন্থের-১ম খণ্ড ৮৬ পৃঃ দ্রঃ)

যা হউক ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, যদিও সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষে ক্রমাগত ১৭ বার আক্রমণ করে সেখানকার শত্রুদের সামরিক শক্তি খুবই দুর্বল করে দিয়েছিলেন এবং পাঞ্জাবকে গযনী রাজত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে তথায় তাঁর একজন প্রতিনিধি একদল সৈন্য স্থায়ীভাবে রেখে অনাগত ভবিষ্যতের বংশধরদের জন্যে ভারতবর্ষে আক্রমণের এবং নিজ রাজত্ব সম্প্রসারণের পথ খুলে দিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি ভারতবর্ষে কোন স্থায়ী ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। তাঁর নির্দয় আক্রমণের ফলে কিছু লোক স্বেচ্ছায় এবং কিছু লোক অনিচ্ছায় অত্যাচারিত হয়ে মুসলমান হয়ে

ছিল। কিন্তু সমাজের সার্বিক অবস্থার উপর কোন বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় নি। এর কারণ একেবারে স্পষ্ট। অর্থাৎ সুলতান মাহমুদের ঝটিকা আক্রমণ ঐ প্রবল ঝড়ো হাওয়ার মত যে, প্রবল বেগে বাতাস প্রবাহিত হয়ে ধুলি বালি উড়ায়ে বৃক্ষাদি উপড়ায়ে, ভাঙ্গাচুরা দেওয়ালের পতন ঘটায়ে আগমন ও প্রস্থান করেছে। কিন্তু পরিশেষে ভাঙ্গাচুরার কিছু নিদর্শন রেখে যাওয়া ব্যতীত চিরস্মরণীয় কিছু রেখে যেতে পারেনি।

সুলতান জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও কবিতা এবং কলাবিদ্যার ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর দরবার আব্বাসী খলীফা মামুনের দরবারের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ ছিল। তিনি ভারতবর্ষ থেকে যেসব ধনরত্ন, মণি-মুক্তা, মূল্যবান পাথর ও অন্যান্য জিনিস-পত্র নিয়ে ছিলেন, তা' দ্বারা তিনি গযনীকে খুবই সুসজ্জিত করেন। তন্মধ্যে মিউজিয়াম, বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরী ইত্যাদি সব কিছুই ছিল।

গযনী রাজত্বের পতন

সুলতান মাহ্মুদের ইন্তিকালের পর গযনী রাজত্বের অধঃপতনের চিহ্ন পরিলক্ষিত হতে লাগল। পিতার ইন্তিকালের পর থেকেই রাজসিংহাসন নিয়ে ভাইদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। পরিশেষে মাসঊদ জয়ী হলেন এবং অপর ভাইকে হত্যা করে নিজেই সিংহাসনে বসেন। কিন্তু এতেও ভাগ্যে শান্তি মিলল না। একদিকে তুর্কী সালজুকীরা গযনীর এলাকা ধ্বংস করছিল এবং অন্যদিকে রাজ্যের বিশৃংখলা বিনষ্ট করছিল। পরিণামে মাসঊদকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে তাঁর ভাই মুহাম্মদকে সিংহাসনে বসানো হল। অতঃপর আরো কয়েকজন বাদশাহ হলেন, যাঁরা রাজনৈতিক দিক দিয়ে তেমন গুরুত্বের অধিকারী ছিলেন না। গযনী রাজত্বের অধঃপতনের ফলে ভারবর্ষে এমন প্রতিক্রিয়া হল যে, ছোট বড় অনেক রাজ্যই স্বাধীন হয়ে গেল। এমন কি নগরকোটও গভর্নর থেকে ছিনিয়ে নেয়া হল।

ঘোরী বংশ

যখন গযনী রাজত্বের অধঃপতন শুরু হল তখন কান্দাহাহের নিকটবর্তী ঘোর প্রদেশে উহার এক বিরোধী রাষ্ট্রের উদ্ভব হল। খ্রীস্টীয় দ্বাদশ

শতাব্দীর প্রারম্ভে এই উভয় রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল। কয়েক বছর পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলল। পরিশেষে ঘোরের বাদশাহ আলাউদ্দীন আপন ভাইয়ের ষড়যন্ত্রমূলক হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ১১৪৯ খ্রীস্টাব্দে গযনী রাজ্য অবরোধ করেন এবং ভীষণ যুদ্ধের পর উহা জয় করেন। আলাউদ্দীনের এতে তৃপ্তি মিটল না। তাঁরই অনুমতিক্রমে ঘোরীর সৈন্যরা গযনীতে সাত দিন পর্যন্ত ক্রমাগত হত্যা কাণ্ড এবং লুন্ঠণ চালাল। গযনীর বড় বড় নেতা, যারা আলাউদ্দীনের ভাইয়ের হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তাদেরকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করে ঘোরে আনায়ন করলেন এবং তাদেরকে হত্যা করে তাদের রক্ত দিয়ে ইট তৈরীর কাদা মাটিতে মিশ্রিত করে ঐ সব দালান তৈরী করা হল, যা তখন ঘোরে নির্মিত হতেছিল। এরূপ পাষাণ অন্তর এবং নির্মম অত্যাচারের কারণেই আলাউদ্দীনকে বিশ্ব অত্যাচারীর উপাধিতে আজো স্মরণ করা হয়।

গযনী পতনের পূর্বে এখানকার বাদশাহ খসরুশাহ কোনক্রমে জীবন বাঁচিয়ে লাহোর পৌঁছেছিলেন। তথায় (সাত বছর রাজত্ব করার পর) ৫৫৫ হিজরী, মুতাবিক ১১৬০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।

তাঁর পর তাঁর ছেলে 'খসরু মালিক' পিতার স্থলাভিষিক্ত—হন। তিনি ছিলেন গযনী রাজত্বের সর্বশেষ শাসক। সেই সময় আলাউদ্দীনের ইন্তিকাল হল। তাঁর রাজত্ব আপন ভাতিজাদের মধ্যে এমনভাবে বণ্টিত হয়েছিল যে, এক ভাতিজা ঘোরের বাদশাহ ছিলেন এবং অপর যে জন সুলতান শিহাবউদ্দীন ঘোরী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি গযনীর গভর্ণর হন। শিহাবউদ্দীন খুবই সাহসী ও উন্নত চিন্তাধারার লোক ছিলেন। তিনি প্রথম থেকেই ভারতবর্ষ বিজয়ের আশাপোষণ করছিলেন। এই উদ্দেশ সফল করার জন্য প্রথমেই পাঞ্জাবকে গযনী রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন বলে বিবেচিত হল। সুতরাং তিনি লাহোর আক্রমণ করলেন। পরিশেষে দু'বার ব্যর্থ হয়ে ১১৮৬ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাব জয় করেন। গযনী রাজত্বের শেষ শাসক খসরু মালিককে গ্রেফতার করে ঘোরে প্রেরণ করা হল।

পাঞ্জাব জয় হওয়ার পর শিহাব উদ্দীন ঘোরীর জন্য ভারতবর্ষ আক্রমণ করা অতিসহজ হয়ে গেল। সেই সময় কানুজ এবং দিল্লী ও আজমীর

উত্তর ভারতে। রাজপুতদের দু'টি অতিশক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল কানুজ জয় চন্দরের শাসনাধীন ছিল। দিল্লী ও আজমীরের শাসক ছিলেন পৃথিরাজ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উভয়ের মধ্যে ভীষণ শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গেল। এর ফলে উত্তর ভারতের কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এবং আমীর উমারা জয় চন্দরকে সাহায্য করতে লাগল। আর কিছু লোক পৃথিরাজকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতেছিল। এই সুযোগে শিহাব উদ্দীন ঘোরী ১১৯১ খৃীস্টাব্দে বাহট্টান্ডা'র উপর আক্রমণ করে বিজয়ী হন। পৃথিরাজ এই সংবাদ পেয়ে এক বীর সেনাবাহিনী নিয়ে মুকাবিলার জন্যে থানেশ্বর থেকে ১৪ মাইল দূরে এক স্থানে অবস্থান করলেন। উভয় সৈন্যদল যুদ্ধের মাঠে একত্র হল। কিন্তু রাজপুতগণ এমন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করলেন যে, মুসলমানদের পদস্খলন ঘটল। খোদ সুলতান ঘোরী ও ভীষণভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এমন সময় তাঁর একজন দেহরক্ষীদাস তাঁকে লোফে নিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করল এবং দ্রুত বেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে আপন মনিবকে নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করল। অতঃপর ঘোরী গযনীতে ফিরে এলেন এবং নতুন করে পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন। তিনি দু'বছর পর পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন।

পৃথিরাজ ও খুব বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি বহুসৈন্য-সামন্ত ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করলেন। কিন্তু এবার শিহাবউদ্দীন ঘোরীরই বিজয় হয়। পৃথিরাজ যুদ্ধক্ষেত্রের প্রথম সারিতে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি যখন বন্দী হলেন তখন সৈন্যদের মাঝে বিশৃংখলার সৃষ্টি হল। পরিশেষে আজমীরের এলাকা পর্যন্ত সুলতানের দখলে এল। এই যুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে ঘোরী ভারতবর্ষে আপন দাস কুতুবউদ্দীন আইবেককে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে রেখে গযনী চলে গেলেন। এক বছর পরই কুতুবউদ্দীন দিল্লী অধিকার করেন।

১১৯৪ খৃীস্টাব্দে ঘোরী উত্তর ভারতের অন্য আর একটি রাজপুত রাজ্য অর্থাৎ কানুজের উপর আক্রমণ করেন। জয়চান্দ খুবই বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, কিন্তু পরাজিত হলেন। ঘোরী ইহা জয় করে

আফগানিস্থান চলে গেলেন। অতঃপর কুতুবউদ্দীন গুজরাট এবং বখতিয়ার খালজী যিনি কানুজে ঘোরীর প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন, প্রথমে 'উদ' এবং পরে বিহার ও পশ্চিম বঙ্গ জয় করেন।

এতে সন্দেহ নেই যে, শিহাবউদ্দীন ঘোরী ভারতবর্ষের এক বিরাট এলাকা দখল করেছিলেন। কিন্তু এই সব বিজয় এত দ্রুতগতিতে অর্জিত হয়েছিল যে, স্থির মস্তিষ্কে উহাদের শৃংখলা এবং সুব্যবস্থা করতে পারেননি স্থানে স্থানে বিশৃংখলা এবং বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল। তন্মধ্যে উত্তর ভারতেই এর জোর ছিল বেশী।

১২০৬ খ্রীস্টাব্দে সুলতান এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য নিজেই 'ঘোর থেকে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইহা নিষ্পত্তি করে ফিরে যাওয়ার সময় 'জিলাম' নদীর তীরে 'দিমিয়াক' নামক স্থানে একজন ইসমাঈলীর আক্রমণে নিহত হন। আমাদের প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ শিহাব উদ্দীন ঘোরীর মৃত্যুকে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এক বিরাট বিপদ বলে মনে করতেন। হাজী আদু দাবীর জুযজানী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, হযরতকে যখন জিজ্ঞেস করা হল যে, কিয়ামত কখন হবে? ইরশাদ হল—

ستكون على رأس ستمائة وشيئ

"ছয়শত বছর ও কিছু বেশী সময়ের পর"। অতঃপর সম্মানিত ঐতিহাসিক লেখেন যে, ঘোরীর ইন্তিকাল ও ৬০২ হিজরীতে হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাকে কিয়ামতের প্রথম চিহ্ন মনে করা যায়। আর চেঙ্গিযখানের আক্রমণ ও এই বছরই শুরু হয়েছিল। এই জন্য ইহাকে কিয়ামতের দ্বিতীয় চিহ্ন বলা যায়।

যা হউক, এতে সন্দেহ নেই যে সুলতান শিহাবউদ্দীন ঘোরী খুবই সাহসী. বীরপুরুষ এবং দানশীল ছিলেন। আল্লামা ইবনে আসীর লেখেন যে,

وكان رحمة الله شجاعا مقداما كثير الغزو الى بلاد
الهند عادلا فى رعيته حسن السيرة فيهم -

"তিনি ছিলেন বীরপুরুষ হিসেবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্বরূপ। ভারতবর্ষের অনেক যুদ্ধেই ছিলেন অগ্রগামী। তদুপরি তিনি ছিলেন ইসলামী শরীয়তের অনুসারী। প্রজাদের প্রতি ছিলেন সদয় ও অনুগ্রহশীল"।

আলেম সমাজের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। অধিকাংশ সময় তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর সঙ্গে তাঁর খুবই হৃদ্যতা ছিল। ইমাম সাহেব নিজে প্রায়ই শাহী মহলে এসে ওয়াজ করতেন। একদা তিনি ওয়াজের সময় সুলতানকে লক্ষ্য করে বললেন, হে রাজন, আপনার এই রাজত্ব চিরস্থায়ী নয় এবং রাযীর এই পরিধান ও থাকবে না। আমাদের সকলকেই আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে"। সুলতানের উপর এই কথা দু'টির এমন প্রতিক্রিয়া হল যে, তিনি তা' শ্রবণ করে কাঁদতে লাগলেন। এত কাঁদলেন যে, দর্শকদের ও তাঁর প্রতি দয়ার ভাব উদয় হল। ("ইবনে আসির" গ্রন্থের দ্বাদশ খণ্ড' ৮৪ পৃঃ দ্রঃ)

সুলতানের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি একটি মেয়ে পালন করতেন। কিন্তু দাস আযাদ করা যেন তাঁর একটি শখের ব্যাপার ছিল। তিনি বিভিন্ন দাস খরিদ করে উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতেন। এমনিভাবে তাঁর চল্লিশ জন স্বাধীন কৃত দাস উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন স্থানের হাকিম কিংবা গভর্ণর পর্যন্ত ছিলেন। সুলতান তাদেরকে নিজের স্বাধীন উত্তরাধিকারী মনে করতেন।

সুলতান ঘোরী আপন দাসদেরকে আইন শৃংখলা শিক্ষা দিয়ে এবং সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে এমনভাবে তৈরী করেছিলেন যে, তাঁর ইন্তিকালের পর ও তারা ভারতবর্ষের রাজ্য শাসন উত্তম রূপে পরিচালনা করেছেন। অনেকের ধারণা ছিল যে, ঘোরীর ইন্তিকালের পর তাঁর রাজ্য ও টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তাই এই রূপ দ্বন্দ্বের সময় দিল্লীর গভর্ণর কুতুব উদ্দীন আইবেক' নিজেকে স্বাধীন বাদশাহ বলে ঘোষণা করলেন।

দাস বংশ : কুতুবউদ্দীন আইবেক

(দাস বংশ ১২০৬—১২৯০ খ্রীঃ) কুতুবউদ্দীন আইবেক দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই বংশকে দাস বংশ বলার কারণ হল—কুতুবউদ্দীন আইবেক একজন দাস ছিলেন। তাঁর পরে যারা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন দাস।

কুতুবউদ্দীন আইবেক প্রকৃতপক্ষে বংশগত দিক দিয়ে তুর্কী ছিলেন। আইবেক শব্দের অর্থ 'অবশ' কেননা তার একটি হাত 'অবশ' ছিল এই জন্য তাঁকে আইবেক বলা হত। যখন তাঁকে নিশাপুরে আনায়ন করা হলো তখন সেখানের প্রধান বিচাবপতি ইমাম আবু হানীফার বংশধর ফখর উদ্দীন আবদুল আযীয কুফীকে খরিদ করেন। তিনি তাঁকে নিজ সন্তানের মত লালন-পালন ও বিশেষভাবে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। মক্তবে প্রবেশ করেই তিনি কুরআন শরীফ, ফিকাহ্, সাহিত্য ইত্যাদি বিদ্যা অর্জন করেন। অতঃপর এক ব্যক্তি বিচারপতি ফখরুদ্দীনের নিকট হতে খরিদ করে গযনীতে নিয়ে এলেন এবং সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর রাজ দরবারে উপস্থিত করেন। সুলতান কোন লোক দেখলেই তার চেহারা দেখে তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলে দিতে পারতেন। তিনি কুতুবউদ্দীনকে দেখা মাত্রই উপযুক্ত রত্ন মনে করে খরিদ করলেন। অতঃপর নিজ তত্ত্বাবধানে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা এবং সামরিক বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলেন। সাহেবে তাবকাত নাসির উদীনের বর্ণনা মতে যদিও কুতুব উদ্দীন দৃশ্যতঃ সুদর্শন ছিলেন না তথাপি তাঁর চরিত্র ও আচার-ব্যবহার ছিল খুবই উত্তম। তিনি অশ্বারোহণে, বীরত্বে, বুদ্ধিমত্তায় দানশীলতায়, সম্মানজনক চাল-চলনে এবং সৎকর্মের দিক দিয়ে উন্নতমানব ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি খুবই শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাই জনসাধারণ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতো। কুতুবউদ্দীন ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতঃপর তিনি তাজুদ্দীন থেকে লাহোরও ছিনিয়ে নেন। সেখান থেকে অবসর হয়ে তিনি গযনীতে ফিরে গেলেন। চল্লিশ দিন তথায় অবস্থান করে পুনরায় লাহোর ফিরে এলেন। এখানে অবস্থানকালে একদিন 'পোলো' (Polo) খেলতে ছিলেন, এমন সময় ঘোড়া হতে পড়ে গিয়ে ইন্তিকাল করেন। এই ঘটনা তাঁর সিংহাসনে আরোহণের চার

বছর পর অর্থাৎ ১২১০ খ্রীস্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল। লাহোরেই তাঁকে দাফন করা হয়। লাহোরের আনারকলি বাজারের পিছনে তাঁর মাযার আজো বিদ্যমান আছে।[১]

কুতুবউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে আরাম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু খুবই দুর্বল হওয়ার কারণে তিনি এই গুরুদায়িত্ব পালনের উপযুক্ত ছিলেন না। পরিণামে শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ যিনি সেই সময় দিল্লীতে ছিলেন, আরামশাহের সঙ্গে সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তিনি কুতুব উদ্দীনের জামাতাও ছিলেন। আরাম শাহ যুদ্ধে পরাজিত হলে তাঁকে বন্দী করে বাদাউন পাঠিয়ে দেয়া হল।

---

১. কুতুব উদ্দীন যেমন বাহাদুর ও বীরত্বের অধিকারী ছিলেন, তেমনি চিন্তাশীল ও জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন বিজয়ের কৃতিত্ব ছাড়াও সম্ভবতঃ সবচেয়ে অধিক কৃতিত্বের বিষয় ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীন ইসলামী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এখানে তাঁর শাসন পদ্ধতি কেমন ছিল? আর এ ব্যাপারে তিনিই বা কোন পদ্ধতি তে রাজ্য শাসন করতেন? উহার একটু নিদর্শন ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের বর্ণনাতে পাওয়া যায়। কুতুব উদ্দীন দেশ থেকে সমস্ত অনৈসলামিক টেক্স আদায় করা বন্ধ করে দেন। শুধু শরীয়ত সম্মত উপায়ে টেক্স আদায় প্রথা চালু রাখেন। এর পরিপেক্ষিতে কোন কোন অবস্থায় 'উপর' ১/১০ এবং কোন কোন অবস্থায় উহার অর্ধেক আদায় করা হতো। (আজ্ঞায়ের নামা ' স্যার, এ, ডি' রোশ, ৪০৩ পৃঃ দ্রঃ)

'ডঃ ট্রিপাঠী' উহা বর্ণনা করার পর লেখেন যে, "কুতুব উদ্দীনের শাসন পদ্ধতি নিঃসন্দেহে সদয় প্রকৃতির ছিল। কেননা তিনি একটি বিস্তারিত কর্ম পদ্ধতি অনুসারে কাজ করতে চাইতেন। ইহা অবশ্য বলা যাবে না যে, ইসলামী আইন মতে টেক্স্ আদায়ের যে বিভিন্ন পদ্ধতি ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে তন্মধ্যে কোন্ পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। যা' হউক যে পদ্ধতিই হউক না কেন উহা ইসলামী টের্কস্ আদায় পদ্ধতির নিকটবর্তীই ছিল, যা' সেইসময় ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল।

দাশ বংশের সর্বমোট রাজত্বকাল ছিল ৮৪ বছর। ইসলাম দাসদের জন্য শিক্ষা-দীক্ষার ও তাদের প্রতিপালনের যে সুব্যবস্থা করেছে এবং মুসলমানদেরকে দাসদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের যে শিক্ষা দিয়েছে, ইসলামী ইতিহাসে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। ভারতবর্ষের দাস বংশও এই শিক্ষার বাস্তবতা এবং সত্যকার এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত ও প্রকাশ্য প্রমাণ। কুতুবউদ্দীন নিজে সমস্ত গুণাবলী ও চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, তা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

"সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ বা (আলতামাশ)"

আরাম শাহের পর কুতুবউদ্দীনের স্বাধীন কৃতদাস ও জামাতা শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ ১২১০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একজন আশ্চর্যজনক এবং অভূতপূর্ব গুণের ও চরিত্রের মানুষ ছিলেন। একদিকে তিনি খুবই চিন্তাশীল, হুঁশিয়ার এবং রাজনীতিবিদ ও বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণের পর প্রথমেই সিন্ধু এবং বাংলার বিদ্রোহী গভর্নরদেরকে পরাজিত করেন। অতঃপর হিন্দুদের প্রতিবেশী স্বাধীন রাজ্যসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং রাজ পুতনা আক্রমণ করেন। গোয়ালীয়ার দুর্গসমূহ অধিকার করেন। 'মালোহুর' প্রাক্তন রাজধানী 'আজ্জীন' বিজয় করেন। তাছাড়াও তাঁর আইন-শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা এমম ছিল যে, এ সম্পর্কে 'ডঃ ট্রি পাথী' তাঁকে ভারতবর্ষের স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সবপ্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন। অন্যদিকে তিনি উল্লিখিত গুণের অধিকারী হওয়া ছাড়াও খুবই আবিদ, আল্লাহ্‌ভীরু, সূফী এবং দরিদ্রতা প্রিয় স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। যেমন "খাযায়েনুল-আস্‌ফিয়া" গ্রন্থের লেখক বর্ণনা করেন যে,

اگرچه بظاهر تعلق به بادشاهی داشت لیکن از دل
فقیر و فقیر دوست بود -

"যদিও তিনি বাহ্যিক দিক থেকে বাদশাহীর সাথে সম্পর্ক যুক্ত ছিলেন, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে তিনি ছিলেন ফকীর এবং ফকীর প্রিয়"।

ফরয ও নফল ইবাদত এমনভাবে সমাপন করতেন যে, বাদশাহ হওয়ার পর রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কোন সময়

নামায পরিত্যাগ করতেন না। 'তাবকাতে আকবরী' গ্রন্থের লেখক বর্ণনা করেন যে, তিনি সদা-সর্বদা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন এবং জুমা'র দিনে মসজিদে গমন করতেন ও ফরয শেষে নফল ইবাদতও করতেন। ধর্মীয় ওয়াজ নসীহত শুনতে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। সপ্তাহে তিনদিন এবং পবিত্র রমযান মাসে দৈনিক ওয়াজ শুনতেন। সাইরুল আরিফীল' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, জুমার নামাযের পর সুলতান শাহী মহলে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতেন, যা'তে বড় বড় আলেম, সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং ধর্মীয় পন্ডিতগণ অংশগ্রহণ করতেন। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ স্বাধীনভাবে ইসলামী রাজত্বের বাদশাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে মত বিনিময় করতেন এবং বাদশাহ ইহা অত্যন্ত মনযোগ সহকারে ও আগ্রহের সাথে শ্রবণ করতেন। ফরয ও সাধারণ নফল ইবাদত ছাড়াও তিনি সারারাত আল্লাহর যিকির এবং বিভিন্ন অযিফা বা তাসবীহ পাঠে মগ্ন থাকতেন। বাবা ফরিদ ফাওয়ায়েদুস্ সালেকীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "তিনি ছিলেন সরল বিশ্বাসী প্রকৃতির লোক। সারারাত জাগ্রত থেকে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। পৃথিবীর কর্ম কোলাহল ছেড়ে কিছু সময়ের জন্য নিদ্রা গেলেও আমাদের মনে হত যে, তিনি যেন জাগ্রত। অনেক সময় ধুলা-বালীতেই শুয়ে পড়তেন নিজেই অযু করতেন এবং মুসাল্লাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। রাত্রিতে অযু কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনে দাস-দাসীদেরকে জাগ্রত করতেন না। তাঁর কথাবার্তা শুনে চিন্তিত ব্যক্তিরও চিন্তা দূরীভূত হয়ে যেত"।

সুলতানের পরিপূর্ণ আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও সাধুতার প্রমাণের জন্যে খাজা উসমান হারুনীর (রঃ) বক্তব্যই যথেষ্ঠ, যিনি একজন উন্নতমানের বুযুর্গ ও সাধু পুরুষ ছিলেন এবং খাজা মঈনউদ্দীন চিশতীর (রঃ) পীর ও মুর্শিদ ছিলেন। তিনি সুলতানকে انسان کامل 'পরিপূর্ণ মানুষ' মনে করতেন। এখানেই সুলতান আলেম সমাজ, ধর্মীয় সুপুরুষ এবং সুফীদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখতেন। তাঁর সময়েই খাইবার গিরিপথ দিয়ে অসংখ্য সাধু পুরুষ ও 'সুফী ভারতবর্ষে আগমন করেন। সুলতান যখন শুনতেন যে, তাঁদের কেহ দিল্লী আগমন করছেন, তখন তিনি নিজে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মাইলের পর মাইল পায়ে হেটে গমন করতেন।

হযরত খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ) যখন সুলতান থেকে দিল্লী এলেন তখন সুলতান জাঁকজমকতার সাথে খাজা সাহেবকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং রাজমহলে অবস্থান করার জন্য বিনীত প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু কুতুব সাহেব যখন সুলতানের আবেদন নামঞ্জুর করে শহরের বাইরে এক খানকায় অবস্থান করতে লগেলেন তখন সুলতান অধিকাংশ সময় তাঁর সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে খানকায় গমন করতেন এবং তাঁর নিকট উপদেশের বাণী শ্রবণ করতেন। কুতুব সহেবের প্রতি সুলতানের কিরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল সে ধারণা এই ঘটনা থেকেই বুঝা যাবে যা খোদ-কুতুব সাহেবই বর্ণনা করেছেন। "এক রাত্রিতে সুলতান আমার ইবাদাত খানায় আগমন করলেন এবং কাছেই এসেই আমার পা-ধরে ফেললেন, আমি বললাম, 'কোন কষ্ট আছে কি ? যদি কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকে তো বলুন"। সুলতান উত্তর করলেন, "প্রয়োজন ? প্রয়োজন তো সেই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়ার, যিনি আমাকে এই রাজ্য ও রাজত্ব প্রদান করেছেন। আমার আর কোন প্রয়োজন নেই। আমাকে শুধু এই কথা বলে দিন যে, কিয়ামত দিবসে আমার হাশর কোন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে হবে" ?

একদা যখন কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে হযরত খাজা মাঈন উদ্দীন চিশতী (রঃ) কুতুব সাহেবকে নিয়ে দিল্লী থেকে আজমীর যাচ্ছিলেন তখন দিল্লীর বিরাট জনসাধারণের সঙ্গে সুলতান ও কয়েক মাইল পর্যন্ত উভয় বুযুর্গের সঙ্গ লাভের জন্য পায়ে হেঁটে গেলেন। কিন্তু যখন খাজা আজমীর সাহেব দিল্লীর অধিবাসী এবং খোদ সুলতানের দুঃখ কষ্ঠের কথা অনুভব করলেন, তখন তিনি কুতুব সাহেবকে দিল্লীতেই অবস্থান করার অনুমতি দিয়ে ছিলেন। এমন সময় সুলতান আনন্দেদ্ধ ,আতিশয্যে খাজা আজমীর পদ চুম্বন করলেন এবং কুতুব সাহেবকে খুবই সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন।

খিলাফতে রাশেদার পর সম্ভবতঃ শামসুদ্দীন ইলতুতমিশের মত এমন বাদশাহ পাওয়া কঠিন হবে যিনি আল্লাহ্‌র যিকির ও তলোয়ার উভয়ের সমন্বয়ে পরিপূর্ণতা অর্জন করেছেন। উন্নত চিন্তাধারা ও রাজনীতিবিদ হওয়ার সাথে উচ্চ পর্যায়ের সুফী এবং মারিফাতপন্থী ও ছিলেন। তাঁর

তলোয়ার বড় বড় শত্রু শক্তিকে পরাস্ত করে' এক বিশাল রাজত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করছিল। কিন্তু তিনি নিজে সাধু, পুরুষ এবং ফকিরদের পদধূলী নিয়ে থাকতেন। বিরাট বিরাট রাজ শক্তি তাঁর পদতলে আনুগত্য ও দাসত্বের মস্তক অবনত করতো, কিন্তু তিনি তো নির্জনবাসী ফকীরের খানকায় গিয়ে মা'রিফাত পন্থী ফকীরের পদ চুম্বন করতেন। রাতের আঁধারের মাঝে খানকার ভিতর গিয়ে আল্লাহ্‌র ভয় ও ব্যক্তিগত মুক্তির চিন্তায় কান্নাকাটি করতেন। সুলতানে পবিত্র জীবন-যাপন, আত্মার পবিত্রতা এবং আল্লাহ্‌ভীতি ও পরহিযগারী সম্পর্কে প্রমাণের জন্য এর চেয়ে অধিক বর্ণনার প্রয়োজন কি? ১৪ই রবিউল আউয়াল, ৬৩৩ হিজরীতে যখন হযরত খাজা কুতুব উদ্দীন বখ্‌তীয়ার কাকীর ইন্তিকাল হল এবং তাঁর মৃত দেহ গোসল ও কাফনের পর বাইরে আনা হল' তখন খাজা আবু সাঈদ (রঃ) বললেন যে, হযরত খাজা সাহেব, মৃত্যুর পূর্বে অসীয়ত করে গিয়েছেন যে, "আমার জানাযার নামায শুধু ঐ ব্যক্তি পড়াবেন, যিনি জীবনে কোনদিন ব্যভিচার করেননি এবং আসরের সুন্নত ও 'তাকবীর উলা, (প্রথম তাকবীর) পরিত্যাগ করেননি"। উপস্থিত জনতার মাঝে সুলতান ও ছিলেন। তিনি অপেক্ষা করছিলেন যে, হযরত খাজা সাহেবের 'অসীয়ত' অনুযাযী এমন কোন বুযুর্গ অগ্রসর হয়ে নামায পড়ান কিনা? সুলতান দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে যখন দেখলেন যে, কোন ব্যক্তিই জানাযার ইমামতির সাহস করছেন না তখন সুলতান নিজেই সামনে অগ্রসর হলেন এবং বললেন যে,

আমি আমার গোপন অবস্থা প্রকাশ করে নামায পড়তে ইচ্ছুক ছিলাম না, কিন্তু খাজা সাহেবের অসীয়ত পূর্ণ করাও সর্বাবস্থায় অত্যাবশ্যক"। এই বলে সুলতান নামায পড়ালেন এবং জানাযা কাঁধে নিয়ে কবরস্থান পর্যন্ত গমন করলেন। ("খাযায়েনুল আসফিয়া" গ্রন্থের ২৭৫ পঃ দ্রঃ)

হযরত খাজা সাহেবের ইন্তিকালের কয়েক মাস পর ৬৩৩ হিজরীতে খোদ সুলতানের ও ইন্তিকাল হল। কিন্তু যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন কাযী হামিদুদ্দীন নাগোরী (রঃ)-এর খানকার খাজা সাহেবের 'ফাতেহা' হিসেবে খানা প্রেরণ করছিলেন। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে সুলতান

শামসুদ্দীন ইলতুতমিশই ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম বাদশাহ, যাঁর জন্যে বাগদাদের খলীফার দরবার থেকে গৌরবজনক পোশাক উপঢৌকন এসেছিল এবং ভারতবর্ষে যাঁর শাসন মেনে নেয়া হয়েছিল। 'তাবকাতে আকবরীর লেখক নিযাম উদ্দীন আহমাদ বর্ণনা করেন যে, সুলতানের জন্য সেই দিনটি খুবই আনন্দের ছিল, যেদিন এই خلعت উপঢৌকন কৃত পোশক পরিধান করলেন। তিনি খুশীর আতিশয্যে সেদিন আমীরদেরকেও পোশাক উপঢৌকন দেন এবং শহর সুসজ্জিত করেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৬৩৩ হিজরীতে তিনি-ইন্তিকাল করেন। দিল্লীর এক মসজিদের কাছে "কুওয়াতুল ইসলাম' অর্থাৎ 'কুতুব সাহেবের মনিবের পার্শ্বে রাস্তা সংলগ্ন স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আজো তা সর্ব শ্রেণীর লোকের জন্য উপদেশস্থল হিসেবে চিহ্নিত। আমি অনুভব করতেছি যে, সুলতানের অবস্থা বর্ণনা পুস্তকের স্বল্প পরিসরে কিছু বেশী হয়ে গেছে। তবুও বর্ণনা করলাম শুধু একজন নিরীক্ষকের কাছে পুস্তকের বিষয়-বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব যেন দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এই বিষয়ে যদি আমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয় তবে শুধু এই জন্যে যে, لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم "বিষয় বস্তু রসাত্মক হওয়ার কারণে আমার বর্ণনা দীর্ঘায়িত করলাম"।

সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশের ইন্তিকালের পর তাঁর ছেলে রুকনুদ্দীন ফিরোজশাহ বাদশাহ নির্বাচিত হন। পিতার ইন্তিকালের সময় তিনি সৌভাগ্যক্রমে দিল্লীতে ছিলেন। তিনি রাজ্য শাসনের উপযুক্ত ছিলেন না। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি আপন মাতা 'শাহ্ তুরকানের' কাছে রাজ্যভার সমর্পণ করে দেন। আর তিনি দীন-দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে দিবারাত্র আনন্দ উল্লাসে জীবন যাপন করতে লাগলেন।

'শাহ তুরকান' খুবই হিংসা পরায়ণা তুর্কীদাসী ছিলেন তিনি ছেলের অমনোযোগিতা ও স্বাধীনতার সুযোগে স্বার্থ উঠিয়ে ইলতুতমিশের বিভিন্ন বিবিদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে হত্যা করেন। শামসী মহলের অনেক সুন্দরী মহিলা এবং দাসী তার অত্যাচারের শিকার হয়ে দরিদ্র

ও অভাব অনটনের জীবন-যাপন করতে বাধ্য হন। ইলতুতমিশের সবচেয়ে ছোট ছেলে কুতুব উদ্দীনও তারই ইঙ্গিতে নিহত হল। এর পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র রাজ্যে রুকুনুদ্দীনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। অতএব তাঁর সিংহাসন আরোহণের ছয় মাস পরেই তাঁকে অপসারণ করে হত্যা করা হল। তাঁর স্থলে ইলতুতমিশের কন্যা সুলতানা রাজিয়াকে সিংহাসনে বসানো হল। রাজিয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিক ফিরিশতা'র বর্ণনা খুবই চিত্তাকর্ষক।

'সুলতান রাজিয়ার মধ্যে রাজ্য শাসনের যাবতীয় গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাশীলতা, সুন্দর ব্যবস্থাপনা এবং রাজনৈতিক পরিপক্কতায় এই মহিলা তৎকালের যোগ্য পুরুষদের সমকক্ষ ছিলেন মানবীয় উৎকৃষ্ট গুণাবলীর যাচাইকারীকেও রাজিয়ার মধ্যে শুধু মহিলা হওয়া ব্যতীত এমন কোন দোষত্রুটি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যা রাজ্য শাসনে ব্যাপারে উচ্চ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। রাজিয়া কুরআন পাঠ করতেন খুবই আদব সম্মানের সাথে। ধর্মীয় জ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়েও তাঁর পরিপূর্ণতা অর্জিত হয়েছিল। ইলতুতমিশের সময় থেকেই রাজিয়া রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্মে পরিপক্কতা অর্জন করেছিলেন। শামসী রাজত্বের রাষ্ট্রীয় অনেক জটিল বিষয়ও রাজিয়ার সঠিক সিদ্ধান্তে মীমাংসা হতো। ইলতুতমিশ গোয়ালীয়া'র বিজয় উৎসবের সময় স্বীয় বিশেষ কয়েকজন আমীরের সামনে রাজিয়াকে নিজের উত্তরাধিকারী বানিয়ে ছিলেন। যখন তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হল তখন তিনি উত্তর দিলেন, "আমি আমার ছেলেদের চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে অবগত আছি। এই সময়েও যখন তারা আমার তত্ত্বাবধানে আছে, তখনও তারা মদ্যপান ও আনন্দ উল্লাসে মত্ত আছে। আমি তাদেরকে এমন উপযুক্ত মনে করি না যে, তারা রাজ্য শাসন পরিচালনা করতে পারবে। তাদের উল্টো রাজিয়া যদি ও মহিলা, কিন্তু বুদ্ধিমত্তা দূরদর্শিতার দিক দিয়ে প্রকৃত পক্ষেই সে পুরুষের সমকক্ষ। এই জন্যেই আমি প্রত্যেক দিক বিবেচনা করে ছেলেদের উপর তাকে প্রধান্য দিলাম"। (তারিখ ফিরিশতা" উর্দু অনুবাদ, ১ম-খণ্ড, ২৫৭ পৃঃ দ্রঃ)

সকল ঐতিহাসিকই একথার উপর একমত যে, রাজিয়া প্রকৃত পক্ষেই একজন বুদ্ধিমতী, জ্ঞানী ও কর্তব্য-পরায়ণা মহিলা ছিলেন। তিনি পুরুষের পোশাক পরিধান করে রাজদরবার পরিচালনা করতেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের দমন এবং রাজত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় করার পর কিছু কিছু কারণে তাঁর বিশ্বস্ত তুর্কী আমীরদের মধ্যে তাঁর প্রতি অসন্তোষ সৃষ্টি হল। পরিশেষে তা কঠিন বিদ্রোহ এবং প্রতিশোধ স্পৃহা ও হিংসার রূপ ধারণ করল। ফলে সাড়ে তিন বছর রাজত্বের পর তাঁকে অপসারণ করে হত্যা করা হল।

সুলতানা রাজিয়ার পর ছয় বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে দু'জন বাদশাহ (১) বাহরাম শাহ এবং (২) আলা উদ্দীন অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু উভয়ই সীমাহীন অনুপযুক্ত এবং বিলাসী ছিলেন। অতএব বাহরাম শাহ দু'বছর আড়াই মাস রাজত্ব করার পর তাঁকে হত্যা করা হয়। আলাউদ্দীন চার বছর একমাস রাজত্ব করার পর তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে প্রেরণ করা হল এবং এই অবস্থাতেই তিনি ইন্তিকাল করেন।[১]

অতঃপর সকল আমীরের সর্বসম্মতিক্রমে সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশের ছোট ছেলে নাসির উদ্দীন মাহমুদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। নাসির উদ্দীন মাহমুদ চরিত্র, আচার-ব্যবহার এবং মন-মানসিকতার দিক থেকে সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশের সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব স্বরূপ ছিলেন। ঐতিহাসিক ফিরিশতার বর্ণনা মতে "এই বাদশাহ বীরত্ব, ইবাদাত এবং দানশীলতার দিক দিয়ে তৎকালে অদ্বিতীয় ছিলেন। বাদশাহ

---

১. প্রকাশ থাকে যে, সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশের দু'ছেলের একই নাম নাসিরুদ্দীন মাহমুদ ছিল। এই নামের এক ছেলের ইন্তিকাল ৬২৬ হিজরীতে খোদ ইলতুতমিশের জীবদ্দশাতেই লৌক্ষ্ম্যতে হয়েছিল। ইলতুতমিশ এই ছেলের মৃত্যুতে এত ব্যথিত হলেন যে, কিছুদিন পর যখন তাঁর ঘরে আর এক সন্তান জন্ম নিল তখন তিনি মৃত পুত্রের স্মরণে এই ছেলের ও নাম রাখলেন নাসির উদ্দীন মাহমুদ।

নিজের ব্যক্তিগত খরচাদির জন্য কখনও রাজকোষ থেকে কোন অর্থ নিতেন না। নিজের ব্যক্তিগত খরচাদির টাকা কুরআন শরীফ নকল করে সংগ্রহ করতেন। ("তারিখে ফিরিশ্তা" ১ম খণ্ড ২৬৮ পৃঃ দ্রঃ)

"তাবকাতে আকবরী" গ্রন্থের লেখক নিযাম উদ্দীন বর্ণনা করেন যে, সুলতান নাসির উদ্দীন প্রতি বছর কুরআনের দুকপি নিজ হাতে নকল করতেন। এর হাদীয়া (বিনিময় মূল্য) দিয়েই নিজের ও পরিবারের খরচ চালাতেন। একদা বাদশাহর লিখিত কুরআন মজীদের এককপি একজন আমীর সাধারণ হাদীয়া থেকে অধিক হাদীয়া দিয়ে গ্রহণ করলেন। অতঃপর সুলতান নির্দেশ দিলেন যে, আগামীতে তাঁর লিখিত কুরআন মজীদের কপি গোপনে অর্থাৎ তাঁর নাম উল্লেখ না করে বর্তমান বাজারের প্রচলিত হাদীয়া নিয়ে হস্তান্তর করা হবে। বাদশার ঘরে তাঁর বিবি ব্যতীত আর অন্য কোন দাসী কাজের জন্যে ছিল না।

একদা তাঁর বিবি সংসারের কাজকর্ম অতিষ্ঠ হয়ে একজন দাসী খরিদের জন্য বাদশাহর নিকট আবেদন করলেন। বাদশাহ প্রতিউত্তরে বললেন, রাজভাণ্ডার তো জনগণের গচ্ছিত সম্পদ আমার এতে কোন অধিকার নেই যে, এ থেকে কিছু টাকা পয়সা নিয়ে ব্যক্তিগত আরামের জন্য দাসী খরিদ করবো? ইহজগতের কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করুন, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা পরকালে এর প্রতিদান দিবেন।

('তারিখে ফিরিশ্তা' ১ম খণ্ড, ২৭৭ পৃঃ দ্রঃ)

সুলতানের মন-মানসিকতা যেহেতু সদা ইবাদাত ও নির্জনবাসের দিকে ঝোকে ছিল, সেইহেতু তিনি শামসুদ্দীন ইলতুতমিশের প্রিয় দাস (ঐতিহাসিক ফিরিশ্তার মতে জামাতাও ছিল) গিয়াসউদ্দীন বলবনকে 'খান আজম-আলগ খান' উপাধি দিয়ে মন্ত্রীত্বের পদ প্রদান করেন। রাজত্বের গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁর উপরই নির্ভর করতেন। রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রী নির্বাচনের সময় তিনি বলবনকে বলেন যে, আমি আপনাকে আমার প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছি। আল্লাহ্‌র বান্দাদের পরিচালনার রশি আপনার হাতে দিয়ে দিলাম। আপনি এমন কোন কাজ করবেন না যাতে আমাকে আল্লাহ্‌র সামনে কিয়ামতের দিন জবাবদিহি হয়ে লজ্জিত হতে না হয়।

তিনি কৃতদাস বংশের একজন তুর্কী এবং ঐ জাতিরই "আলবেরী" গোত্রের সন্তান ছিলেন। যখন মুগলদের বিজয়ের স্রোত তুরস্কের সীমান্ত পর্যন্ত পেঁছিল তখন বলবনও এক মুগলের হাতে বন্দী হলেন। এই মুগল তাঁকে এক বণিকের হাতে বিক্রি করে দিল এবং বণিক তাঁকে বাগদাদে নিয়ে তথাকার এক বিখ্যাত ধর্ম পরায়ণ বুযুর্গ খাজা জামাল উদ্দীনের হাতে বিক্রি করল। খাজা জামাল উদ্দীন বলবনসহ আরো কয়েকজন দাসকে নিয়ে ভারতবর্ষ এলেন এবং সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশের কাছে উপস্থিত করলেন। ইলতুতমিশ চড়াদামে এইসব দাসদের খরিদ করলেন। কিন্তু বলবনের মাঝে সরলতা ও সাধুতার চিহ্ন দেখে ইলতুতমিশ তাঁর শিক্ষাদীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করলেন। তিনি ইলতুতমিশের সময়, বাযদার (শিকারীবায পাখীর রক্ষণাবেক্ষণকারী) অথবা খাসদার (বাদশাহর পানের খিলি বানানো কিংবা খানা পিনার ব্যবস্থাপক পদে ছিলেন। রুকুনুদ্দীনের সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের তুর্কীদের নেতা হিসেবে পাঞ্জাবের বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব করছিলেন। সুলতান রাজিয়ার সময়ে রাজকীয় সৈন্যদের হাতে প্রথমে গ্রেফতার ও পরে নযর বন্দী হন। কিন্তু কিছু দিন পর মুক্তি পেয়ে 'মীর শিকার' (পদে অধিষ্ঠিত) হলেন। মঈয উদ্দীন বাহরাম শাহের রাজত্বকালে মীর শিকারের পদ থেকে উন্নীত হয়ে "আমীর আখোর" امیرا خور (আস্তাবল বা অশ্বশালা প্রধান) পদে অধিষ্ঠিত হন। সেই সময় তিনি "হাসী" এবং "রুদারী" পরগনার জাগীর প্রাপ্ত হন।

বাহরামের পর আলাউদ্দীন মাসউদের রাজত্বকাল আরম্ভ হল। তখন তাঁর সম্মান আরো বৃদ্ধি পেল। "আমীর হাজেব" (প্রহরী প্রধান) হিসেবে রাজত্বের গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম, বিবাদ নিষ্পত্তি ও শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদের রাজত্বকালে তিনি যেভাবে স্বাধীনতার সাথে প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছিলেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় নাসিরুদ্দীন মাহমুদের শুধু নামে মাত্র বাদশাহ ছিলেন এবং বাকী যাবতীয় কাজকর্ম বলবনই করতেন।

গিয়াস উদ্দীন বলবন নিজের উপযুক্ততা ও যোগ্যতা ব্যতীতও তিনি বাদশাহের এক কন্যাকে বিয়ে করে বাদশাহর আরো অধিক বিশ্বস্ততা অর্জন

করেন। রাজ্যের বড় বড় পদে নিজের বিশ্বস্ত আমীর স্বজনদেরকে চাকরি দিয়ে নিজের রাজত্বের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় করেন। অতএব তার ছোট ভাই 'কাশলু খান'কে 'আমীর হাজেব' পদে এবং তাঁর চাচাতো ভাই শেরখানকে লাহোর ও ভাটানডার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। এক সংক্ষিপ্ত সময় ব্যতীত যাতে সুলতান—"ইমাদুদ্দীন—দীহান" নামক এক ব্যক্তি এবং তার দলবলের কান কথায় বলবন এবং তাঁর স্বজনদেরকে কিছু দিনের জন্যে রাজত্বের দায়িত্ব থেকে পৃথক করে দিল্লী পর্যন্ত পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। বলবন নাসিরুদ্দীনের শেষ জীবন পর্যন্ত সুলতানের বিশ্বস্ত ছিলেন এবং রাজকার্য স্বাধীনতার সাথে পরিচালনা করেন।

১২৬৬ খৃস্টাব্দে সুলতান নাসির উদ্দীনের ইন্তিকালের পর তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। একদিকে মুগলরা পাঞ্জাবের উপর আক্রমণ করছিল, যাদেরকে আলাউদ্দীন মাসউদের সময়ে তিনি পরাজিতও করেছিলেন। অন্য দিকে গিয়াস উদ্দীন বলবনের কঠোরতার কারণে নিজ দেশের অভ্যন্তরেই স্থানে স্থানে বিদ্রোহ এবং অবাধ্যতার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ছিল। বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরগণও বিদ্রোহী হলেন। গিয়াস উদ্দীন বলবন কঠোর হস্তে যে সব বিদ্রোহ দমন করেন।

মুগলরা বাগদাদ এবং নিশাপুরে যেসব ধ্বংসাত্মক কাজ করছিল তার মুকাবিলায় সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ এবং গিয়াসউদ্দীন বলবন এই দু'জনের কৃতিত্ব কম গুরুত্বের অধিকারী নয়। তাঁরা মুগলদেরকে ক্রমাগত পরাজিত করেন ফলে ভারতবর্ষ তাদের গণ্ডগোল এবং অত্যাচার থেকে সংরক্ষিত হয়ে গেল।

গিয়াস উদ্দীন বলবনের মধ্যে একটি উত্তম গুণ ছিল এই যে, তিনি সব কিছু দেখে শুনে ও চিন্তা-ফিকির করে পা ফেলতেন। একদা কয়েকজন আমীর গুজরাট এবং মালোহ এবং আরো কয়েকটি এলাকা যা' কুতুবউদ্দীন আইবেক ও ইলতুতমিশের সময়ে ইসলামী রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল, বর্তমানে বিদ্রোহরত, ঐগুলোর উপর আক্রমণের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বলবল আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অবস্থার পরিপেক্ষিতে দিল্লী ছেড়ে বাইরে যাওয়া সময়োপযোগী মনে করেননি, তাই তিনি আমীরদের আবেদন নাকচ করে দিলেন।

চরিত্র ও আচার-ব্যবহারের দিক থেকে গিয়াসউদ্দীন সার্বিকভাবে স্ববিরোধী প্রকৃতির ছিলেন। অর্থাৎ একদিকে তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার অবস্থা এমন ছিল যে, মুগলদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণের কারণে যে সব বাদশাহ ও শাহযাদা তুরস্ক মাওয়ারুন্নাহার, খুরাসান, ইরাক, আযার-বায়জান, পারস্য, রোম এবং শাম ইত্যাদি দেশ থেকে পর্যুদস্ত হয়ে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন, বলবন সবাইকে রাজনৈতিক আশ্রয় দান করলেন এবং তাঁদেরকে আমীরের পদ পর্যন্ত প্রদান করেন। তাদের মধ্যে দু'জন শাহযাদা খলীফা বনী আব্বাসী বংশের ছিলেন। তাঁরা রাজসিংহাসনে খুবই কাছাকাছি বসতেন। বলবনের অভ্যাস ছিল, এই প্রকার কোন আগন্তুক যখন তাঁর কাছে আশ্রয়প্রার্থী হতো তখন তিনি খুবই খুশী হতেন। তিনি তাদেরকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতেন। অনেক সময় এই সব অতিথিদের নামানুসারে কোন কোন মহল্লার নাম করণ পর্যন্ত করতেন। অতএব ঐতিহাসিক ফিরিশ্তা এইরূপ ১৫টি মহল্লার নাম তালিকাভুক্ত করেছেন। তাছাড়া উলামা, মাশায়েখ এবং জ্ঞানী গুণীদেরকে খুবই সম্মান প্রদর্শন করতেন। ওলামাদের প্রতি তাঁর এমন প্রগাঢ় হৃদ্যতা ও বিশ্বাস ছিল যে, ঐতিহাসিক ফিরিশ্তা বর্ণনা করেন, জুমার নামাযের পর তাঁদের বাড়ীতে যেতেন। শায়খ বুরহান উদ্দীন বালখী, মাওলানা সিরাজ উদ্দীন সানজুরী এবং মাওলানা নাজমুদ্দীন মুশ্‌ফেকীর মত বুযুর্গদের সঙ্গলাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। দুঃখিত ও চিন্তাযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশের প্রেরণা এমন ছিল যে, অনেক সময় মৃত ব্যক্তিদের জানাযায় অংশ গ্রহণের পর তাদের ঘরে যেতেন এবং মরহুমের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতেন এবং তাদেরকে বিপদে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতেন। ইয়াতীমদের লালন-পালনের জন্য বিরাট অংকের মুদ্রা বৃত্তি হিসেবে প্রদান করতেন। চলার পথে যদি কোথায় ও কোন ওয়াজ মাহ্‌ফিল দৃষ্টিগোচর হতো তৎক্ষণাৎ তথায় বসে যেতেন। ওয়াজে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আহকাম মনোযোগের সাথে শ্রবণ করতেন এবং সময় সময় কাঁদতেন।
("তারিখে ফিরিশ্‌তা, উর্দু অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ২৮৬ পৃঃ দ্রঃ)

এতদসত্ত্বেও তাঁর রাজত্বের মর্যাদা এবং রাজ্যের প্রভাব-পতিপত্তি ও জাঁকজমকতার প্রতি ও দৃষ্টি ছিল। এর পরিপেক্ষিতে কোন বিরোধী

এবং আইন শৃংখলার পরিপন্থী ব্যক্তিকে কোন প্রকারেই সহ্য করতেন না। বিদ্রোহী এবং আইন অমান্যকারীকে কঠিনতম শাস্তি প্রদান করতেন। অতএব শামসী পরিবারের যাদের প্রতি তাঁর শত্রু হওয়ার সন্দেহ হতো তাদেরকে কোন না কোন ভাবে হত্যা করে মারতেন। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ছোট বড় কারো প্রতি সামান্যতম অনুকম্পা ও প্রদর্শন করতেন না। প্রকাশ থাকে যে, একথা বাদাইউনের সুবাদার 'মালিক লাগিক' নামী এক রাজকীয় আমীর একজন 'তাবুসংরক্ষক'কে বেত্রাঘাত করে হত্যা করল। কিছুদিন পর বলবন যখন বাদাইউন গেলেন, তখন মৃত তাবু সংরক্ষকের স্ত্রী তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে বিচার প্রার্থী হলেন। বলবন তখন নির্দেশ দিলেন যে, সুবাদারকে ও বেত্রাঘাত করে হত্যা করে তাঁর লাশ মরহুমের বিধবা স্ত্রীর নিকট পাঠিয়ে দেয়া হউক। রাজকীয় নির্দেশ তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হল। আমীরের মৃত্যুর পর তার লাশ শহরের দ্বার প্রান্তে সর্ব সাধারণের উপদেশ গ্রহণের জন্য ঝুলিয়ে দেয়া হ'ল। (তারিখে ফিরিশ্তা-১ম-খণ্ড, ২৮৪ পৃঃ দ্রঃ (উর্দু অনুবাদ))

গিয়াসউদ্দীন বলবন কোন্ প্রকৃতির লোক ছিলেন? এবং তাঁর রাজ্যশাসন পদ্ধতি ই-বা-কেমন ছিল? তা এই ঘটনা থেকে বুঝা যাবে যে, একদা তিনি তাঁর সন্তানদের একত্র করে বললেন, "সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ 'বলতেন যে, আমি দু'বার মুয়েজউদ্দীন মুহাম্মদ বাহাউদ্দীন সাম' এর দরবারে সাইয়্যিদ মু'বারক গযনবীকে বলতে শুনেছি যে, বাদশাহদের অধিকাংশ কর্ম শিরকের সীমা পর্যন্ত পৌছে যায় এবং তাঁদের থেকে অধিকাংশ কর্ম-নবী করীম (সাঃ)-এর আদর্শের পরিপন্থী হিসেবে প্রকাশ পায়। কিন্তু এর উপর ও যদি এই চার বিষয়ে দুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে তাঁর চেয়ে অধিক অপরাধী আর কেহ নয়। তন্মধ্যে (১) প্রথম হল বাদশাহর উচিৎ নিজের প্রভাব প্রতিপত্তিকে যথাযথ স্থানে ও যথা সময়ে প্রয়োগ করা এবং সৃষ্টজীবের কল্যাণ ও আল্লাহ্'র ভয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়কে প্রাধান্য না দেয়া। (২) দ্বিতীয় হল কোন প্রকারেই কোন অন্যায় কাজকে রাষ্ট্রে প্রচলন হতে না দেয়া এবং সদা সর্বদা অপরাধী ও নির্লজ্জদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা। (৩) তৃতীয় হল রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম সদা বুদ্ধিমান এবং শান্ত প্রকৃতির

লোকদের কাছে ন্যস্ত করা। প্রজাদের প্রতিপালনের রাশি সদা বিশ্বস্ত এবং আল্লাহ্‌ভীরু লোকদের হাতে সমর্পণ করা। ভ্রান্ত-বিশ্বাসীদেরকে কখনও আপন দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে না দেয়া। (৪) চতুর্থ হল সদা ন্যায় বিচার করার পরিপূর্ণ চেষ্টা করা এবং অধীনস্থদের কর্মসমূহ ন্যায় বিচারের তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা, যেন দেশে অত্যাচার অবিচারের নাম গন্ধও না থাকে। অতঃপর স্বীয় সন্তানদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আমার কলিজার টুকরা। এ কথাটি তোমরা ভাল করে বুঝে রাখ যে, তোমাদের মধ্য হতে যদি কেহ কোন দুর্বল ও অসহায়ের প্রতি অত্যাচার কর, তবে আমি অত্যাচারীকে অবশ্যই শাস্তি দিব"।

গিয়াস উদ্দীন বলবনের সদয় অন্তকরণ এবং ন্যায় বিচারমূলক আচরণ কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। বরং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সমস্ত প্রজাদের সঙ্গে থাকতেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ ইশতিয়াক হোসাইন কুরেশী লেখেন, 'এই প্রসঙ্গে একটি মজার কথা আছে, একটি হিন্দু প্রবাদ বাক্য (মসজিদের মেহরাব অথবা পান্থশালার দ্বারে লেখা ছিল) পাওয়া গেল, যার কিছু অংশ সংস্কৃত এবং কিছু অংশ হরিয়ানা ভাষায় লেখা ছিল। এতেই বুঝা যায় যে, হিন্দুরা মুসলমান বাদশাহদেরকে কোন দৃষ্টিতে দেখতো অপর একটি প্রবাদ বাক্য ১২৮০-৮১ সনে সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সময়ের সাথে সম্পর্কিত ছিল। এতে মুসলান বাদশাহদের প্রশংসা করা হয়ে ছিল। বিশেষকরে বলবন সম্পর্কে লেখা ছিল যে, "এই বাদশাহের শান্তিপূর্ণ এবং নিরাপত্তামূলক রাজ্য শাসনের সময় কালে "ডিরাওঁয়াদী মুলুক' এবং 'রিশোরাম' ও গৌড় থেকে গযনী পর্যন্ত প্রত্যেক, স্থানের ভূমিতে শস্য-শ্যামল বসন্তের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হতো। তাঁর সৈন্যগণ শান্তি ও নিরাপত্তার যিম্মাদার ছিল। সুলতান স্বীয় প্রজাদের দেখা-শুনার দায়িত্ব ও কর্তব্য এমনভাবে পালন করতেন যে, মনে হতো যেন 'বিষ্ণু দেবতা' পৃথিবীর দেখা শুনার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। দুধের উপর যেন সোনার পুল পরিচালিত"। বলা হয় যে, বলবনের আমীর থাকাকালীন সময়ে মদ্যপানের অভ্যাস ছিল। কিন্তু রাজ সিংহাসনে আরোহণ

করার পর থেকে তিনি কোন দিনই মদ্যপানের মত এইরূপ প্রধান অন্যায় কাজ করেননি। বরং এরূপ জঘন্য অপরাধের নাম পর্যন্ত দেশ থেকে বিলুপ্ত করেছেন। সদা নিয়মিত নামায রোযার অনুসারী ছিলেন। ফরয ব্যতীত তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাস্তের নামাযও বাদ দিতেন না। সদা-সর্বদা অযুর সাথে থাকতেন। চল্লিশ বছর রাজত্ব করার পর ৬৮৫ হিজরীতে গিয়াস উদ্দীন বলবন ইন্তিকাল করেন। প্রাতঃকালে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য যখন তাঁর জানাযা শাহী মহল থেকে বের করে যাত্রা করা হল তখন রাজ্যের মন্ত্রীগণ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং রাজমহলের দাসগণ সকলই অশেষ দুঃখ ও ব্যথায় এমন কাতর হয়ে পড়েন যে, অনেকেই মাথাকোট্‌তে ছিল এবং কাপড় ছিড়তেছিল, কেহবা মাথায় মাটি লাগাচ্ছিল সকলেই কান্নারত। সবচেয়ে অধিক ব্যথিত মনে হচ্ছিল প্রধান মন্ত্রী ফখর উদ্দীনকে। বলা হয় যে, বলবনের মৃত্যুর পর ছয় মাস পর্যন্ত তিনি মাটিতেই ঘুমাতেন। দিল্লীতে এমন কোন লোক হয়ত বাকী ছিল না, যাঁরা দান-খায়রাত করে সুলতানের বিদেহী আত্মার উপর সাওয়াব পেঁছানোর চেষ্টা করেননি।

সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র কায়কোবাদ, যিনি বাংলার গভর্নর বুগরাখানের পুত্র ছিলেন, সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি খুবই অযোগ্য এবং বিলাসী ছিলেন। রাজ দরবারে সুন্দর সুন্দর সারিন্দা বাদক এবং গায়ক-গায়িকাদের ভিড় লেগে থাকতো। তাঁর সময়ে মদ্যপায়ী এবং তামাসাকারীদের প্রভাব ও সম্মান বৃদ্ধি পেতে লাগল।

'তাবকাতে আকবরী'র লেখকের বর্ণনা মতে "বিদ্রূপকারী রসিক স্ত্রী পুরুষ, গায়ক-গায়িকা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর দরবারে আগমন করতো। যেহেতু ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর লোকের অভাব নেই, সেইহেতু খেল্‌-তামাশাকারীদেরই প্রাধান্য বৃদ্ধি পেল। অন্যায় ও অপকর্মের দ্বার খুলে গেল। বাদশাহর দরবার সুন্দরী রমনী ও রূপশ্রী গায়ক-গায়িকা হাসী-খুশী মিষ্টভাষী রসিক নর-নারীর দ্বারা সদা সর্বদা পরিপূর্ণ থাকতো"।

পিতা বুগরাখান যখন এসব জানতে পারলেন, তিনি পুত্রকে শাস্তি প্রদানের জন্য দিল্লীতে সৈন্য প্রেরণ করলেন। কিন্তু যুদ্ধ করার সুযোগ

হয়নি। কারণ কায়কোবাদ পিতার উপদেশ অনুযায়ী জীবন-যাপনের অঙ্গীকার করলেন।

পিতার বাংলায় ফিরে আসার কিছুদিন পরও তিনি অঙ্গীকার অনুযায়ী কাজ করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে তিনি একটি ঘটনায় প্রভাবান্বিত হয়ে 'তওবা' (অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার) ভঙ্গ করলেন। অতঃপর পুনরায় আনন্দ-উল্লাস ও বিলাসিতায় বিভোর হলেন। পরিশেষে সাড়ে তিন বছর এমনিভাবে রাজ্য শাসন করার পর যখন তিনি "অর্ধাঙ্গ অবশ" রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন কয়েকজন তুর্কী তাঁকে হত্যা করলো। তৎপর সর্ব সম্মতিক্রমে পাঞ্জাবের গভর্নর জালাল উদ্দীন খালজী সিংহাসনে আরোহণ করেন। অমনিভাবে ৮৪ বৎসর রাজত্ব করার পর দাসবংশের পরিসমাপ্তি ঘটল এবং খালজী বংশের রাজত্ব শুরু হল।

"খালজী বংশ"

খালজীরা তাতারী বংশের ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে উত্তর ও পশ্চিম আফগানিস্তানে এসে বসবাস করছিল। তাবকাতে আকবরীর লেখক নিযাম উদ্দীন আহমদ বখশী বলেন যে, খালজীরা 'চেঙ্গীয-খানের' জামতা কালিজ খানের বংশ থেকে আগত। এই জন্য তাদেরকে কালিজী বলা হতো। (قالجی) শব্দের (الف) 'অধিক ব্যবহারের কারণে পড়ে গেছে এবং 'ق' অক্ষরটি 'خ' খা-অক্ষর দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে (خلجی) খালজী রূপ ধারণ করেছে। যা' হউক ভারতবর্ষে খালজী বংশের প্রথম বাদশাহ ছিলেন জালাল উদ্দীন। কায়কোবাদের নিহত হওয়ার পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় পাঞ্জাবের মুগলদের আক্রমণসমূহ প্রতিরোধ করতে ব্যয়িত হয়। অতঃপর বৃদ্ধকালে দিল্লীর সিংহাসন ভাগ্যে জুটল। কিন্তু জনগণ জালাল উদ্দীনের রাজ্য শাসন পছন্দ করতো না। এই জন্য তিনি 'কিলোখারী'তে অবস্থান করে সেখানে একটি নতুন 'নগর' পত্তন করেন এবং দিল্লীতে এসে রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হননি। কিন্তু তাবকাতে আকবরীর লেখকের বক্তব্য অনুসারে

বর্ণিত হয়েছে যে, যখন জনগণ জালাল উদ্দীনের আল্লাহ্‌ভীতি, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, ন্যায়-পরায়ণতা এবং অনুগ্রহশীলতা সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা শহর থেকে দলে-দলে তার নিকট এসে 'বায়আত বা আনুগত্যের শপথ করতে লাগল। তখন সুলতান খুবই জাকজমকতার সাথে এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে নগরে প্রবেশ করলেন। রাজমহলে উপস্থিত হয়ে ঘোড়া থেকে অবতরণ করলেন এবং দু'রাকাআত কৃতজ্ঞার নামায আদায় করলেন। অতঃপর রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়ার পর বললেন, "আমি ষোল বছর আগে এই সিংহাসনের অধিকারী হয়েছি, কিন্তু দীর্ঘদিন পর আজ এটার উপর পা রাখলাম। আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহের জন্য আমি কিভাবে শুকরীয়া আদায় করতে পারি?

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জালালউদ্দীন খুবই পুণ্যবান, শান্ত প্রকৃতির এবং ধৈর্যশীল ছিলেন বাদশাহ হওয়ার পর ও তাঁর বাল্যকালের ঘটনা স্মরণ ছিল। সুতরাং যখন তিনি ধনাগারে সিংহাসন আরোহণের আনুষ্ঠানিক কার্যাদি সম্পন্ন করার পর গিয়াস উদ্দীন বলবনের 'বিশেষ মহলের' (মতিমহলের) দ্বারে উপনীত হলেন, তখন প্রাচীন কালের রীতি অনুসারে খালি পাঁয়ে গমন করলেন। উমদাতুল মুলক্, মালিক আহমাদ বারবাক তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বললেন, এখন তো এই 'বিশেষ রাজমহল' (মতি মহল) আপনারই তবে এর সম্মানার্থে ঘোড়া থেকে অবতরণ কি সমীচীন হয়েছে? সুলতান উত্তরে বললেন, "আপন প্রভুর দানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা অত্যাবশ্যক। মালিক আহমাদ অতঃপর বললেন, সুলতানকে তো এই বিশেষ মহলের মধ্যেই রাজধানী স্থাপন করা চাই। সুলতান প্রতি উত্তরে বললেন, এই বিশেষ মলটি সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন তাঁর রাজত্বকালে তৈরী করে ছিলেন। এখন এর মালিক তাঁর সন্তানগণ। এতে আমার কোন অধিকার নেই। মালিক আহমদ উত্তরে বললেন, রাজকার্যে এত সতর্কতা অবলম্বনের সুযোগ কোথায়? সুলতান তখন বললেন, "আমি-তো শুধু কিছু দিনের জন্যে রাজ্যের কল্যাণার্থে আছি। সুতরাং কি করে' আমি ইসলামের আদেশ-নিষেধ থেকে বিমুখ হবো এবং বাস্তবের পরিপন্থী কাজ করবো"? "জ্ঞানী

ব্যক্তিরা ইহকালের বিনিময়ে পরকালকে জলাঞ্জলি দিতে পারে, এমন সিদ্ধান্ত কি কখনও 'বুদ্ধি' অথবা 'শরীয়ত' দিতে পারে" ?

জালাল উদ্দীনের সিংহাসন আরোহণের দ্বিতীয় বছর সুলতান বলবনের ভাতিজা মালিক 'জাহজো' বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এবং খুতবা ও রাষ্ট্রীয় 'সীলমোহরে' নিজের নাম প্রচলন করে সুলতান মুগিছুদ্দীনের নামে রাজত্ব করতে লাগলেন। অনেক আমীর উমারাও তাঁর সহযোগী হলেন। তখন তিনি দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করলেন। সুলতান জালাল উদ্দীন আপন সন্তান "আকবর খানে খানান" দিল্লী শহরে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে' 'মালিক জাহজো' এর মুকাবিলার জন্য নগর থেকে বের হলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর শত্রুকে পরাজিত করলেন এ অধিকাংশ আমীর ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে গ্রেফতার করে রাজদরবারে পাঠিয়ে দেয়া হল। মালিক 'জাহজো'কেও বন্দী করে রাজদরবারে উপস্থিত করা হল। সুলতান সকলকেই মুক্তি দিয়ে দিলেন। এমনকি তা'দের মধ্যে কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তিকে যাঁরা সুলতান বলবনের নিকট বিশেষ পদ-মর্যাদায় ছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন যে, তাঁদেরকে হাম্মাম খানায় নিয়ে গোসল করায়ে বিশেষ পোশাক পরিধান করায়ে আতর প্রদান করা হউক। তাঁরা সুলতানের এইরূপ অপরিসীম অনুগ্রহে অতিশয় লজ্জিত হলেন। লজ্জায় তাঁদের মুখে থেকে একটি কথাও বের হল না। সুলতান তাঁদের এই অবস্থা দেখে বললেন, "আপনারা আপন প্রভুর হক আদায় করতে যেয়ে অস্ত্র ধারণ করেছেন, এটা কোন দোষের কথা নয়।

সুলতান "মালিক জাহজো'কে পাল্কীতে আরোহণ করায়ে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকেও সসম্মানে তথায় পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তৎসঙ্গে তাঁদের আনন্দ-উল্লাসের যাবতীয় উপকরণে ব্যবস্থা করতে ও আদেশ দিলেন। মালিক আহমদ এবং অন্যান্য আমীরগণ বললেন যে, মালিক জাহজো এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সবাইকে হত্যা করা অত্যাবশ্যক ছিল। এমন বিদোহীদের সঙ্গে সদয় ও অনুগ্রহশীল হওয়া রাজ্য শাসননীতির পরিপন্থী। সুলতান প্রতি উত্তরে বললেন, "রাজ্য শাসনের ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য যথার্থ। কিন্তু আমার ৭০ সত্তুর বছর কাল মুসলমানীর জীবনে কখনও কোন মুসলমানের অনর্থক রক্তপাত করিনি। তবে এখন

কি এই বৃদ্ধ বয়সে কোন মুসলমানের রক্তপাত করতে পারি ? (তাবকাতে আকবরী' ১২১ পৃঃ দ্রঃ)

সুলতান ৬৮৯ হিজরীতে 'নাথাবোর' দুর্গ বিজয়ের উদ্দেশ্যে সৈন্য প্রেরণ করলেন। রাজা দুর্গের ফটক বন্ধ করে ভিতরে অবস্থান করতে লাগলেন। কয়েকদিন, দুর্গ অবরোধ করে রাখার পর সুলতান সৈন্যদেরকে ফেরত আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, "এই দুর্গ এমন গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, ইহা জয় করার জন্য একটি জীবন ও উৎসর্গ করা যায়। যদি আমি এই দুর্গ জয় করি এবং এর কারণে আল্লাহ্‌র বান্দাদের কোন একটি জীবন ও নষ্ট হয়, তবে কাল যখন মেয়েরা বিধবা হয়ে এবং সন্তানরা ইয়াতীম হয়ে আমার সামনে আগমন করবে, তখন আমার কি অবস্থা হবে ? দুর্গ জয়ের সমস্ত অপবাদ ও অপমান আমার কাছে 'বিষ' থেকেও অধিক তিক্ত হয়ে যাবে। ("তাবকাতে আকবরী', ১ম খন্ড ১২৭, ১২৮ পৃঃ দ্রঃ)

একদা সুলতান মনে করলেন যে, আমি তো মুগলদের সাথে বহু যুদ্ধ করেছি এবং বিজয়ী ও হয়েছি। তবে কোন খুতবায় আমাকে المجاهد في سبيل الله "আল্লাহর পথে মুজাহিদ" উপাধিতে স্মরণ করা হয় না ! সুতরাং তিনি আপন "সম্রাজ্ঞী "জাহান" (মালেকা জাহান) কে বললেন, যখন কোন ব্যাপারে রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রাজ প্রাসাদে আগমন করেন, তখন যেন বেগম সাহেবা তাঁদেরকে বলে দেন যে, তাঁরা যেন উল্লিখিত উপাধিতে আমাকে সম্বোধন করেন এবং এ ব্যাপারে আমার অনুমতি নেন। কিন্তু যখন এর স্বীকৃতি অনুসারে তৎকালের বিখ্যাত জ্ঞানী কাযী ফখর উদ্দীন রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধিত্ব করে সুলতানের সামনে এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন সুলতানের 'হুস' হল এবং তিনি বললেন, "আপনারা তো আমার কথামত "সম্রাজ্ঞী জাহানের ইঙ্গিতে এই কথা বলতেছেন। কিন্তু আমার তখন ধারণা ছিল না যে, আমি আল্লাহ্‌র শত্রুদের সঙ্গে যতটি যুদ্ধ করেছি তম্মধ্যে কোন যুদ্ধই পার্থিব উদ্দেশ্য সাধন ব্যতীত শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেনি। এখন

আমার মধ্যে এই ধারণা জাগ্রহ হ'তেই আমি আমার উল্লিখিত অভিপ্রায়ের উপর লজ্জিত হলাম। এবার আমি আমার পূর্ব ইচ্ছা প্রত্যাহার করলাম”

এই সব ঘটনাবলী থেকে অবশ্যই বুঝায় যে, সুলতান সভাবতঃই অনুগ্রহশীল, পুণ্যাত্মা ও নরম প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু এটা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁর এই নম্রস্বভাব অনেক সময় অস্থানে অপপ্রয়োগ হতো। সুতরাং এ সম্পর্কে নিযাম আহমাদ বখ্‌শী বর্ণনা করেন যে,

در جرائمے کہ از نزدیکان او بوقوع آمدے ہیچ یک را اذیت و بلر نفرمودے و ہرکرا جاگیر دادے ہرگز تغیر نہ کردے ۔

“বাদশাহর নিকটতম বন্ধু বান্ধবদের নিকট থেকে যে সেব অন্যায় কার্য প্রকাশিত হতো এর জন্য তিনি তাদেরকে কোন প্রকার শাস্তি দিতেন না। যে কোন সময় থাকে ইচ্ছে জায়গীর' দিয়ে দিতেন এবং তা' কখনও তার নিকট হতে আর ফেরত নেয়া হতো না।

এরূপ অপরিসীম নম্র স্বভাবের ফলে দেশের মধ্যে গণ্ডগোল ও বিশৃংখলা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং নাগরিক জীবনের শান্তি ও নিরপত্তা বিনষ্ট হল। চোর-ডাকাতদেরকে গ্রেফতার করে সুলতানের দরবারে উপস্থিত করা হলে সুলতান তাদেরকে কোন প্রকার শাস্তি না দিয়ে শুধু ভবিষ্যতে চুরি না করার অঙ্গীকার নিয়ে মুক্তি দিয়ে দিতেন। মদ্যপায়ীরা মদপান করে মাতাল অবস্থায় সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-মূলক কথাবার্তা বলতো। সুলতান এই সব কিছু অবগত হওয়া সত্ত্বেও ইহাতে কোন গুরুত্ব না দিয়ে বলতেন, ওরা মাতাল অবস্থায় এসব কথা বার্তা বলেছে, তাই এর কোন গুরুত্ব নেই। অন্যান্য লোক যারা প্রকাশ্যে সুলতানের দুর্নাম করতো, তাদেরকে গ্রেফতার করে রাজ দরবারে উপস্থিত করা হলে সুলতান তাদেরকে শুধু মুক্তিই দিতেন না, বরং তাদেরকে উপঢৌকন দিয়ে সম্মান প্রদান করতেন। এমনকি এক ব্যক্তি ‘মান্দাহারী, জালাল উদ্দীনের গভর্নরীর সময়ে ‘সামানা’র মুখমণ্ডলে এমন এক আঘাত করল যে, উহার দাগ তার শেষ জীবন পর্যন্ত ছিল। কিন্তু তাসত্ত্বেও জালাল উদ্দীন বাদশাহ হওয়ার পর

যখন এই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে রাজ দরবারে আনা হল, তখন সুলতান তার সাথে ও ঐ ব্যবহারই করলেন।

এটা খুবই আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে, একদিকে তো জালাল উদ্দীন বলতেন "কয়েক দিনের রাজত্বের জন্য আমি শরীয়তের আদেশ-নিষেধ থেকে বিমুখ হব কি করে? আর অন্য দিকে তাঁর শাহী মহলে মদ্য পানের চক্কর চলছিল। সুন্দর ও সুদর্শন কিশোর ,এবং প্রমোদকারীদের দ্বারা আসর সরগরম থাকতো। বিখ্যাত কবি আমীর খসরু প্রতিদিনই একটি নতুন 'গযল' লিখে আনতেন এবং বাদ্যযন্ত্রের তালে তাল মিলিয়ে শুনাতেন। (১) আমীর খসরু নিম্নের কবিতাটি সম্ভবতঃ জালাল উদ্দীনকে সম্বোধন করেই বলেছিলেনঃ—

گلستانیست خاک آستانت ز رخ خوبان -
که مرغ ای گلستان خسرو سحر البیان امد -

"তোমার রাজ দরবারের সুন্দরী রমণীদের চেহারা যেন প্রস্ফুটিত ফুলের বাগান। আর খসরু যেন ঐ বাগানের সুমিষ্ট গায়ক এক পাখি।

রিয়াজ উদ্দীন বারণী খুবই সুন্দরভাবে তাঁর আসরের বর্ণনা দিয়েছেন। বাদশাহর সীমাহীন নম্র স্বভাব এবং তাঁর মাজলিসের সমালোচনা যখন সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ল তখন জন সাধারণের মধ্যে তাঁর প্রতি বিরূপ ভাব সৃষ্টি হয়ে গেল। আর তারা প্রকাশ্যে বলতে লাগলো "এই ব্যক্তি রাজ্য শাসনের অনুপযুক্ত"। এমন সময় এমন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল যে, সাইয়েদী মাওলা নামক একজন খুবই বুযুগ ছিলেন। দিল্লীতে তাঁর একটি বড় খানকা ছিল। তাঁর প্রতি বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের সন্দেহ হওয়ায় বাদশাহর ইঙ্গিতে তাঁকে অতি নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় সমগ্র দেশে যেন আগুন লেগে গেল।

একদিকে তো জালাল উদ্দীন সম্পর্কে বিভিন্ন দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ায় তাঁর প্রতি জনগণের আস্থা ছিল না এবং অন্যদিকে বাদশাহর ভাতিজা আলাউদ্দীন খালজী বিভিন্ন বিজয় অর্জন করে শক্তি সঞ্চয় করছিল। এমনকি একটি পরিপূর্ণ ও গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি চাচাকে

"কুররা' তে আমন্ত্রণ জানালেন এবং তথায়ই অতি নির্মমভাবে গোধুলী লগ্নে জালাল উদ্দীনের রোযা থাকা অবস্থায় তাঁকে হত্যা করলেন। তাঁর খণ্ডিত মস্তক একটি বল্লমের অগ্রভাগে বিদ্ধ করে সমস্ত শহরের অলি-গলিতে চক্কর দেয়া হল। জালাল উদ্দীনের রাজ্য শাসনকাল ছিল সাত বছর চার মাস।

(তারিখে-ফিরিশ্তা' ১ম-খণ্ড, ৩৫২ পৃঃ দ্রঃ)

এই ঘটনা ৬৯৫ হিজরীতে রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

জালাল উদ্দীনের বেগম 'মালেকা জাহান, (সম্রাজ্ঞীজাহান) সেই সময় কুটনীতে কাজ করলেন। শাহ্‌জাদা 'আর কলি খান' সেই সময় মুলতান ছিলেন। বেগম নিজের ছোট ছেলে রুকুনুদ্দীন্ ইবরাহীমকে অনভিজ্ঞ ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকা সত্ত্বেও এবং রাষ্ট্রের মন্ত্রীবর্গ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শ ব্যতীতই রাজ সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। 'আর কলি খান' যিনি জালাল উদ্দীনের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সর্বদিক দিয়ে উপযুক্ত ছিলেন, ছোট ভাইয়ের সিংহাসনে আরোহণের সংবাদ পেয়ে মুলতানেই রয়ে গেলেন। আর এমনিভাবে দিল্লীর অবস্থা এক জন সংকীর্ণ বুদ্ধির মহিলার জিদ্দের কারণে অতি খারাপ হয়ে গেল।

আলাউদ্দীন খালজী

আলাউদ্দীন খালজী যখন উল্লিখিত অবস্থা অবগত হলেন তখন তিনি দিল্লী আক্রমণের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করলেন। সুতরাং এতদ অঞ্চলের দুটি প্রবাহমান নদী 'গঙ্গা' ও 'যমুনা' যেমন অফুরন্ত দানে সকলকে ধন্য করে, ঠিক এমনিভাবে আলাউদ্দীন স্বীয় শক্তি সামর্থ্য এবং সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করলেন। পরিশেষে দু'তিনটি ছোট-খাট যুদ্ধের পর ২২শে-যিলহাজ্জ, ৬৯৫ হিজরী, মুতাবিক ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিজয়ীর বেশে-নগরে প্রবেশ করলেন এবং রাজসিংহাসনে আরোহণ করলেন। সেই সময় বিজয় উৎসব উপলক্ষে শহরকে যেভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছিল, এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ফিরিশ্তা-নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়েছেন। "সিংহাসনে আরোহণ করার পর বাদশাহ 'বিশেষমহল (মতিমহল)টিতে প্রবেশ করলেন এবং উহাকে স্বীয় রাজধানী করে তিন দিন পর্যন্ত আনন্দ উল্লাস ও বিজয়

উৎসবে লিপ্ত রইলেন। জনগণ ও শহরের সাজসজ্জা ও আনন্দ উল্লাসের আসরে অংশগ্রহণ করল। নগরের প্রতিটি অলিগলিতে মদের ব্যবস্থা করা হল। খেলা-তামাশা ও আনন্দ উল্লাসের ব্যবস্থা করা হল। বাদশাহ ও-প্রাচুর্যের অহমিকায় এবং যৌবনের মত্ততায় বিভোর হয়ে এমন আনন্দ উল্লাসের ব্যবস্থা করলেন যে, জনগণ এতে উল্লাসিত হয়ে নিরপরাধ জালাল উদ্দীনের হত্যাকাণ্ডের ব্যথা অন্তর থেকে ভুলে গেল।"

একদিকে অজানা অচিনাদের সাথে তাঁর এমন অমায়িক ও দানশীলতার ব্যবহার ছিল যে, আমীরদেরকে বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত করে এবং রাজ্যের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদেরকে পদোন্নতি দিয়ে এবং টাকা পয়সার বৃষ্টি বর্ষণ করে' স্বীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্র শস্য শ্যামল করে তুললেন। কিন্তু অপরদিকে স্বীয় পুণ্যবান এবং বর্ষীয়ন সম্মানিত চাচার সঙ্গে-ও তাঁর দুছেলে 'আরকলি খান' এবং রুকুনুদ্দীন ইবরাহীম ও তার জামাতা 'আলুগোখান' এর সাথে তিনি যে রক্তপিপাসু পশুর মত আচরণ করলেন, তা' ভুলার নয়। তিনি প্রথমতঃ তাঁদের চক্ষু সেলাই করে অন্ধ করলেন, অতঃপর 'হাঁসী' দুর্গে নযর বন্ধী করে রাখেন এবং আরকলীখানের দুছেলেকে হত্যা করেন। ইহা ব্যতীত তিনি জালাল উদ্দীন খানের বেগমদেরকে-এবং 'মালেকাজাহান' কেও দিল্লীতে এনে নযর বন্ধী করে দেন। তৎপর মজার ব্যাপার হল বাদশাহ জালালের রাজত্ব কালে যে সব আমীর ওমরা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জালাল উদ্দীন খালজীর সন্তানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ছিল। আলাউদ্দীনের সিংহাসন সুদৃঢ় হওয়ার পর তিনি তাদের প্রতি ও ক্ষমা করেননি। তাদেরকে প্রথমতঃ গ্রেফতার করে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি প্রদান করেন। পরিশেষে তাদের একের পর এককে হত্যা করে তাদের বংশের নাম নিশানা পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হ'তে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। তাদের মাল-সম্পদ রাষ্ট্রায়াত্ত করে প্রায় এককোটি টাকা রাজকোষে জমা করা হল।

আলাউদ্দীনের রাজত্বের প্রথম দু'বছর মুগলদের সাথে যুদ্ধে অতিবাহিত হয়। তিনি তাদেরকে পরাজিত করে' পাঞ্জাব থেকে বহিষ্কার করে দেন। তৃতীয় বছর তিনি গুজরাটের উপর আক্রমণ করেন। তথাকার

রাজা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালায়ন করলেন। তাঁর অধিকৃত অঞ্চল আলাউদ্দীনের রাজ্যের অন্তর্গত হয়ে গেল। এই যুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে তিনি রাজপুতদের দিকে ধাবিত হলেন। মুসলমানগণ যখন উত্তর ভারতবর্ষ অধিকার করে ছিলেন তখন বহু রাজপুত আমীর আপন ছেলে মেয়ে এবং মাল-সম্পদ নিয়ে রাজপুতানায় পালায়ন করে এসেছিল। আর এখানে তারা ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। অতঃপর নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য তারা একটি সম্মিলিত প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করেছিল। এর প্রধান সেনাপতি ছিলেন চিতোরের রানা। “রান্তাবোর” দুর্গ জয় করে এখানকার লোকদেরকে সাধারণভাবে হত্যা করার পর তিনি চিতোর আক্রমণ করলেন। কিন্তু ছয় মাস পর্যন্ত তা অবরোধ করে রাখার পর ও বিজয়লাভ সম্ভব হয়নি পরিশেষে কয়েকটি শর্তের উপর সন্ধি হল।

আলাউদ্দীনের রাজত্বকাল ছিল বিশ বছর। এই সময়ে তিনি সৈন্যদের যোগ্যতা ও দক্ষতা এবং বিভিন্ন বিজয়ের কারণে স্বীয় রাজত্বের পরিধি-এত বিস্তৃত করেছিলেন যে, নিজের অগ্রগামীদেরকেও অতিক্রম করে গেলেন।

আলাউদ্দীনের অহমিকা এবং আমিত্ব

আলাউদ্দীনের বিভিন্ন রাজ্য বিজয়ের ফলে তাঁর মধ্যে অহমিকা ও আমিত্বের ভাব সৃষ্টি হল। সুতরাং তিনি নিজে দ্বিগজয়ী “দ্বিতীয় আলেকজান্ডার” উপাধি ধারণ করলেন এবং নির্দেশ জারি করলেন যে, রাষ্ট্রীয় সীলমোহরে এবং চিঠি পত্রে তাঁর নামের সঙ্গে ঐ উপাধিটিও সংযোজন করতে হবে। দ্বিগজয়ী দ্বিতীয় আলেকজান্ডার হওয়ার আগ্রহে তিনি ইচ্ছা পোষণ করলেন যে, ভারতবর্ষ থেকে বের হয়ে প্রথমে খুরাসান, মাওয়ারান্নাহার, এবং তুরস্ক জয় করলেন। তৎপর আরো অগ্রসর হয়ে রোম, পারস্য, ইরাক আরব ও আজম, শাম এবং হাবশা ইত্যাদি ও স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

এক দিকে তাঁর মস্তিষ্কে রাজ্যজয় ও রাজ্যশাসনের চিন্তাধারা চক্কর খাচ্ছিল এবং অন্য দিকে যেহেতু তিনি অশিক্ষিত, নিরক্ষর ও ধর্মীয় বিষয়ে অজ্ঞছিলেন সেই হেতু তাঁর মাথায় এক পাগলামী চিন্তাধারা ঢুকল। তিনি মনে করলেন যে ভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজ প্রভাব প্রতিপত্তি ও শক্তি সামর্থ্য দিয়ে

একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাঁর চারজন খালীফা দ্বারা উহাকে সুদৃঢ় করেছিলেন, এমনি ভাবে তিনিও একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করবেন। নিজের সহচর ও উপদেষ্টাদের সাহায্যে উহার প্রচলন করবেন। আলাউদ্দীন ভেবে ছিলেন যে, যদি তিনি ইহাতে সফলকাম হতে পারেন, তবে তাঁর নাম সমগ্র বিশ্বে ‘মহা প্রলয় দিবস’ পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে।

ইহাতেই অনুমান করা যায় যে, আলাউদ্দীন যা কিছু করতে ছিলেন, তাতে সঠিক ধর্মীয় প্রেরণার স্থান ছিল না। বরং তাঁর কৃতিত্ব অর্জন ও বিভিন্ন রাজ্য জয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। নিজের প্রসিদ্ধি লাভ এবং ধন-সম্পদ আহরণ করা।

আলাউদ্দীন বহু বিজয়ে সম্রাট আকবরেব সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিলেন। কিন্তু পার্থক্য ছিল শুধু এই যে, সৌভাগ্য ক্রমে ‘আলাউল মুলুকের মত যোগ্য ‘কোতোয়াল’ এবং ‘কাযী মুগীছের’ মত সভ্যভাষী ও সত্য প্রিয় লোক তাঁর ভাগ্যে জুটে ছিল। তাদের দ্বারা আলাউদ্দীন স্বীয় ভ্রান্ত বিশাস ও বিভ্রান্তি থেকে সাবধান হয়ে গেলেন এবং নতুন ধর্ম প্রবর্তনের অপকর্ম থেকে মুক্তি পেলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলাউল মুলক জীবন হাতে নিয়ে অবিচারী ও অত্যাচারী বাদশাহর সামনে যে সত্য ভাষণ দিয়েছিলেন, এর সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

“শরীয়ত ও ধর্মের সম্পর্ক তো নবীদের সঙ্গেই শুধু সম্পর্কযুক্ত। তাঁদের ধর্ম আসমানী প্রত্যাদেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নবুওতের পদ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। আপনার নতুন ধর্ম প্রবর্তনের কথা শুনে সমাজের সাধারণ ও অসাধারণ সকল শ্রেণীর লোকই আপনার প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে এবং আপনাকে পরিত্যাগ করবে। রাজ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। জাঁহাপনার জানা আছে যে, চেঙ্গিজখান এবং তাঁর বংশধরগণ বহু বছর চেষ্টা করেও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্ম নিশ্চিত করে হাজার বছর পর্যন্ত তুরস্কের প্রচলিত নিজ ধর্ম টিকাতে পারেনি এই উদ্দেশ্যে তিনি লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হল না। পরিশেষে তারা নিজেরাই মুসলমান হয়ে গেল। (“তারিখে ফিরিশ্তা” ১ম খণ্ড, ২৬৫, ২৬৬ পৃঃ দ্রঃ)

আলাউল মুলকের স্পষ্ট ভাষণে বাদশাহর অন্তরে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। তিনি খুব চিন্তা-ফিকিরের পর বললেন, "আপনি যা বললেন, তা যথার্থ ও বাস্তব। অতঃপর এই ধরনের কথা বার্তা আর কোন দিন আমা থেকে প্রকাশিত হবে না।"

("তাবকাতে আকবরী" ১ম খণ্ড, ১৪৫ পৃঃ দ্রঃ)

অতঃপর আলাউদ্দীন বললেন, "যা হউক আমার দ্বিতীয় ইচ্ছা অর্থাৎ বিশ্বজয়ের ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি? আলাউল মুলক বললেন, "বাদশাহর দ্বিতীয় চিন্তাধারা যথার্থ ও ঠিক। কেননা বর্তমানে আপনার শ্রেষ্ঠ বীরত্বের কারণে যে গুরুত্ব উপলব্ধি করতেছেন, ইহা অন্যান্য বাদশাহগণ ও গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আপনার যে শক্তি-সামর্থ্য ও ধন-ভাণ্ডার এবং সৈন্য-সামন্ত অর্জিত হয়েছে এর দ্বারা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধা করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু এই যে, যখন জাঁহাপনা রাজ সিংহাসন ছেড়ে অন্যান দেশের উপর আক্রমণ করবেন এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত পরদেশে অবস্থান করবেন, তখন এখানে এমন কোন আমীর আছেন কি যিনি জাঁহাপনার অনুপস্থিতে রাজকার্য পরিচালনা করতে পারবেন? তাছাড়া যখন বাদশাহ কোন দেশ বিজয়ের পর তথায় স্বীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত করে অন্য কোন দেশের দিকে ধাবিত হবেন, তখন কে জানে এই প্রতিনিধি রাজধানীর প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকে কিনা? আলাউলমুলক এ কথাও বললেন যে, জাঁহাপনাকে দ্বিগিদ্বজয়ী "আলোকজাণ্ডার" এর চিন্তা ভাবনা না করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা আলেকজাণ্ডারের রাজত্ব কালে বিশ্বাস ঘাতকতা নিমক হারামী (অকৃতজ্ঞতা) এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের অস্তিত্ব খুব কমই ছিল। তৎপর ও এরিষ্টটলের মত বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও মহাজ্ঞানী মন্ত্রী তার ভাগ্যে জুটে ছিল। তার ক্ষমতা ও সুব্যবস্থাপনায় বিজিত দেশসমূহের কাজকর্ম বিঘ্নিত হতো না।"

আলাউদ্দীন খালজী এই ভাষণ শুনে জিজ্ঞেস করলেন যে, আচ্ছা যদি আমি রাজ্যজয়ের আশা পরিত্যাগ করি এবং শুধু দিল্লীর রাজত্বের উপরই সন্তুষ্ট থেকে বসে থাকি, তবে আমার অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত এবং পরিপূর্ণ ধন-ভাণ্ডার কি কোন কাজে আসবে।"

আলাউলমুলক প্রতি উত্তরে বললেন, বর্তমানে এমন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জাঁহাপনার সামনে বিদ্যমান আছে যে, সমস্ত সঞ্চিত সম্পদ এতে ব্যয়িত হতে পারে। প্রথমতঃ উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতবর্ষের সীমান্তের কিছু শহর জয় করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল মুগলদের প্রতিহত করা। এই দুটি বিষয়ের নিষ্পত্তি করে জাঁহাপনাকে শান্তিতে রাজধানীতে অবস্থান করাই বাঞ্ছনীয়। অতঃপর বিশ্বস্ত ও যোগ্য গভর্নর-দেরকে বিজয়ের উদ্দেশ্যে চতুর্দিক প্রেরণ করতে পারেন।

পরিশেষে আলাউলমুলক বললেন, "এই সমস্ত কাজ সেই সময় সম্ভব, যখন জাঁহাপনার মদ্যপান বিলাসীর জীবন-জাপন এবং শিকার ও প্রমোদ ভ্রমণ কম করে নিজেই ঐসব কাজের তত্ত্বাবধান করবেন।

আলাউদ্দীন খালজীর উপর এই সারগর্ভ ভাষণের বিরাট প্রতিক্রিয়া হল। তিনি আলাউলমুলকের সঠিক সিদ্ধান্ত এবং সুন্দর ব্যবস্থাপনার ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁকে বহু মূল্যবান উপঢৌকন ও সম্মান প্রদর্শন পূর্বক ধন্য করলেন। যে সব আমীর-উমরা এই বিশেষ সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও এই ভাষণ শুনে এত খুশী হলেন যে, তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই আলাউলমুলককে এক হাজার টাকা এবং দুটি ঘোড়া উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করলেন। হযরত শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়া আলাউদ্দীনের অহমিকা এবং তার পথ ভ্রষ্টতার সংবাদ শুনে খুবই চিন্তিত ও ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি যখন আলাউলমুলকের সত্য ভাষণের সংবাদ শুনেতে পেলেন তখন খুবই আনন্দিত হলেন এবং আলাউলমুলকের কল্যাণের জন্য আল্লাহর দরগায় প্রার্থনা কবলেন।

('তারিখে ফিরিশ্তা' ১ম খণ্ড ৩৬৬, ৩৬৭ পৃঃ দ্রঃ)

এরূপ আর একটি ঘটনা আলাউদ্দীন খালজী এবং কাজী মুগিছের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। উভয়ের কথোপকথন যদি ও দীর্ঘ কিন্তু আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এর কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। এতে পাঠকগণ ধারণা করতে পারবেন যে, একজন অতি অত্যাচারী শাসকের সামনেও সত্যবাদী আলেমগণ কেমন নির্ভয়ে কথোপকথন করতেন এবং রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্মের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনায় তাদের কতটুকু আধিপত্য

ছিল। ঐতিহাসিক ফিরিশ্‌তা বর্ণনা করেন যে, "যখন বাদশাহর কর্মচারীদের দরখাস্তসমূহ বাদশাহর সামনে পেশ হতে লাগলো তখন প্রয়োজনের তাগিদে বাদশাহকে ও কিছু লেখা পড়া করার জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বাধ্য করল। আলাউদ্দীন পারস্পারিক সাহায্য সহযোগিতায় কতটুকু যোগ্যতা অর্জন করলেন যে, টুটাফাটা চিঠি-পত্র সহজেই পড়তে শিখলেন। অতঃপর বাদশাহ ফার্সী ভাষার কয়েকটি পুস্তক পাঠ করে আলেমগণের সঙ্গে মাঝে মধ্যে ফার্সীর শব্দ এবং বাক্য ও প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। এই অবস্থায় উপনীত হয়ে বাদশাহর ভ্রান্ত বিশ্বাস ঠিক হয়ে গেল এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, আলিম, কাযী এবং মুফতীগণের উদ্দেশ্য সৎ এবং তাদের অভ্যন্তর খুবই পবিত্র। তারা পার্থিব লোভ-লালসায় আকৃষ্ট হয়ে নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া 'মাস্‌আলা' (ধর্মীয় বিষয়ের সমস্যার সমাধান) বর্ণনা করেন না। তখন থেকে বাদশাহ মাঝে মাঝে আলেমগণের সঙ্গে বসতেন এবং তাদের নিকট থেকে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। সুতরাং একদা বাদশাহ 'কাযী-মুগীছ বয়ানুবী'কে লক্ষ্য করে বললেন, "আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই। যেহেতু বাদশাহর সারাজীবনে কখনও আলিমদের সঙ্গে কথোপকথন করতেন না এবং সদা সর্বদা তাদেরকে 'ফাকিবায' ও 'বাহানাকারী' মনে করে তাদের সঙ্গে কোন বিষয়ে পরামর্শ করার ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেন না, সেইহেতু বাদশাহর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী সম্বোধনে কাজী সাহেব ভীত হলেন এবং করজোড়ে বিনীতভাবে বললেন, "বাহ্যিকভাবে তো মনে হয় যে, আমার শেষ সময় হয়ত উপস্থিত। কাজেই ভাল ছিল যে, জাহাপনা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে কষ্ট না উঠায়ে বরং রাজকীয় কোন কর্মচারীকে নির্দেশ দেয়া হউক যে, আমার শিরশ্ছেদ করে ফেলুক। কেননা যা' কিছু আপনি জিজ্ঞেস করবেন, যদি উহার সঠিক উত্তর দেয়া হয়, তবে হয়তঃ উহা আপনার বিপক্ষে হবে, তখন এর কারণে আমার মৃত্যুও হতে পারে। আর যদি আমি জাঁহাপনার মর্জি ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী বে-ঠিক উত্তর দেই, তবে কালকে যখন আপনি অন্য কোন আলিমের নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, তখন

তার বক্তব্য যদি আমার বক্তব্যের সততা প্রমাণ না করে, তবে তো মিথ্যা বর্ণনার অপরাধে আমাকে জবাব দিহি করতে হলো। আর এর পরিণাম ও ধ্বংস। ইহা শ্রবণ করে বাদশাহ হাসলেন এবং বললেন, যা কিছু আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করবো, আপনি উহার শরীয়ত সম্মত উত্তর প্রদান করবেন এবং এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে' বাস্তবিকই আপনার কোন ক্ষতি হবে না। অতঃপর আলা উদ্দীন খালজী কাযী সাহেবকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন।

প্রথম প্রশ্ন ছিলঃ— "শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন হিন্দুকে 'যিম্মী' কিংবা 'জিযিয়া' প্রদানকারী বলা যায়? কাযী সাহেব উত্তর দিলেন, ইসলাম এই সব অমুসলমানকে 'যিম্মী' সাব্যস্ত করেছে, যে ব্যক্তি ইসলামী বাদশাহর কর্মচারীর আহব্বানের পরিপ্রেক্ষিতে বিনাদ্বিধায় 'কর' প্রদান করে দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যদি রাষ্ট্রীয় কর্মচারী উৎকোচ হিসেবে কোন টাকা পয়সা গ্রহণ করে তবে ইহাকে 'চৌর্যবৃত্তি' কিংবা চুরি বলা যায় কিনা? কাযী সাহেব উত্তর দিলেন, যদি কোন সরকারী কর্মচারী তাঁর নির্ধারিত বেতনের উর্ধে কিছু অতিরিক্ত গ্রহণ করে, তবে অতিরিক্ত টাকা তাঁর নিকট থেকে কঠোরতার সাথে ফেরত নেওয়া চাই। কিন্তু চুরির অপরাধের ন্যায় তার হাত কাটার নির্দেশ জারি হতে পারে না। তৃতীয় প্রশ্ন ছিল 'যে সমস্ত ধন-সম্পদ আমি রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়ার পূর্বে আমার তত্ত্বাবধানে" অর্জিত হয়েছে, উহা রাজকোষের সম্পদ হিসেবে জনগণ ইহার মালিক, না আমি? কাযী সাহেব উত্তর দিলেন, "বাদশাহর তত্ত্বধানে যে সম্পদ অর্জিত হয়েছে তাতে একজন সাধারণ মুসলমানের যে অধিকার, বাদশাহর ও ততটুকুই অধিকার। আলাউদ্দীন খালজী এতে অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, "যে সম্পদ আমার আমীর থাকা-কালীন সময়ে অর্জিত হয়েছে এবং উহা রাজ ভান্ডারে প্রবেশ করানো হয়, তা কিভাবে রাজকোষের সম্পদ মনে করা যেতে পারে?

কাযী সাহেব প্রতি উত্তরে বললেন, যে সম্পদ বাদশাহ নিজের বাহুবলে অর্জন করেছেন, তা তাঁর নিজস্ব সম্পদ। আর যে সম্পদ তিনি ইসলামী

সেনাদলের সাহায্যে সংগ্রহ করেছেন, এতে সাধারণ মুসলমানের ততটুকু অধিকার, যতটুকু খোদ বাদশাহর। তখন আলা উদ্দীন বললেন যে, আচ্ছা এই প্রকার সম্পদে আমার এবং আমার সন্তানদের কতটুকু অধিকার? এই প্রশ্নের উত্তরে কাযী সাহেব বলেন, এখন মনে হচ্ছে যে. আমার মৃত্যু অতি নিকটবর্তী। কেননা প্রথম উত্তরেই বাদশাহ অসন্তুষ্ট ছিলেন, আর এমন দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তো বাদশাহর অসন্তোষ আরো বৃদ্ধি পাবে। আলাউদ্দীন বললেন, আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন এবং নিজের জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকুন"। কাযী সাহেব উত্তর দিলেন, এই ব্যাপারে তিন পদ্ধতিতে কার্য হতে পারে। যদি শুধু ন্যায় বিচার এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণ করা যায় তবে বাদশাহকে এই সম্পদের মধ্য থেকে একজন সাধারণ মুসলমানের সমান অংশ প্রাপ্য হবে। আর যদি মধ্যপন্থা অবলম্বন করা যায় তবে বাদশাহকে আমীরদের সমপরিমাণ অংশ মিলবে। আর যদি দেশের কল্যাণের প্রতিলক্ষ্য রেখে বণ্টন করা যায়, যেমন আজকাল আলেমগণ দুর্বল সূত্র ধরে বণ্টনের যে পদ্ধতি বর্ণনা করেন, সেই অনুসারে বাদশাহ আমীরদের থেকে কিছু বেশী অংশ নিতে পারেন। অতঃপর বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, "আমার নিয়ম হল, যে সমস্ত সৈন্য সামরিক প্রয়োজনের সময় উপস্থিত থাকবে না তাদের তিন বছরের প্রদত্ত বেতন ভাতা ফেরত নেই এবং বিদ্রোহী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোকদের সঙ্গে তাদের পরিবার পরিজনসহ সকলেই হত্যা করার পর তার সমস্ত ধন-সম্পদ রাজকোষে প্রদান করি"। এটা শুনে কাযী সাহেব নিজ স্থান থেকে উঠলেন এবং দূরে গিয়ে এক কোণে দাঁড়ালেন এবং মাথায় হাত রেখে বললেন, "এই সমস্ত কাজ শরীয়তের নিয়মনীতির পরিপন্থী"। বাদশাহ এই উত্তর শুনে অসন্তুষ্ট হয়ে রাগে ও ক্ষোপে অন্দরমহল চলে গেলেন। এদিকে কাযী সাহেব ও তৎক্ষণাৎ স্বীয় আবাস স্থলের দিকে গমন করলেন, যেন আপন পরিবার পরিজন থেকে চির বিদায় নিতে পারেন।

কাযী সাহেব ঘরে প্রত্যাবর্তন করে সর্বদা অপেক্ষায় ছিলেন যে, না জানি কখন বাদশাহর দূতের আগমন হয় এবং তাকে হত্যা করে ফেলে। কিন্তু সত্যি কথার প্রতিক্রিয়া এমন হল যে, দ্বিতীয় দিন আলাউদ্দীন খালজী তাঁকে রাজদরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য আহবান জানালেন এবং আশাতীতভাবে

তাঁকে অসাধারণ মূল্যবান পুরস্কারে পুরস্কৃত করে সম্মান প্রদান করলেন আর কাযী সাহেবকে সম্বোধন করে বললেন, "যদিও আমি লেখা পড়া থেকে অপরিচিত এবং ফরয ও নফলের 'মাসআলা' সম্পর্কে অজ্ঞ, কিন্তু জেনে রাখুন যে' সর্বোপরি আমি একজন মুসলমান এবং মুসলমানদের সন্তান। আমি জানি যে, আপনি যা কিছু বললেন—তা' সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু দেশের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি অত্যাবশ্যক বলে মনে করি যে, অপরাধী-দেরকে কঠিনতম শাস্তি দেয়া প্রয়োজন। যাই হউক, আমার নিয়ত ভাল। আর তার উদ্দেশ্যে আল্লাহর সৃষ্ট জীবের কল্যাণ কর।"

হযরত সুলতান নিযামউদ্দীন আউলিয়ার প্রতি বিশ্বাস

সুলতান আলাউদ্দীন খালজীর হযরত সুলতান নিযামউদ্দীন আউলিয়া (রঃ)-এর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং আন্তরিকতা ছিল। যখনই কোন বিশেষ বিপদ কিংবা সমস্যা দেখা দিত তখনই তিনি হযরত নিযামউদ্দীন আউলিয়ার শরণাপন্ন হতেন। যে সময় সুলতান চিতোর দুর্গ জয়ের উদ্দেশ্য যুদ্ধরত ছিলেন, সেই সময় মুগল সৈন্যদের একটি দল "তারগী" নামক এক সেনাপতির তত্ত্বাবধানে নিজেদের দেশ থেকে যাত্রা করল। আলাউদ্দীন এই সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ সমস্ত কার্যক্রম স্থগিত রেখে দিল্লী পৌঁছলেন। ঐতিহাসিক ফিরিশতার বর্ণনা মতে সেই সময় মুগলদের এই দলও একলক্ষ বিশহাজার সৈন্য নিয়ে দিল্লীর নিকটে এসে উপস্থিত হলো। কিন্তু সুলতানের উত্তম সেনাবাহিনী তখন দাক্ষিণাত্যে ছিল। এই জন্য তাদের মুকাবিলা করা আলাউদ্দীনের পক্ষে কঠিক মনে হয়েছিল। মুগলরা যমুনা নদীর তীরে এসে অবস্থান করতে লাগল। আলীগড়ের যে সমস্ত আমীর দিল্লী আগমন করিতে চাইছিলেন, তাঁদের পথে তারা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। সুযোগ পেয়ে তারা দিল্লী শহর আক্রমণ করে শস্য ও অন্যান্য জিনিস-পত্র নিয়ে যেতে ছিল। সুলতান এই সব ঘটনায় খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। পরিশেষে তিনি হযরত নিযামউদ্দীন আউলিয়ার কাছে সাহায্য প্রার্থী হলেন। ঐতিহাসিক ফিরিশতার বর্ণনা মতে সেই রাতেই সেনাপতি 'তাগরীর' এর মনে এমন ভয়ের সঞ্চার হল যে, হঠাৎ অবরোধ উঠায়ে স্বদেশ ফিরে গেল। ঐতিহাসিক নিযামউদ্দীন আহমদ

বখ্শী লেখেন যে দিল্লীর জনগণ এই ঘটনাকে হযরত শায়খ নিযাম-উদ্দীন আউলিয়া (রঃ)-এর অলৌকিক ঘটনা বলে বিশ্বাস করেন। ("তারিখে ফিরিশ্তা" ১ম খন্ড, ৩৭৭—৩৮১ পৃষ্ঠা। "তাবকাতে আকবরী' ১ম খন্ড, ১৫৩—১৫৮ পৃষ্টা)।

এমনি আরো একটি ঘটনা: একদা আলাউদ্দীন দিল্লীতে ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে তাঁর সৈন্যগণ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। বাদশাহ কয়েকদিন পর্যন্ত সেনাবাহিনী সম্পর্কে কোন খবর পাচ্ছিলেন না। এ ব্যাপারে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। কাযী মুগীছ এবং মালিক কারাবেগকে একটি পত্র দিয়ে হযরত শায়খ নিযাম উদ্দীন আউলিয়া সমীপে প্রেরণ করলেন। পত্রে উল্লেখ ছিল "যদি হযরত অন্তর চক্ষু দিয়ে ঐ সেনাবাহিনীর অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন, তবে মেহেরবানী করে তা আমাকে জানায়ে শান্ত করুন। হযরত শায়খ প্রতি উত্তরে কোন এক প্রাচীন বাদশাহর বিজয় কাহিনী বর্ণনা করেন এবং বললেন হে, এছাড়া আরো বিজয়ের আশা আছে। অতএব ঐদিন আসরের সময় দূত আগমন করে দাক্ষিণাত্যের বিজয় সংবাদের চিঠি বাদশাহ সমীপে পেশ করলেন। ঐতিহাসিক ফিরিশ্তা বর্ণনা করেন যে, এই ঘটনার পর হযরত শায়খ সম্পর্কে আলাউদ্দীনের বিশ্বাস আরো প্রগাঢ় হল। যদিও বাদশাহ কখনও হযরত শায়খের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই, কিন্তু পত্রের মাধ্যমে সর্বদা আনুগত্য ও আন্তরিকতার প্রকাশ করে হযরত শাইখের আভ্যন্তরীণ আলোর সাহায্য প্রার্থী হতেন। ("তারিখে ফিশ্তা" ১ম খন্ড, ৪০১, ৪০৩ পৃঃ দ্রঃ)

রাজ্যের সংস্কার

শায়খ মুহাম্মদ আকরাম আই, সি, এস, সাহেব বর্ণনা করেন যে, রাজ্যজয় ও বিস্তাতির দিক দিয়ে ভারতবর্ষে তাঁর যে সমস্ত অঞ্চল অধিকৃত ছিল, একমাত্র ব্রিটিশ ব্যতীত অন্য কারো ভাগ্যে ততটুকু অঞ্চলের রাজত্ব ভাগ্যে জুটে নাই। কিন্তু তিনি যতবড় বীরপুরুষ বাহাদুর এবং যুদ্ধের ব্যাপারে উৎসাহী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, ঠিক তেমনি ছিলেন চিন্তাশীল হুশিয়ার ও সুশৃংখল শাসক। তিনি গুপ্তচর বিভাগকে এত উন্নত করেছিলেন যে, দেশের আনাচে-কানাচের সব বিষয় সম্পর্কে অবগত

ছিলেন। এমনকি রাত্রিতে আমীরদের বাসস্থানে যে সব কথাবার্তা হতো প্রাতঃকালে যখন তারা রাজদরবারে উপস্থিত হতেন, তখন তিনি আমীরদের রাত্রের কথাবার্তা হুবহু শুনিয়ে দিতেন। এর পতিক্রিয়া এমন হল যে, যদি কারো অন্তরে বাদশাহর বিপক্ষে কোন অভিযোগ কিংবা খারাপ চিন্তাধারাও থাকতো, এখন তিনি গোপনীয় বৈঠকেও তা প্রকাশ করার সাহস করতেন না। রাজ্য শাসনের ব্যাপারে যথেষ্ট চিন্তা-ফিকির এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করার পর নিজস্ব (পলিসি) রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারিণ করতেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তা কার্যকরীর চেষ্টা করতেন সৈন্যদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকার জন্যে তিনি এমন ব্যবস্থা করলেন যে যখন কোথাও সৈন্য প্রেরণ করতেন, তখন সেখান থেকে সৈন্যদের অবস্থান স্থল পর্যন্ত ডাক প্রথার প্রচলন করতেন। একে প্রাচীন কালে (بام) 'বাম' বলা হতো। প্রতি মাইলের মধ্যে দুজন পেয়াদা নির্দিষ্ট করতেন, যাদেরকে হিন্দিতে পাইক বলা হতো। এভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দৈনিক কার্যক্রম লিখিতভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন। পথের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এত জোরদার ছিল যে, ব্যবসায়ীরা সঙ্গী-সাথী কিংবা কারো সাহায্য ব্যতীতই রাত্রিতে ভ্রমণ করতে পারতো। ("তারিখে ফিরিশতা" ১ম খন্ড ৩৭৪ পৃঃ দ্রঃ) সড়কপথের এমন উন্নত ব্যবস্থা ছিল যে, বাংলার সড়ক 'শোর'নদীর তীর পর্যন্ত, সিন্ধু ও গুজরাটের সড়কসমূহ তেলেঙ্গানা' এবং 'মালাবার' পর্যন্ত লাহোরের সড়কসমূহ কাবলে ও কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পথিকগণ যে পরিমাণ মাল সম্পদ ইচ্ছে করতেন একস্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে নিয়ে যেতে পারতেন। আর যে কোন প্রান্তরে যখনই ইচ্ছে করতেন বিনাদ্বিধায় আপন সংরক্ষিত ঘর মনে করে তথায় ই মাল সম্পদ ফেলে রেখে নিঃশ্চিন্তায় ও নির্ভয়ে রাত্রি যাপন করতেন। গরীব পথিক এবং অপরিচিত ব্যক্তিরাও যখন কোন গ্রামে উপনীত হতো, সেই গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরা তাদের আতিথেয়তা করতেন। সাধারণতঃ চারিত্রিক কলংক গন্ডগোল, বিশৃংখলা ও মদ্যপান থেকেই সৃষ্টি হয়। আলাউদ্দীন খালজী এ দিকেও দৃষ্টি দেন। প্রথমতঃ তিনি মদ্যপান ত্যাগ করেন। অতঃপর সমগ্র দেশে

ঘোষণা করে দেন যে, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে মদপান করবে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। বাদাইউনে একটি কূপ এই জন্য নির্দিষ্ট ছিল যে, যে ব্যক্তি ঐ নির্দেশের পরও মদ্যপানের অপরাধে ধৃত হতো তাকে এই কূপে নিক্ষেপ করে মারা হতো। এইরূপ কঠোরতার ফলে দেশ থেকে সকল অপরাধের মূল মদের নাম গন্ধ ও মিটে গেল।

আলাউদ্দীন আরো নির্দেশ জারি করলেন যে, কোন রাষ্ট্রীয় আমীর এবং রাজ পরিষদের সদস্যবর্গ রাষ্ট্রীয় অনুমতি ব্যতীত একে অন্যের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন কিংবা নিমন্ত্রণ খাওয়া অথবা আতিথেয়তা করতে পারবে না।

আমাদের সময়ে রাজ্যের সুশৃংখলা রক্ষা এবং জনগণের আর্থিক ও সামাজিক সচ্ছলতার জন্য দু'টি বিষয় খুবই অত্যাবশ্যক বলে মনে করা হয়। তম্মধ্যে একটি হল—অর্থনৈতিক সুসম বন্টন, যেন কোন সচ্ছল ব্যক্তি ধনের অহমিকায় গরীবদের উপর অনর্থক অবিচার অত্যাচার এবং বাড়াবাড়ি করতে না পারে। আর দ্বিতীয়টি হল—বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী এবং উহার ক্রয়-বিক্রয় নীতি রাষ্ট্রের পক্ষ হতে নির্ধারিণ করে দেয়া প্রয়োজন। আর এসব বস্তুর বিক্রয় মূল্য ও রাষ্ট্র কর্তৃক ধার্য হওয়া চাই। যেন ধনী ও স্বার্থান্বেষী মহল সীমাতিরিক্ত স্বার্থ উঠায়ে জনসাধারণের অশান্তির কারণ না হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, আলাউদ্দীন খালজী উল্লিখিত উভয় বিষয়ের প্রতি সুদৃষ্টি দেন। আর তিনি তাদের এমন সুব্যবস্থা করলেন যে, ভারতবর্ষের কোন মুসলমান সম্রাট কিংবা কোন হিন্দু রাজার সময়েও এমন দৃষ্টান্ত মিলবে না। সুতরাং তিনি প্রথম কাজ অর্থাৎ রাষ্ট্র থেকে পুঁজিপতিদেরকে খতম করেন এবং জনগণকে পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জনের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য এমন করলেন যে, প্রতিটি নগর—যা' ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি হিসেবে অথবা অন্য কোন ভাবে প্রজাগণের অধিকারে ছিল তা' রাষ্ট্রায়াত্ত করলেন। প্রত্যেক মুসলমান এবং অমুসলমান, গরীব ও ধনীর উপর বিভিন্ন প্রকারের চাপ প্রয়োগ করে'—তাদের নিকট থেকে অতিরিক্ত পুঁজি হস্তগত করে রাজকোষে জমা দেন।

ঐতিহাসিক ফিরিশ্তা বর্ণনা করেন—"আলাউদ্দীন ইচ্ছা করলেন যে, রাষ্ট্রের মধ্যে এমন কিছু আমদানী ও রপ্তানী নীতি চালু করবেন, যাতে

করে ধনী-গরীব ও সবল-দুর্বলের পার্থক্য রহিত হয় এবং সকলেই সমভাবে জীবন যাপন করতে পারে। গ্রাম্য মাতাব্বর ও চৌধুরীদের জনসাধারণের উপর আর প্রাধান্য বাকী না থাকে।" ("তারিখে ফিরিশ্তা" ১ম খণ্ড, ৩৭৬ পৃঃ দ্রঃ)

সুতরাং উৎকোচ গ্রহণের দ্বার বন্ধ করার জন্য তিনি নির্দেশ জারি করলেন যে, কোন কর্মচারীই তার নির্দিষ্ট প্রাপ্য—(বেতন) ব্যতীত অতিরিক্ত অর্থ কখনও কারো নিকট হতে আদায় করতে পারবে না। আর যদি কোন কর্মচারী-এর ব্যতিক্রম করতো, তবে গ্রাম্য হিসাব রক্ষকের দপ্তর পরিদর্শন করা হতো। তৎপরও কোন ব্যক্তির নামে অতিরিক্ত টাকা পয়সা পাওয়া গেলে কঠোরতার সাথে তার নিকট থেকে তা ফেরত নেয়া হতো।

এখন বাকী রইল অন্যান্য জিনিস অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর বাজার দর এবং সেগুলোর মূল্য ও মওজুদের তত্ত্বাবধান। এতে সন্দেহ নেই যে, তৎকালে আমদানী-রপ্তানী এবং সংবাদ আদান-প্রদানের উপায় ও উপকরণের স্বল্পতার কারণে এই পদ্ধতির প্রচলন করা এবং স্থায়ী রাখা খুবই কষ্টকর ছিল। কিন্তু আলাউদ্দীন খালজী যেভাবে তার প্রচলন করলেন এবং সে জন্য যে সব নীতি ও পদ্ধতি তৈরী করলেন, নিঃসন্দেহে সেসব তৎকালে একটি আশ্চার্যজনক কৃতিত্বই বটে। বাজার দর পদ্ধতিতে—খানা-পিনার বস্তুসমূহ পরিধানের বস্ত্র, ঘোড়া এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশুপাখী ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের বস্তুই এর আওতাধীন ছিল। এমন কি সরকারী কর্মচারীদের বিভিন্ন পদ ও পদ পর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে প্রতিটি পদ ও স্তরের জন্য পৃথক পৃথক বেতন স্কেল নির্ধারিণ করে দেয়া হয়েছিল। এতে কোন ব্যতিক্রম ছিল না। তা'ছাড়া প্রমোদ ও কৌতুককারী, বাঠবাদক, গায়ক-গায়িকাদের পর্যন্ত ও তাদের বিভিন্ন স্তর এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে বেতন স্কেল কিংবা ভাতা নির্ধারিণ করে দেয়া হয়েছিল। এর অধিক কেউ এক পয়সাও অতিরিক্ত আদায় করতে পারতেন না। বিভিন্ন বস্তুর আমদানী ও রপ্তানীর জন্য "শুল্ক বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যবসায়ীরা বহির দেশ থেকে যেসব জিনিসপত্র আমদানী করতো, তা এই বিভাগকে না জানিয়ে কিংবা তার অনুমতি ছাড়া ধার্যকৃত মূল্যের অধিক মূল্যে বিক্রি করতে পারতো না। ঐতিহাসিক 'ফিরিশ্তা' এই পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

আমরা এখানে নমুনা হিসেবে শুধু শস্যাদির বাজার দরপত্রের কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম। এতে অন্যান্য দ্রব্যাদির ও দরপত্রের অনুমান করা যাবে।

জিনিসের নাম	প্রতি মণ হিসাবে	বাজার দর
আটা	(১মণ=৯৬০ তোলা =১২ সের) ,,	৭½ চিতল (১ চিতল—১ টাকার ১/৫০ অংশ)
যব	,,	৪ চিতল
'বুট' বা ছোলা	,,	৫ ,,
ধান	,,	,, ,,
মাশ কলাই	,,	,, ,,
মটর	,,	৩ ,,

আলাউদ্দীর খালজীর শেষ সময় পর্যন্ত শস্যাদির এরূপ বাজার দর স্থায়ী ছিল। অবশ্য কখনও কখনও অনাবৃষ্টি কিংবা অন্যান্য জিনিস পত্রের অভাবের সময় দরের কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো।

সেই সময় 'আবাহিয়া' নামে একটি দল ছিল। তারা বছরে একবার একটি আমোদ-প্রমোদের আসর (জলসা) প্রতিষ্ঠা করতো। সেই রাতে এমন কোন নিকৃষ্ট অপরাধ থাকতো না যাতে তারা লিপ্ত হতো না। এমন কি শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ আপন মা বোনদের সঙ্গেও আনন্দ উল্লাস করতো এবং 'সহবাস' করতো।

আলাউদ্দীন খালজী যখন জানতে পারলেন যে দিল্লীতে তাদের আস্তানায় তখন তিনি তাদেরকে হত্যা করলেন এবং তাদেব নাম নিশানা পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠা থেকে মুছে দিলেন। আলাউদ্দীন খালজীর স্বভাব এমন ছিল যে, তিনি যার প্রতি সন্তুষ্ট হতেন, তাঁর জন্যে অনুগ্রহ ও দয়া-দাক্ষিণ্যের নদী প্রবাহিত করে দিতেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নির্দেশ অমান্যকারীদের উপর

এত কঠোর ছিলেন যে, অনেক সময় একেবারে আটারমত নিষ্পিষ্ট করে দিলেন।

চেঙ্গিজ খানের নাতি আলগো খান জালাল উদ্দীনের জামাতা ছিলেন এবং চার হাজার মুগল নর-নারীর সঙ্গে মুসলমান হয়ে ছিলেন। এই সব নওমুসলিম মুগলরা এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিল। এই দলের কয়েকজন যুবক একদা আলাউদ্দীনকে শিকারের সময় হত্যা ষড়যন্ত্র করেছিল। আলাউদ্দীন যখন তা জানতে পারলেন, তখন তিনি শুধু এই ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিই নয় বরং সমস্ত নও-মুসলিম মুগলদের সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করলেন যে তাদের স্ত্রী-পুত্রসহ সকলকেই হত্যা করে দাও। সুতরাং নির্দেশ মুতাবিক সকলকেই অতিনির্মমভাবে হত্যা করে দেয়া হল। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে আলাউদ্দীনের এই হত্যা কান্ড 'যাহ্হাক' এবং ফিরাউনের অত্যাচারের কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আলাউদ্দীনের নির্মাণ কার্যের প্রতি ও একান্ত আগ্রহ ছিল। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ফিরিশ্তা বর্ণনা করেন যে, "আলাউদ্দীনের খালজী যে পরিমাণ অধিক সংখ্যক মসজিদ, খানকা, জলাশয়, মিনার ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন, কোন বাদশাহর কৃতিত্ব এত অধিক নয়। তিনি জ্ঞানী-গুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং তাদের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করতেন। ঐতিহাসিক ফিরিশতা বর্ণনা করেন যে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং কারিগরী বিদ্যার বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা তাঁর সময় এত আধক ছিল যে, অন্য কোন সময়ে এমন সমাবেশ দৃষ্টি গোচর হয় না।

সত্য ও সততা, ন্যায়বিচার ও আনুগত্যের আধিক্য এবং বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার স্বল্পতা তাঁর সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে দৃষ্টি গোচর হতো না। এমনিভাবে তাঁর সময়ে বিপুল সংখ্যক মাশায়েখ ও আউলিয়া দরবেশের দিল্লী আগমন 'বরকত' বা প্রাচুর্যের কারণ হয়েছিল। সাধু পুরুষের এমন সমাবেশ হয়ত অন্য কোন কালে পাওয়া যাবে না। বুযুর্গানে দীন, সাধু পুরুষ ও কাযী ব্যতীত ও ৪৬ জন পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী আলেম, যারা সর্বজ্ঞানে গুণান্বিত ছিলেন। আলাউদ্দীন খালজীর

সময়ে শিক্ষা-দীক্ষার ও চর্চা ছিল। তাবকাতে আকবরী এবং "ফিরিশ্তা" উভয় ইতিহাসে এসব আলেমদের নামের তালিকা লিপিবদ্ধ আছে। এখানের স্বল্প পরিসরে এর আলোচনা সম্ভব নয়।

খালজী বংশের পরিসমাপ্তি

আলাউদ্দীন খালজী বিশ বছর পর্যন্ত খুবই জাঁকজমক ও প্রভাব প্রতিপত্তির সাথে রাজত্ব করেন। কিন্তু পরিশেষে এমন কিছু কারণ সৃষ্টি হল, যার পরিণতিতে খালজী বংশের ধ্বংস ও পতন হয়।

সব চেয়ে বড় কারণ ছিল আলাউদ্দীনের প্রধান মন্ত্রী একজন নও-মুসলীম ছিলেন। তাঁর নাম ছিল 'মালিক কাফোর'। তিনি প্রথমতঃ হিন্দু ছিলেন। গুজরাটের যুদ্ধের সময় একজন দাস হিসেবে তাঁর হাতে এসে পৌঁছেন। তাবকাতে আকবরীর লেখক বর্ণনা করেন যে, 'মালিক কাফোর' আলাউদ্দীন খালজীকে রূপ-গুণে এত মুগ্ধ করে ফেলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে আপন সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার বানালেন। মালিক কাফোর যখন দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধসমূহে অসাধারণ সফলতা অর্জন করলেন। তখন তিনি তাঁকে প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করেন। ধীরে ধীরে কাফোর এত অধিক বশ্যতা অর্জন করলেন যে, শেষকালে আলাউদ্দীন তাঁর ইচ্ছা ও সম্মতির বিপক্ষে কোন কর্মই করতেন না। এর পরিপ্রেক্ষিতে খোদ শাহী মহলেই বাদশাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হতে লাগল। আলাউদ্দীনের বিবি মালেকা জাহান এবং তাঁর ছেলে খিযির খান যাকে রাজ্যের উত্তরাধিকার প্রদান করেছিলেন তিনি আনন্দ-উল্লাস ও বিলাসিতায় লিপ্ত থাকতেন। কাফোর, খিযির খানের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকার কারণে সর্বদা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। যে কখন তাঁকে তার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায়। একদা বাদশাহ যখন রুগ্ন ছিলেন, তখন খিযির খান পিতার অনুমতি ক্রমে 'আম রোহার' দিকে শিকারে বের হলেন। তাঁর যাবার বেলায় পিতা বললেন যে, "আমার স্বাস্থ্য ভাল হলে আমি তোমাকে ডেকে পাঠাব। ঘটনাচক্রে খিযির খান যখন জানতে পারলেন যে, পিতা সুস্থ হয়ে গেছেন, তখন তিনি পিতার পক্ষ হ'তে পত্রের ফেরত আসার

আহবান জানানোর পূর্বেই তার অনুমতি ব্যতীত দিল্লীর পথে যাত্রা করলেন। কাফোর তখন বাদশাহকে বুঝালেন যে, খিযির খান মস্তিষ্কে একটি দুষ্ট বুদ্ধি নিয়ে আপনার অনুমতি ব্যতীত দিল্লী চলে এসেছে তিনি পরামর্শ দিলেন যে, তাকে গোয়ালীয়ার দুর্গে বন্ধী করা উচিৎ। বাদশাহ তাঁর কথায় একমত হলেন। খিযির খানকে বন্ধী করে দেয়া হল। অতঃপর কাফোর 'মালেকা-জাহানের ভাই আল্পে খানকেও গুজরাট থেকে ডেকে এনে হত্যা করেন। তৎপর খোদ আলাউদ্দীন ও 'ইস্তেসকা' (পেটে পানি জমে যাওয়া) রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করলেন। অনেক ঐতিহাসিক বর্ণনা করেন যে, 'কাফোর' বাদশাহকে 'বিষ' খাওয়ায়ে হত্যা করছিল। ('তাবকাতে আকবরী" ১ম-খন্ড, ১৭২ ১৭৩ পৃঃ দ্রঃ)

সুলতান আলাউদ্দীনের ইন্তিকালের দ্বিতীয় দিন মালিক কাফের বাদশাহর একটি লিখিত দলীল রাজ দরবারের আমীর এবং মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবর্গকে দেখালেন, এতে খিযির খানকে উত্তরাধিকার থেকে বাদ দিয়ে তার ছোট ভাই শিহাব উদ্দীনের নাম লিপিবদ্ধ ছিল। অতএব শিহাব উদ্দীনকে সিংহাসনে আরোহণ করানো হল। আর মালিক কাফোর নিজে বাদশাহর প্রতিনিধি হিসেবে সমস্ত রাষ্ট্রীয় -কাজকর্মে কর্তৃত্ব করতে লাগলেন। শিহাবউদ্দীনের সিংহাসন আরোহণের প্রথম দিনই এক ব্যক্তিকে "বারবিগী" অর্থাৎ অশ্বারোহীর চাকুরীর লোভ দেখায়ে তার দ্বারা খিযির খান এবং তাঁর ভাই শাদী খানকে চোখ সেলাই করে অন্ধ করে দিলেন। তারা উভয়েই গোয়ালীয়ার দুর্গে বন্ধী দিলেন। আলাউদ্দীনের বিবি 'মালেকা জাহান' ও তথায় বন্ধী ছিলিন। তিনি তার সমস্ত ধন-দৌলত অধিকার করে নিলেন। শিহাব উদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করার সময় তিনি একেবারে শিশু ছিলেন। "তাবকাতে আকবরী"তে বর্ণিত হয়েছে যে, 'মালিক কাফোর' দু,এক ঘণ্টার জন্য শিহাব উদ্দীনকে অন্দর মহল থেকে এনে রাজ সিংহাসনে বসিয়ে দিতেন এবং সকল আমীর ও সরকারী কর্মচারীদেরকে তার সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিতেন। অতঃপর যখন রাজদরবার শেষ হতো

তখন শিশুকে রাজমহলে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আর কাফোর নিজে কয়েকজন বিশ্বস্ত "খাজাসারা" (পুরুষত্বহীন চাকর) দের সঙ্গে পাশা খেলায় লিপ্ত হতো। অকৃতজ্ঞ কাফোর এতেও তৃপ্ত হননি অধিকন্তু সে জন্মগতভাবে অযোগ্য থাকা সত্ত্বেও শিহাব উদ্দীনের মাতাকে বিয়ে করল।"

খিযিরখান এবং শাদীখানকে অন্ধ করার পর আরো একজন শাহযাদা মুবারক খান বাকী ছিলেন, তাঁকেও অন্ধ করার জন্য কয়েকজন 'খাজা সারা' (পুরুষত্ব হীন চাকর)-কে প্রেরণ করলেন। কিন্তু মুবারক খান যখন তাদেরকে স্বীয় পিতার অনুগ্রহের ও দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখন তাদের মনে খুবই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। অতঃপর তারা দৃঢ় সংকল্প করল যে, মুবারক খানের শত্রুকেই বরং খতম করে নিঃশ্বাস ফেলবে। সুতরাং ঐ দিনের রাত্রেই তারা মালিক কাফোরের শোয়ার ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে এবং তার সঙ্গী-সাথী সবাইকে হত্যা করলো। এই ঘটনা আলাউদ্দীন খালজীর ইন্তিকালের পঁয়ত্রিশ দিন পর সংঘটিত হয়েছিল।

মালিক কাফোর এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে হত্যা করার পর মুবারক খান দু'মাস পর্যন্ত আপন ভাই শিহাব উদ্দীনের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনা করেছিলেন। পরিশেষে সুলতান কুতুবউদ্দীন মুবারক শাহ উপাধি ধারণ করে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। আর শিহাব উদ্দীনকে 'গোয়ালিয়া' দুর্গে নযর বন্দী করে রাখেন।[১]

---

[১] "ফিরিশ্তা" নামক ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, যখন মালিক কাফোর মুবারক খানকেও অন্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল, তখন মুবারক খানের মাতা "বিবি মাহিক" তৎকালের অন্তর চক্ষু বিশিষ্ট 'অলী' শায়খ নাজমুদ্দীনের কাছে যিনি হযরত শায়খ আহমদ জাম (রঃ)-এর সন্তান ছিলেন, এক লোক পাঠিয়ে এ ব্যাপারে সাহায্যের আবেদন জানালেন। শায়খ বললেন, কোন চিন্তা করবেন না, অদৃশ্য শক্তির সাহায্যের আশায় রাখুন"। অতঃপর হযরত শায়খ নিজের মাথা থেকে টুপি নামিয়ে উহা উল্টা করেন এবং তৎপর পুনরায় মাথায় দিয়ে বললেন, "ইনশা আল্লাহ্ এই টুপি আমি তখনই ঠিক করবো যখন মুবারকশাহ সিংহাসনে আরোহণ করবে।

কুতুবউদ্দীন মুবারকশাহ ৭ই মুহাররম, ৭১৭ হিজরীতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথম অবস্থায় তাঁর কাজ কারবার ভালই ছিল। সুতরাং তিনি একদিকে বিদ্রোহীদেরকে দমন করেন এবং বিশৃংখলাকারীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। সরকারী কর্মচারীদেরকে ছয় মাসের বেতন অগ্রিম দিয়েছেন। আলা উদ্দীন খালজীর সময়ে যে অধিক পরিমাণে খাজনা টেক্স ধার্য হয়েছিল, তিনি তা কমিয়ে দেন। উলামা-মাশায়েখ ও সাধু-দরবেশ দেরকে বর্ধিত হারে বৃত্তি দেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই তিনি আনন্দ-উল্লাসে এমন মত্ত হলেন যে, রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে একেবারে উদাসীন হয়ে গেলেন। সদা-সর্বদা আনন্দ উল্লাসকারীদের আসরে বসে থাকতেন। 'মালিক খসরু' নামে একজন নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ছিল। সে নামে মাত্র মুসলমান হয়ে ছিল। যেমনিভাবে মালিক কাফোর আলাউদ্দীন খালজীর খুবই বিশ্বস্ত ও প্রিয় পাত্র হয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে 'মালিক খসরু ও কুতুবউদ্দীনের বিশ্বস্ত ও ভরসার পাত্র ছিল। তিনি তাঁকে প্রধান মন্ত্রী বানিয়ে রাজত্বের যাবতীয় কাজকর্ম তাঁর উপর ন্যস্ত করেন। মালিক খসরু স্বীয় স্বাধীনতা থেকে স্বার্থ উঠিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দপ্তর ও পদে আপন লোকদেরকে ভর্তি করতে লাগলেন। এমননিভাবে যখন রাজত্বের সকল স্তরে তাঁর শক্তি অর্জিত হল, তখন তিনি স্বজাতীয় কিছু লোকের সাহায্যে কুতুবউদ্দীনকে নির্মমভাবে হত্যা করান। তার মস্তক শরীর থেকে পৃথক করে 'হাজার সুতুন' বালাখানার নীচে নিক্ষেপ করে দিলেন। অতঃপর আলাউদ্দীন খালজীর সন্তান-সন্তুতি ও তাদের মাতাসহ সকলকেই হত্যা করে দেন। তৎপর বেগম এবং শাহাযাদাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন, তা ঐতিহাসিক ফিরিশতার ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

"তিনি আপন ভাইকে (প্রকাশ যে, সে ছিল অতি নিকৃষ্ট বংশের হিন্দু) 'খানে খানান' উপাধি প্রদান করে সুলতান আলাউদ্দীন খালজীর কন্যাকে তার হস্তগত করে দিল। কুতুবউদ্দীন মুবারক শাহের বিবিকে নিজেই আপন ঘরে প্রবেশ করাল। তাছাড়া কুতুবউদ্দীন এবং আলাউদ্দীন হেরেমের দামী ও বিবিগণ খসরু খান ও তার সৈন্যদের ভাগে পড়ল।

আলাউদ্দীন এবং কুতুবউদ্দীনের দাসদেরকে হত্যা করার পর তাদের স্ত্রী-পুত্রদেরকে গুজরাটের হিন্দুদের হস্তে ন্যস্ত করলো।[১]

মোটকথা এই নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু নামে মাত্র মুসলমান হয়ে ছিল, কিন্তু অভ্যন্তরে হিন্দুই ছিল। সে আলাউদ্দীন খালজীর বংশের নাম-নিশানা মিটিয়ে দিতে এবং তাঁর বংশের নর-নারী ও ছেলে মেয়েদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে অত্যাচারের কোন দিক বাকী রাখে নাই। এই বংশের যে কোন লোককে যেখানেই পেয়েছে হত্যা করেছে। আলাউদ্দীনের মালিক মুসাররাত নামের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ সংসার ত্যাগী হয়ে নির্জন বাস করতে ছিলেন, খসরু তাকেও হত্যা করলো।

তৎকালে শায়খ বাশীর পাগল নামে একজন আল্লাহ্ প্রেমিক ছিলেন। জনগণ তাঁর কাছে আলাউদ্দীনের বংশের উপর বিভিন্ন প্রকার অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত এসব হচ্ছে কি? শায়খ উত্তর দিলেন, "ইহা আল্লাহ্‌র দানের অকৃতজ্ঞতার প্রতিফল, যা আলাউদ্দীনের পক্ষ হতে স্বীয় বর্ষীয়ান চাচা জালালউদ্দীনের বেলায় প্রকাশিত হয়েছিল।

('ফিরিশ্তা ও তাবকাতে আকবরী')

কুতুবউদ্দীন মুবারকশাহ সম্পর্কে তাবকাতে আকবরীর লেখক ইহাও লিখেছেন যে, "ইনি হযরত 'শায়খ নিযামউদ্দীন আউলিয়া (রঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন এবং হযরত শায়খের সঙ্গে প্রকাশ্যে নিজের শত্রুতার কথাও ব্যক্ত করতেন।

যা হউক খালজী বংশের উত্থান ও পতনের ইতিহাস-উপদেশে পরিপূর্ণ। তাদের উত্থান ও পতনের কারণসমূহ এত সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য যে এর অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

---

[১] স্মরণ রাখার বিষয় যে, 'খিযির খান' এবং 'শাদী খান' উভয়ে আলাউদ্দীন খালজীর ছেলে এবং কুতুবউদ্দীনের ভাই ছিল। কুতুবউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করার পর নিজেই তাদেরকে হত্যা করালেন এবং খিযির খানের বিবিকে বিয়ে করেন। (তারিখে ফিরিশ্তা ৪২৭ পৃঃ দ্রঃ)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, খসরু খান শুধু নামে মাত্র মুসলমান হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সে আন্তরিকভাবে ছিল হিন্দু। যিয়াউদ্দীন বারনী বলেন যে, তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল—উত্তর ভারতে পুনরায় নতুন করে হিন্দুদের একটি শক্তিশালী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। সুতরাং সে আলা-উদ্দীন খালজীর পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে হত্যা করার পর প্রকাশ্যে ইসলামের শত্রুতা করতে শুরু করল। ইসলামী সংস্কৃতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। মসজিদসমূহ মন্দিরে রূপান্তরিত করা হল। ঐতিহাসিক ফিরিশতার বর্ণনা মতে সর্বশেষ পরিস্থিতি হল—"হিন্দুরা প্রকাশ্যে চেয়ারের পরিবর্তে কুরআন মজীদ স্তূপ করে এর উপর বসতো।" ('তারিখে ফিরিশতা" ১ম খণ্ড, ৪২৭ পৃঃ দ্রঃ) খাজা নিযামউদ্দীন আহমাদ বর্ণনা করেন যে, "যখন অধিকাংশ হিন্দুকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা হল তখন ইসলামের সংস্কৃতি অধঃপতিত হতে লাগল এবং হিন্দুদের কৃষ্টি প্রাধান্য পেল। প্রতিমা পূজা শুরু হল এবং মসজিদগুলো ধ্বংস হতে লাগল।"

('তাবকাতে আকবরী' ১ম খণ্ড, ১৮৭ পৃঃ দ্রঃ)

কারণ হতো তা থেকে তিনি বিরত থাকতেন। কোন ব্যক্তিকে খাঁটি মনে করলে তার কাজকর্মে উৎসাহ প্রদান করতেন। তা ছাড়াও রাজ্যশাসনের ব্যাপারে সকল কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন এবং সর্বদা অল্প-বেশীর আধিক্য ও বাড়াবাড়ি পরিহার করে চলতেন। গিয়াসউদ্দীন অন্যান্য কাজকর্মের সাথে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ও সংস্কার সাধন করেন। এতে তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। যদি কোন সরকারী কর্মচারী নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায়ের অধিক কিছু আদায় করতেন এবং তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হত, তবে কঠোরতম শাস্তি প্রদান করতেন। খসরু খান জনগণের সহানুভূতি অর্জনের জন্য রাষ্ট্রীয় ধনাগার অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিল। রাজকোষের যে সব টাকা পয়সা যার যার নিকট ছিল, বাদশাহ জানতে পেরে তাদের নিকট থেকে তা ফেরত নিয়ে সমস্তই রাজ ভান্ডারে জমা দেন।

রাজ্যের উলামা, মাশায়খ এবং সাধু পুরুষদেরকে খুবই সম্মান করতেন রাজমহলে কোন উৎসব হলে রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং রাজপরিষদের আমীর ও মন্ত্রীদের সঙ্গে ঐসব আলেমগণকেও নিমন্ত্রণ করতেন। তাদের সঙ্গে খুবই ভদ্র আচরণ করা হতো। বাদশাহর সৎ ইচ্ছা ও কল্যাণকর কার্যের প্রতিক্রিয়া এমন হল যে, নিযামউদ্দীন আহমদ বখ্শীর বক্তব্য অনুসারে আলেমদের মাঝে সাম্যতা প্রতিষ্ঠা হল এবং বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার নাম পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মুগলরা ভারতবর্ষের জন্য একটি পৃথক বিপদ হিসেবে চিহ্নিত ছিল। তিনি তাদের আগমনের পথ এমনভাবে বন্ধ করে দেন যে,. তুগলকের রাজত্বকালে-তারা আর ভারতবর্ষে আগমনের চিন্তাও করতে পারেনি। অসাধারণ বীরত্ব এবং উন্নত রাজনৈতিক চিন্তাধারার সাথে তার নির্মাণ কার্যের প্রতিও আগ্রহ ছিল দিল্লীর তুগলকাবাদ দুর্গ তাঁরই স্মরণীয় কীর্তি। রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম ও ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহারে ইসলামী শরীয়তের প্রতি খুবই দৃষ্টি রাখতেন। তাবকাতে আকবরীর বর্ণনা মতে—"আদেশ নিষেধের হাওয়া নিয়ন্ত্রণ করলেন। তিনি অধিকাংশ সময় ইবাদাতে নিমগ্ন থাকতেন। রাত্রি জাগরণ থেকে কর্তব্য কাজে লিপ্ত থাকতেন। কখনও মদ্যপায়ীদের সংস্পর্শে যেতেন না। তাঁর সময়ে মদপানের প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল।"

১লা শাবান, ৭২০ হিজরীর এক সোনালী প্রভাতে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং "সুলতান গিয়াসউদ্দীন" রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন।

তুগলক বংশের পরিচয়

গিয়াস উদ্দীন তুগলকের সময় থেকে তুগলক বংশ নামে একটি নতুন বংশের রাজত্বের যুগ আরম্ভ হল। গিয়াসউদ্দীন এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত গুণাগুণ স্বীয় ও পূর্ণত্বের কারণে উন্নতি করতে করতে এই উচ্চ পদ মর্যাদায় উন্নীত হয়। ঐতিহাসিক ফিরিশতা লেখেন যে, "তিনি খুবই সহিষ্ণু ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। দানশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার গুণ যেন তাঁর মাঝে ভর্তি ছিল। তা ছাড়াও তিনি ছিলেন পবিত্র স্বভাবের ও পবিত্র আত্মার মানুষ। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে আদায় করতেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাধারণ আদালতে বসে থেকে জনগণের অভাব অভিযোগ, রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী ও অর্থনৈতিক সমস্যা-সমূহের সমাধা কল্পে তিনি সকল সময় ব্যয় করতেন।" ("তারিখে ফিরিশতা' ২য় খন্ড, ২য় পৃঃ দ্রঃ (উর্দু অনুবাদ)) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করার পর খসরু খানের নামী-ধামী বন্ধু-বান্ধব ও সাহায্যকারীদেরকে হত্যা করেন। খসরু খানকে-"হাজার সুতুন" বালাখানার সেই স্থানে ঠিক এমনি ভাবে হত্যা করা হল, যেমনিভাবে এই দুর্ভাগা আপন দানশীল মনিবকে নির্মমভাবে হত্যা করছিল। তার মস্তক ও শরীর থেকে পৃথক করে নীচে নিক্ষেপকরা হল। ("মাসনবী তুগলক নামা" ১৫১ পৃঃ দ্রঃ)

বিশৃংখলাকারীদের নির্মূল করার পর তিনি দেশের সংস্কারমূলক কাজকর্ম এবং আইন-শৃংখলার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। নিযামউদ্দীন আহমদ বখশীর বর্ণনা মতে "যে কাজ অন্যদের দ্বারা হয়ত কয়েক বছরে সমাপ্ত হতো তা তিনি এক সপ্তাহে সমাপ্ত করেন"। ('তাবকাতে আকবরী' ১ম খন্ড ১৯১ পৃঃ দ্রঃ) যদি কোন প্রজাকে অস্থির বা চিন্তাযুক্ত অবস্থায় দেখতেন তখন তিনি তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন এবং তার কষ্ট দূরীভূত করার চেষ্টা করতেন। যেসব কাজ সৃষ্ট জীবের কষ্টের

মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আমীরগণ গিয়াসউদ্দীনের বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্বের বর্ণনা করে সকলই একবাক্যে বললেন যে, রাজসিংহাসনে আরোহণের অধিকার আপনি ছাড়া কারো নেই। তুগলক প্রতি উত্তরে খুবই কার্যকারী একটা ভাষণ দিলেন, যার সারাংশ আমীর খসরুর বর্ণনা মতে নিম্নরূপঃ—"আমার মুকুট ও রাজসিংহাসন বলতে আমার এই তীর ও কামান। খসরুখানের মানবতা বিবর্জিত অত্যাচারের কথা শুনে আমার চোখের সামনে পৃথিবী একেবারে আঁধার হয়ে গেল এবং আমার জীবনের প্রতি আমার ধিক্কার এল। আমি তৎক্ষণাৎ তিনটি বিষয়ের উপর দৃঢ় সংকল্প করলাম। (১) প্রথমতঃ—দীন ইসলামকে নাস্তিকতার রাজ্যে পুনঃজ্জীবিত করবো। (২) দ্বিতীয়তঃ—স্বদেশকে এই নিকৃষ্ট ও ছোট বংশের হিন্দু সন্তানের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে ঐসব শাহযাদাদেরকে রাষ্ট্র পুনঃগঠনের জন্যে স্থান করে দিব-যাঁরা এর প্রকৃত মালিক। (৩) তৃতীয়তঃ ইচ্ছা ছিল যে সব দুর্ভাগা ও অকৃতজ্ঞের দল শাহী বংশের সদস্যদেরকে অতি নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তাদের কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবো। এই তিনটি সংকল্পই শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছায় ছিল। আল্লাহ্‌র অশেষ অনুগ্রহ যে, আমার প্রবল সাহসেই এই তিনটি দৃঢ় সংকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। আমি রাজ সিংহাসনের আকাংক্ষী নই। ধর্মযুদ্ধ ব্যতীত আর তলোয়ার প্রয়োগ করবো না। যদি রাজবংশের মধ্যে হতে কোন ব্যক্তি জীবিত থেকে থাকেন, তবে রাজসিংহাসন তাঁরই প্রাপ্য। আর যদি রাজ-পরিবারের কোন সদস্য জীবিত না থাকেন, তবে এখানে অনেক বড় বড় আমীর উপস্থিত আছেন, তাঁরাই এর উপযুক্ত। আমার ঘোড়া এবং দীবালপুরের নির্জন স্থান আমার খুবই প্রিয়। আমি শুধু ধংস স্তূপের উপর একটি সতেজ চারাগাছ রোপণ করতে চাই এবং সিংহাসনচ্যুতদেরকে সিংহাসন প্রদান করতে চাই"।

এই ভাষণের পর দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তুগলকের পদচুম্বন করলেন এবং সকলই দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন যে, 'রাজত্ব আপনার জন্যেই শোভা পায় আপনিই এটার উপযুক্ত"। তুগলক তবুও তা' অস্বীকার করলেন। অবশেষে অনেক বিতর্কের পর তিনি বাদশাহ হতে সম্মত হলেন। সুতরাং

তুগলক বংশ

খালজীরা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি পেয়েছে এবং ধরাপৃষ্ঠ থেকে তাদের নাম নিশানা পর্যন্ত ভুল অক্ষরের মত মিটে গিয়েছে। কিন্তু শিহাবউদ্দীন ঘোরী ও কুতুবউদ্দীনের বাহুবল এবং হযরত খাজা মাঈন উদ্দীন চিশতী (রঃ) ও হযরত কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ)-এর মত পবিত্র জীবনাত্মা ইসলামের যে আলো শিখা নাস্তিকতাবাদ ও অংশিবাদের মাঝে প্রজ্বলিত করেছিলেন, তা এত ক্ষীণ ছিল না যে, কোন দুষ্কৃতিকারী—কিংবা কোন অসভ্য মানুষের ফুঁকে নিভে যাবে? অতএব খসরু খানের সিংহাসন আরোহণের পর তখন ও পাঁচমাস অতিবাহিত হয়নি, পাঞ্জাবের গভর্নর গাযী মালিক ফখরউদ্দীন যিনি পরবর্তী সময়ে গিয়াসউদ্দীন তুগলক নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন, এক বিরাট বীর সেনা বাহিনী নিয়ে ঝটিকা বেগে দিল্লীর দিকে ধাবিত হলেন এবং সমস্ত অভিশপ্তদেরকে খড়কুটোর ন্যায় উড়িয়ে দিলেন। খসরু খান এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে হত্যা করা হল। এমনিভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের উদীয়মান জীবনী শক্তির উপর দুঃখ কষ্টের যে বাদল ছেয়ে গিয়েছিল, তা দেখতে দেখতে নিমিষের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আমীর খসরু সেই সময় একটি কবিতা লেখেন, তাতে তিনি বলেন—

دا مى اسلام تغلق شاه كه انجم سالها
چرخ مى زد تا فلک زين گونه دين پرور شود -

"ইসলামের পৃষ্ঠপোষক তুগলকশাহ ইসলামের ভাগ্যাকাশ থেকে বিপদের ঘনঘটা বিদূরিত করে ধর্মের প্রতিপালন করলেন"।

গাযী মালিক ফখরউদ্দীনের এই কৃতিত্বে দিল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই খুশি হলেন। সবাই তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানালেন। দ্বিতীয় দিন গাযী মালিক—"হাজার সুতুন" বালাখানায় এক বৈঠকে মিলিত হন। এতে বড় বড় আমীর ও রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং

সুলতান সম্পর্কে সাধারণ কল্যাণকামী এবং ন্যায়পরায়ণ লোকদের অভিমত কি? এ ব্যাপারে জিয়াউদ্দীন বারনীর বক্তব্য হল—"আমি তারিখে ফিরোজশাহীর" লেখক। আমি বহু দূরদর্শী ও ন্যায় পরায়ণ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে বলতে শুনেছি যে, তাঁরা মুসলমানদের দীন-দুনিয়ার কল্যাণ ও সাধারণের শান্তিকামী হিসেবে দিল্লীর সিংহাসনে বাদশাহ তুগলকের মত অন্য কোন বাদশাহ দেখেননি। সম্ভবতঃ তাঁর পরেও তাঁর মত কোন বাদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নি। (তারিখে ফিরোযশাহী দ্রষ্টব্য)

সুলতান সিংহাসনে আরোহণ করেছেন, সবেমাত্র চার বছরের কিছু উপর সময় হয়েছে। হঠাৎ মৃত্যু দূতের আগমন হল। বাংলার অবাধ্য গভর্নরদেরকে দমন করে এবং প্রজাদের উপর তাদের অত্যাচারের শাস্তি প্রদান করে সবেমাত্র রাজধানীতে ফিরে এসেছেন। তুলক আবাদের অনতি দূরে তার ছেলে মুহাম্মদ তুগলক তাঁর অভ্যর্থনার জন্য সাময়িকভাবে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, এখানে এসে তিনি অবস্থান করলেন। খানাপিনা শেষে এখনও তিনি হাত ধৌত করেন নি হঠাৎ উপর থেকে ছাদ ধসে তাঁর উপর পড়ল। সুলতান তৎক্ষণাৎ সেখানেই ইন্তেকাল করলেন। এই মর্মান্তিক ঘটনা ৭২৫ হিজরী মুতাবিক ১৩২৫ খৃস্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সেই বছর হযরত সুলতান নিযামউদ্দীন আউলিয়া এবং আমীর খসরু (রঃ) ও ইন্তিকাল করেন। এতে যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত এক বিপদ উপস্থিত দেখা দিল।

('তারিখে ফিরোযশাহী' ৪৫২ পৃঃ দ্রঃ)

সুলতান মুহাম্মদ ইবনে তুগলক

গিয়াসউদ্দীন তুগলকের পর তাঁর ছেলে মুহাম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ঐতিহাসিকদের কাছে অভূতপূর্ব ও আশ্চার্যজনক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তিনি খুবই চিন্তাশীল, হুশিয়ার, রাজনীতিবিদ এবং বীরপুরুষ ছিলেন। যিয়াউদ্দীন বারনী বলেন যে, "রাজসিংহাসন যেন তাঁর জন্যেই বিশেষভাবে সৃষ্টি করা

হয়েছিল।" তাঁর দানশীলতাও উদারতার অবস্থা এমনছিল যে, একজন সাধারণ ফকীরকেও রাজভান্ডার উজাড় করে দান করতে চাইতেন। এত অধিক দান করেও নিজের দানকে নগণ্য বলে মনে করতেন। দানের বেলায় আপন পর, আমীর, ফকীর সকলই তাঁর দৃষ্টিতে সমান মনে হতো। নিযামউদ্দীন আহমাদ বখ্শী বর্ণনা করেন যে, "জ্ঞানী-গুণী ও সম্মানী যে কোন ব্যক্তিই তার দরবারে গমন করতেন, তাকেই বিভিন্ন সম্মানজনক পুরস্কারে ভূষিত করতেন। খুরাসান, ইরাক, মাওয়ারান্নাহার এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে কেহ তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থী হতো তাকে তিনি রাজ দরবারের পক্ষ হতে অফুরন্ত দানে ধন্য করতেন। অতঃপর তার জীবনে আর কোন বস্তু প্রার্থনার প্রয়োজন বাকী থাকতো না। তিনি এত তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও মেধাসম্পন্ন ছিলেন যে, কোন ব্যক্তিকে দেখা মাত্র প্রথম দৃষ্টিতেই তার ভাল-মন্দ বলে দিতে পারতেন এবং তার কিছু বলার পূর্বেই তার মনের ভাব সম্পর্কে অবগত হতে পারতেন। অধিকন্তু তিনি ইতিহাস শাস্ত্রের বিজ্ঞ পন্ডিতও ছিলেন। তাঁর স্মরণ শক্তি এত প্রখর ছিল যে যদি কোন কথা একবার শুনতেন, তবে জীবনে তা কখনও ভুলতেন না। ইতিহাস-শাস্ত্র ব্যতীত দর্শন, চিকিৎসা-বিদ্যা, বিজ্ঞান জ্যোতি-বিদ্যা, শরীর-বিদ্যা এবং তর্কশাস্ত্রে বিশেষভাবে সুপন্ডিত ছিলেন। এসব বিদ্যার প্রতি তিনি এত অনুরাগী ছিলেন যে, তাঁর রাজত্বকালেও অধিকাংশ সময় বিভিন্ন বিজ্ঞানের পুস্তক অধ্যয়নে ব্যয়িত হতো। তিনি একজন মিষ্টভাষী সুবক্তা ও ছিলেন। আরবী ও ফার্সী ভাষায় এত উন্নত ধরনের চিঠিপত্র লেখতেন যা দেখে বড় বড় সাহিত্যিক ও লেখক পর্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হতেন তাঁর চিঠিপত্রগুলোও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর ছিল। বিখ্যাত লেখকও তাকে একজন পাকা লেখক বলে মনে করতেন। (তারিখে ফিরিশতা ২য় খণ্ড, ১০ পৃঃ দ্রঃ)

এইসব শিক্ষামূলক বিষয়ে পরিপূর্ণ মেধাশক্তি সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় অনুভূতি ও একাগ্রতা এবং শরীয়তের অনুসারী হওয়ার ব্যাপারে এত পরিপক্ক ছিলেন যে, নিয়মিত নামায-রোযা ব্যতীত ও মুস্তাহাব নফল, অযীফা ইত্যাদি ইবাদত ও যথারীতি আদায় করতেন। নিষিদ্ধ

কাজ কর্ম ও মাদক দ্রব্য থেকে সর্বদা বিরত থাকতেন। জনগণের প্রতি ও শরীয়তের নির্দেশ প্রতি পালনের কঠোর তাকীদ ছিল। নামায পড়ার জন্য সকলকেই তাকীদ করতেন। ইবনে বতুতা বর্ণনা করেন যে, "সুলতানের নির্দেশ ছিল—যে ব্যক্তি জামাআতের সাথে নামায পড়বে না তাকে শাস্তি দেয়া হবে তিনি অনেক লোককে নামাযের তদারকির জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, তারা নামাযের সময় যেসব লোককে বাজারে পেতেন, তাদের গ্রেফতার করে। নিয়ে আসতেন। সুলতানের নির্দেশ ছিল—সকলই যেন নামায ও ইসলামের অন্যান্য আদেশ নিষেধ যথাযথভাবে পালন করেন। সুতরাং মানুষ বাজারেও চলাফেরার সময় নামাযের মাসআলা শিক্ষা করতো। অনেকে কাগজে লেখে লেখে পড়তো। রাষ্ট্রীয় নির্দেশের প্রতি ক্রিয়া এমন হল যে, গায়ক-গায়িকারা পর্যন্ত নামাযের অনুসারী হয়ে গেল। ইবনে বতুতা—আমীর সাইফুদ্দীনের বিয়ের অবস্থা সম্পর্কে লেখেন যে, "আমি তথায় উপস্থিত থেকে দেখেছি যে, নামাযের আযান হতেই প্রত্যেক গায়ক-গায়িকারা অযু করে নামায পড়তে শুরু করেছে"।

নামায-রোযার অনুসরণ করা ব্যতীত ও সুলতান সাধারণভাবে রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ও শরীয়তের নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি রাষ্টীয় ব্যাপারে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার পূর্বে আলেমগণের নিকট থেকে এ ব্যাপারে 'ফতোয়া' (শরীয়তী নির্দেশ) চেয়ে নিতেন। অনেক সময় তিনি এ ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে বিতর্ক ও করতেন। তিনি আলেমগণকে বলে রেখেছিলেন, "যদি কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয় এবং আপনারা যদি এ ব্যাপারে সত্য গোপন করেন, তবে এর সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব আপনাদেরকেই বহন করতে হবে"। ("মুন্তাখাবুত্তাওয়ারিখ", মুল্লা আবদুল কাদের বাদাইউনী দ্রঃ)

ইবনে বতুতা লেখেন যে, "আমি সুলতান মুহাম্মদ তুগলক থেকে অধিক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি দেখিনি। একদা এক হিন্দু আমীর দাবী করলেন যে, বাদশাহ তাঁর ভাইকে বিনা কারণে হত্যা করেছেন। কাজীর আদালতে এ ব্যাপারে মুকদ্দমা দায়ের করা হল। বাদশাহ তখন কোন প্রতিরক্ষা ব্যতীতই একজন সাধারণ অপরাধীর মত কাজীর আদালতে উপস্থিত হলেন।

বাদশাহ কাজীকে সালাম দিলেন এবং যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করলেন। পূর্বেই নির্দেশ জারি ছিল যে, বাদশাহ যদি আদালতে উপস্থিত হয়, তবে তাঁর সম্মানার্থে কাজীর দণ্ডায়মান হওয়া প্রয়োজন নেই। মুকদ্দমার শুনানী শেষে কাজী সাহেব 'রায়' দিলেন যে, "বাদশাহর উপর উত্থাপিত অভিযোগ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে"। সুতরাং তাঁর কর্তব্য হল—তিনি বাদী পক্ষ অর্থাৎ হিন্দু আমীরকে সন্তুষ্ট করতে হবে। অন্যথায়—"কিসাস" (খুনের বদলে খুন) নেওয়া হবে। অতএব বাদশাহ আমীরকে সন্তুষ্ট করলেন এবং কাজী সাহেবও তাঁকে মুক্তি দিয়ে দিলেন।

এর চাইতে আশ্চর্যজনক আর একটি ঘটনা এই যে, জনৈক আমীরের ছেলে দাবী করলেন যে, বাদশাহ তাকে বিনা কারণে প্রহার করেছে। কাজীর সামনে বিষয়টি উত্থাপিত হল। কাজী সাহেব নির্দেশ দিলেন যে, "বাদশাহ হয়তঃ ছেলেটিকে সন্তুষ্ট করবেন, নয়তঃ "কিসাস" (প্রহারের বদলে প্রহার) দিবেন"। ইবনে বতুতা নিজ চক্ষে দেখা ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, "আমি স্বচক্ষে দেখলাম যে, বাদশাহ উল্লিখিত ছেলেটিকে রাজ দরবারে ডেকে এনে তার হাতে একটি 'বেত' প্রদান করে বললেন, "নিজের প্রতিশোধ নিয়ে নাও। আমি তোমাকে শপথ দিয়ে বলছি, আমি তোমাকে যেভাবে প্রহার করেছিলাম তুমিও আমাকে সেইভাবে প্রহার কর"। সুতরাং ছেলেটি বাদশাহকে একুশটি বেত্রাঘাত করল। এমনকি এক পর্যায়ে বাদশাহর মুকুট মাথা থেকে পড়ে গিয়েছিল। ("সফর নামা ইবনে বতুতা" ২য় খণ্ড, ১৩০ পৃঃ দ্রঃ)

তা ছাড়া তাঁর উচ্চাকাংক্ষা ও মনোবল এমন ছিল যে ঐতিহাসিক ফিরিশতা এবং নিযাম উদ্দীন আহমদ বখশীর বক্তব্য অনুসারে সপ্ত রাজ্যের রাজত্ব ও তাঁর নিকট একটি সুতী চাদর থেকে অধিক মূল্যবান বলে মনে হতো না"। ("তারিখে ফিরিশতা" ২য় খণ্ড ৯ পৃঃ দ্রঃ)

৭৩৮ হিজরীতে তিনি এক লক্ষ্যের একটি বীর সেনাবাহিনী আপন ভাগিনে খসরু মালিকের তত্ত্বধানে 'চীন' বিজয়ের উদ্দেশ্যে আসামের পথে প্রেরণ করেন। তাছাড়া ইরান জয়ের উদ্দেশ্যে ও তিনি সৈন্য প্রেরণ করে ছিলেন। কিন্তু উভয় সেনা দলই ব্যর্থ হয়।

এই সব গুণাগুণ ও পূর্ণত্ব এবং চারিত্রিক সৌন্দর্য্যের কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই যে সমস্ত প্রদেশের আইন-শৃংখলার পরিস্থিতি লন্ড-ভন্ড হয়ে গিয়েছিল, তা তিনি সুশৃংখলাবদ্ধ করে শক্তিশালী করেন। বিভিন্ন প্রকার টেক্‌স্‌ আদায় পদ্ধতি এমন উন্নত হল যে, এ সম্পর্কে "তাবকাতে আকবরী" এর লেখক বর্ণনা করেন, "প্রাদেশিক গভর্নর ও কর্মচারীদের দৃঢ়তা এমন পর্যায়ে পৌছে দিল যে, কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির পক্ষেও রাজ কোষের একটি পয়সা ও এদিক সেদিক করার ক্ষমতা ছিল না। রাজ্যের সমস্ত প্রজা ও জমিদারগণ জনসেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হতো। রাজ্যের বিভিন্ন দিক থেকে রাজকোষে এত অধিক পরিমাণ ধন-সম্পদ জমা হতে লাগল যে, বিভিন্ন খাতে অধিক পরিমাণে খরচ করে ও তা, শেষ করা যেতো না।

বিশেষভাবে স্মরণ যোগ্য যে, রাজ্যের খাজনা টেক্‌স্‌ আদায়ের এত উন্নত সুব্যবস্থা থাকা সত্ত্বে ও তিনি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন, যাতে রাজকোষে একটি পয়সা ও অবৈধভাবে সঞ্চিত না হয়। সুতরাং ইবনে বতুতার বর্ণনা অনুযায়ী ৭৪২ হিজরীতে বাদশাহ নির্দেশ জারি করলেন যে, যাকাত এবং 'উশর' (১/১০ অংশ) ব্যতীত অন্যান্য টেক্‌স্‌ 'মাওকুফ' করে দেয়া হল"। ("সফরনামা ইবনে বতুতা" ২য়-খন্ড, ১৩১ পৃঃ দ্রঃ)

ইনসাফ বা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সপ্তাহের দু'দিন—বুধবার ও বৃহস্পতিবার আদালত প্রাঙ্গণে একটি মুক্তাঙ্গণ আদালত বসতো। সেই দিন তথায় শুধু (১) আমীর হাজেব (প্রধান প্রহরী) (২) খাছ হাজেব (বিশেষ প্রহরী) (৩) সাইয়্যেদুল হাজেব (প্রহরী সর্বাধিনায়ক) (৪) শরফুল হাজেব (সম্মানিত প্রহরী প্রধান) এই চার জন পুলিশ অফিসার নিযুক্ত থাকতেন। জনগণের মাঝে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল যে, যার যে কোন বিষয়ে অভিযোগ আছে, তা' যেন তারা এই চার জন পুলিশ অফিসারের যে কোন্ একজনের কাছে ডাইরী করেন। সকল অভিযোগ ডাইরী যুক্ত হলে বাদশাহ এশার পর নিজেই সেগুলো তদারক করতেন। যদি বাদশাহ কোন ক্রমে জানতে পারতেন যে, তাদের মধ্যে কেহ কোন অভিযোগকারীর অভিযোগ ডাইরীভুক্ত করতে অস্বীকার

করেছেন. কিংবা স্বীয় কর্তব্যে অবহেলা বা অলসতা করেছেন, তবে তার প্রতি তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হতেন।

স্বেচ্ছাচারিতা ও চঞ্চলতা

উল্লিখিত চারিত্রিক সৌন্দর্য ও পূর্ণত্বের গুণাগুণ থাকা সত্ত্বেও সুলতান মুহাম্মদ তুগলক অপরিসীম স্বেচ্ছাচারী, কঠোরতাপ্রিয় এবং চণ্ডমনা ছিলেন। এই কারণেই তাঁর ব্যক্তিত্ব ঐতিহাসিকদের নিকট এক আশ্চর্যজনক ও অভূতপূর্ব চরিত্র হিসেবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর চঞ্চলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে সবচেয়ে দুঃখজনক এবং আশ্চর্যজনক কার্য ছিল এই যে, একদা তাঁর মনে জাগল যে সমগ্র ভারতবর্ষ দিল্লী রাজধানীর চাবিকাঠি। সুতরাং রাজধানীকে এমন স্থানে স্থাপন করা চাই, যা'তে অধিকৃত নগরসমূহের সাথে একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং কেন্দ্রের সাথে সব কিছুর যোগাযোগ থাকে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কিছু সংখ্যক লোক 'আজিনে'র নাম প্রস্তাব করলো। কিন্তু সুন্দর আবহাওয়ার দিক দিয়ে দেবগিরীকে রাজধানী করা বাদশাহর অধিক পছন্দনীয় ছিল।

তাই তিনি দিল্লীর সমস্ত অধিবাসীকে দেবগিরীতে যেয়ে বসতি স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। হাকীমের হুকুম যেন অতর্কিতে মৃত্যু। সুতরাং দিল্লী জনশূন্য হয়ে উজাড় হল। দিল্লী এখন মানুষের স্থলে পশু পাখীর বাসস্থানে পরিণত হল। এদিকে দেবগিরী 'দৌলত আবাদ' নতুন নামে আবাদ হয়ে একটি সুন্দর নগরে পরিণত হল। ঐতিহাসিক ফিরিশতা বর্ণনা করেন যে, রাজধানী পরিবর্তনের ফলে জন সাধারণের সার্বিক অবস্থার ও আমূল পরিবর্তন হল এবং রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে স্থবিরতা দেখা দিল। অতঃপর কিছু দিন পরে পাঞ্জাব ও মুলতানে বিদ্রোহ হল। সুলতান এই বিদ্রোহ দমন করতে নিজেই তথায় গমন করেন। এবার তিনি তাঁর ভুল সিদ্ধান্ত অনুভব করতে পারলেন। দৌলতআবাদে পুনরায় ঘোষণা দিলেন যে, যে ব্যক্তি দিল্লী চলে যেতে চায় সে যেতে পারে। এই ঘোষণার পর হাজার হাজার লোক দিল্লী ফিরে এলেন। দিল্লীশহর পুনরায় জনমানবে পরিপূর্ণ হল। অনেক ঐতিহাসিক ইহাকে তুগলকের চঞ্চল মতি এবং

অনেকে তাঁর পাগলামী বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আমাদের বন্ধু, প্রফেসর খালিক আহমদ নিযামী, এম, এ, তাঁর লেখা 'সুলতান মুহাম্মদ তুগলকের ধর্মীয় অনুভূতি নামক পুস্তকে—মার্চ, ১৯৪৬ খৃীস্টাব্দে লিখেছেন যে, সুলতান যা কিছু করেছেন, তা ধর্ম প্রচারের অনুভূতিতেই করেছেন। তার লেখার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ।

"তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টি শক্তির ফলে তিনি মনে করেন যে, যেখানে মুসলমানদের বসতি নেই-সেখানে ইসলামী রাজত্বের ভিত্তি মজবুত হতে পারে না। তাই এ ব্যাপরে যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুতরাং দাক্ষিণাত্যের সার্বিক অবস্থার উপর যখন তিনি চিন্তা করলেন, তখন তাঁর দূরদৃষ্টি এদিকেই নিপতিত হল। তিনি অনুভব করলেন যে, এই পরিপ্রেক্ষিতে শক্তি সঞ্চয় ব্যতীত দাক্ষিণাত্যে সরাসরি রাজত্ব করা সম্ভব নয়। আলাউদ্দীনের মত বাদশাহ ও সেখানে শুধু টেক্স্ আদায় করেই ক্ষান্ত হলেন। তাঁর দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ আরো গভীরে গিয়ে পৌঁছল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই ভূ-খন্ডে যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে না পারবে ততক্ষণ দিল্লী থেকে এর রাজত্ব করার স্বপ্ন কোন সময়ই সফল হবেনা। সুতরাং তিনি চেষ্টা করলেন যে, উলামা ও মাশায়েকগণকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা চাই।যেন তারা তথায় গিয়ে ইসলাম প্রচার করতে পারেন এবং মুসলমানদের বসতি আরো ব্যাপক করতে পারেন। রাজধানী পরিবর্তনের যে কথাটি শুনা যাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি কি ছিল? মূলতঃ এটা উল্লিখিত বিষয়ের একটি প্রচেষ্টা মাত্র ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ বিষয়টি এমন ভাবে উপস্থাপন করলেন যে, তা হাস্যাস্পদ হয়ে গেল। প্রকৃত পক্ষে সুলতান মুহাম্মদ তুগলক স্বীয় রাজধানী দিল্লী থেকে পরিবর্তন করেননি বরং তিনি শুধু আলিম ও মাশায়েখগণকে দেবগিরী (দৌলত আবাদ) প্রেরণ করেছিলেন, যেন তাঁরা তথায় গিয়ে ইসলামের প্রচার কার্য চালাতে পারেন। বাস্তবে তার সৈন্য সামন্ত, ধনাগার এবং সরকারী অফিস আদালত দিল্লীতেই ছিল।...............সুলতান যে উদ্দেশ্যে দিল্লীর বুযুর্গদেরকে 'দেবগিরী' প্রেরণ করেছিলেন, তা' এই ঘটনা থেকে বুঝাযায় যে, "মীর খোরদ্" লেখেন—দেবগিরী' যাত্রার প্রাক্কালে সুলতান একটি সাধারণ সভা করলেন এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে জনগণকে জিহাদের প্রতি

উৎসাহ প্রদান করেন। এই সভায় মাওলানা ফখর উদ্দীন, মাওলানা শামছুদ্দীন চেরাগ দেহলবী (রঃ) ও উপস্থিত ছিলেন। (সায়রুল আউলিয়া" ১২৩১ পৃঃ দ্রঃ) অতঃপর একটু আগে বেড়ে লেখেন "ডঃ মেহদী হোসাইনের লেখা "মুহাম্মদ ইবনে তুগলকের উত্থান ও পতন" নামক পুস্তকে উল্লেখ আছে যে, "শুধু মুসলমানদেরকেই তিনি 'দেবগিরী' প্রেরণ করেছিলেন'। একথার প্রমাণ ঐতিহাসিক-বারনী 'মীর খোরদ' এবং 'ইসামী' এর বর্ণনা মতেও পাওয়া যায়। অতঃপর তিনি এই তিনজন ঐতিহাসিক থেকেও দলীল প্রমাণ পেশ করেছেন। বর্ণনা দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় আমরা তা' পরিহার করলাম।

যা হউক-এতে সন্দেহ নেই যে, যদি মুহাম্মদ ইবনে তুগলক এই সব কিছু ইসলামের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই করে ছিলেন তবুও তিনি যে ভাবে তা করেছেন, তা'তে তার চঞ্চলমনা, কঠোরতা প্রিয় এবং স্বেচ্ছাচারি চিত্রই প্রতি ফলিত হয়েছে। আরো আক্ষেপের বিষয় যে, তার নিয়্যত উত্তম থাকা সত্ত্বেও তিনি যে কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, তা'তে উপকার ব্যতীত দিল্লীর কেন্দ্রীয় ও ইসলামী শক্তির বিবাট ক্ষতি হয়েছে এবং সমগ্র দেশে অশান্তি, অসন্তোষ ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাঁর রাজত্বকালে দিল্লী এবং এর আশে-পাশের এলাকায় এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যে, ১৭ টাকায় ও ১ সের খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যেত না। দেশের মানুষ এমন কি চতুষ্পদ জন্তু পর্যন্ত ঘাসের অভাবে মরতে লাগল। সুলতান এই অবস্থা কাটিয়ে উঠার বহু চেষ্টা করেছেন এবং কৃষকদের সাথে সহযোগিতাও করেছেন, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর কমলো না। ঐতিহাসিক 'ফিরিশতা' লেখেন যে "রাজধানী এবং এর আশে-পাশের এলাকায় আল্লাহর রোষ ও গযবের তলোয়ার যেন কোষমুক্ত হয়ে গিয়ে ছিল। "তারিখে ফিরিশতা'—২য় খন্ড, ২৩ পৃঃ দ্রঃ) বড় বড় কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায় এবং অন্যান্য কারণে রাজকোষ খালি হয়ে গেল। এই শূন্যতা পূর্ণ করার জন্য তিনি জনসাধারণের উপর বিশেষ করে হিন্দুদের উপর অধিক টেক্স ধার্য করেন। জনগণ এইসব অতিরিক্ত টেক্স পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে অনেকে বাড়ী-ঘর, পালিত পশু এবং শস্য ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে

জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিল। অপর দিকে তিনি তামার মুদ্রা-প্রচলন করায় বাহির দেশের বণিকরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। ফলে বাহির দেশের সঙ্গে বাণিজ্য অচল হয়ে গেল। হাট-বাজার স্তিমিত হয়ে গেল। ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে গেল। দারিদ্র্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

সাধারণ অনিয়ম ও দুরবস্থা, অধঃপতন ও অস্থিরতা এবং অশান্তি দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও আইন শৃংখলার উপর বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। কয়েকটি প্রদেশ দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পৃথক হয়ে গেল। বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের কিছু অঞ্চল এমনভাবে স্বাধীন হয়ে গেল যে, তৎপর মুসলমানদের তা পুনরায় জয় করার ভাগ্য হল না। বিজয় নগরের বিস্তীর্ণ হিন্দু রাজত্ব এবং দাক্ষিণাত্যে 'বাহমনী' রাজত্বের ভিত্তি সুলতান মুহাম্মদ তুগলকের রাজত্বকালেই স্থাপিত হয়েছিল। সুলতান আলাউদ্দীন খালজীর রাজত্বের রাজ্যসীমার অনুপাতে মুহাম্মদ ইবনে তুগলকের রাজত্বকালে দিল্লীর সীমারেখা সংকীর্ণ হয়ে বহু পরিমাণে কমে গেল। তৎকালের কয়েকজন সম্মানিত শায়খ ও সুফীর (সাধু পুরুষ) সাথে সুলতান কাজ কারবার ভাল ছিল না। ইবনে বতুতার বর্ণনা অনুযায়ী সুলতান চাইতেন যে, এই সব মাশায়েখ এবং আলেমগণের মধ্যে সবচেয়ে অধিক ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগ আলী দেহলবী (রঃ) দ্বারা নিজের ব্যক্তিগত কিছু কাজ করাবেন। কিন্তু হযরত চেরাগ দেহলবী ইহা অস্বীকার করলেন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে অধিক আশ্চর্যজনক ও শিক্ষামূলক ঘটনা হল হযরত শায়খ শিহাবউদ্দীন (রঃ) যিনি শায়খুল ইসলাম জাম জিন্দাপীরের বংশধর ছিলেন এবং দিল্লীর মহান শায়খদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি বাদশাহর অত্যাচার এবং স্বেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ঠ হয়ে দিল্লীর বাইরে ছয় মাইল দূরে এক গুহায় গিয়ে আশ্রয় দিলেন। একদা বাদশাহ তাঁকে ডাকালেন। তিনি রাজদরবারে উপস্থিত হতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, আমি এই অত্যাচারী বাদশাহর সেবা কখনও করবো না। বাদশাহ তাঁকে গ্রেফতার করে তাঁর দরবারে উপস্থিত করালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি আমাকে

অত্যাচারী বলেছেন? শায়খ উত্তর দিলেন, হাঁ, আপনি অত্যাচারী এবং অমুক অমুক অত্যাচার করেছেন। এতদসঙ্গে দিল্লী শহর জন শূন্য করার এবং এখানকার জনগণকে "দৌলত আবাদ" নিয়ে যাওয়ার কথাও শায়খ উল্লেখ করলেন। সুলতান মুহাম্মদ তুগলক স্বীয় তলোয়ার বের করে সদর জাহানের হাতে দিলেন এবং বললেন, "আমাকে অত্যাচারী হিসেবে সাব্যস্ত করুন এবং আমার গর্দান এই তলোয়ার দ্বারা উড়িয়ে দিন"। শায়খ বললেন, যে ব্যক্তি আপনার উপর অত্যাচারের সাক্ষ্য দিবে সে তো নিজের মৃত্যু ডেকে আনবে। কিন্তু আপনি তো নিজেই ভাল জানেন যে, আপনি একজন অত্যাচারী"। বাদশাহ তখন শায়খের হাত পা জিঞ্জিরাবাজ করার নির্দেশ দিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর চৌদ্দ দিন অতিবাহিত হল, তিনি কিছুই আহার করেন নি। চৌদ্দ দিনের পর বাদশাহ তাঁর নিকট কিছু খাদ্য দ্রব্য প্রেরণ করলেন। তিনি বাদশাহ প্রদত্ত খানা খেতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, আমার খাদ্য পৃথিবী থেকে উঠে গিয়েছে। বাদশাহর খাদ্য তাঁর কাছেই ফেরত নিয়ে যাও। এটা শুনে বাদশাহ আরো রাগান্বিত হলেন এবং বললেন যে, শায়খকে জোর করে কিছু গোবর খাওয়ায়ে দাও। অতএব কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী তাঁকে জবরদস্তি করে মাটিতে শোয়ায়ে বাদশাহ এই অমানবিক আদেশ কার্যকরী করল। এই ঘটনার দ্বিতীয় দিন শায়খকে কাযী সদর জাহানের নিকট নিয়ে যাওয়া হল। তথায় উপস্থিত সকল জনতা তাঁকে তার পূর্বের বক্তব্য প্রত্যাহারের অনুরোধ করলো, কিন্তু শায়খ তা মানলেন না পরিশেষে তাঁকে (হত্যা) শহীদ করে দেয়া হল। ('সফর নামা ইবনে বতুতা' ২য় খণ্ড, ১৩৭ ১৩৯ পৃঃ দ্রঃ)

বর্তমান যুগের অনেক ঐতিহাসিক সুলতানের এই কলঙ্ক মুছে ফেলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সর্বাবস্থায় এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সুলতানের ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব, কঠোরতা প্রিয়, স্বেচ্ছাচারিতা এবং ভারসাম্যহীন চিন্তাধারাও তার অধঃপতনের মূল কারণ নয়। বাদশাহ দেশের দুরবস্থা ও দৈনন্দিন অধঃপতন নিজেও অনুভব করছিলেন। তিনি তৎকালের বিখ্যাত ঐতিহাসিক যিয়াউদ্দীন বারনীকে বলেছিলেন, আমার

স্বাস্থ্যের প্রতিটি অঙ্গেই বিভিন্ন ব্যাধি সৃষ্টি হয়েছে। যদি একটি ব্যাধির চিকিৎসা করি তবে অন্যটির উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। আপনারা তো ইতিহাসে যথেষ্ট চর্চা করেছেন, বলুন তো এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? বারনী বলেন যে, "আমি উত্তর দিলাম, যদি কোন বাদশাহর প্রতি জনগণের অনীহা সৃষ্টি হয় এবং দেশে বিশৃংখলা ও গণ্ডগোলের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তবে কর্তব্য হল স্বীয় ভ্রাতা কিংবা পুত্রকে রাজ্যের শাসনভার দিয়ে নির্জন বাস অবলম্বন করা। আর যদি রাজ্য শাসন পরিত্যাগ করতে মন না চায় তবে যে সব কথা বা কাজে জনগণের ঘৃণা বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়, তা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। সুলতান উত্তর দিলেন, আমার এমন কোন সন্তান নেই। আমার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং আমিও রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করবো না। যা কিছু হবার তাই হবে, তাতে আমার কোন পরওয়া নেই।

পরিশেষে এই দুঃখজনক অবস্থায় যখন দেশ ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হলো, রাজ ভাণ্ডার শূন্য হল, জনগণের উপর অশান্তি নেমে এল, স্থানে স্থানে বিভিন্ন বিদ্রোহ এবং দিল্লীর শাসকের বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতা শুরু হল তখন ২৭ বছর রাজত্ব করার পর ২১শে মুহাররম ৭৫২ হিজরী মুতাবেক ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইন্তিকাল করলেন। ঐতিহাসিক ফিরিশতা সেই সময় নিম্নলিখিত কবিতাটি লেখেন যা বাদশাহ নিজেই তাঁর অন্তিমকালে পাঠ করেছিলেন।

بسیار درین جهان چمیدیم - بسیار نعیم و ناز دیدیم -
بسیار بلند بر نشستیم - ترکان گران بها خریدیم -
کردیم بسی نشاط آخر - چون قامت ماه نو خمیدیم -

"এই পৃথিবীতে আমি অনেক ভ্রমণ করলাম এবং অনেক ভোগ বিলাসের সামগ্রীও দেখলাম। অনেক উঁচু ঘোড়ার উপর আরোহণ করলাম। তুরস্কের অনেক মূল্যবান ও সুন্দর জিনিস ক্রয় করলাম। জীবনে অনেক চিত্তবিনোদনমূলক কাজ ও করলাম। পরিশেষে নতুন চাঁদের মত বেঁকে গেলাম"।

সুলতান ফিরোযশাহ তুগলক

মুহাম্মদ ইবনে তুগলকের ইন্তিকালের পর তাঁর চাচাতো ভাই ফিরোযশাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফিরোযশাহ সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুগলকের আপন ভাই সেনাপতি রজবের ছেলে ছিলেন। তাঁর মাতা ছিলেন দীবালপুরের এক রাজ কন্যা, যিনি বিবি 'নালাহ' নামে বিখ্যাত ছিলেন সেনাপতি রজবের সাথে বিয়ে হওয়ার পর তাঁকে 'কদবানু' বলে ডাকা হতো। ৭০৯ হিজরীতে সুলতান ফিরোযশাহ জন্মগ্রহণ করেন। তার সাত বছর বয়সের সময় পিতা ইন্তিকাল হয়। অতঃপর তার চাচা অর্থাৎ সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুগলক নিজ তত্ত্বাবধানে তাকে লালন-পালন করেন। সুলতান গিয়াস উদ্দীনের সিংহাসন আরোহণের সময় তার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর পুণ্যবান চাচা স্বীয় উদীয়মান ভাতিজার প্রতি এই অনুগ্রহশীল ছিলেন যে, তিনি সর্বদা ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিজের সঙ্গে রাখতেন এবং ফলে ফিরোযশাহ তার রাজত্বকালে আইন-শৃংখলা সম্পর্কে বেশ বুৎপত্তি লাভ করে। সুলতান তুগহকের ইন্তিকালের পর মুহাম্মদ ইবনে তুগলক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর অসাধারণ অনুগ্রহশীল ছিলেন। এমনকি তিনি ফিরোযশাহকে উপ-প্রধান আমীর হাজেব হিসেবে নিয়োগ করে, নায়েব বারযাক উপাধি প্রদান করেন। আফীফ শামসুস সিরাজ বর্ণনা করেন যে, সুলতান মুহাম্মদ ফিরোযশাহকে সদা সর্বদা নিজের সামনে রাখতেন। যদিও কখনও কখনও ফিরোযশাহের উপর অপরিসীম কঠোরতাও করতেন, কিন্তু এর উদ্দেশ্য ছিল শুধু ফিরোযশাহকে সাংসারিক কাজ কর্ম পরিপক্ক করে গড়ে তোলা। ("তারিখে ফিরোযশাহী, মুকাদ্দমা আউয়াল ও দোত্তম")

সুলতান মুহাম্মদ যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, তখন ফিরোযশাহ তার খুব সেবা-শুশ্রূষা করেন। সুলতান মৃত্যুর সময় অসীয়ত করে যান যে আমার পর ফিরোযশাহ বাদশাহ হবে। কিন্তু ইচ্ছানুযায়ী আলিমগণ, মাশায়েখগণ এবং অন্যান্য আমীর রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সম্মিলিতভাবে যখন ফিরোযশাহকে সিংহাসনে আরোহণের আহবান জানালেন, তখন তিনি বললেন, 'আমি হজ্জ ও হারামাইন শারিফাইন (মক্কা ও মদীনা

পরিভ্রমণের মনস্থ করেছি। অতএব আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে এই সম্মানিত পদের জন্য মনোনীত করুন"। কিন্তু সেই সময়ে দেশের সার্বিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। দিল্লীতে এবং অন্যান্য অঞ্চলে তখন মুগলরা উৎপাত শুরু করেছিল। তবুও রাজ্য শাসনের জন্য ফিরোযশাহের মত অন্য কোন উপযুক্ত লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলিম ও মাশায়েখগণ যাঁদের মধ্যে শায়খ নাসির উদ্দীন চেরাগ দেহলবী (রঃ) ও মাখদুম যাদাহ আব্বাসী এবং রাজ্যের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ একবাক্যে ফিরোযশাহকে বাদশাহ বলে মেনে নিলেন। আমীর তাতার খান, যিনি এই সভায় সবচেয়ে অধিক বষীয়ান ছিলেন, তিনি ফিরোযশাহকে হাতে ধরে জোর পূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করায়ে দিলেন। বাদশাহর সদিচ্ছা, আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা এবং আল্লাহ্ ভীতির পরিমাপ এতেই করা যায় যে, তখন তাঁকে জোরপূর্বক সিংহাসনে বসানো হচ্ছিল তখন তিনি বললেন, আচ্ছা যদি আপনারা এই গুরু দায়িত্ব আমার কাঁধে অর্পণ করতেই চান তবে একটু ধৈর্য ধরুন। আমি অযু করে নেই। অতএব অযুর পর দু'রাকাআত নামায পড়লেন এবং দীর্ঘসময় পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদায় থেকে প্রার্থনা করলেন, 'হে আল্লাহ্ ! দেশের শান্তি শৃংখলা, জন কল্যাণমূলক কাজ, আইন-শৃংখলা রক্ষা করা এবং সুন্দরভাবে রাজ্যশাসন করা মানুষের শক্তি সামর্থ্যের বাইরে। বিশ্বের শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা তোমার পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। হে আল্লাহ তুমিই আমার শক্তি ও আশ্রয় স্থল।" (তারিখে ফিরোযশাহী তৃতীয় মুকদ্দামা দ্রঃ)

সুলতান ফিরোযশাহ প্রায় ৩৮ বছর (১৩৫১—১৩৮৮ খৃঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু বাস্তবিকই তিনি একজন মুসলমান বাদশাহ হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। একজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের বর্ণনা মতে "তিনি স্বীয় রাজ্য বিস্তারের তেমন আকাংক্ষী ছিলেন না, যেমন স্বীয় ধর্ম প্রচারের প্রতি আগ্রহী ছিলেন"। (History of India. Page No. 109 By Delafans.)

তাঁর রাজত্বকালে দেশে শান্তি-শৃংখলা বিদ্যমান ছিল। জনহিতকর কার্য এবং প্রজা প্রতিপালনের দিক দিয়ে তাঁর রাজত্বকাল দিল্লীর রাজত্বের

এক স্বর্ণযুগ ছিল। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি ঐ সমস্ত জেল-বন্ধীদেরকে মুক্তি দিয়ে দেন যাদেরকে মুহাম্মদ ইবনে তুগলক অন্যায়ভাবে বন্ধী করে রেখেছিলেন। আর যাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল, তিনি তাদের উত্তরাধিকারদের ক্ষতিপূরণ দেন। যাদের সহায় সম্পত্তি এবং জায়গীর রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল, তা তিনি ফেরত দিয়ে দেন যাদের উপর কঠিন টেক্সের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল তাদেরকে তিনি তা থেকে মুক্ত করে দেন।

সুলতান মুহাম্মদ ইবনে তুগলকের রাজত্বকালে অনেক প্রদেশই স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল এবং দিল্লীর সীমারেখা অতি সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ফিরোযশাহ এই গুলোকে পুনরায় জয় করার পরিবর্তে তাদের স্বঘোষিত স্বাধীনতা মেনে নিলেন। অবশ্য অনিচ্ছাকৃতভাবেই তিনি বঙ্গদেশ জয় করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সফলকাম হতে পারেন নি। তাঁর দখলী রাজ্য টুকু সংরক্ষণের উপরও তাঁর অধিক দৃষ্টি ছিল। তাঁর বিশেষ ইচ্ছে ছিল যে, তিনি দেশকে একটি খাঁটি ইসলামী দেশে রূপান্তরিত করে তাতে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়িত করবেন। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সমাধা করেন।

১. প্রথম যুগের বাদশাহদের রাজত্বকালে মুসলমানদের উপর যেসব অত্যাচার করা হতো, তিনি তা রহিত করেন। সমস্ত দাস-দাসীদের জন্য বেতন নির্ধারণ করেন এবং আইন জারি করে দেন যে, যদি তাদের কেহ মৃত্যুবরণ করে তবে তাদের পেশা বা চাকরি তাদের সন্তান সন্তুতিদেরকে প্রদান করা হবে। যদি তার কোন সন্তান না থাকে তবে তার জামাতাকে প্রদান করা হবে। আর যদি জামাতাও না থাকে তবে তাদের দাসকে যদি মৃত ব্যক্তির কোন দাসও না থাকে তবে তার আত্মীয় স্বজনকে দেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে আফীফ শামস্ সিরাজ বর্ণনা করেন যে, "এই ব্যবস্থার ফলে রাজ্যের প্রজাদের বসতি এত বৃদ্ধি পেল যে, দেশের প্রতিটি অঞ্চলের প্রতি চার মাইলে একটি করে গ্রাম আবাদ হল। প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে স্বর্ণ রৌপ্য এবং অন্যান্য জিনিস পত্র ও বিলাসিতার সামগ্রী ঢের মওজুদ হল।

২. খুতবায় তখন ইসলামী বাদশাহদের নাম নেওয়া হতো না। ফিরোযশাহ নির্দেশ দিলেন যে তাঁর নাম খুতবায় পাঠ করা হবে।

৩. প্রথম থেকে যে অবৈধ ও অনৈসলামিক টেক্স প্রচলিত ছিল তিনি সম্পূর্ণরূপে তা বন্ধ করে দেন। কোন কর্মচারী যদি প্রজাদের নিকট হতে একটি পয়সাও অবৈধ টেক্স হিসেবে গ্রহণ করতো তাদেরকে কঠোরতম শাস্তি দেয়া হতো।

৪. পূর্ববর্তী বাদশাহদের রাজত্বকালের প্রথা ছিল যে, (মালে গানীমত) যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চাংশ সৈনিকদের মাঝে বণ্টিত হতো এবং বাকী অংশ রাজকোষে জমা হতো। এ ব্যাপারে সুলতান শরীয়তের নির্দেশ মুতাবিক আদেশ দিলেন যে, শুধু এক পঞ্চামাংশ রাজকোষে জমা হবে এবং বাকী অংশ সৈনিকদের মাঝে বণ্টিত হবে।

৫. যে সব লোক দেশে নাস্তিকতাবাদ ও অধর্মীয় কাজকর্ম বিস্তার করছিল, তাদেরকে কঠোরতম শাস্তি প্রদান করেন। তাদের প্রচার পুস্তকগুলো জ্বালিয়ে দেন। এমনিভাবে দেশ থেকে তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দেন।

৬. মুসলমানদের মাঝে শরীয়তের পরিপন্থী যে সব অবৈধ প্রথা চালু ছিল যেমন 'সহমরণ', মূর্তি তৈরীর করা ও তা ঘরে সংরক্ষণ করা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের থালা-বাসন ব্যবহার ইত্যাদি উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। রাজমহল থেকে পর্যন্ত সমস্ত ফটো ও স্বর্ণ-রৌপ্যের বরতন বাইরে ফেলে দেন।

উল্লিখিত সংস্কারমূলক কর্ম ব্যতীত ও বহু নির্মাণ কার্য সম্পাদন করেন। মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। উলামা ও মাশায়েখদের প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করতেন। বিভিন্ন দিক থেকে অনেক ধর্মীয় পুস্তক সরবরাহ করেন। বিভিন্ন জ্ঞান ও সাহিত্যের অনেক প্রসার ঘটান। সংস্কৃতের কয়েকটি পুস্তক ফার্সীতে অনুবাদ করান। ফিকাহ্‌র বিখ্যাত পুস্তক "ফাতুয়ায়ে তাতার খানিয়া" এবং "ফিকহ ফিরোযশাহী" তাঁর সময়েরই কীর্তি। বাদশাহ "ফতুহাতে ফিরোযশাহী" নামে ৩২ পৃষ্ঠার একটি চটি পুস্তক লিখেছিলেন, যা তিনি 'কোটলা'তে একটি স্তম্ভের মধ্যে খোদাই করে রেখেছিলেন। এতে তিনি নিজের সংস্কারমূলক কাজকর্ম ও কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাছাড়া ও তিনি স্থানে স্থানে হাসপাতাল ও

পান্থশালা নির্মাণ করেন। বহু জলাশয় ও নদী-নালা খনন করান। রাস্তা-ঘাট, পুল ইত্যাদি নির্মাণ ও সংস্কার করা ছাড়াও অসংখ্য জনহিতকর কার্য সম্পাদন করেন। ঐতিহাসিক ফিরিশ্তা ফিরোযশাহের জনহিতকর কার্যসমূহের একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল—

ক্রমিক নং	কার্যের নাম	সংখ্যা
১।	কৃষি কার্যের সুবিধার্থে বাঁধ	৫০ টি
২।	মসজিদ	৪০ টি
৩।	মাদ্রাসা	৩০ টি
৪।	খানকাহ	২০ টি
৫।	প্রাসাদ	১০০ টি
৫।	হাসপাতাল	৫ টি
৬।	গোরস্থান	১০০ টি
৭।	হাম্মাম খানা	১০ টি
৮।	কূপ	১৫০ টি
৯।	পুল	১০০ টি

অতঃপর 'ফিরিশ্তা' লেখেন যে, তা, ছাড়া অসংখ্য ফল-মূলের বাগান রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থে তৈরীর করেন। বাদশাহ প্রতিটি প্রাসাদ নির্মাণ করে তার খরচের জন্য আয়ের কিছু অংশ ওয়াক্ফ করে দেন। প্রত্যেকটি ওয়াক্ফ সম্পত্তির জন্য একটি দলীল করে উহা যথারীতি চালু রাখার নিয়মাবলী ও আইন-কানুন জারি করেন। ফিরোযশাহ আলেম ও ফকীহ্গণের সঙ্গে পরামর্শ করে, হিন্দুদেরকে 'যিম্মী' সাব্যস্ত করে তাদের উপর 'জিযিয়া' কর ধার্য করেন। এর বিনিময়ে তাদেরকে যাবতীয় নাগরিক অধিকার প্রদান করেন, যা, একজন যিম্মির জন্য ইসলাম অনুমোদন করেছে। পরিশেষে নব্বই বছর বয়সে ৩৮ বছর

রাজত্ব করার পর ৭৯১ হিজরী, মুতাবিক ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

আমীর তাইমুর

ফিরোযশাহ তুগলকের ইন্তিকালের পর সমগ্র দেশে বিদ্রোহ ও অশান্তির অগ্নিশিখা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলো। নয় বছরের মধ্যে একেরপর এক কয়েকটি দেশে স্বাধীনতার দাবী উঠলো এবং তাদের সিংহাসনে আরোহণের পর তাদেরকে হত্যা করে দেয়া হল। প্রথমে তাঁর পৌত্র তুগলকশাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং গিয়াস উদ্দীন তুগলকশাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং গিয়াস উদ্দীন তুগলকশাহের নামে রাজত্ব করতে শুরু করেন। এক বছর পূর্ণ হতে না হতেই তাঁকে হত্যা করা হল। অতঃপর তাঁর চাচাতো ভাই আবুবকরশাহ বাদশাহ হন। কিন্তু দেড় বছর পরেই নাসির উদ্দীন মুহাম্মদ তাঁকে হত্যা করেন এবং তিনি নিজেই সিংহাসন অধিকার করে বসেন। তিনি ছয় বছর সাত মাস রাজত্ব করেন। তৎপর তাঁর ছেলে হুমায়ুন খান সুলতান সেকান্দর—নাম ধারণ করে বাদশাহ হন। কিন্তু দেড় মাস রাজত্ব করার পর এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। এবার আমীরদের মধ্যে ক'াকে বাদশাহ বানানো হবে, এই নিয়ে ভীষণ বিরোধিতা শুরু হল। এই বিরোধিতা এত প্রকট রূপ ধারণ করল যে, ১৫ দিন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন স্থির সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হল না। রাজ সিংহাসন খালী পড়ে' রইল। অবশেষে একজন বিখ্যাত আমীর খাজা জাহানের প্রচেষ্টায় নাসির উদ্দীন মুহম্মদের সর্বকনিষ্ঠ ছেলে মাহমুদ'কে ৭৯৬ হিজরীর জমাদিউল উলা-মাসে-সিংহাসনে বসানো হল। তিনি নাসির উদ্দীন উপাধিতে প্রসিদ্ধ হন। কিছুদিন পর "সা'দাতখান" নামী একজন আমীর বিদ্রোহী হন। তিনি সুলতান ফিরোজশাহ তুগলকের পৌত্র নুসরাত খানকে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করানোর চেষ্টা কর

উল্লিখিত তথ্যাবলী' 'তারিখে ফিরোজশাহী, আফীফ শামস্ সিরাজ এবং 'তারিখ ফিরিস্তা' থেকে উদ্ধৃত হয়েছে'।

ছিলেন। সাদাত-ইন্তিকাল করার পর ফিরোয আবাদের আমীরগণ নুসরাত খানকে নিজেদের বাদশাহ মনোনীত করেন। দিল্লীতে বাদশাহ ছিলেন তখন মাহমুদ তুগলক এবং ফিরোয আবাদের ছিলেন-নুসরাত খান। এমনিভাবে একই সিংহাসনে যেন দু'জন শাসক রাজত্ব করছিলেন। এই অবস্থায় দিল্লীর শাসন ব্যবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। দেশের প্রত্যেক দিকে অশান্তি ও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। বাংলা, জৌনপুর, সিন্ধু, গুজরাট, মালোহ এবং দাক্ষিণাত্যে যদিও মুসলমানদের রাজত্ব ছিল, কিন্তু প্রদেশ গুলো ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। দিল্লীর সঙ্গে এ গুলোর কোন সম্পর্ক ছিল না। রাজ পুতানা এবং দক্ষিণ ভারতে হিন্দুদের শক্তিশালী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল। এমন অবস্থায় দিল্লী রাজত্বের শক্তিই বা কতটুকু থাকতে পারে? আর যা' কিছু বাকী ছিল তা' তাইমুর-লং ৮০০ হিজরীতে আক্রমণ করে' একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিল।

আশ্চর্যের কথা যে, তাইমুর নিজের বক্তব্যে-ভারত বর্ষের উপর আক্রমণ করার দু'টি উদ্দেশ্যেই বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হল ইসলামের শত্রু মূর্তিপূজারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং দ্বিতীয়টি হল—মূর্তি পূজারীদের নিকট থেকে মাল-সম্পদ আহরণ করে ইসলামী-সৈন্যদের জন্য জীবনের উপকরণ সংগ্রহ করা। কিন্তু তাইমুরের সীমাহীন অত্যাচার ও অবিচার এবং তার অমানুষিক কার্যকলাপ, দিল্লীতে কয়েকদিন পর্যন্ত সাধারণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার পর লুটতরাজ করে প্রত্যাবর্তন করা, দিল্লী ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরে, এবং ইরান, আঙ্গুরা ইত্যাদি দেশ সমূহে খোদ-মুসলমানদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা এমন কি কোন কোন স্থানে নিহতদের কর্তিত মুণ্ডের দ্বারা মিনার তৈয়ার করা, আঙ্গুরায় সুলতান বায়যীদ ইল্দরমের মত ইসলামের বীর মুজাহিদের সঙ্গে যুদ্ধ করা, অতঃপর তাঁকে গ্রেফতার করে, একটি খাঁচায় আবদ্ধ করে রাখা, এই সবই কি একথার সাক্ষ্য যে, উল্লিখিত কাজ কর্মের কর্তাব্যক্তি ইসলামী প্রেরণা নিয়েই এসব কাজ করেছেন?

তাইমুরের দিল্লী অবরোধের একদিন পূর্বেই মাহমুদ তুগলক দিল্লী ছেড়ে গুজরাটে পালায়ন করেছিলেন। দিল্লী শহর বাসী কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাইমুরে

মুকাবেলা করল। পরিশেষে তাদের জীবনের নিরাপত্তার শর্তে তারা তাইমুরের অনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে নিল। কিন্তু চেঙ্গিযখানের স্থলাভিষিক্ত রা-এই শর্তের উপর এমনভাবে কাজ করলো যে, দিল্লীর পতনের পর তারা সাধারণ হত্যাকান্ড শুরু করে দিল। হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাঠ, অলি-গলি মানুষের মৃত দেহে স্তুপ হয়ে গেল। অবশেষে শহর উজাড় করে ১৫ দিন পর তারা এখান থেকে বিদায় নিল। তৎপর মাহমুদ তুগলকের মন্ত্রী 'মলো-ইকবাল' সুযোগ পেয়ে দিল্লী অধিকার করেন এবং রাজত্ব করতে শুরু করেন। ১৪০৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এক ঝড় উঠলো এবং পরিশেষে তাকে হত্যা করা হল। অতঃপর জনগণ মাহমুদ তুগলককে গুজরাট থেকে ডেকে এনে নিজেদের বাদশাহ বানালেন। ১৪১২ খ্রীস্টব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। কিন্তু তার নিকট অতীত কালের দিল্লীর প্রশস্ত রাজত্ব চলে গিয়ে শুধু দিল্লী শহর টুকুই বাকী ছিল। একারণেই তিনি বাদশাহ উপাধিটুকুও পছন্দ করেননি।

"সৈয়দ (সাদাত) বংশ (১৪১৪—১৪৩০ খ্রীঃ)

মাহমুদ তুগলকের ইন্তিকালের পর দেশে অরাজকতা ও বিশৃংখলা বিস্তার লাভ করল। এমনকি ১৪১৪ খ্রীস্টাব্দে খিযির খান যিনি সিন্ধুর গভর্ণর ছিলেন, দিল্লী জয় করেন। অতঃপর তাঁর তিনজন উত্তরাধিকারী পর্যায় ক্রমে রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাদের রাজ্য সীমা দিল্লীও এর আশ-পাশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। অতঃপর তাদের অধিকাংশ সময় মুসলমানদের প্রতিবেশী রাজাসমূহের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহে অতিবাহিত হয়। খিযির খানের বংশকে এই কারণে সৈয়দ বংশ বলা ছয় যে, খিযির খান মালিক সুলায়মানের পুত্র ছিলেন। তিনি সৈয়দ হওয়ার দাবী করতেন। ঐতিহাসিক ফিরিশতা এই দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য "তারিখ মুবারকশাহী ফিরিশতা এই দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য "তারিখ মুবারকশাহী"র উদ্ধৃত দিয়ে দু'টি দলীল উত্থাপন করেছেন। কিন্তু উভয় প্রমাণের সূত্রই দুর্বল ও অসার।

এই বংশের শেষ সুলতান ছিলেন আলাউদ্দীন ইবনে সুলতান মুহাম্মদ শাহ। কিন্তু তিনি নিজের পিতার ন্যায় অযোগ্য এবং আরামপ্রিয় ছিলেন।

একদা তিনি 'বাদাইনি গেলেন, তথাকার আবহাওয়া তাঁর খুবই পছন্দ হল। সুতরাং সেখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। অথচ এদিকে দিল্লীর অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে গেল। এতদব্যতীত সীমারেখা সংকীর্ণ হয়ে অনেক কমে গেল। এই অবস্থা দেখে পাঞ্জাবের গভর্ণর বাহলুল লোদী দিল্লী এসে শহর দখল করে নিলেন। অতঃপর তিনি বাদাইনে অবস্থান রত আলাউদ্দীনকে লেখলেন, "আমি দিল্লী এসে সমস্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থার অবসান ঘটায়ে সব কিছু শৃংখলাবদ্ধ করেছি। খুতবা থেকেও আপনার নাম বাদ দেয়া হয়নি। আলাউদ্দীন প্রতি উত্তরে লেখলেন, আমার পিতা আপনাকে পুত্র তুল্য গণ্য করেছিলেন এবং আমিও আপনাকে বড় ভাই মনে করতাম. সুতরাং আমি খুশী হয়েই দিল্লীর রাজত্ব আপনাকে প্রদান করলাম। আর আমি 'বাদাইনে থেকেই সন্তুষ্ট আছি। ("তারিখে ফিরিশ্তা" ২য় খন্ড, ১২৩ পৃঃ দ্রঃ) অতএব ৮৫৫ হিজরী, মুতাবিক ১৪৫১ খৃীস্টাব্দে বাহলুল লোদী দিল্লীর পৃথক শাসক হয়ে গেলেন এবং আফগানীদের রাজত্ব দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হল।

লোদী বংশ

বাহলুল লোদী প্রকৃত পক্ষেই একজন উপযুক্ত বাদশাহ ছিলেন। তিনি দিল্লীর অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনার অক্লান্ত চেষ্টা করেন। আশেপাশের অঞ্চল ও জয় করেন। ১৪৭৮ খৃীস্টাব্দে জৌনপুর জয় করেন। ১৪৮৯ খৃীস্টাব্দে তাঁর ইন্তিকাল হল। অতঃপর তাঁর ছেলে সিকান্দার লোদী তাঁর স্থলাভিষিক্ত. হলেন। তাঁর দখলে তখন পাঞ্জাব ও কয়েকটি প্রদেশ মাত্র ছিল। তাঁর রাজত্বকালে বিহার রাজ্যও তাঁর রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি আগ্রাতে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। এতে সন্দেহ নেই যে, সিকান্দার লোদী খুবই হুঁশিয়ার, চিন্তাশীল ও একজন উপযুক্ত শাসক ছিলেন। তা'ছাড়া তিনি ছিলেন একজন বাহাদুর ও বীর পুরুষ। সুতরাং বিদ্যার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল যথেষ্ট। তাঁর রাজত্ব কালে শায়খ আবদুল্লাহ্ একজন জ্ঞানী লোক ছিলেন। সেকান্দার লোদী নিজে তাঁর শিক্ষার আসরে অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁর উপস্থিতিতে পাঠ দানে যেন

ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি মাদ্রাসার সংলগ্ন মসজিদের এক কোণে চুপ করে বসে যেতেন এবং তাঁর পাঠদান শ্রবণ করতেন। এইরূপ আগ্রহের কারণে তিনি আলিম ফাজিলগণকে খুবই সম্মান করতেন। মাওলানা রাফি উদ্দীন সিরাজী, মুহাদ্দিস, সিরাজ থেকে আগমন করেন। সুলতান তাঁকে খুবই সম্মান প্রদান করেন। তিনি আগ্রায় বহুদিন পর্যন্ত হাদীসের শিক্ষা দান করেন। সিকান্দার লোদী নামায রোযার অনুসারী ছিলেন। তিনি শরীয়তের আদেশ-নিষেধের প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখতেন। তিনি একজন কবিও ছিলেন। "গুলরখী" তাঁর উপনাম ছিল। তাঁর রাজত্বকালে ফার্সী ভাষায় প্রভূত উন্নতি হয়। ফার্সী ভাষায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উন্নত মানের পুস্তক ও রচিত হয়। কিন্তু আপেক্ষের বিষয় যে, তিনি কর্কশ প্রকৃতির লোক ছিলেন। এই জন্য সাধারণতঃ হিন্দুরা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। তার রাজত্বকালের একটি দুঃখজনক ঘটনা হল 'বুধনব্রাহ্মণের' হত্যা। এই ব্রাহ্মণ অন্যান্য ভ্রান্ত চিন্তাশীলদের মত অভিমত ব্যক্ত করে ছিলেন যে' "ইসলাম ও হিন্দুধর্ম মূলতঃ একই"। সিকান্দার লোদী "বুধনব্রাহ্মণ" এর এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের কথা একদল আলিমের সামনে উত্থাপন করেন। এই আলেমগণ কি পরিমাণ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারী ছিলেন, তা, তাদের এই সিদ্ধান্ত থেকেই অনুমান করা যায় যে, "উল্লিখিত 'ব্রাম্মণ' যদি ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে থাকেন, তবে এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। অতঃপর যদি হিন্দু ধর্মের সত্যতা ও স্বীকার করেন তবে এর অর্থ হল যে, তিনি ইসলাম থেকে 'মুরতাদ, বা বিচ্ছুত হয়েছেন। সুতরাং 'মুরতাদ' বা ধর্মত্যাগের শাস্তি অর্থাৎ 'হত্যা' তাঁর প্রাপ্য। অতএব আলিমগণের অভূতপূর্ব ও আশ্চার্যজনক 'রায়' অনুযায়ী তিনি কেন ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে অস্বীকার করলেন, সেজন্য তাঁকে হত্যা করা হল। ৯২৩ হিজরী মুতাবিক ১৫১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রায় ত্রিশ বছর রাজত্ব করার পর এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে আগ্রাতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

বাবর

সিকান্দার লোদীর ইন্তিকালের পর ইব্রাহীম লোদী সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। অরাজকতায় সাধারণ হয়ে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতে পাঞ্জাবের গভর্নর দৌলত খান কাবুলের বাদশাহকে লেখলেন যে, "এখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করে অধিকার করা খুবই সহজ হবে"। বাবর এই সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলেন। তাই মুরের বংশধর হওয়ার কারণে দিল্লীর রাজত্বকে নিজেদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য বলে মনে করতেন। সুতরাং এক বীর সেনাবাহিনী নিয়ে কাবুল থেকে যাত্রা করলেন এবং পাঞ্জাবকে পদাদলিত করে অগ্রসর হলেন। ইব্রাহীম লোদী এক বিরাট সেনাবাহিনী ও বিপুল পরিমাণে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম নিয়ে দিল্লী থেকে যাত্রা করলেন। পানি পথের ময়দানে উভয় সৈন্য দলের মাঝে ভীষণ যুদ্ধ হল। একদিনের যুদ্ধেই ভারতবর্ষ বাবরের ভাগ্যে জুটল। এই একদিনের যুদ্ধেই ইব্রাহীম লোদীর সঙ্গে তাঁর সৈন্যদের ১৫ হাজার সৈন্য মারা গেল। অতঃপর বাবরে দিল্লীর দিকে যাত্রা করলেন এবং বিনা যুদ্ধেই তিনি দিল্লী অধিকার করে নিলেন। অতঃপর নিজেকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলে ঘোষণা দিলেন। ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে এখান থেকে অবসর হয়ে আগ্রা অধিকার করেন। ইব্রাহীম লোদীর পরিবার বর্গকে বন্ধী করেন। আফগানরা দিল্লী ও আগ্রা থেকে হাত গুটায়ে জৌনপুরে নিজেদের রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু তথায় ও তাদের পরাজয় হল। বাবর ও হুমায়ুন আফগানদের গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়সমূহ তখন ও নিষ্পত্তি করে শেষ করতে পারেননি, এমন সময় ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে রানাসিং রাজপুত্রদের এক বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে আগ্রার দিকে অগ্রসর হলেন। ইব্রাহীম লোদীর ভাই মাহমুদ লোদীও এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে রানাসিং এর সঙ্গে মিলে গেলেন। আগ্রার নিকট ফতেহপুর সিক্রীতে ভীষণ যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধে 'বাবর' মদ্যপান এবং অন্যান্য শরীয়ত বিরোধী কাজকর্ম থেকে "তওবা" (আল্লাহর দরবারে স্বীয় অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা) করে, খোদার দরগায় সত্য অন্তকরণে বিজয়ের জন্য প্রার্থনা জানালেন। রাজপুত্ররা মরণপণ করে, যুদ্ধ করল। প্রথমতঃ যুদ্ধের গতি তাদের স্বপক্ষে ছিল। কিন্তু পরিণামে

ইসলামী সেনা দলের বিরাট বিজয় হল। বাবর রাজপুতদের পশ্চাদ্ধাবন করে, তাদের কেন্দ্রীয় শক্তিসমূহ ধ্বংস না করা পর্যন্ত থামেননি। ১৫২৯ খ্রীস্টাব্দে বাবর বিহার জয় করেন। তাঁর রাজ্য সীমা একদিকে নাঙ্জার থেকে মুলতান পর্যন্ত এবং অনাদিকে আরব সাগর থেকে বিহারের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দে, মুতাবিক ৯৩৭ হিজরীতে বাবর বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে আগ্রায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃতদেহ কাবুলে এনে দাফন করা হয়।

বাবরের গুণাবলী ও পূর্ণতা

মুগল বংশে বড় বড় বিখ্যাত বাদশাহ জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিভিন্ন গুণাবলীর ও উপযুক্ততার দিক দিয়ে বাবরের ব্যক্তিত্বে যে সব চিত্তাকর্ষক সার্বিকগুণের সমাবেশ ঘটেছে তা অন্য কোন বাদশাহর মধ্যে পাওয়া যায় না বাবর ১২ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৮ বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি একদিকে কৃতী বীরপুরুষ ও সৈনিক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। এবং অন্য দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলায়, গান বাদ্যেও যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন রচনা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ এমন ছিল যে, তিনি “খত্তেবাবরী” (বাবরের রচনা) নামে একটি পৃথক পত্র রচনার ধারা বা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই সব পত্রে কুরআন মজীদের কয়েকটি কপি লিখে তিনি মক্কায় প্রেরণ করে ছিলেন। তিনি ‘বাবরের ডাইরী’ নামে একটি দৈনন্দিন কার্যক্রম পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেন। তাতে তিনি স্বীয় রাজত্বকালের বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনাবলীর বিবরণ তুর্কী ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। বাদশাহ আকবরের সময় তার নির্দেশে আবদুর রহীম খানে খানান উহাকে ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন গদ্য লেখক, সুন্দর পত্র লেখক এবং সুসাহিত্যিক ও কবি। সুতরাং বাবরের কাবুল থাকা কালীন সময়ে রচিত একটি বিখ্যাত কবিতাংশ যা একটি হাউজের পাশে খোদাই করা আছে তা নিম্নরূপ ঃ

نوروز و نوبہار و مئے و دل ربا خوش است -
بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست -

"নববর্ষের নতুন দিন, নব-বসন্ত শরাব এবং চিত্তাকর্ষক বস্তুসমূহ আনন্দ দায়ক। হে বাবর! আনন্দ উল্লাসে মত্ত থাক, কেননা পৃথিবীর এই সুখ-ভোগ আর দ্বিতীয়বার আর জুটবে না"।

যদিও ভারতবর্ষে নিশ্চিন্তে থাকা এবং শান্তিতে রাজত্ব করার সুযোগ তাঁর ভাগ্যে বেশীদিন জুটেনি, তথাপি তিনি কিছুদিনের মধ্যেই অনুভব করে ছিলেন যে, ভারতবর্ষে কোন রাজত্বই ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে না, যতক্ষণ এখানে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতির সহায়তা করে তাদের সঙ্গে অনুগ্রহ এবং বন্ধুত্বের ব্যবহার না করা হবে। সুতরাং তিনি মৃত্যুকালে হুমায়ুনকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করার সময় অসীয়ত করে ছিলেন যে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বসবাস করে, ইহা আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ দান। তিনি তোমাকে এই দেশের বাদশাহ বানিয়েছেন, এখন তোমার কর্তব্য হবে নিম্ন লিখিত বিষয় সমূহের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা।

১. ধর্মীয় পক্ষপাতিত্বকে কখনও অন্তরে স্থান দিবে না। অন্য ধর্মালম্বীদের ধর্মীয় অনুভূতি এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির প্রতি দৃষ্টি রেখে পক্ষপাতিত্ব ব্যতীত সকল জাতির সঙ্গেই পরিপূর্ণ ন্যায় বিচার করবে।

২. গো হত্যাকে বিশেষভাবে এড়ায়ে চলবে। ইহার ফলে হিন্দু জন সাধারণের অন্তরে তোমার স্থান মিলবে এবং তারা আন্তরিকভাবে তোমার আনুগত্য করবে। শাসক ও শাসিতের মাঝে সর্বদা হৃদ্যতা বজায় রাখবে এবং দেশের শান্তি শৃংখলার প্রতি নযর রাখবে।

৩. কখনও কোন সম্প্রদায়ের উপাসনালয় ধ্বংস করবে না এবং সর্বদা সকলের সঙ্গে ন্যায় বিচার করবে।

৪. 'শিয়া' সুন্নীর বিরোধের প্রতি সর্বদা সুদৃষ্টি রাখবে। কেননা এতে ইসলাম দুর্বল হয়ে যাবে।

৫. ইসলামের প্রচার ও প্রসার অত্যাচার ও অবিচারের খড়্গের মুকাবিলায় অনুগ্রহ ও দয়ার তলোয়ার অতি উত্তম পদ্ধতিতে কার্যকরী হবে।

৬. আপন প্রজাদের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্টকে বছরের বিভিন্ন ঋতুর মত মনে করবে, যেন রাষ্ট্র অসুস্থতা ও দুর্বলতা থেকে সংরক্ষিত থাকে। ('চশমাযে কাউসার' ৩৫৮ পৃঃ দ্রঃ)

উল্লিখিত গুণাগুণ ছাড়াও তিনি নামায রোযার অনুসারী ছিলেন। ফিরিশতা লেখেন যে, 'ফেরদাউস মাকানী' (জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিকারী সম্রাট বাবর) হানাফী মাযহাবের একজন 'মুজতাহিদ' (গবেষক) ছিলেন। কখনই তিনি নামায কাযা করেননি। প্রত্যেক জুমার দিন নিয়মিতভাবে রোযা রাখতেন। ('তারিখে ফিরিশতা' ২য় খণ্ড, ২২৭ পৃঃ দ্রঃ)

হুমায়ুন

বাবরের ইন্তিকালের পর তাঁর রাজত্ব ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। হুমায়ুন ছিলেন আপন ভাইদের মধ্যে সকলের বড়। তিনি দিল্লীর বাদশাহ হলেন। কামরানের দখলে ছিল আফগানিস্তান। আর অবশিষ্ট দু'ভাই হুমায়ুনের অধীনে পাঞ্জাবের গভর্নর নিযুক্ত হন। কিন্তু বেচারা হুমায়ুন ভাইদের বিরোধিতা এবং আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের কারণে শান্তিতে থাকতে পারেন নি। বাবর যদিও আফগানীদেরকে পরাজিত করেছিলেন, তথাপি শেরশাহ শুরী স্বীয় শক্তি সামর্থ্য বিহারে একত্র করলেন এবং পরবর্তী সময়ে বঙ্গদেশ জয় করে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা দিলেন। হুমায়ুন তখন গুজরাটের একযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। যখন এই সংবাদ জানতে পারলেন, তখন তিনি কাল বিলম্ব না করে পূর্ব দিকে যাত্রা করলেন। অনেক ছল চাতুরীর পর ১৫৩৯ খৃীস্টাব্দে উভয় সেনাদলের মুকাবিলা হল। প্রথম পর্যায়ে সন্ধির কথাবার্তা হচ্ছিল। আফগানীরা প্রবঞ্চনা করে অতর্কিতে হুমায়ুনের সৈন্যদের উপর আক্রমণ করল, এতে সৈন্যদের মাঝে আতঙ্কের সৃষ্টি হল। হুমায়ুনও কোনক্রমে জীবন বাঁচায়ে আগ্রায় পৌঁছলেন এবং পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন। ১৫৪০ খৃীস্টাব্দে 'কানুয' নামক স্থানে মুগল ও আফগান উভয় সেনাদলের মাঝে পুনরায় যুদ্ধ হল। এবার হুমায়ুনের এক শোচনীয় পরাজয় হল যে,

তিনি পরিবার পরিজনসহ ইরানের বাদশাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থী হলেন। দুশ্চিন্তার এই দুর্দিনে ৯৪৯ হিজরী মুতাবিক ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'অমর কোট' নামক স্থানে জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ আকবর, হামিদা বেগমের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন।

শেরশাহ এবং শুরী বংশ

কানুযের যুদ্ধ বিজয়ী হওয়ার পর শেরশাহ দিল্লী পেঁছেন এবং নিজকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন। শোরশাহ এর প্রকৃত নাম ফরিদখান এবং পিতার নাম হাসান খান। তিনি ছিলেন আফগানী বংশজাত। ফরিদ খান জৌন পুরে লালিত পালিত হন। জৌনপুর তৎকালে আলিম-ফাজিলগণের এক বিরাট কেন্দ্রস্থল ছিল। সুতরাং ফরিদখানও এখানে থেকে তৎকালের প্রচলিত ফার্সী পুস্তক যেমন, গুলেস্তা, বোস্তাঁ, সিকান্দার নামা কাফিয়া, ও উহার ব্যাখ্যা ইত্যাদি অন্যান্য পুস্তক ও পাঠ করেন। তাছাড়া গদ্য ও পদ্য সাহিত্য এবং ইতিহাসের পুস্তকও পাঠ করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়াও তিনি নিয়ম শৃংখলা এবং রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনার দক্ষতা অর্জন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে একটা সাধারণ জায়গীরদারের পদ থেকে উন্নতি করে দিল্লীর বাদশাহ হলেন। যদিও তিনি তাঁর পাঁচ বছর রাজত্ব (১৫৪০—১৫৪৫ খ্রীঃ)-কালে যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে কোন অবসর পাননি তপাপি তিনি রাজ্যের শৃংখলা রক্ষা কল্পে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করেছিলেন, যা পরবর্তী সময়ে সম্রাট আকবর এবং অন্যান্য মুগল বাদশাহগণ গ্রহণ করেছিলেন। মুহাম্মদ আকরাম আই, সি, এস, সাহেব লেখেন যে, শেরশাহ দেশকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন। প্রত্যেক জেলাকে আবার বিভিন্ন পরগনায় ভাগ করেন। প্রত্যেক পরগনায় একজন করে পুলিশ অফিসার, একজন ট্রেজারী অফিসার (কোষাধ্যক্ষ), একজন মুন্সেফ (বিচারক) এবং দুজন হিসাবরক্ষক নিধারিণ করেন। তাদের মধ্যে একজন ফার্সীতে হিসাব রাখতেন এবং অপরজন হিন্দিতে। সমগ্র দেশের ভূমি জরিপ করা হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে খাজনা, টেক্স ধার্য করা হয়। তৎকালের খাজনা টেক্স ধার্যের অনুপাতে ইংরেজ রাজত্বে ও তা প্রচলন করা হয়। আকবরের রাজত্বকালে তা লিপিবদ্ধ করা হয় এবং

সেই অনুসারে দেওয়ান খাজা শাহ মনসুর দশশালা বন্দোবস্ত প্রথা চালু করেন। কৃষি জীবিদের উন্নতি ব্যতীত ও শেরশাহ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তিনি আমদানী শুল্ক রহিত করে দেন। ব্যবসার পণ্যদ্রব্য আমদানী রফতানী এবং পথিকদের কষ্ট লাঘবের জন্য সমগ্র দেশের বহু সড়ক তৈরী করেন। একটি সড়ক আটক থেকে ঢাকা পর্যন্ত দ্বিতীয়টি আগ্রা থেকে বুরহানপুর পর্যন্ত তৃতীয়টি আগ্রা থেকে চিতোর পর্যন্ত এবং চতুর্থটি লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সড়কগুলোর উভয় পার্শ্বে ছায়াদার বৃক্ষ রোপণ করেন এবং মাঝে মধ্যে পান্থশালা স্থাপন করেন, যেখানে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকের অবস্থান করার ব্যবস্থা ছিল। 'মাউজে কাউসার' ২৬০ পৃঃ দ্রঃ ঐতিহাসিক ফিরিশ্তা বর্ণনা করেন যে, তাঁর রাজত্বকালে শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তার এমন সুব্যবস্থা ছিল যে, পথিকরা মাঠে ময়দানে, জঙ্গলে, যেখানে ইচ্ছে সেখানেই নির্ভয়ে মালপত্র ফেলে রেখে রাত্রিতে ঘুমাতে পারতো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শেরশাহের প্রকৃত নাম ছিল ফরিদ খান। বিহারের গভর্নর সুলতান মুহাম্মদ খানের অধীনে যখন তিনি চাকরি করতেন তখন একদিন পায়ে হেঁটে যাওয়ার সময় একটি বাঘ তাঁর সামনে পড়ে, তিনি বাঘটিকে আক্রমণ করে হত্যা করেন। সেইদিন থেকে তাঁর উপাধি হল শেরখান। অতঃপর যখন তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীন সুলতান হলেন তখন শেরশাহ উপাধিটিই গ্রহণ করলেন। ১৫৪৬ খ্রীস্টাব্দে যখন তিনি কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করেছিলেন তখন হঠাৎ এক বিপদে পতিত হয়ে কঠিন আঘাত প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁর নির্দেশে সৈন্যরা যুদ্ধ করতে ছিল। পরিশেষে যখন দুর্গজয়ের শুভ সংবাদ শোনা গেল, তখন তিনিও পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন।

অতঃপর তার দ্বিতীয় ছেলে ইসলাম শাহ, যিনি সাধারণতঃ সলিম শাহ নামে বিখ্যাত ছিলেন, সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতার প্রচলিত প্রথা ও কার্যক্রম শুধু স্থায়ীই রাখেননি বরং ঐ গুলোর অনেক উন্নতিও করেছেন। নয় বছর রাজত্ব করার পর ৯৬০ হিজরী মুতাবিক, ১৫৫৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন। অতঃপর সালিম শাহের শালক মুবারেক

খান মুহাম্মদ শাহ আদেল' নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খুবই অযোগ্য, নির্বোধ এবং অসদাচারী ছিলেন। তিনি সালিম শাহের ইন্তিকালের তিনদিন পরেই রাজমহলে প্রবেশ করে' সালিম শাহের অল্প বয়সের শিশু এবং তাঁরই ভাগিনি ফিরোয খানকে শুধু রাজত্বের লোভে অতি নির্মমভাবে হত্যা করেন। শিশুর মাতা তার অন্যান্য ভাইদের সামনে কান্নাকাটি শুধু করে দিলেন। কিন্তু এই দুষ্কৃতিকারীর মনে এতে কোন রেখাপাত করল না। যে অতিশয় অসৎ প্রকৃতির লোক ছিল। সুতরাং 'ফিরিশতা' বর্ণনা করেন যে, "সে তার অযোগ্যতার কারণে অসৎ ও নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোকদের সাহায্য নিল এবং রাষ্ট্রীয় উচ্চপদ গুলোতে তাদেরকেই বহাল করল"। এর পরিপ্রেক্ষিতে সে 'হিন্দু' (নামী—বাক্কাল) তরকারী বিক্রেতা এক নিকৃষ্ট শ্রেণীর হিন্দুকে শহরের 'কোতোয়াল' নিযুক্ত করল। সে ক্রমে উন্নতি করতে করতে প্রধান মন্ত্রীয় পদ পর্যন্ত লাভ করল।

আদিল শাহকে মানুষ 'আদলী' বলতে লাগলো। তিনি দিবারাত্র অনান্দ উল্লাসে বিভোর ছিলেন। তরকারী বিক্রেতা 'হিমু' রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজকর্মের একচ্ছত্র অধিকারী হয়ে বসল। আফগান নেতারা-কিভাবে একজন নীচ প্রকৃতির হিন্দুর নেতৃত্ব মেনে নিতে পারে? তাঁরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে দিল। কিন্তু 'হিমু' তাদেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম হল। যে সময় 'হিমু' আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে লিপ্ত ছিল। 'সেই সময় হুমায়ুন ইরানের বাদশাহর সাহায্যে কাবুলের বাদশাহ হয়ে গেলেন এবং ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে সদা খবর রাখছিলেন। অতএব সুযোগ পেয়ে ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে সৈন্য প্রেরণ করলেন ও পাঞ্জাবের গভর্নর সিকান্দার শাহকে পরাজিত করে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হলেন এবং বিনা যুদ্ধে ১২ (বার) বছর পর পুনরায় দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করলেন। কিন্তু সিংহাসন আরোহণের ছয় মাস পরেই ৭ই রবিউল আউয়াল ৯৬২ হিজরী মুতাবিক-১৫৫৪ খ্রীস্টাব্দে নিজ লাইব্রেরীতে উঠলেন এবং অল্পক্ষণ-তথায় অবস্থান করে-নীচে অবতরণ করতে লাগলেন, সবেমাত্র একটি সিঁড়ি অতিক্রম করে ছিলেন-এমন সময় মুয়াযযিন নামাযের আযান দিলেন। বাদশাহ আযানের সম্মানার্থে তথায়ই বসে গেলেন। আযান শেষে লাঠিতে ভর দিয়ে উঠলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লাঠিটি হাত থেকে ছুটে গেল।

আর অমনি তিনি সিঁড়ি থেকে নীচের দিকে পড়ে' আহত হলেন। অনেক চিকিৎসা করার পরও কোন ফল হল না। পরিশেষে ১১ই রবিউল আউয়াল তিনি এই নশ্বর জগত ছেড়ে চির বিদায় নিলেন।

হুমায়ুন বীরত্ব, সৎসাহস, ভদ্রতা এবং উত্তম চরিত্রের একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁর ভাই মীর্জা হিন্দাল এবং মীর্জা কমেরান সর্বদাই তাঁর সঙ্গে অবিচারমূলক ও কষ্টদায়ক ব্যবহার করেছেন। কিন্তু হুমায়ুন তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। কামরানের বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র প্রিয়তা যখন সীমা অতিক্রম করল এবং চেঙ্গিজের বংশের আমীরগণ তাকে হত্যা করার পরামর্শ দিলেন, তখন হুমায়ুন তাকে হত্যা না করে শুধু চক্ষু দু'টি সেলাই করে দিলেন। হুমায়ুনের রাজত্বকালের সব চেয়ে অধিক নির্ভর-যোগ্য পুস্তক—তাঁর ভগ্নি গুলবদন' কর্তৃক লিখিত 'হুমায়ুন নামা" ছিল একটি প্রসিদ্ধ পস্তক। এতেই বুঝা যায় যে, তিনি-কি পরিমাণ ধৈর্যশীল সহিষ্ণু, ভদ্র, নম্র এবং উচ্চাঙ্গের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর ধার্মিকতা এবং ধর্মীয় অনুগত্যের প্রমাণের জন্য উল্লেখিত ঘটনাটি কোন অংশে কম গুরুত্বের অধিকারী নয়—যা, তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। ঐতিহাসিক 'ফিরিশ্তা, বর্ণনা করেন যে, হুমায়ুন বাদশাহ সর্বদা অযু অবস্থায় থাকতেন। বিনা অযুতে তিনি কখন আল্লাহ্‌র নাম পর্যন্ত নিতেন না। সুতরাং একদা মীর আব্দুল হাই সদরকে-'আব্দুল' বলে ডাকলেন, অতঃপর 'অযু' করে তাকে বললেন, আমি আপনার সঙ্গে কথোপকথনের সময় 'অযু, অবস্থায় ছিলাম না, এই জন্য আমি আপনার পূর্ণ নাম ধরে ডাকিনি। ("তারিখে ফিরিশ্তা" ২য় খন্ড ৩১২ পৃঃ দ্রঃ)

মুগলদের রাজত্বকাল

হুমায়ুনের দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে রাজসিংহাসনে আরোহণের তারিখ অর্থাৎ ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ভারতবর্ষে মুগলদের রাজত্ব পুনরায় শুরু হল। যদিও এখানে হুমায়ুনের দীর্ঘদিন রাজত্ব করার সুযোগ মিলে নি, তথাপি তাঁর হাতেই এই রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। পরবর্তী সময়ে আকবর স্বীয় শিক্ষক 'বৈরাম খান' আদেল শাহ শুরীর মন্ত্রী 'হিমু' বাক্কালকে পানি পথের যুদ্ধে ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে পরাজিত করে 'শুরী' বংশের রাজত্ব একেবারে শেষ করে দিলেন। এমনিভাবে ভারতবর্ষে মুগলদের রাজত্ব সুদৃঢ় করার সুযোগ মিলল।

হুমায়ুন যখন ইরান থেকে ভারতবর্ষের এলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ইরানী আলিম-ফাজিল, আমীর-উমারা এবং সৈন্যর এক বিরাট দল ও আগমন করলেন। এর ফলে ভারতবর্ষের ইসলামী কৃষ্টির মাঝে ইরানী সংস্কৃতি ও সভ্যতা এবং অনুভূতির ও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার লাভ করল। ফলে উভয় দেশের মাঝে এমন এক সুদৃঢ় বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা হল, যা ভারতবর্ষের পরবর্তী ইসলামী সংস্কৃতি ও ইতিহাসের উপর গভীর ও সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল।

জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ আকবর

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবর আপন শিক্ষক এবং পিতার বিশ্বস্ত বন্ধু বৈরাম খানের সঙ্গে পাঞ্জাবের যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। সেই সময় তাঁর বয়স পরিপূর্ণ ১৪ চৌদ্দ বছুরও ছিল না। কিন্তু তিনি পিতার সঙ্গে কষ্টকর জীবন-যাপনে অভ্যস্থ হয়েছিলেন। অতঃপর বৈরাম খানের মত উপযুক্ত শিক্ষকের শিক্ষা-দীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করে ভারতবর্ষের রাজত্ব করার উপযুক্ত হয়েছিলেন। সুতরাং পিতার ইন্তিকালের পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বৈরাম খানকে স্বীয় প্রধান মন্ত্রী ও পৃষ্ঠপোষক নির্ধারণ করেন।

বৈরাম খানের আকবরের রাজত্বকালে দু-বছর পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রী হিসেবে বিরাট দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু পরিশেষে আকবর এবং বৈরামখানের মাঝে কোন কারণে মনোমালিন্য সৃষ্টি হল। এর পরিণাম এই হল যে, যখন বৈরাম খান গুজরাট থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এমন সময় জনৈক আফগানী তাঁকে হত্যা করল। আকবর ১৬৬০ খৃস্টাব্দে রাজ্যের যাবতীয় কর্তৃত্ব নিজ হাতে নিয়ে সাধারণ ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে শুধু তার নির্দেশই কার্যকরী হবে।

আকবর তৎপর রাজ্যজয়ের ধারা প্রচলন রাখেন। এমনকি ষোল শতাব্দীর শেষ না হতেই তাঁর রাজ্য সীমা পশ্চিম ও উত্তরে কান্দাহার এবং কাবুল থেকে মিশে পূর্বে বঙ্গদেশ ও আরিচা পর্যন্ত দক্ষিণে আহমদনগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তিনি দিল্লীর বিভিন্ন প্রদেশও অঞ্চল জয় করেই ক্ষান্ত হন নাই, বরং ইহাদের উপর নিজের পরিপূর্ণ প্রভাব প্রতিপতি ও প্রতিষ্ঠা করেন। আইন শৃংখলার প্রয়োগ সহজ করার লক্ষ্যে তাঁর রাজত্বকে পনেরটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রতিটি প্রদেশেই পৃথক পৃথক গভর্নর নিয়োগ করেন। তাঁর অধীনে একদল সেনাবাহিনী দিয়ে স্বায়ত্ব-শাসনের অধিকার ও প্রদান করা হয়। কিন্তু স্বীয় কৃত-কর্মের জন্য তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জবাব দিহি করতে হতো। অতঃপর গভর্নরের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য ফৌজদারী আদালতের একজন বিচারপতি ও একজন সেরেস্তাদার নিযুক্ত ছিল। নগরের প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে থাকতেন একজন কোতোয়াল। তাছাড়া গ্রামের শৃংখলা রক্ষা খোদ জমিদার কিংবা কৃষকদের সম্মতি অনুসারে করা হতো।

আর্থিক লেনদেন ও শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে সম্রাট আকবর অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেরশাহ শুরীর অনুসরণ করেন। অর্থনৈতিক শৃংখলা রক্ষার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন রাজা টুডরমল। তিনি প্রস্তাব করেন যে, ফসলী ভূমির প্রতি বছরই জরিপ করা প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু কাজটির বাস্তবায়ন খুবই কঠিন ব্যাপার তাই নিয়ম করলেন যে, প্রতি দশ বছর অন্তর ভূমির জপির করা হবে। অতঃপর উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ অনুসারে ভূমির বিভিন্ন স্তর সুবিন্যস্ত করা হয়। এর পরিপূর্ণ বিবরণ আইনে

আকবরী" (আকবরের শাসন প্রণালী) নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। যা হউক এরূপ শাসন প্রণালীর সঙ্গে সম্পর্কে থাকার কারণে আকবরের রাজত্বকাল সফল হয়েছিল এবং তার রাজ্য সীমাও যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল। বিভিন্ন জাতির সঙ্গে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় থাকার কারণে জনগণের অবস্থা ছিল স্বচ্ছল ও শান্তিপূর্ণ।

আকবরের নতুন ধর্মীয় কুসংস্কার এবং ইসলামের অধঃপতন

কিন্তু এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিভিন্ন জাতির সঙ্গে পারস্পরিক সুসম্পর্কের ফলে তাঁর রাজত্বে গঠিত সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা ইসলামী আহ্‌কাম ও মূল্যবোধের অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার পর অর্জিত হয়েছিল। ইহাতে ইসলামের বিরাট ক্ষতি হল। আকবর হিন্দু রাজপুতদের সহানুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে নিজে হিন্দু মহিলাদেরকে বিয়ে করেন। জাহাঙ্গীরের বিবাহ ও চৌদ্দপুরের রাজার নাতনীর সঙ্গে হয়েছিল। হিন্দুদেরকে বড় বড় রাষ্ট্রীয় পদ ও পদমর্যাদা প্রদান করা হয়। এর ফলে রাজ প্রাসাদে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব প্রাধান্য লাভ করতে লাগল। বাদশাহর ধর্মীয় অনুভূতির মাঝেও এর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আকবর সিংহাসন আরোহণের বিশ বছর পর পর্যন্তও একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে ছিলেন। সূফী ও সাধু পুরুষদের প্রতি তার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও সম্পর্ক এমন ছিল যে, তিনি আগ্রা থেকে আজমীর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতেন। নিজের গর্ভবতী বিবিকে বরকত লাভের আশায় হযরত শায়খ সালিম চিশতীর হুজরাতে প্রেরণ করতেন। তাঁর ইবাদাত পদ্ধতি এমন ছিল যে, মসজিদ সংলগ্ন এক পুরাতন হুজরা খানায় একাকী বসে 'অযীফা' পড়তেন, এবং মুরাকাবা ও প্রার্থনায় নিমগ্ন থাকতেন। কিন্তু যখন তাঁর মধ্যে ধর্মীয় পথ ভ্রষ্টতার লক্ষণ পরিলক্ষিত হ'তে লাগল, তখন তিনি জগতটাকেই অন্য দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। রাজ প্রাসাদে হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু প্রথাসমূহ প্রকাশ্যে প্রচলন হতে লাগল। হিন্দু বিবিদের জন্যে পৃথক মন্দির প্রতিষ্ঠা হতে লাগল। বাদশাহ তাদেরকে খুশী করার জন্যে তাদের খাজনা টেক্‌স মওকুফ করে দিলেন এবং 'জিযিয়া' কর ও রহিত করে দিলেন; অতএব সামনে

মাথা নত করতে লাগলেন। কখনও বা নক্ষত্রকে আবার কখনও হযরত মরিয়মকে ও উপাস্য মনে করে অর্চনা করতে লাগলেন। মোটকথা ধর্মীয় ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী বিশ্বাস ও অনুভূতির সংমিশ্রণ ঘটতে লাগলো। নিম্নের কবিতাংশটি তাঁর বেলায় প্রযোজ্য—

کس کی ملت میں گنوں آپکو بتلا ائے شیخ -
تو کہے گبر مجھے گبر مسلمان مجھکو -

"হে শায়খ! আপনিই বলুন, আপনাকে কোন্ ধর্মের লোক বলে গণ্য করবো? প্রতি উত্তরে হয়তঃ আমাকে অগ্নি উপাসক অথবা মুসলমান অগ্নি উপাসক বলা হবে"।

এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কারণ হিন্দুদের সাথে স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন এবং তাদেরকে সর্বদিক দিয়ে খুশী করার অনুপ্রেরণার মধ্যে নিহত। সবচেয়ে বড় কারণ হল স্বার্থান্বেষী আলেমগণের রাজ দরবারে ভিড় জমালে ও পারস্পরিক ঝগড়া-কলহ এবং নিজেদেরকে বাদশাহর প্রতি আকৃষ্ট করার আকাংক্ষা ও স্বার্থপরতা আলিম এবং বিভিন্ন ধর্মালম্বী জ্ঞানী-গুণীদের সঙ্গে আকবরের কথোপকথন করা ও তাঁদের বিতর্ক সভায় যোগদান করার আগ্রহ তাঁর প্রথম থেকেই ছিল। এইরূপ বিতর্ক সভায় প্রত্যেক মাযহাবের জ্ঞানীগণ স্বীয় মাযহাবের সৌন্দর্য বর্ণনা করতেন। তাঁদের এরূপ কার্যকলাপের প্রতি আকবরের পক্ষ হতে কোন বাধা নিষেধ ছিল না। এক দিকে আকবর তাঁদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হতেন এবং অন্য দিকে স্বার্থান্বেষী আলিমদের কাজ কারবারে তাঁকে ইসলাম থেকেই বিমুক করে দিচ্ছিল। এসব কার্যক্রমের ফলে আকবর শুধু বাহ্যিক কাজ কর্মের দিক দিয়েই বিভ্রান্ত হন নি, বরং আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসেও তাঁর বেশ ত্রুটি দেখা দিল। পরিশেষে "দ্বীনে ইলাহী" নামে একটি পৃথক নতুন ধর্মের ও তিনি প্রবর্তন করেন রাজ পরিষদের সকলকেই এই ধর্ম গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করলেন। কি আশ্চর্যের বিষয় যে, একদিকে ধর্মীয় বিষয়ে তাঁর পাগলামী চরম পর্যায়ে উপনীত হল, অন্য দিকে তিনি নিজেকে ধর্মীয় কাজকর্মে অত্যাবশ্যকীয় আনুগত্য ও স্বীয় বুদ্ধি বিবেককে নিষ্পাপ

বলে মনে করতে লাগলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ঘটনা এমন হাস্যস্পদ হিসেবে প্রকাশ পেল যে, অনিচ্ছাতেই হাসির উদ্রেক করে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও হয়।

উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আকবরের মৃত্যুর পূর্বের এক বছর ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে খুবই মারাত্মক অবস্থা ছিল। এতে সন্দেহ নেই যে, যদি মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ) সেই সময়ে স্বীয় ইজতিহাদ ও সংস্কারের পরিপূর্ণ শক্তি সামর্থ্যের সাথে অগ্রসর না হতেন, তবে ইসলাম এই দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেত এবং আজকের হিন্দুস্থান (পুরোভারত) প্রকৃত অর্থেই হিন্দুধর্মের আবাসস্থলে পরিণত হত।

আকবরের ইন্তিকাল

আকবরের শেষ জীবন খুবই দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার মধ্যে অতিবাহিত হয়। এর প্রধান কারণ হল তাঁর ছেলেদের অসদাচরণ ও অসৎ চরিত্র। অধিক মাত্রায় মদ্যপানের কারণে ১৫৯৯ খৃীস্টাব্দে শাহযাদা মুরাদের ইন্তিকাল হয়। ১৬০১ খৃীস্টাব্দে সালিম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, যিনি আকবরের নতুন ধর্ম প্রবর্তনের প্রতি অধিক আগ্রহশীল ছিলেন। আকবর অল্প সময়ের মধ্যেই এই বিদ্রোহ দমন করেন। অতঃপর তাঁকে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে বাংলা ও উড়িষ্যার গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু শাহযাদাহ সালিমের চিন্তা ধারায় তখন ও কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। তিনি ইলাহাবাদে অবস্থান করে দিবা-রাত্রি আনন্দ-উল্লাস ও স্ফূর্তিতে মত্ত থেকে পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সম্রাট আকবরের প্রিয় মন্ত্রী আবুল-ফজলকে হত্যা করান। এই সংবাদ শুনে আকবর অপরিসীম ব্যথিত হলেন। এই ঘটনার পর শাহযাদাহ দানিয়াল ও অতি মাত্রায় মদ্যপানের কারণে ইন্তিকাল করেন। এই সব বিপদ-আপদ ব্যতীত ও রাজমহল বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের আখড়ায় পরিণত হল। কিছু সংখ্যক লোক পরামর্শ দিল যে, শাহযাদাহ সালিমকে-বঞ্চিত করে' তাঁর ছেলে খসরুকে রাজ্যের উত্তরাধিকার বানানো হউক। এতে অপারগ হয়ে পরিশেষে আকবর সালিমকে ডাকালেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাঁকেই নিজের স্থলাভিষিক্ত করলেন। এই ঘটনার

কয়েক মাস পরেই ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দ, মুতাবিক ১০১৪ হিজরীতে আগ্রায় তিনি ইন্তিকাল করেন।

জাহাঙ্গীর

আকবরের ইন্তিকালের পর তাঁর বড় ছেলে সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আকবর মুগল বাদশাহদের সাধারণ নিয়মনীতি এবং প্রথানুযায়ী সেলিমের শিক্ষাদীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। সুতরাং তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে তৎকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বিখ্যাত আলিম মাওলানা মীর কালান হারবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ব্যতীত ও যাদের উপর-শাহযাদা-সেলিমের প্রতিপালন ও দেখাশুনার দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে শাহযাদার "দুগ্ধপিতা" শায়খ-আহমদ কুতুব উদ্দীন মুহাম্মদ খান ও আব্দুর রহীম খানে-খানান-উল্লেখযোগ্য ছিলেন। আব্দুর রহীম খানে-খানান সে-যুগের জ্ঞান-গরিমা, কবিত্ব ও সাহিত্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। এতদ্‌ব্যতীত ও তিনি স্বীয় আমলের পূর্ণত্বের দিক দিয়ে ও অসাধারণ ছিলেন। তাঁরা সবাই ছিলেন আকবরের রাজদরবাবেব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্তর্গত। শিক্ষাদীক্ষার এইরূপ সুব্যবস্থার ফলে শাহযাদা ফার্সী, তুর্কী এবং হিন্দী ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এই সব ভাষায় সাহিত্য চর্চা ও কবিতা লেখার প্রতি ও তিনি উৎসাহী ছিলেন। সৌন্দর্যপ্রিয়তা ছিল তাঁর জন্মগত স্বভাব। কবিতা ও সাহিত্য চর্চায় তাঁর এই মনোবৃত্তিকে আরো পরিমার্জিত করল। শিল্পকলা এবং সঙ্গীতের প্রতি তিনি বিশেষভাবে অনুরাগী ছিলেন। সুন্দর ফুল দেখলে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন।

কিন্তু অতিশয় ভোগ-বিলাসে লালিত-পালিত হওয়ার কারণে এবং পিতার একান্ত আদরে সন্তান হওয়ার ফলে শাহযাদা খুব শক্তিশালী মানুষ ছিলেন না। তিনি খুবই সরল সোজা এবং চঞ্চলমনা প্রকৃতির লোক ছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন দ্বীনে ইলাহী' এবং সীমাতিরিক্ত হিন্দু তোষণ নীতির কারণে শাহী মহলে ও রাজদরবারে আকবরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হতে লাগলে তখন তিনি অতি সহজেই এর শিকার হলেন। কিন্তু

তিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝান্ডা উত্তোলন করলেন কিন্তু আকবরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, শাহযাদার এই কার্যক্রম সাময়িক। অন্যথায় প্রকৃত পক্ষে তিনি ভারতবর্ষের একজন সফলকাম ও পরিপূর্ণ শাসক হওয়ার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং আকবর শাহযাদাহকে এলাহাবাদ থেকে ডেকে এনে নিজের স্থলাভিষিক্ত করলেন। অতএব ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৩৫ বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু সম্ভবতঃ দায়িত্বভারের অনুভূতির কারণে তার আচার-ব্যবহার এবং চাল-চলনে হঠাৎ আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে গেল। তিনি রাষ্ট্রীয় সংস্কার এবং আইন-শৃংখলার ব্যাপারে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। সুতরাং তার রাজত্বকাল আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা এবং প্রকৃত ন্যায় বিচারের জন্য এমন বিখ্যাত হল যে, এতে অনেক কাহিনীর জন্ম দিয়েছে। এতে সন্দেহ নেই যে, ধর্মীয় ব্যাপারে জাহাঙ্গীরের প্রাথমিক রাজত্বকাল আকবরের রাজত্বকালের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল ছিল। এই কারণেই জাহাঙ্গীর হযরত মুজাদ্দিদে আলফে-সানী (রঃ)-এর সংস্কারের আহ্বানকে সহ্য করতে পারেননি। অতএব তাকে গোয়ালীয়ার দুর্গে নযরবন্দী করে রাখলেন। কিন্তু পরিশেষে হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব (রঃ)-এর আভ্যন্তরীণ শক্তি এবং মনোবল ও চরিত্রের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পেল। পরিণামে জাহাঙ্গীর শুধু তাকে বন্দীশালা থেকে মুক্তিই দেননি, এবং শাহযাদা খুররমকে তার অভ্যর্থনার জন্য প্রেরণ করলেন এবং যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে তাকে শাহীমহলে আমন্ত্রণ জানালেন। হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব (রঃ) এই সুযোগকে মূল্যবান মনে করে প্রথমেই নিম্ন লিখিত দাবী সমূহ পেশ করলেন।

১. বাদশাহর জন্য মাথানত করে অভিবাদন করা বন্ধ করা হউক।

২. 'গো' যবেহ্ করার সাধারণ অনুমতি প্রদান করা হউক।

৩. বাদশাহ এবং রাজপরিষদের সদস্যবর্গ ও আমীর-উমারাদের জামা'তের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থা করা হউক।

৪. 'কাযী' এবং 'শরীয়তী হিসাব রক্ষকের পদ নতুনভাবে পুনরায় চালু করা হউক।

৫. যাবতীয় (বেদআত) অনৈসলামিক কার্যকলাপ এবং শরীয়তের পরিপন্থী কার্যক্রম বন্ধ করা হউক।

৬. অনৈসলামিক আইন কানুন সম্পূর্ণরূপে বাতিল ঘোষণা করা হউক।

৭. ভাঙ্গাচুরা এবং ধ্বংসকৃত মসজিদসমূহ নতুন করে নির্মাণ করা হউক।

বাদশাহ এই সব দাবীগুলো মেনে নিলেন এবং যথাশীঘ্র এই গুলো বাস্তবায়নের রাষ্ট্রীয় নির্দেশ জারি করেন। এমনিভাবে প্রায় অর্ধশতাব্দী থেকে ভারতবর্ষে 'ইসলাম' এক জীবন-মরণ দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। এখন তা থেকে মুক্ত হল এবং মুসলমানরাও শান্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (রঃ)-এর কৃতিত্ব শুধু অনৈসলামিক রাজত্বের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ইসলামী জীবনী শক্তি ও ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ এবং ইসলামী সংস্কৃতিকে পুনঃজীবিত করেই শেষ হয়নি, বরং তিনি হুমায়ুনের দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে তার সময় পর্যন্ত যে সব ইরানী ভ্রান্তবিশ্বাস ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ ও চিন্তাধারা বিস্তার লাভ করেছিল, তিনি এই গুলোর ও সংস্কার করেন। অন্যদিকে হিন্দুদের কৃষ্টি ও দর্শনের সংমিশ্রণে যে নতুন ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল তিনি এরও সংশোধন করেন। এমনি ভাবে দুধ-দুধের সঙ্গে এবং পানি-পানির সঙ্গে পৃথক হয়ে গেল। (১) তার লিখিত কিতাবসমূহে

---

১. হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানীর নাম-শায়খ-আহমদ (রঃ) ছিল। উপাধি ছিল-বদর উদ্দিন এবং উপ-নাম আবুল বারকাত। তিনি ৯৭১ হিজরী'-১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সার্ হিন্দ' নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শায়খ আব্দুল আহাদ। তিনি শায়খ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুলী (রঃ)-এর শিষ্য এবং নিজেও একজন জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ (রঃ) প্রথমে স্বীয় পিতার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর শিয়ালকোট গিয়ে মাওলানা কামাল কাশ্মীরী থেকে বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্র এবং ইয়াকুব কাশ্মীরী থেকে হাদীসের পুস্তকসমূহ অধ্যয়ন করেন। ১৭ বছর বয়সে ব্যবহারিক ও ধর্মীয় বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করে শিক্ষাকতার কাজ শুরু করেন। প্রকাশ্য জ্ঞান ব্যতীত ও তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে 'ইলমে-মা'রিফাত' এর যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর চিশ্তিয়া তরীকায় দীক্ষাগ্রহণ করে' তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। পরিশেষে ১০০৮ হিজরীতে হযরত খাজা মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহর সঙ্গলাভে ধন্য হন। ১০৩৪ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। সার্হিন্দে তাঁর মাযার আজো বিদ্যমান।

এই সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে। এতেই অনুমান করা যায় যে, তার সংস্কারমূলক কার্যক্রম কত ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটা ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাসে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল—১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের বাদশাহ '১ম-জেমস্‌' এর পক্ষ হতে 'স্যার থমস্‌ রাভ' ইংরেজ শাসকের তরফ থেকে জাহাঙ্গীরের রাজ দরবারে দূত হিসেবে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি জাহাঙ্গীরের এত নৈকট্য লাভ করলেন যে, জাহাঙ্গীর যখন গুজরাট গমন করেন তখন রাজ দরবারের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তিনিও ছিলেন। 'ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' ১৬০০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমতঃ এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষ এবং ইংল্যান্ডের মাঝে ব্যবসায়িক সম্পর্ক সম্প্রসারণ ও সুদৃঢ় করা। প্রথমতঃ ব্যবসায়ীরা ইংরেজদের প্রতিদন্ধী থাকার কারণে তাদের ব্যবসা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হল। এই নিয়ে তাদের-মাঝে কয়েকবার যুদ্ধও হল। পরিশেষে ইংরেজদের-ই-বিজয় হল। তারা পর্তুগীজীদেরকে এদেশ থেকে মারপিট করে তাড়াল। ইংরেজদের এই বিজয়ের ফলে ভারতবর্ষে এমনকি বাদশাহর দৃষ্টিতেও তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি কয়েক গুণ বেড়ে গেল। সুতরাং এর পরিপ্রেক্ষিতেই সম্রাট জাহাঙ্গীর ১১ই জানুয়ারী ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীকে 'সোরাট' আহমাদাবাদ ইত্যাদি স্থানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে অনুমতি দিলেন। দু'বছর পর পর্তুগীজরা আবার প্রতিযোগিতামূলক যুদ্ধে পরাস্ত হল। এই সব যুদ্ধে কোম্পানীর খুবই ক্ষতি হল। কিন্তু স্যার ফমস্‌ রাভ' স্বীয় বুদ্ধিমতা ও চতুরতার গুণে অতি শীঘ্র কোম্পানীকে সাহায্য করে আরো শক্তিশালী ভিত্তিতে নতুনভাবে গড়ে তোলেন। রাজদরবারে অসাধারণ প্রভান্বিত হাওয়ার কারণে তিনি কোম্পানীর জন্যে অধিক পরিমাণে সাহায্য সহযোগিতা অর্জনেও সফলকাম হন। অতএর জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পূর্বেই তারা মুগল রাজত্বের সমগ্র অঞ্চলেই ব্যবসা বাণিজ্য

করার পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। মোটকথা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এমনিভাবে ভারতবর্ষে তাদের পদ সুদৃঢ় করার ফলেই পরবর্তী সময়ে তা ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ঘাঁটিরূপে কাজ কাজ করল।

ইন্তিকাল

১৬২৭ খৃীস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণে নূরজাহান আফসখান ও শাহরিয়ারের সঙ্গে কাশ্মীর ভ্রমণে যান। কিন্তু তাঁর হাঁপানি রোগ এই ভূ-স্বর্গে (কাশ্মীরে) উপস্থিত হয়েও সুস্থ হল না। ইহা ব্যতীত শাহরিয়ার ও তথায অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর পরিপ্রেক্ষিতে জাহাঙ্গীর ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী লাহোর যেতে মনস্থ করলেন। তিনি রুগ্ন অবস্থায় দুর্বল থাকা সত্ত্বেও ভ্রমণ পথের একস্থানে শিকার করতে ছিলেন, এমন সময় একজন সৈনিক দুর্ভাগ্যক্রমে পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এতে জাহাঙ্গীব খুবই মর্মাহত হন, ফলে তাঁর রোগ আরো বৃদ্ধি পেল। পরিশেষে ২৭শে সফর, ১০৩৭ হিজরী, মুতাবিক ১৬২৭ খৃীস্ট.ব্দের প্রাতঃকালে ইন্তিকাল করেন। লাহোর তাঁকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৫৮ বছর। ২২ বছর পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন।

শাহজাহান :

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সময় শাহযাদাহ খুররম, যিনি পরবর্তীতে শাহজাহান উপাধি নিয়ে সম্রাট হয়েছিলেন, তিনি দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহীর ভূমিকা পালন করছিলেন। পিতার ইন্তিকালের সংবাদ পেয়ে তিনি মহব্বত খান উভয়েই দ্রুত আগ্রার অভিমুখে রওয়ানা হন। এদিকে শাহযাদাহ শাহরিয়ার নূরজাহানের সাহায্য-সহযোগিতায় উৎসাহিত হয়ে রাজসিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রাজদরবারের প্রধান মন্ত্রী আসফখান শাহযাদাহ খুররমের একান্ত সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আর সাহায্য করবেনই না কেন? শাহযাদা খুররমের প্রিয়তমা বিবি 'মুমতাজ মহল' তো-আসফখানেরই কন্যা ছিলেন। শাহযাদা খুররম রাজধানী পৌঁছার পূর্বেই আসফখান এক সেনা বাহিনী নিয়ে শাহরিয়ারের উপর

আক্রমণ করে' তাঁকে বন্দী করেন। শাহযাদাহ খুররমের পথে এমন আর কোন প্রতিবন্ধকতা রইল না। তিনি আগ্রায় পেঁাছেই সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শাহ্জাহান উপাধি ধারণ করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই প্রথমে শাহ্রিয়ার এবং আপন দু'ভ্রাতুষ্পুত্রকে (সিংহাসন আরোহণের ভয়ে) হত্যা করেন। শাহ্জাহানের রাজত্বকাল ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে-১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৩১ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর রাজত্ব-ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের যেসব রাজ্যে বিদ্রোহ চলছিল, তা, ও দমন করা হল। সকল অঙ্গ রাজ্যই তাঁর অনুগত হয়ে খেরাজ প্রদান করতে লাগল। শাহ্জাহানের রাজত্বকালের বিখ্যাত মন্ত্রী সা'দুল্লাহ খানের দূরদর্শিতা এবং সঠিক চিন্তাধারার ফলে আকবরের অর্থনৈতিক সংস্কারসমূহ সমগ্র দেশের কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করল। ফলে দেশের জনগণ সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করতে লাগল।

শাহ্জাহান শিল্প-কলার প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। দিল্লী ও আগ্রায় তাঁর নির্মিত অট্টালিকাসমূহে তাঁর বিশেষ শিল্পী মনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। যদি এই সব অট্টালিকাকে জাহাঙ্গীর এবং আকবরের নির্মিত ইমারত সমূহের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে স্পষ্ট ধরা পড়বে যে আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে ইসলামী বিশ্বাস ও চিন্তা ধারার উপর হিন্দু সংস্কৃতির যে প্রভাব পড়েছিল, তার নিদর্শন তাদের সময়কার অট্টালিকা-সমূহেও সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শাহজাহান শিল্পকলার মধ্যে এর কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। শাহজাহানের রাজত্বকাল আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল দিক দিয়েই শান্তি শৃংখলা বিরাজমান ছিল এবং জনগণের সুখ-শান্তি ও স্বচ্ছলতার জন্য ও বিখ্যাত ছিল। কিন্তু বাদশাহকে জীবনের শেষের দিনগুলোতে বিপদ আপন এবং কষ্টের মধ্যে নিপতিত হতে হয়। যা তাঁর শান্তিপূর্ণ জীবনের স্বাদ ও আরামকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিল। এর কারণ হল। যে, তাঁর চার ছেলে যথা—(১) দারা শেকোহ, (২) সুজা, (৩) আওরঙ্গজিব, (৪) মুরাদ, এদের মধ্যে রাজসিংহাসন নিয়ে বিরোধিতা চল্ছিল। পিতা যখন এই খরব জানতে পেলেন, তখন দারা শেকোহ্কে কাবুল ও মুলতানের গভর্ণর

নিযুক্ত করলেন। সুজাকে বাংলায় পাঠিয়ে দিলেন। আওরঙ্গজিবকে দাক্ষিণাত্যে এবং মুরাদকে গুজরাটের শাসন ক্ষমতা প্রদান করলেন।

এইভাবে চার পুত্রকে চার প্রদেশে পাঠিয়ে গণ্ডগোলের দ্বার বন্ধ করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টার ফল উল্টো হল। কেননা শাহযাদাদেরকে এমনিভাবে তাদের উদ্দেশ্য সফলকাম করতে এবং সামরিক শক্তির অধিকারী হতে সুযোগ মিলে গেল।

শাহযাদাদের মধ্যে দারাশেকোহ সকলের বড় ছিলেন। চরিত্র আচার ব্যবহার, চিন্তা-ফিকিরের দিক দিয়ে অন্যান্য ভাইদের থেকে তিনি পৃথক ছিলেন। হিন্দু সভ্যতা ও কৃষ্টি এবং তাদের ধর্ম ও দর্শনের প্রতি তাঁর অধিক ঝোঁক ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাজদরবারের বিশিষ্ট মুসলমান ব্যক্তিবর্গ আমীর উমারাদেরকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখতেন। 'সুজা' খুবই চতুর দানশীল ছিলেন, কিন্তু অধিক মাত্রায় মদ্যপানের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গিয়েছিল। আওরঙ্গজিব অতিশয় সঠিক বিশ্বাসী এবং দরবেশ প্রকৃতির মুসলমান ছিলেন। মুসলমান আমীরগণ সাধারণত তাঁকেই পছন্দ করতেন। শাহযাদাহ মুরাদ উপযুক্ততা ও যোগ্যতার দিক দিয়ে অন্যান্য ভাইদের চেয়ে পশ্চাদপদ ছিলেন।

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাহান কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। বাদশাহ ইন্তিকাল করেছেন বলে একটি অমূলক কথা সাধারণভাবে প্রচারিত হল। এই সংবাদ শোনা মাত্র চার শাহযাদার মাঝে সিংহাসন অর্জনের প্রবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। অতএব সুজা বাংলা থেকে যাত্রা করলেন এবং একটি অজুহাত দাঁড় করলেন যে, দারাশেকোহ (যিনি রাজধানীতে অবস্থান করেছেন) বাদশাহকে বিষ পান করায়ে হত্যা করেছেন তাই তিনি এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য রাজধানীতে যাচ্ছেন। মুরাদ গুজরাট ছিলেন, তিনি সেখান থেকেই নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা দিলেন। দারাশেকোহ এই অবস্থা দেখে নিজের ছেলে সুলায়মান শেকোহ এবং রাজা জয়সিংহ এর তত্ত্বাবধানে এক সেনাবাহিনী সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন। বেনারসের নিকটে যুদ্ধ হল। সুজা যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে

বাংলায় ফিরে গেলেন। আওরঙ্গজিব মুরাদের সঙ্গে মিলে গেলেন। তাই তারা উভয়েই সৈন্য-সামন্ত নিয়ে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। এ দিকে দারা শেকোহ এক বিরাট বাহিনী নেয়ে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন। 'সামগড়' কিংবা 'ফাতেহ গড়ে' যুদ্ধ হল। দারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। এবার আওরঙ্গজিব এবং মুরাদ উভয়ে রাজধানীর দিকে ধাবিত হলেন। এখানে উপস্থিত হয়ে জানা গেল যে, বাদশাহর ইন্তিকালের সংবাদ ভিত্তিহীন ছিল। তিনি অসুখ থেকে সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু এর মধ্যে রাজ্যের আইন শৃংখলা একেবারে লণ্ড-ভণ্ড হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় প্রবল ধারণা হচ্ছিল যে, যদি এ সময়ে রাজত্ব অধিকার করা না যায় তবে হয়ত দারাশেকোই বাদশাহর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবেন। কেননা তিনিই ভাইদের মধ্যে সকলের বড় ছিলেন। তা ছাড়া বাদশাহর সুদৃষ্টি তাঁর দিকেই সবচেয়ে অধিক ছিল।

প্রকাশ থাকে যে, যদি দারাশেকোরই সিংহাসন অধিকারের সুযোগ মিলে যায়, তবে আকবরের সময়ের অধর্ম কাজকর্ম পুনর্জীবিত হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্‌ই জানতেন যে, এই দেশে ইসলামের কি পরিণতি হতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আওরঙ্গজিব সেই সময় নিজের সামরিক শক্তি সামর্থ্য নিয়ে সিংহাসন অধিকারে সফলকাম হলেন। বাদশাহকে রাজপ্রাসাদে নযরবন্ধী করা হল। এমনিভাবে ১৬৫৮ সালের জুন মাসে শাহ্‌জাহানের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটল। যদিও এই ঘটনার আট বছর পর পর্যন্ত ও তিনি জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর এই দীর্ঘ সময় নযরবন্ধী অবস্থাতেই অতিবাহিত হয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, ইতিহাস ও কিভাবে নিজ গতিতে চক্কর খায়। মহান আকবরের বিরুদ্ধে তাঁর ছেলে জাহাঙ্গীর বিদ্রোহ করেন। অতঃপর জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে তাঁরই সন্তান শাহযাদার খুররম (শাহজাহান) বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন। এর পরিণতি শাহজাহানকেও এমনিভাবে ভুগতে হয় যে, তাঁর ছেলে আলমগীর তার সিংহাসন ছিনায়ে নিয়ে তাকে নযরবন্ধী করে দেন।

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

"অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ তোমরা ইহা হতে উপদেশ গ্রহণ করো"। অতএব কোন এক অজুহাতে মুরাদকে গ্রেফতার করে গোয়ালিয়ার দুর্গে বন্দী করে রাখেন। সুজা আওরঙ্গজিবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়ে বাংলার দিকে পলায়ন করেন। আবার সেখান থেকেও কিছুদিন পর পলায়ন করে আরাকানের বাদশাহর কাছে সাহায্যের জন্যে গমন করেন। কিন্তু তথায় অবস্থান কালে তার কাছে অল্প কিছু যা সম্পদ ছিল, তা ও লুণ্ঠিত হল। অবশেষে নিরুপায় হয়ে পাহাড়ের দিকে পলায়ন করেন এবং সেখানেই কোন এক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দারাশেকোহ ও এক সেনাবাহিনী নিয়ে আজমীরে আওরঙ্গজিবের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। পরিশেষে তার একজন প্রাক্তন বন্ধু আফগানী হাকিমের নিকট আশ্রয় নিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তিনি তাকে আলমগীরের নিকট সমর্পণ করে দিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আরো আশ্চর্যের কথা এই যে, আলমগীর শুধু নিজের ভাই ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা কিংবা বন্দী করেই ক্ষান্ত হন নাই, বরং নিজ সন্তান সুলতান মাহমুদ, যার সাহায্য ও সহযোগিতায় আওরঙ্গজিব আপন পিতা শাহজাহানকে নযরবন্দী করতে সফলকাম হয়েছিলেন তিনিও স্বীয় পিতা আলমগীরের কাছে অবাধ্য ও বিদ্রোহী বলে চিহ্নিত হলেন। তিনিও আপন চাচা ও চাচাতো ভাইদের সাথে আওরঙ্গজিবের নির্দেশে গোয়ালিয়ার দুর্গে বন্দী হলেন। সেখান থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আর মুক্তি পেলেন না।

আওরঙ্গজিব আলমগীর (১৫৫৮—১৭০৭ খ্রীঃ)

এমনিভাবে আওরঙ্গজিব সর্বদিক থেকে চিন্তামুক্ত ও নির্ভয় হয়ে-১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে নিজেকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলে ঘোষণা দিলেন এবং আলমগীর উপাধি ধারণ করলেন। আওরঙ্গজিবের প্রকৃত নাম ছিল মুহিউদ্দীন মহাম্মদ আওরঙ্গজিব। ১৫ই 'যিলকাদ, ১০২৭ হিজরী, মুতাবিক ২৪শে অক্টোবর ১৬১৮ খ্রীস্টাব্দে 'দুহুদ' নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জাহাঙ্গীর যখন শাহজাহান, মুমতাজ মহল এবং অন্যান্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে গুজরাট

থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন তাঁর জন্ম ভূমির কথা মনে পড়ল। আওরঙ্গজিবের স্বীয় পুত্র মুহাম্মদ আজমকে এক চিঠিতে লেখলেন, 'দুহুদ' গুজরাট প্রদেশে অবস্থিত এই অপরাধীর (আমার) 'জন্মভূমি'। তুমি এর অধিবাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে"। (আলমগীরের চিঠি নং ৩)

সম্রাট শাহজাহান-শাহযাদা থাকা কালীন সময়ে নিজের বিদ্রোহী প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে যখন পিতার আনুগত্য স্বীকার করলেন তখন স্বীয় দু'পুত্র দারাশেকোহ এবং আওরঙ্গজিবকে তাঁর নিকট 'যামানত' (বন্ধক) হিসেবে রাখতে হয়েছিল। অতএব এই উভয় শাহযাদাই ১৬২৬ খ্রীস্টাব্দের 'জুন' মাসে-জাহাঙ্গীরের দরবার-লাহোরে পৌঁছলেন এবং তাদেরকে নূরজাহানের তত্ত্বাবধানে রাখা হল। ঘটনাক্রমে অল্প দিন পরেই অর্থাৎ ১৬২৬ খ্রীস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের ইন্তিকাল হল। শাহযাদা খুররম যখন শাহজাহান উপাধি নিয়ে রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন তখন এই উভয় শাহযাদার ও মুক্তি পেলেন এবং তাঁরা মা-বাবার সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। স্যার যাদুনাথ সরকার লেখেন যে, পণবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে উভয় শাহযাদা যখন আসফখানের তত্ত্বাবধানে ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৬২৮ খ্রীস্টাব্দে আগ্রায় সর্বপ্রথম পিতা-মাতার সঙ্গে মিলিত হন, তখনকার দৃশ্য খুবই মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক ছিল। মা (মুমতাজ মহল) পণবন্দী নিজ সন্তানদেরকে ফিরে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা হয়ে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরলেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সোহাগ করতে লাগলেন।

শিক্ষা-দীক্ষা

আওরঙ্গজিবের বয়স যখন দশ বছর তখন শাহজাহান তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রতিপালনের বিশেষ সুব্যবস্থা করেন। শাহজাহানের রাজত্বকালের বিখ্যাত মন্ত্রী সাদুল্লাহ খান এবং তৎকালের বিখ্যাত আলিম ও পরবর্তী সময়ে আহমাদাবাদের প্রধান বিচারপ্রতি হাকিম মুহাম্মদ হাশিম গীলানী আওরঙ্গজিবের শিক্ষক মনোনীত হন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে এই উভয় সম্মানী ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আওরঙ্গজিব জন্মগতভাবেই অসাধারণ মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি এই দু'জন মহাজ্ঞানী শিক্ষকের

তত্ত্বাবধানে অতিশীঘ্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পরিপক্কতা অর্জন করেন। আওরঙ্গজিবের পত্রাবলীই এই কথার সাক্ষ্য যে, কুরআন হাদীসে-তাঁর দৃষ্টি সুদূর প্রসারী এবং উহার অধ্যয়নে তাঁর গভীরতা ছিল। সুতরাং যেখানে সেখানে তিনি কুরআন মজীদের আয়াত ও হাদীসের খণ্ড অংশের উদ্ধৃতি দিতেন। স্যার যাদুনাথ সরকার লেখেন যে, আওরঙ্গজিব আরবী ও ফার্সী ভাষায় একজন সুপণ্ডিত ছিলেন।

তাছাড়া তিনি হিন্দী ভাষায় ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এই ভাষায় বিখ্যাত রচনা ও গল্প নিজের কথোপকথনের সময় উদ্ধৃত করতেন। বাল্‌খ্‌ এবং কান্দাহারে অবস্থানকালে 'চগতাই তুর্কী' ভাষাও শিক্ষা করে ছিলেন। তাতে কথোপকথন ও করতে পারতেন। তাঁর পত্র লিখন পদ্ধতি এত উন্নত ও বিশুদ্ধ ছিল যে, তিনি একজন সত্যিকার সাহিত্যিক ছিলেন। সুতরাং তাঁর শাহযাদা থাকা কালীন সময়ে এবং তৎপরে ও তিনি পুণ্য লাভের আশায় কুরআন পাকের কয়েকটি কপি হতে নকল করে মক্কা ও মদীনায় উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করেন। তাঁর লেখা কুরআনের দু'একটি কপি ভারতবর্ষেও পাওয়া যায়। আওরঙ্গজিব কুরআন মজীদের হাফিজও ছিলেন।

পুস্তক পাঠ করা তাঁর জন্মগত অভ্যাস ছিল। অধিকাংশ সময় কুরআন শরীফের তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ এবং সুফীসাধকের বাণীও তাঁদের লেখা পুস্তক পাঠ করতেন। সাধারণতঃ কবিতা লেখা এবং সাহিত্যের প্রতি তিনি আগ্রহী না হলেও শেখ সাদী এবং খাজা হাফিজ শিরাজীর কথা তাঁর কাছে খুবই প্রিয় ছিল। তাঁর লেখা খুব অর্থ পূর্ণ, কার্যকারী এবং প্রামাণ্য হতো। তাঁর ধর্মীয় বিদ্যার প্রতি আগ্রহ থাকার কারণে উলামা এবং ফুকাহা (ধর্মীয় শাস্ত্রের পণ্ডিত)-দের সঙ্গ লাভের প্রতি তিনি অতিশয় আগ্রহী ছিলেন। এর ফলে তাঁর মন-মানসিকতায় সত্য অন্বেষণের প্রেরণা এবং স্বভাবের মধ্যে গবেষণার উদ্দ্যোম সৃষ্টি হয়ে ছিল। সুতরাং এর সুফল এমন হল যে, আকবরের রাজত্ব কালের যাকিছু অধর্মীয় কার্যক্রম বাকী ছিল, আলমগীরের কঠোরতার ফলে তা' সমূলে বিনষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু এটা অস্বীকার করার জো নেই যে, তার অস্বাভাবিক কঠোরতার

কারণে রাজস্বের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে ছিল, যা, আমরা কিছু আগে বেড়ে এর বর্ণনা করবো।

মুহাম্মদ সাকী মুসতাদ খান বর্ণনা করেন যে, হযরত আলমগীর (রঃ) স্বীয় স্বভাব সুলভ পুণ্যাত্মার কারণের ধর্মীয় কাজ কর্মে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তিনি হানাফী মাযহারের অনুসারী সুন্নী ছিলেন। ইসলামের পঞ্চ ফরযের প্রতি কঠোর অনুসারী ছিলেন। সদা সর্বদা-অযু অবস্থায় থাকতেন। কালেমায়ে তাইয়্যেবা এবং অন্যান্য অযীফা সর্বদা অন্তরে স্মরণ করতেন। জামাআতের সাথে যথা সময়ে নামায আদায় করতেন। যাবতীয় সুন্নত ও নফল ইবাদত আদায় করতেন। "আইয়্যামে বীয (সুক্লপক্ষের) রোযা যথারীতি পালন করতেন। সপ্তাহের মধ্যে সোমবার, বৃহস্প্রতিবার এবং শুক্রবার রোযা রাখতেন। জুমার নামায জামে মসজিদে পড়তেন। ইসলামের পবিত্র রাত্রিসমূহে জাগরণ থেকে ইবাদত বন্দেগীতে রত থাকতেন। যথারীতি নামায আদায় করা ছাড়া ও তিনি শরীয়তের নির্দেশ মুতাবিক যাকাত প্রদান করতেন। ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য যেসব খাত নির্ধারিত ছিল, তিনি নিজে উহার যাকাত দিতেন এবং সন্তানদের প্রতি ও যাকাত প্রদানের বিশেষ তাকীদ ছিল। রোযার মাসে বিভিন্ন ইবাদত ও তাস্‌বীহ তাহ্‌লিল অতিমাত্রায় আদায় করতেন এবং শেষে দশ দিন ইতেকাফ্‌ করতেন।

ন্যায় বিচার

তার ন্যায় বিচারের অবস্থা এমন ছিল যে, প্রতি দিন দু'তিনবার জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শন দিতেন এবং কোন প্রতিবন্ধকতা ব্যতীতই যেন তারা নিজেদের অভিযোগ বাদশাহর সামনে পেশ করতে পারে এর সুযোগ দিতেন। এর প্রতিপ্রেক্ষিতে অনেক সময় অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে অনেক অভিযোগকারী এমন শব্দ ব্যবহার করতেন, যা, শাহী দরবারের আদবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হতো। কিন্তু বাদশাহ তাদের এইসব ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি কোন লক্ষ্য করতেন না। আলমগীরের উপর একটা সাধারণ অভিযোগ ছিল যে, তিনি হিন্দুদের সঙ্গে অনেক কঠোর ব্যবহার করতেন।

মাওলানা শিবলী-নুমানী এবং মাওলানা আকবর শাহ খান নাজিব আবাদী এই সব অভিযোগের যথার্থ এবং প্রামাণ্য উত্তর দিয়েছেন, যারা দেখতে চান, তা পাঠ করুন। তবুও এটা স্মরণ রাখা চাই যে, আলমগীর এক জন মানুষ ছিলেন, ফিরিশতার মত নিষ্পাপ ছিলেন না। অবশ্য অনেক সময় বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর দ্বারা অনেক অবৈধ ও কঠোরতামূলক কিছু আচরণ প্রকাশিতও হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সকল হিন্দুর সঙ্গেই আলমগীরের আচরণ কঠোরতামূলক ছিল। বরং প্রকৃত ঘটনা এই যে, যে সব হিন্দু গন্ডগোল প্রিয়, বিদ্রোহী এবং ষড়যন্ত্রকারী ছিলো, আলমগীর শুধু তাদের প্রতিই কঠোর ব্যবহার করেছেন এবং শাস্তি দিয়েছেন। অন্যথায় সকলই জানেন যে, আলমগীরের রাজত্বকালে বড় বড রাষ্ট্রীয় পদে মুসলমানদের ন্যায় হিন্দুরাও অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজদরবারের পক্ষ হতে মন্দির সমূহের জন্য ও সম্পত্তি ওয়াক্ফ (দান)-করা হতো।

সংস্কারমূলক কার্যসমূহ

আওরঙ্গজিব আলমগীরের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল, তিনি সমগ্র রাজ্যকে রাজনৈতিক দিক দিয়ে সংরক্ষণ ও নিরাপদ রেখে এবং রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকের চরিত্র গঠন ও সার্বিক অবস্থার উন্নতির ও চেষ্টা করেছিলেন। আলমগীরের রাজত্বকালের পূর্ববর্তী সময়ে জনগণ সংশয় ও অপসংস্কৃতির মধ্যে বন্দী ছিল। মদ্যপান ছিল সাধারণ ব্যাপার জোয়া খেলা এবং শরীয়তের পরিপন্থী কার্যকলাপ ও কু-প্রথা সর্বত্র প্রচলিত হয়ে পড়েছিল। আলমগীর এইসব অপকর্মের দ্বার একেবারে বন্ধ করে দেন। বীরাঙ্গনাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, হয়ত তারা দেশ ছাড়বে, নয়তঃ বৈধ-দাম্পত্য জীবন-যাপন করবে। এই সব নির্দেশ কার্যকরী করার জন্য যথারীতি পরিদর্শক ও সংরক্ষক নিযুক্ত করেন। ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'সতীদাহ' কিংবা 'সহমরণ'-এর মত কুপ্রথাসমূহ রহিত করে দেন এবং শিশুদেরকে দাস কিংবা পুরুষত্বহীন করে বিক্রি করার বিরুদ্ধে আইন-জারি করেন। ঈদ উৎসব এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় উৎসবের সময় অতিরিক্ত খরচ পরিহার করার নির্দেশ দেন। শরীয়তের পরিপন্থী অনেক অবৈধ ট্যাক্স বন্ধ করে দেন। বর্ণিত আছে যে, এইরূপ প্রায় ৮০ (আশি) প্রকার ট্যাক্স মাওকুফ করে দেয়া হয়েছিল। মুহাম্মদ

সাকী খান বর্ণনা করেন যে, জনগণ থেকে আদায় যোগ্য প্রায় ৩০ ত্রিশ লাখ টাকার 'কর' মওকুফ করে দেন।

আলিমগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

আলিম ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। তিনি রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ইসলামী শরীয়তের মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেশের বিখ্যাত আলিমগণকে একত্রিত করে "ফাতুয়ায়ে আলমগীরী" নামে হানাফী মাযহাবের একটি বিরাট পুস্তক রচনা করান, যাতে যাবতীয় ইসলামী আইন কানুন একত্রে সংরক্ষিত থাকে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিভাগকে বিচার কার্য সম্পন্ন করা অতি সহজ হয়। 'মাছার আলমগীরীর লেখক বর্ণনা করেন যে, এই বিরাট কিতাব (পুস্তক) রচনা করতে তৎকালীন মুদ্রায় প্রায় দুলক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। ('মাছার আলমগীরী' উর্দু অনুবাদ, ৩৮৭ পৃঃ দ্রঃ)

বীরত্ব

সাধারণতঃ যাঁরা বিভিন্ন ইবাদাত এবং 'অযিফা' কিংবা তাসবীহ পাঠের দিকে মনোযোগী হন, তাঁদেরকে বীরত্বের ময়দানে বীরপুরুষ হিসেবে দেখা যায় না। কিন্তু আলমগীরের ব্যক্তিত্বে যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্তর ও মন-মানসিকতায় সৌন্দর্য ও কল্যাণ কর প্রেরণা একত্রে সংযোজন করে দিয়ে ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞান আল্লাহভীরুতা, বীরত্ব এবং দৃঢ়তার এমন অবস্থা ছিল যে একদা যখন তিনি বালখে আবদুল আযীয খানের মুকাবিলায় যুদ্ধরত ছিলেন এবং বিপক্ষের সৈন্যরা তাঁকে চার দিক দিয়ে বেষ্টন করে ফেলে ছিল, এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত হল। আলমগীর নামায পড়তে মনস্থ করলেন, তখন সঙ্গি-সাথীরা এমতাবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি সকলের কথা উপেক্ষা করে ঘোড়া হতে নীচে নেমে ফরয, সুন্নত এবং নফল নামায পর্যন্ত স্থির ধীরভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্রেই আদায় করেন বুখারার গভর্নর আবদুল আযীয খান যখন ইহা জানতে পারলেন, তখন তিনি অস্থির হয়ে গেলেন এবং বললেন, এমন ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করায়

অর্থ নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিপতিত করা"। ('মাছার আলমগীরী ১০৮৮ পৃঃ দ্রঃ)

আলমগীরের রাজত্বকাল অর্ধশতাব্দী থেকেও অধিক ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য কার্য সম্পাদন করেছেন। যা মুগল বংশের অন্য কোন বাদশাহর পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। এতে সন্দেহ নেই যে, তাঁর রাজত্বকালের অধিকাংশ সময় যুদ্ধ বিগ্রহ এবং বিভিন্ন প্রকার অস্থিরতার মাঝে অতিবাহিত হয়েছে। মারাঠা এবং রাজপুতরা বার বার বিদ্রোহ করেছে, আওরঙ্গজিব-আলমগীর প্রতি বারই তাদেরকে সফলতার সাথে প্রতিহত করেছেন। দক্ষিণ ভারতের যুদ্ধসমূহ দীর্ঘ দিন পর্যন্ত চলতে ছিল, এই জন্য রাজকোষের উপর বিরাট চাপ পড়ে ছিল। কিন্তু যাই হউক, এতসবের পরও তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এই সমস্ত কৃতিত্বের পরও তাঁর রাজত্বের শেষ যুগ থেকেই মুগল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। কারণ, আলমগীর স্বীয় ইচ্ছা ও ধ্যান ধারণার এত সুদৃঢ় ছিলেন যে, তিনি কোন বিষয়ের পরিণামের কথা চিন্তা ভাবনা না করেই বেপরওয়াভাবে কাজ করতেন। তিনি একজন সুন্নী ও কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন। অবশ্য তার এ গুণাবলী ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার স্থান অনেক উন্নত করেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মানতে হয় যে, আকবর এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দেশে যে অবাধ স্বাধীনতা, বিলাসিতা, আনন্দ প্রিয়তার চিন্তাধারা সৃষ্টি হয়েছিল, এতে হঠাৎ সাধুতা আত্ম-সংযমতা এবং শুষ্ক মানসিকতায় রূপান্তরিত করা সম্ভব ছিল না। ফলে একদিকে হিন্দু সম্প্রদায় আলমগীরকে বড় শত্রু বলে মনে করতে ছিল এবং অন্যদিকে খোদ মুসলমানরাও তাঁর প্রতি বিরূপ হতে লাগল। তাদের ধারণা ছিল যে, আলমগীর একজন খাঁটি মোল্লা হয়ে গেলেন। সুতরাং তিনি রাজত্ব করার উপযুক্ত নন।

এ সবচেয়ে আক্ষেপের বিষয় হল, যে সব ওলামা ও ফুকাহা (ধর্মীয় গবেষক)-দের উপর আওরঙ্গজিব সর্ববিষয়ে অধিক বিশ্বাস ও ভরসা রাখতেন, দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানদের জীবন যাপনের উপর অধিক প্রভাব-শালী ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করলেও তাঁরা শুধু বাহ্যিক ও স্থূল-

দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁদের এ বিষয়ে কোন অনুভূতিই ছিল না যে, ইসলাম যখন একটি বিশ্বব্যাপি সনাতন ধর্ম এবং প্রত্যেক দেশ ও জাতির জন্যেই সাম্য, শান্তি শৃংখলার বাণী বহনকারী, তখন একজন বিচারক হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের দৃষ্টি ভঙ্গি অন্যান্য জাতির সঙ্গে কিরূপ হওয়া চাই? সহানুভূতিশীল ও বিনম্রভাব, না কঠোরতামূলক 'মাছার আলমগীরী গ্রন্থের লেখক অতিশয় গর্বের সঙ্গে লিখেছেন, 'অমুসলিম ব্যক্তিদেরকে বিশেষ কোন সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত করা হতো না। সমগ্র অধিকৃত অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়'। অতঃপর এই লেখকই একটু অগ্রসর হয়ে লেখেন যে, হযরতের রাজত্বকালে অমুসলিমদের উপর পুনরায় জিযেয়া কর ধার্য করা হয়। এটা হযরতের এমন এক ধর্মীয় কৃতিত্ব যা তাঁর পূর্বের কোন মুসলিম শাসকই সম্পাদন করতে পারেন নি। (পৃঃ ৩৬৮) সত্য কথা এই যে 'মাছার আলমগীরীর লেখক আলমগীরের যে, সব কর্মকে গর্বের বিষয় বলে সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন, তা প্রকৃতপক্ষে প্রশংসার যোগ্য নয়। কেননা কোন মুসলমানি শাসকের জন্য অমুসলিমদের তৈরী কোন উপাসনালয় ধ্বংস করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। আলমগীর যখন খাঁটি ইসলামী প্রেরণা নিয়েই এই সব কাজ কর্ম করছিলেন এবং সর্বদা ওলামা ও ফুকাহ (ধর্মীয় চিন্তাশীল)-দের পরামর্শ গ্রহণ করতেন, তখন আলেমদের কর্তব্য ছিল, এই সব বিষয়ে ইসলামের মূল শিক্ষাকে সামনে রেখে আলমগীরের ধ্যান-ধারণায় একটা ভারসাম্য অবস্থার সৃষ্টি করা। কিন্তু সেই যুগে শিক্ষার অধঃপতনের কারণে যে সব আলিম সৃষ্টি হয়েছিলেন, নিম্নের উদ্ধৃতি থেকেই এর একটা স্পষ্ট ধারণা করা যাবে। 'বারনিয়ার' লেখেন যে, "আওরঙ্গজিবের সিংহাসন আরোহণের পর একদা তার নিকট একজন আলেম শিক্ষক কোন স্বার্থ সিদ্ধির আশায় তাঁর নিকট আগমন করেন, তখন আওরঙ্গজিব তাঁকে নিরবে ডেকে নিয়ে এক দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। তা নিম্নরূপ ঃ

"মোল্লাজী! আপনার বাসনা কি? আপনি কি চান যে, আমি আপনাকে রাজ দরবারের প্রথম শ্রেণীর আমীরদের অন্তর্ভুক্ত করবো? আমি জানি

যে, আমার উপর আপনার দাবী থাকতো, যদি আপনি আমাকে কোন কার্যকরী শিক্ষা দিতেন। কিন্তু আপনি আমাকে কি শিক্ষা দিয়েছেন? আপনি আমাকে জানিয়েছেন যে, ইংল্যাণ্ড একটি সাধারণ দ্বীপ, সেখানে সবচেয়ে বড় বাদশাহ প্রথমতঃ পর্তুগালের শাসক ছিলেন। অতঃপর হল্যাণ্ডের বাদশাহ এবং বর্তমানে ইংল্যাণ্ডের রাজা। ফ্রান্স এবং স্পেনের শাসকদের সম্পর্কে আপনি বলেছেন যে, তাঁরা আমাদের সাধারণ রাজাদের মত ছিলেন। আর ভারত বর্ষের সম্রাট ঐসব শাসক থেকে অনেক বড় ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বাদশাহ হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান অতিবাহিত হয়েছেন। তাঁরা ছিলেন জগত বিখ্যাত বিশ্ব বিজয়ী মহান সম্রাট। আপনি আমাকে আরো জানিয়েছেন যে, ইরান, কাশগড়, তাতার, পিগো, সিয়াম এবং চীন—ভারতবর্ষের সম্রাটের নাম শুনে কেঁপে উঠত। সুবহানাল্লাহ্! আপনার ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক জ্ঞান সম্পর্কে কি বলবো? আপনার কি কর্তব্য ছিল না যে, আপনি আমাকে পৃথিবীর সমস্ত জাতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত করায়ে বলে দিতেন যে, এসব দেশের উৎপন্ন দ্রব্য এবং সামরিক শক্তির অবস্থা কেমন? তাঁরা কিভাবে যুদ্ধ করতেন? তাঁদের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার এবং ধর্ম ও শাসন প্রণালী কেমন ছিল? আপনার কর্তব্য ছিল—আমাকে ইতিহাসের যথারীতি শিক্ষা দিয়ে রাজ্যসমূহের ভিত্তি পতন এবং উহাদের উত্থান ও পতনের কারণসমূহ বর্ণনা করা। আর ঐ সব ঘটনাবলী, বিপদাপদ এবং ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া—যার কারণে বড় বড় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। আচ্ছা পৃথিবীর পরিপূর্ণ ইতিহাস সম্পর্কে অবগত করানোর কথা দূরে থাকুক, আপনি তো আমার বাপ-দাদাদের পরিপূর্ণ নামটি পর্যন্ত জানান নি! আপনি তো চিন্তাও করেন নি যে, একজন শাহযাদার উপযুক্ত শিক্ষার জন্য কোন্ কোন্ বিষয় অত্যাবশ্যকীয়। আপনি মনে করেছেন যে, আমাকে শুধু আরবী ব্যাকরণের একজন পণ্ডিত হওয়া চাই। আমাকে এমন বিদ্যা অর্জন করা প্রয়োজন ছিল, যা' একজন বিচারক কিংবা গবেষকের জন্য আবশ্যক হয়। এমনিভাবে আপনি আমার যৌবনের মূল্যবান সময়টুকু শুধু শব্দ শিক্ষার নিরস ও স্বার্থহীন এবং বৃথা চেষ্টায় ব্যয় করেছেন। আপনি আমার সম্মানের পিতাকে বলেছেন যে "আমি

তাঁকে দর্শন বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছি"। এটা যথার্থ যে, আপনি কয়েকটি বছর পর্যন্ত আমার মস্তিষ্ককে এইসব অনর্থক এবং নির্বুদ্ধিতার বিষয় দ্বারা অস্থির করে রেখেছেন, যা জীবনের কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কহীন ছিল। নিশ্চয়ই আপনি আমার জীবনেব মূল্যবান সময়টুকু স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী অমূলক বিষয়সমূহের আলোচনায় ব্যয় করেছেন যখন আমার শিক্ষা সমাপ্ত হল—তখন আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানা ছিল না যে, আমি শুধু এমন কয়েকটি সূক্ষ্ম এবং অবোধগম্য পরিভাষা ব্যবহার করতে পারতাম, যাতে উন্নত চিন্তা-ধারার বুদ্ধিমান মানুষ ও অবাক হয়ে যেতো। আপনি যদি আমাকে ঐসব জ্ঞান শিক্ষা দিতেন, যা বুদ্ধি ও জ্ঞানের মূলনীতির উপর মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি ও প্রতি-পালন করতো এবং উহা দ্বারা সঠিক ও গুরুত্বপূর্ণ দললীসমূহের প্রতি আকাংক্ষী করে তুলতো কিংবা আমাকে যদি ঐসব কথা পড়াতেন, যা' দ্বারা আত্মার মহত্ত্ব অর্জিত হতো অথবা যদি ঐসব মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করতেন, যা দ্বারা কালের দুর্বিপাকের মুকাবিলায় মানুষ এত শক্তিশালী হতো যে, না বিপদ-আপদে তাকে অস্থির করতে পারে না, আনন্দ ও সফলতার সময়ে তার মস্তিষ্কের চিন্তাধারা বিভ্রান্ত হতে পারে। কিংবা আপনি যদি আমাকে মানবীয় প্রকৃতিক বৈশিষ্টের নিগূঢ় তথ্য সম্পর্ক অবগত করতেন, কিংবা আমাকে যদি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের এবং উহার আইন শৃংখলার পরিপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান দান করতেন, তবে আমার উপর আপনার অনুগ্রহসমূহ—আলেকজা'ডারের উপর এরিষ্টটলের বিভিন্ন অনুগ্রহ থেকে অধিক হতো এবং আমিও পরিপূর্ণভাবে আপনার সম্মান প্রদর্শন করতাম" (জনাব মুহাম্মদ আকরাম সাহেব, আই, সি, এস, লিখিত 'কাউসার' গ্রন্থের—২৮৬—২৮৮ পৃঃ দ্রঃ)

উল্লিখিত ব্যক্তব্যটা অবশ্য কিছুদিন দীর্ঘ হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি ইহা অধ্যয়ন করে' বুঝতে পারবেন যে, আলমগীর এখন থেকে আড়াইশত বছর পূর্বে মাদ্রাসাসমূহের কর্ণধারদের সম্পর্কে যেসব কথা এবং সেই যুগের প্রচলিত শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে যেসব সমালোচনা-

মূলক বক্তব্য রেখেছেন, তা' আজো কিভাবে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

আলমগীরের উল্লিখিত ভাষণ দ্বারা তাঁর সময়ের গুরুত্ব এবং প্রকৃত দর্শন উপলব্ধির অনুমান করা যায়। কিন্তু আপেক্ষের বিষয় এই যে, এসব কিছু জেনে বুঝেও তারা এই প্রকার শিক্ষাপদ্ধতিকে আলেম তৈরীর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন, এ কারণেই রাজ্যের স্থিতি ভাগ্যে জুটে না।

আলমগীরের ব্যক্তিগত দুর্বলতা ছাড়াও মুগল রাজত্বের অধঃপতনের আরেকটা বড় কারণ এই যে, তৎকালে চারিত্রিক দিক দিয়ে মুসলমানদের সমাজ একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। রাজ্যের বড় বড় ব্যক্তিবর্গ এবং আমীরদের অবস্থা এমন ছিল যে, তারা আজ হয়তঃ টাকা পেয়ে যায়েদের সঙ্গে আছে, কাল হয়তঃ আরো অধিক টাকা পেয়ে উমরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। আন্তরিকভাবে কোন মহতকাজে জীবন উৎসর্গ করা, অঙ্গীকার পূরণ বিশ্বস্ততা এবং গচ্ছিত সম্পদের সংরক্ষণের নাম নিশানা ও তাদের মধ্যে ছিল না। এমন কি মুগল শাহযাদারাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। সুতরাং শাহযাদাহ "কামবখ্‌শ" এক যুদ্ধের সময় আপন পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মারাঠাদের সঙ্গে মিলে যান। আলমগীরের একজন সেনাপতি যুলফিকার খান এবং তার পিতা আসাদুল্লাহ খান এ সম্পর্কে অবগত হলেন এবং তাঁরা উক্ত শাহযাদাকে গ্রেফতার করে আওরঙ্গজিবের কাছে পাঠিয়ে দেন। এমনিভাবে 'সিতারায়' মারাঠারা শাযহাদা মুহাম্মদ আজমকে উৎকোচ দিয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করে নিয়ে ছিল যে, তিনি তাদের রসদ পেঁছাতে প্রতিবন্ধক হবেন না। সুতরাং তিনি যে দুর্গে বন্দী ছিলেন, তাতে তখন দু মাসের রসদ ছিল, অথচ ছয় মাস পর্যন্ত তা জয় হয় নি। আলমগীরের সমস্ত ঘটনার অবস্থা জানা ছিল। অতএব তিনি বিভিন্ন পত্রে আমানতদার এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের দুষ্প্রাপ্যতায়-আক্ষেপ করেছেন।

آدم هوشیار - امانت دار - خداترس - آبادان کارهیاب -
آنچه برجستیم و کم دیدیم و بسیار جست و نیست
نیست جز آدم درین عالم که بسیار است و نیست -

"হুশিয়ার মানুষ, আমানতদার, খোদাভীরু ও কর্মঠ লোক বিরল।

ভাল লোক অন্বেষণ করে খুব কমই পেলাম, কিন্তু মন্দ লোকের সংখ্যাই অধিক। এই বিশ্বে মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী এত খারাপ হয়"।

এই কারণেই তিনি নিজের বড় বড় অন্তরঙ্গ বন্ধুদের বেলায়ও নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত ছিলেন না। মীরজুমলা আওরঙ্গজিব-আলমগীরের উপযুক্ত সেবাকার্য সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উচ্চাঙ্গের ব্যক্তিত্ব ও বীরত্বের কারণে আলমগীর কখনও তাঁর দিক থেকে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। অতএব সুজার পর বাংলার গভর্নরীর সময়ে মীরজুমলার ইন্তিকাল হয়। আলমগীর তাঁর সন্তানদেরকে পিতার মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিতে যেয়ে বলেন, "তোমরা তো দয়াশীল পিতার ইন্তিকালে—কান্নাকাটি করছ, কিন্তু আমি আমার এমন এক বন্ধুর জন্য রোদন করছি, যিনি শক্তিশালীও ছিলেন এবং বিপদজনকও ছিলেন"।

পরিশেষে ৯১ বছর বয়সে ৫০ বছর তিন মাস-রাজত্ব করার পর-১৭০৬ খৃীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। আওরঙ্গআবাদ (দাক্ষিণাত্য) থেকে ৮ ক্রোশ দূরে মুগল সাম্রাজ্যের এই মহান সম্রাটকে সমাহিত করা হয়। বাদশাহর সমাধীস্থল আজো জগতবাসীর জন্য উপদেশের উপকরণ যোগায়।

روح و ریحان و جنۃ نعیم - এই বাক্যে ব্যবহৃত অক্ষর গুলোর সংখ্যা মানের হিসেবে তাঁর মৃত্যুর তারিখ-বের হয়।

আলমগীরের মৃত্যুকালে ভারতবর্ষের অবস্থা

আশ্চর্যজনক ও আক্ষেপের বিষয় এইযে আওরঙ্গজিব আলমগীরের মত বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত বাদশাহ—যিনি প্রায় ৫১ একান্ন বছর পর্যন্ত পরিপূর্ণ জাঁকজমকতা ও শান-শওকতের সাথে ভারতবর্ষের রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থেকে রাজ্য শাসন করেছেন, কিন্তু যখন তিনি পৃথিবী থেকে চির বিদায় হলেন, তখন পরিষ্কারভাবে মুগল রাজত্বের অমাবস্যা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে হয়তঃ এর স্থিতি আর বেশী দিন বাকী নেই। সুতরাং আওরঙ্গজিব আলমগীরের মৃত্যু সময় ভারতবর্ষের রাজত্বে বিশৃংখলা ও অধঃপতন নেমে এসেছিল। মারাঠাদের কেন্দ্রীয় শক্তি যদিও নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হইয়াছিল, কিন্তু মুহাম্মদ আকরাম সাহেবের বর্ণনা

মতে 'তারা কখনও শিবাজীর কোন সহচরের তত্ত্বাবধানে আবার কখনও বা মনগড়া কোন শাসকের অনুসরণে মুগলদের জন্য জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। হিন্দু ধর্মের পুনঃ জাগরণের একটা সাধারণ আলোচনা তখন সর্বত্র শোনা যাচ্ছিল। এই আন্দোলন পাঞ্জাবে রাজপুতানা এবং দক্ষিণ ভারতে বিশেষভাবে দানা বেধে ছিল। এই সব ষড়যন্ত্র ইত্যাদি ও 'ইংরেজ' এবং 'ফরাসী' দুটি বৃহৎ শক্তি ভারতবর্ষে ভবিষ্যতের দীর্ঘমেয়াদী একটা নীল নক্শা তৈরী করছিল। আওরঙ্গজেবের দীর্ঘ রাজত্বকালের সময়ে ইংরেজরা ধীরে ধীরে স্বীয় ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তার করছিল। এমনকি তাঁর ইন্তিকালের সময় পর্যন্ত ভারত উপকূলে অনেক মিল ফ্যাকটরীর উপর অধিকার স্থাপন করে বস্‌ল। মাদ্রাজ, বোম্বে, কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণ করেছিল। আর এসব শহর খুবই উন্নত ও সচ্ছল হয়ে উঠেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে শহরের শাসনকার্য ও ইংরেজ কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছিল। সুতরাং তারা টেক্‌স্‌ আদায় করতো এবং মকদ্দমা ওগয়রহ নিষ্পত্তি করতো। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথমতঃ শুধু একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু তাদের অন্তরে যে কুমতলব লুকায়িত ছিল, তা এখন প্রকাশ পেতে লাগল। অতএব ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র উপকূলীয় শহরে দুর্গ নির্মাণ এবং নিজেদের গভর্নর নিযুক্ত করা, এসবই তাদের কুমতলবের পর্দা-উন্মোচন করতে ছিল। অন্য দিকে ১৬০৪ খৃীস্টাব্দে ফরাসীরা ভারতবর্ষে তাদের ব্যবসায়ী কোম্পানী প্রতিষ্ঠার ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ইহাতে তারা তখনও সফল হয় নাই, কিন্তু পরিশেষে ১৬৬৪ খৃীস্টাব্দে 'ফরাসী ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী' সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে সফলকাম হল। এর দু'বছর পর ফরাসীরা মির্জাপুরের ষ্টেট থেকে নিজেদের জন্য এক বিস্তৃত ভূখণ্ড অর্জন করতে সক্ষম হল। অধিকন্ত তারা 'পুন্ডিচেরী' নগর প্রতিষ্ঠা করলো।

মোট কথা, সে সময় ভারতবর্ষের অবস্থা সাগরের ওপারের অধিবাসী একটি ভিন্ন জাতি এই দেশে ধীরে-ধীরে তাদের পদ সুদৃঢ় করছিল। অন্য দিকে মুসলমানরা আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা এবং কঠোর বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার কারণে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম ছিল না। তাঁরা ছিলেন তখন শক্তির জন্য লালায়িত এবং উদ্দেশ্য হাসিলের ব্যর্থতায় নিমগ্ন।

বাহাদুর শাহ

আলমগীর রাজ্যের সঙিন অবস্থা অনুধাবন করে স্বীয় রাজত্ব আপন তিন ছেলের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে বন্টন করে ছিলেন যে, তাঁদের মধ্যে যেন এ নিয়ে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি না হয়। কিন্তু তাঁর এই আশা-নিরাশায় রূপান্তরিত হল। শাহতাদাহ আযম এবং মুয়ায্যাম উভয়ই দাক্ষিনাত্যে ছিলেন। এমতাবস্থায় পিতার ইন্তিকালের সংবাদ পেলেন। উভয় ভ্রাতাই রাজসিংহাসন অধিকারের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ রাজধানীর দিকে ধাবিত হলেন। এদিকে দাক্ষিণাত্যে সকলের ছোট ভাই 'কামবখ্শ' এই উদ্দেশ্যে সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত করে রেখেছিলেন যে, যে কেহই সিংহাসন অধিকার করবে তার বিরুদ্ধেই তিনি (কামবখ্শ) যুদ্ধ করবে না। যা হউক, 'আয়ম' ও মুয়ায্যম উভয় ভ্রাতার মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হল। যুদ্ধে 'আ'যম' মারা গেলেন এবং মুয়ায্যম ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে 'বাহাদুর শাহ' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাহাদুর শাহ প্রকৃত পক্ষে নম্র প্রকৃতির এবং সত্যিকার ভাবে শান্তিপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু তিনি সবেমাত্র সিংহাসনে আরোহণ করেছেন, এমন সময় 'কামবখ্শ' দাক্ষিণাত্যে নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা দিলেন। আওরঙ্গজিব-আলমগীরের রাজত্বকালের বিখ্যাত সেনাপতি যুলফিকার খান রাষ্ট্রীয় নির্দেশ ব্যতীতই দাক্ষিণাত্যের দিকে যাত্রা করেন এবং কামবখ্শকে বন্দী করে ফেলেন। বাহাদুর শাহ শান্তিপ্রিয় প্রকৃতির লোক হওয়ার কারণে মারাঠা এবং রাজপুতদের সঙ্গে সন্ধি করেন। কিন্তু পূর্ব পাঞ্জাবে শিখরা তাদেব নেতা 'বান্দার' তত্ত্বাবধানে অসভ্যতা ও অশালীনতার ঝড় তুললো। তারা মুসলমান নারীদের পবিত্রতা বিনষ্ট, মসজিদ সমূহে অগ্নিসংযোগ এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে জীবন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপর মত এমন কোন জঘণ্য ধরনের অত্যাচার বাকী রাখেনি যা তারা মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করেনি। বাহাদুর শাহ যখন এই সব সংবাদ জানতে পারলেন, তখন ১৭১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিজেই এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে পাঞ্জাবের দিকে যাত্রা করলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর তিনি তাদেরকে পাহাড়ের দিকে তাড়িয়ে নেন। শিখদের বিরুদ্ধে এই বিরাট সফলতা বাহাদুর শাহের জীবনের শেষ কৃতিত্ব। কেননা তাঁর বয়স তখন ৭০ বছর হয়েছিল। অবশেষে ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে লাহোরে তিনি ইন্তিকাল করেন। বাহাদুর শাহের

রাজত্বকাল যদিও স্বল্প সময়ের তথাপি এ সময়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। যেমন ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে বাহাদুর শাহ শিবাজীর পৌত্র 'সাহু'কে তাঁর রাজত্ব ফেরত দিয়ে দেন। এই উদ্দেশ্যে 'সিতারা' নামক স্থান তাঁর তত্ত্বাবধানে দিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর চাচা এবং চাচাতো ভাইগণ বিরোধিতা করেন। ফলে মারাঠাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বিভিন্ন কারণে 'সাহু' রাজত্ব করার উপযুক্ত ছিলেন না। মারাঠাদের শক্তি তখন দুর্বল হয়ে গেল। সৌভাগ্যক্রমে ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে 'বালাজী পশুনাথ' প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন। তিনি ব্রাহ্মণ বংশের লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি খুবই উপযুক্ত চতুর এবং জাগ্রত চিন্তাধারার লোক ছিলেন। তিনি মারাঠাদের বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলোকে একত্রিত করে শক্তি সঞ্চয় করলেন। 'সাহু' নামে মাত্র বাদশাহ ছিলেন। অন্যথায় প্রকৃত স্বাধীনতা ও কার্যক্ষমতা তাঁরই ছিল। 'বালাজী'কে তাঁর সেবা কার্যের পুরস্কার স্বরূপ প্রধান মন্ত্রীর পদকে তাঁর বংশের জন্য স্থায়ী উত্তরাধিকার করে দেয়া হল। বাদশাহ যেন তাঁর হাতের পুতুলের মত ছিলেন। মোটকথা বাহাদুর শাহের ইন্তিকালের সময় যখন মুগল সম্রাজ্য পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও কলহের কারণে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, তখন মারাঠাদের শক্তি সামর্থ্য বর্ধিত ও সুশৃংখলাবদ্ধ হচ্ছিল। এই অবস্থায় বাহাদুর শাহের পর জাহান্দার শাহ বাদশাহ হলেন। কিন্তু রাজকার্য পরিচালনার ব্যাপারে তিনি অযোগ্য ছিলেন। যুলফিকার খান রাজ্যের ভাল-মন্দের মালিক ছিলেন। তিনি যদিও সৈনিক হওয়ার কারণে একজন সফলকাম জেনারেল ছিলেন, কিন্তু শৃংখলা রক্ষার উপযুক্ততা তাঁর মধ্যে ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রাজত্বকালে দেশে উৎকোচের প্রচলন এবং অবৈধ পদ্ধতিতে অর্থ উপার্জন করার ধুমধাম চলছিল। পরিশেষে এক বছর অতিবাহিত না হতেই সৈয়দ হোসাইন আলী, বিহারের গভর্নর এবং সৈয়দ আবদুল্লাহ, ইলাহাবাদের গভর্নর এই দু'ভাই পরস্পর পরামর্শ করে বাহাদুর শাহের পৌত্র ফররুখসীরকে রাজত্বের দাবীদার হিসেবে জাহান্দার শাহ-এর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং তৎপর উভয় ভ্রাতাও সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন। ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে আগ্রার নিকটে যুদ্ধ হল। জাহান্দার শাহ এবং যুলফিকার খান উভয়কে বন্দী করে হত্যা করে দেয়া হল। ফররুখসীর তৎক্ষণাৎ বাদশাহ হয়ে গেলেন।

ফররুখসীর পাঁচ বছর রাজত্ব করেন। কিন্তু তিনি নামেমাত্র বাদশাহ ছিলেন। প্রকৃত শক্তি ছিল সৈয়দদের হাতে। সৈয়দ হোসাইন আলীকে দাক্ষিণাত্যের গভর্নর নিযুক্ত করা হল। কিন্তু তাঁর সেখানে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মারাঠারা যুদ্ধ ঘোষণা করল। হোসাইন আলীকে বাধ্য হয়েই পরাজয়সূচক সন্ধি করতে হল। এতে দাক্ষিণাত্যের মুগল গভর্নমেন্টকে 'সাহু'র আনুগত হিসেবে 'কর' প্রদান করতে বাধ্য করা হল। প্রকৃতপক্ষে এই সন্ধি মারাঠাদের সম্মুখে মুগল বাদশাহদের এমন অপমানসূচক ছিল—যার দৃষ্টান্ত রাজত্বের প্রাথমিক ইতিহাসেও পাওয়া যাবে না।

সেই সময় আর একটি ঘটনা সংঘটিত হল যে, ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় ইংরেজরা বাংলার গভর্নরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, তিনি 'কর' আদায়ের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেন। এই মর্মে একজন দূত ফররুখসীর নিকট প্রেরণ করেন। দূতের সঙ্গে 'হিমালটন' নামী একজন 'সোলসার্জন' ও ছিলেন। ঘটনাক্রমে বাদশাহ তখন অসুস্থ ছিলেন। রাজদরবারের চিকিৎসকগণ তাঁর চিকিৎসা করে ব্যর্থ হন। বাদশাহ হিমালটনের কাছে নিজ চিকিৎসার আশা ব্যক্ত করলেন। পরিশেষে বাদশাহ হিমালটনের চিকিৎসায় দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন। বাদশাহ তখন খুশী হয়ে বললেন, "আমি আপনাকে কি পুরস্কার প্রদান করবো"? হিমালটন ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে বললেন, আমার পুরস্কার শুধু এই হলে খুশী হব যে, আপনি অনুগ্রহপূর্বক বাংলায় অবস্থিত ইংরেজদেরকে বিশেষ বিশেষ যুদ্ধের চাঁদা ও 'কর' থেকে মুক্তি দিন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের বসতির আশে-পাশের কয়েকটি গ্রাম তাঁদেরকে দান করে দিন।" ফাররুখসীর তাঁর এই আবেদন মঞ্জুর করেন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রের পক্ষ হতে এই মর্মে একটি দলীলও সম্পাদিত হল। বাহ্যতঃ ঘটনাটি সাধারণ বলে মনে হয়, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। কারণ এই ঘটনার ফলেই ভারতবর্ষে ইংরেজদের পদ সুদৃঢ় করার এবং পরিশেষে একদিন এই দেশে রাজত্ব করার সুযোগও মিলে গেল।

সেই সময় ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের গভর্নর সাইয়িদ হোসাইন আলী এক সন্ধির পর দশহাজার মারাঠা সৈন্যের বাহিনী নিয়ে দিল্লী

আক্রমণ করলেন। মারাঠা সৈন্যদের পরিচালনা বালাজীই করছিলেন। পথিমধ্যে চুন কালিজ খান, নামী একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং বিখ্যাত জেনারেল তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন। দুর্বল বাদশাহ এই দুটি সেনা বাহিনীর সঙ্গে কিভাবে মুকাবিলা করবে? সামান্য যুদ্ধের পরই পরাজিত হয়ে গেলেন। ফররুখসীর বন্ধী হওয়ার পর নিহত হলেন। এটাই ছিল প্রথম ঘটনা যাতে মারাঠাদেরকে সোজাসুজি দিল্লীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার এবং নিজ চক্ষে স্বীয় রাজত্বের পরাজয়ের শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করার সুযোগ মিলল। ফররুখসীরকে হত্যা করার পর সাইয়িদগণ নিজেদের পছন্দ মত একজন বাদশাহ নির্বাচন করে নিলেন। কিন্তু তিনি তিন মাস পর ইন্তিকাল করেন। অতঃপর তাঁরা আরো একজনকে বাদশাহ মনোনীত করলেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যে তিনিও ইন্তিকাল করেন। পরিশেষে ১৭১৯ খৃীস্টাব্দে সাইয়িদগণ বাহাদুর শাহ-এর এক পৌত্র রওশন আখতারকে "মুহাম্মদ শাহ" উপাধি দিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করান।

মুহাম্মদ শাহ

সাইয়িদদের ভাগ্যাকাশে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিল। তাদের বিরুদ্ধে চুন কালিজখান এবং তাঁর বন্ধু সাদাতখানের তত্ত্বাবধানে একদল লোক মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তাদের অন্তরালে খোদ বাদশাহর সাহায্য কার্যকর ছিল। তিনি সাইয়িদ হোসাইন আলীকে হত্যা করে এবং তার ভাই আবদুল্লাহকে আগ্রার নিকটে পরাজিত করে নেতৃত্বের প্রভাব একেবারে বিনষ্ট করে দিল। বাদশাহ তখন তাঁর দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে চুন কালিজখানকে নিজের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তিনি তখন আসফজাহ এবং 'নিযামুলমুলুক' উপাধিতে অধিক প্রসিদ্ধ হন। সাদাত খানকে তার সেবার বিনিময়ে উদ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। এই প্রদেশটি পরে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হল। একশত ত্রিশ বছর পর্যন্ত এই রাজ্য স্থায়ী ছিল। এই ঘটনার দ'বছর পর আসফজাহ প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে একটি স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। যার রাজধানী ছিল হায়দাবাদ। এই রাজ্য আজ পর্যন্ত স্থায়ী আছে। এই

রাজ্যের প্রত্যেক গভর্নরকে 'নিযাম' বলা হয়। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে বালাজীর ইন্তিকাল হল। অতঃপর তাঁর ছেলে বাজীরাও পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ফলে মারাঠাদের রাজনৈতিক শক্তি প্রথম থেকে দ্বিগুণ নয় বরং চারগুণ হয়ে গেল। তিনি ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর উপর আক্রমণ করেন। সে সময় দিল্লী রাজত্বের অসহায়তা মারাঠাদের কঠোরতা এবং তাদের দাপটের অনুমান "সিয়ারুল মুতাআক্ষেরীণ" শীর্ষক গ্রন্থ লেখকের বর্ণনা থেকে বুঝা যাবে। তিনি বর্ণনা করেন "মারাঠারা দিল্লীর উপর হঠাৎ আক্রমণ করে নিশ্চিন্তে এর সমস্ত সম্পদ লুন্ঠণ করল। মাল-সম্পদ জমা করল। যখন রাত্রি ঘনায়ে এল তখন খাজা কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ)-এর মাযারের নিকট চলে গেল পরদিন বুধবার প্রাতঃকালে (সেদিন ছিল আরাফাতের দিন) পুনরায় দিল্লীতে আগমন করল এবং জন-বসতি ও দোকান-পাটে অগ্নি সংযোগ করে পুড়িয়ে দিল এবং মাল-সম্পদ লুন্ঠণ করল। অতঃপর এখন থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মুসলমানদের প্রসিদ্ধ বসতি অঞ্চল 'রিওয়ারী' এবং 'পাটুদী' ইচ্ছেমত লুন্ঠন করে ধ্বংস করল।

নাদির শাহের আক্রমণ

সেই সময় নাদির শাহ পারস্য অধিকার করে আফগানিস্তান ও জয় করেন। তিনি মুহাম্মদ শাহ এর উপর এক অভিযোগ উত্থাপন করলেন যে, তিনি মুসলামান বাদশাহদের কর্তব্য পালনে প্রতিবন্ধক সেজেছেন এবং মারাঠাদেরকে "যৌথ" (একপ্রকার) ট্যাক্স দিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে অপমানিত করেছেন। এই অভিযোগ উত্থাপন করে নাদির শাহ খায়বার গিরিপথ দিয়ে বের হয়ে 'পাঞ্জাব' পদদলিত করে দিল্লীতে এসে উপস্থিত হলেন। নাদির শাহ বলছিলেন যে, যদি আমাকে অসংখ্য ধনরত্ন মিলে যায় তবে আর নগর ধ্বংস করবো না। কিন্তু রাত্রিতে দিল্লীর অধিবাসীরা তাঁর কয়েকজন সৈন্যকে হত্যা করল। নাদির শাহ তা জানতে পেরে অতিশয় রাগান্বিত হয়ে সমস্ত নগর লুন্ঠন করেন এবং যাকেই সামনে পেয়েছেন তাকেই হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হত্যাকাণ্ড ও লুন্ঠন চললো। পরিশেষে যখন মুহাম্মদ শাহ এসে নাদির শাহের পায়ের উপর স্বীয় মুকুট সমর্পণ

করলো এবং হত্যাবন্ধের অনুরোধ জানালো, তখন নাদির শাহ সাধারণ হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে দিলেন। দ্বিতীয় দিন নাদির শাহ দিল্লীর ঐ সমস্ত সম্পদ একত্র করলেন, যা সম্রাট বাবরের সময় থেকে নিয়ে মুগল সম্রাটগণ জমা করে ছিলেন। অতএব শাহজাহানের সময়ের ময়ূর সিংহাসন রাজমুকুট, বেগমদের মূল্যবান অলংকার, উন্নতমানের হস্তী, ঘোড়া, তোপ কামান, মূল্যবান 'এতলাস' বা রেশমী কাপড়, উন্নতমানের মখমল, রাজভান্ডারসমূহ এবং দিল্লী ও 'উদ' এর সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সঞ্চিত ধনরত্ন এই সব কিছু নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এই ঘটনা ১৭৩৮ খ্রীস্টাব্দের। এই সময় রাজত্ব অধঃপতনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছেন। দাক্ষিণাত্য, মালুহ, গুজরাট, রাজপুতানা, পাঞ্জাব ও দিল্লীর কেন্দ্রীয় শক্তিকে মানতে পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করেছিল। রুহিলা খন্ডের অঞ্চলে রুহিলারা নিজেদের অধিকৃত অঞ্চল বলে মনে করতে লাগল। শিখ, রাজপুত এবং 'জাট' সম্প্রদায়ের লোকেরা দিল্লীর উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করছিল। অন্য দিকে দাক্ষিণাত্যের দিক থেকে মারাঠাদের প্রবল চাপ ছিল। ধীরে ধীরে তারা চড়াও হতে লাগলো। কিছুদিন পর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং পাঞ্জাবের কিছু অবশিষ্ট অংশ ও দিল্লীর কেন্দ্রীয় শক্তি এবং উহার একনায়কত্ব রাজত্বের পরিমন্ডল থেকে স্বাধীন হয়ে গেল। এমতাবস্থায় পাঞ্জাবের উপর স্বীয় প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠাকারী আহমদ শাহ আবদালী ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে এমন প্রবল বেগে দিল্লী আক্রমণ করলেন যে, দিল্লী রাজ প্রাসাদের ইটের পর ইট খসে গেল। অতঃপর তিনি মথুরার দিকে ধাবিত হলেন এবং তথায় ও হত্যা, লুন্ঠন চালালেন। অবশেষে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

পানি পথের যুদ্ধ

একদিকে মুসলমানদের কেন্দ্রীয় শক্তি এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে, প্রত্যেক প্রদেশের গভর্নরগণ নিজেদেরকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। অন্যদিকে মারাঠাদের শক্তি দৈনন্দিন বৃদ্ধি হওয়ার ফলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, তারা ভারতবর্ষে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সফলকাম হবে

পারবে। তাই প্রকাশ্যভাবে তাদের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করতে লাগল। মুসলমানদের কানে যখন এই সংবাদ পৌঁছিল, তখন তাঁদের কিছু হুঁশ হল। পরিশেষে রুহিলার সর্দার এবং 'উদ' ও আফগানিস্তানের নবাব সম্মিলিতভাবে মারাঠাদের সঙ্গে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দের প্রারম্ভে মুসলমান এবং মারাঠা উভয়ে পানিপথের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ময়দানে ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলো। মারাঠাদের সৈন্য সংখ্যা অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলে সর্বমোট দু'লক্ষ সত্তর হাজারেরও বেশী ছিল।

অন্যদিকে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা সব কিছু মিলেও নব্বই হাজারের কিছু কম ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হল—। প্রথম দিকে মারাঠাদের প্রবল আক্রমণে মুসমানগণ হতাশ হয়ে গেলেন। কিন্তু আহমদ শাহ আব্দালীর সৈন্যগণ এমন প্রবল বেগে আক্রমণ চালালেন যে, শেষ পর্যন্ত শত্রুদের পদস্খলন ঘটল। তাদের যাবতীয় ব্যবস্থা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। বিশ্বাস রায়ের মত তাদের অনেক বিখ্যাত নেতা মারা গেলেন। আর যাঁরা, জীবিত ছিলেন, তাঁরাও পলায়ন করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সেন্যরাও পলায়ন করতে লাগল। তাদের মধ্যে যে সব লোক আফগান সৈন্যদের কাবুতে পড়ল, তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হল। তাদের হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লজ্জাজনক স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল না। আহমদ শাহ আব্দালীকে ঐতিহাসিকগণ সাধারণ হত্যা ও লুণ্ঠনকারী হিসেবে চিহ্নিত করেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল পানি পথের যুদ্ধে মারাঠাদের সম্মিলিত শক্তি এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের বিভিন্ন রাজ্যের পারস্পরিক ষড়যন্ত্রকে চিরদিনের তরে ধ্বংস করে দেয়—তাঁর এক বিরাট ইসলামী কৃতিত্ব। আব্দালীর এই যুদ্ধকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কথা চিন্তা করা কঠিন। কেন না প্রথমতঃ তিনি নাজিবুদ্দৌলা, সুজাউদ্দৌলা এবং রহমতখানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন।

যদিও এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিরাট বিজয়ের নায়ক ছিলেন আহমদশাহ আব্দালী। কিন্তু যুদ্ধ জয়ের পর রাজত্ব—শাহ্ আলমের নামে, মন্ত্রীত্ব সুজাউদ্দৌলার নামে এবং প্রধান আমীরের পদ নাজিবুদ্দৌলার নামে নির্ধারণ করে তিনি ভারতবর্ষ থেকে প্রস্থান করে কান্দাহার চলে গেলেন। আহমদ শাহ আব্দালীর এই কাজ প্রমাণ করে যে, তাঁর উদ্দেশ্য খারাপ

ছিল না। অন্যথায় তিনি ইচ্ছা করলে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে আফগানী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। তিনি তা চাইলে মুসলমানরা অবশ্য নিজেদেরকে সামাল দিতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অন্য কিছু ছিল। এদেকে মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং অভ্যন্তরীণ কলহ কমে গিয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্বের সমুদ্র উপকূল থেকে ইংরেজরা অগ্রসর হতে লাগল।

সিরাজুদ্দৌলা

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদাবাদে যখন বাংলার নবাব আলীবর্দীখানের ইন্তিকাল হল, তখন তাঁর অছিয়ত অনুযায়ী মরহুমের দৌহিত্র সিরাজ-উদ্দৌলা ২৫ বছর বয়সে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। সিরাজুদ্দৌলাকে তো ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ খুবই মন্দ বলে থাকেন, কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হয় যে, সিরাজুদ্দৌলা অতিশয় সতর্ক ও জাগ্রত চিন্তাধারার নবাব ছিলেন। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজরা ব্যবসার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করেছেন বটে, কিন্তু বর্তমানে তারা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক শক্তি-সামর্থ্য অর্জন করে চলেছে। যদি বর্তমান অবস্থা এমনিভাবে চলতে থাকে তবে একদিন হয়ত এমন দিন আসবে যখন ইংরেজরা সমগ্র দেশই অধিকার করে বসবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাদের লাগামহীন স্বাধীনতাকে প্রতিরোধ করতে চাইলেন। ইংরেজরা তা' সহ্য করতে পারলেন না। ফলে যুদ্ধ শুরু হ'ল। প্রথম দিকে ইংরেজরা পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হল। কিন্তু পরবর্বীতে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ইংরেজদের পক্ষ হতে যাথারীতি প্রস্তুতি চলল। লর্ড ক্লাইভের তত্ত্বাবধানে একদল ইংরেজ সৈন্য-ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। ক্লাইভের সঙ্গে রাজকীয় নৌবাহিনীও ছিল। তা পরিচালনা করছিলেন নৌবাহিনী প্রধান ওয়াটসন। এই সেনাদল ডিসেম্বরের দিকে কলকাতা পেঁছল। এখানে অবতরণ করতেই তাদেরকে নতুন কলোনিতে স্থান দেয়া হল। 'সিয়ারুল মুতাআক্ষেরীন' এর লেখক বর্ণনা করলেন যে, "এই যুদ্ধ এমন ভীষণ ছিল যে, সিরাজুদ্দৌলার সৈন্য দলে যেন কিয়ামত (মহাপ্রলয়) উপস্থিত

হল। এই ভীষণ অবস্থা দেখে সাধারণের আন্তরাত্মা বের হওয়ার উপক্রম হল। পরিশেষে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি হল। কিন্তু ইংরেজরা শান্তিতে বসে ছিল না। ইংরেজরা সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে রাজদরবারের কয়েকজন বিশিষ্ট আমীরকে ষড়যন্ত্রের উস্কানী দিল। তাঁদের মধ্যে মীরজাফরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উমী-চাঁদ নামক এক ব্যক্তির মধ্যস্থতায় ইংরেজ এবং বিশ্বাসঘাতক আমীরদের মধ্যে আলোচনা শুরু হল। ঘটনা ক্রমে উমীচাঁদ কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে ষড়যন্ত্রের পরিপূর্ণ ঘটনা নবাবের কাছে বর্ণনা করে দিলেন। নবাব তখন বাধ্য হয়েই ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা দিলেন। পলাশী প্রান্তরে উভয় সৈন্যদের মুকাবিলা হল। ১৭ই জুন, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে লর্ডক্লাইভের তত্ত্বাবধানে ইংরেজ সৈন্যরাই প্রথমে আক্রমণ চালাল। সিরাজুদ্দৌলার পক্ষ থেকে যেসব ফরাসী সৈন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, তারা এমন বীর বিক্রমে এই আক্রমণ প্রতিহত করল যে, অর্ধ ঘন্টার মধ্যেই যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল, যার ফলে সমস্ত গোলা-বারুদ ভিজে গেল। নবাবের ধারণা হল যে, ইংরেজ সৈন্যদের অবস্থাও তো এরূপই হবে, তাই তিনি সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, ইংরেজ সৈন্যদের মাঝে ঢুকে পড়ে। কিন্তু ফল হল উল্টো। ইংরেজরা কিছু গোলা বারুদ বৃষ্টির সময় সংরক্ষণ করেছিল। ফলে নবাবের সৈন্যরা যখন ইংরেজ সৈন্য দলে প্রবেশ করল, তখন তারা কাবু-পেয়ে শিলা-বৃষ্টির মত গোলা বর্ষণ শুরু করল। এই রূপ প্রবল বেগে গোলা বর্ষণের ফলে নবাব একেবারে অস্থির হয়ে গেলেন। এমন সময় মীর জাফর বন্ধুর বেশে নবাবকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালায়ন করে জীবন বাঁচানোর পরামর্শ দিলেন। নবাব তা ছাড়া আর কোন উপায়ও দেখতে পাচ্ছিলো না। পরিশেষে নবাবের সৈন্যগণও পালায়ন করতে লাগল। ইংরেজদের এই বিজয় বাংলার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের ভাগ্য ইংরেজদের হাতে চলে গেল। ইংরেজরা মীর জাফরের নিমকহারামীর (অকৃতজ্ঞতার) পুরস্কার এমনিভাবে প্রদান করলো যে, নবাব সিরাজুদ্দৌলার স্থানে তাঁকে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার নবাব বানালেন। অতঃপর মীর জাফর সিরাজুদ্দৌলকে গ্রেফতার করে হত্যা করল। উপদেশ গ্রহণের জন্য একথা স্মরণযোগ্য যে, যখন সিরাজুদ্দৌলার

নিকট মীর জাফরের দূত মুহাম্মাদী বেগকে তাঁর হত্যার জন্য প্রেরণ করা হল, তখন নবাব বললেন, "মীর জাফর কি এতে রাজি হবে না যে, আমি একটি ঘরের কোণে পড়ে থেকে বাকী জীবন অতিবাহিত করবো"? কিন্তু এই অপভ্রষ্ট না বলে মাথা নাড়ালো এবং মুহূর্তের মধ্যে নবাবের উপর উপর্যুপরি কয়েকটি আঘাত করল। নবাব তা সহ্য করতে না পেরে মাটিতে লুটায়ে পড়লেন। তাঁর মুখ থেকে শুধু তখন এই শব্দ ক'টি বের হল—"এতেই তুষ্ট থাক যে, আমার জীবনের অবসান হয়েছে এবং প্রতিশোধ স্পৃহা শেষ পরিণতিতে পেঁাছেছে"। কিন্তু হতভাগা মীর জাফরের প্রতিশোধ স্পৃহা তখনও নির্বাপিত হয়নি। তিনি নবাবের দেহকে একটি হাতীর হাওদাজে উঠায়ে সমগ্র মুর্শিদাবাদ শহরে চক্কর দেওয়ালেন।

جعفر از بنگال و صادق از دکن -
ننگ ملت - ننگ دین - ننگ وطن -

বাংলার মীর জাফর আর দাক্ষিণাত্যের সাদেক
জাতি, ধর্ম ও মাতৃভূমির কলংক।

•

দেওয়ানী

কিছুদিন পর লর্ড ক্লাইভ ইলাহাবাদে বসে মন্ত্রী সুজাউদ্দৌলা এবং বাদশাহ-শাহ্ আলমের নিকট বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নামে লিখে দিতে চাইলেন। উভয়েই বাধ্য হয়ে তা'তে সম্মত হলেন। ক্লাইভের ইচ্ছানুযায়ী সনদপত্র লেখা হল। অত্যন্ত আক্ষেপ ও আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এত বিরাট বিরাট প্রদেশের মোট ট্যাক্সের পরিমাণ ২৪ চব্বিশ লক্ষ টাকা ধার্য হলো। বাংলার গভর্নরের বার্ষিক খরচ ধার্য হল ৪০ চল্লিশ হাজার টাকা।

মুহাম্মদ শাহের পর মুগল বংশের শেষ পর্যন্ত আহমদ শাহ ১৭৪৮ থেকে ১৭৫৪, আলমগীর দ্বিতীয় ১৭৫৪ থেকে ১৭৫৯, শাহ আলম দ্বিতীয় ১৭৫৯ থেকে ১৮০৬, আকবর দ্বিতীয় ১৮০৬ থেকে ১৮৩৭ এবং বাহাদুর শাহ দ্বিতীয় যফর ১৮৫৭ খৃীস্টাব্দ পর্যন্ত মোট পাঁচজন বাদশাহ হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা সকলই ছিলেন নামেমাত্র বাদশাহ। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিলেন ইস্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানির বৃত্তি ও পেনশন ভোগী। যাবতীয় বিষয় এবং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এবং তাদের পরামর্শক্রমে সম্পাদিত হতো। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহগণ তো প্রকৃতপক্ষে লাল দুর্গের বাইরের কোন কিছুর উপর ক্ষমতা প্রয়োগ কিংবা মত বিনিময় করতে পারতেন না। বাহাদুর শাহ যফর এবং কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মধ্যে যে সব চিঠি বিনিময় হতো তাতেই অনুমান করা যায় যে, বাদশাহ দুর্গের মেরামত করতে চাইলেও কোম্পানীর অনুমতির প্রয়োজন হতো। তাদের এব্যাপারেও কোন অধিকার ছিল না যে, দুর্গের কর্মচারী, নারী-পুরুষের সঙ্গে ইচ্ছে মত ব্যবহার করবে।

এই অবস্থা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে লাগল। এমনকি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ এবং বাহাদুর শাহ যফরের অনুগত ভারতীয়দের মধ্যে এক যুদ্ধ হল। একে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বিদ্রোহ নামে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একে ইংরেজদের রাজনৈতিক বেড়াজাল থেকে মুক্ত হওয়ার শেষ প্রচেষ্টা বলা চলে। বিভিন্ন কারণে তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বাহাদুর শাহ যফরের বংশ প্রবল ঝড়ো হাওয়ার সামনে ফুলের পাপড়ির মত অস্থির এবং অস্থাবর জিনিসের মত বিনষ্ট হয়ে গেল। যে সব শাহযাদাকেই পাওয়া গেল হত্যা করা হল। খোদ বাদশাহর উপর মুকদ্দমা চলল এবং পরিশেষে নযরবন্দি করে নেয়া হল। ইংরেজরা এবার যথারীতি ভারতবর্ষের শাসক নিযুক্ত হয়ে গেল।

মুগল রাজত্বের অধঃপতন এবং এর পরিসমাপ্তির উপদেশমূলক ঘটনা শ্রবণ করে স্বভাবতঃই দু'টি প্রশ্নের উদয় হয়।

১. প্রথমত, আওরঙ্গজিব-আলমগীরের (মৃত্যু—১৭০৭ খৃীঃ) পর থেকে মুগল রাজত্বের যে অধঃপতন শুরু হয়েছিল এবং তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে দেড় শত বছর অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মুসলমানগণ নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের কোন চেষ্টা করেননি কেন ?

২. দ্বিতীয় প্রশ্ন হল—যখন মুসলিম রাজত্বের উপর রাজনৈতিক অধঃপতন দ্রুত গতিতে নেমে আসল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় ও চারিত্রিক অবস্থার সীমাহীন অবক্ষয় দেখা দিল তবু কি কারণে রাজ্য ও রাজত্ব থেকে মুসলমানরা সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হওয়ার পরও ভারতবর্ষ থেকে ইসলাম বিদায় হয়নি

কেন? আমরা উল্লিখিত প্রশ্নদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে এই অধ্যায় সমাপ্ত করবো।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহবলী ও তাঁর বংশ

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর হল—যেহেতু ভারতবর্ষের ভূ-খণ্ডে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব টিকে থাকা আল্লাহ্‌ তা'আলারই ইচ্ছে ছিল। এই জন্য যে ভাবে আকবরের রাজত্বকালে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ)-এর জন্ম হল এবং তিনি ইসলামের পতিত প্রায় ইমারতকে রক্ষা করেছিলেন ঠিক তেমনিভাবে আওরঙ্গজিব আলমগীরের মৃত্যুর চার বছর পূর্বে অর্থাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহবলী (রঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিও সেই কাজ করলেন, যা' হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ) নিজ জীবনে করেছিলেন। হযরত শাহ্‌ সাহেবের পিতা শাহ্‌ আবদুর রহীম সাহেব (রঃ) একজন উন্নতমানের আলেম, সূফী এবং বুযুর্গ ছিলেন। তিনি ছেলের লেখা পড়ার বিশেষ ব্যবস্থা করলেন। অতএব শাহ ওয়ালী উল্লাহ সাহেব ১৫ পনের বছর বয়সেই যাবতীয় প্রচলিত বুদ্ধি-বিদ্যা ও শাস্ত্রীয় বিদ্যা অর্জন করেন। তৎপর সম্মানিত পিতার হাতে বায়আত (ধর্মীয় আনুগত্যের শপথ) করেন। এর দু'বছর পর তাঁর পিতার ইন্তিকাল হয়। তখন শাহ্‌ সাহেব ১৭ বছর বয়সে পথ প্রদর্শন ও হিদায়েতের কার্য শুরু করেন। প্রায় ১২ বছর পর্যন্ত তিনি মারহুম পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষাদানে রত ছিলেন। অতঃপর তিনি 'আরব' চলে গেলেন। তিনি দু'বার হজ্জ করেন। তথায় অবস্থান কালে শায়খ আবু তাহের ইবনে ইবরাহীম মাদানী (রঃ)-এর মত মহান মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীসের সনদ গ্রহণ করেন। তিনি মক্কা মুয়ায্‌যমায় গমন করেছিলেন—তখন ভারতবর্ষে মারাঠাদের প্রতাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অতএব তাঁর কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু-বান্ধব তাঁকে লেখলেন যে, "আপনি আরব দেশেই অবস্থান করুন। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের চিন্তা করবেন না"। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষে এসে মুসলমানদের পথপ্রদর্শন এবং সংস্কারমূলক কাজ করার জন্য সম্ভবত কোন অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতেই দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। তাই তিনি

বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শ উপেক্ষা করে ১১৪৫ হিজরীর প্রারম্ভে যাত্রা করে ১৪ই রজব, ১১৪৫ হিজরীর ঠিক জুমার দিন দিল্লী পৌঁছলেন।[১]

দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি অধ্যাপনার প্রতি কম মনোযোগী ছিলেন। শুধু একটি হাদীস গ্রন্থই পড়াতেন। তাঁর অবশিষ্ট সময় পুস্তক রচনা ও সংকলন এবং ওয়ায-নসিহতেই ব্যয় করতেন। হযরত শাহ সাহেবের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-ধারায় নিজেদের রাজ্য ও রাজত্বের অধঃপতন এবং মুসলমানদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের প্রতি তাঁর প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল এর পরিমাপ শাহ সাহেবের বিখ্যাত পুস্তক "আত্তাফ্হিমাতুল ইলাহীয়াহ" থেকে জানা যায়। এতে তিনি প্রকাশ্যভাবে রাজ্যের আমীরগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থেকে নিয়ে ওলামা, মাশায়েখ, ফুকাহা (ধর্মীয় গবেষকবৃন্দ) দরবেশ, ব্যবসায়ী ও শিল্পী এক কথায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের দুর্বলতাসমূহ একেক করে বর্ণনা করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, "আমি এসেছি শুধু সর্বপ্রকার প্রচলিত অনৈসলামিক নিয়ম-নীতি ভেঙ্গে চুরমার করার জন্য"। শাহ সাহেবের একথা ও অন্যান্য লেখা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি মক্কা ও মদীনা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর থেকেই অসাধারণ ব্যস্ততার সাথে পুস্তক রচনা ও সংকলনের কাজে লিপ্ত থেকে মুসলমান জাতির বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সংস্কার ও সংশোধনের কাজও শুরু করেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতকর্ম হল তিনি ফার্সী ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদ করেন। এর পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জনগণ যেন নিজেরাই কুরআন পাঠ করে' এর ভাবার্থ হৃদয়াঙ্গম করতে পারে এবং এর আভ্যন্তরীণ আলো লাভ করতে পারে। সুবিধাবাদী ও স্বার্থপর আলিমদের পক্ষ হতে এর ঘোর প্রতিবাদ উঠল। এমনকি একদা আসরের নামাযের সময় একদল উত্তেজিত লোক দিল্লীর ফতেহ পুরী মসজিদে শাহ সাহেবকে ঘেরাও করল এবং হত্যা করতে উদ্যত হল। কিন্তু

হযরত শাহ সাহেব মক্কায় অবস্থানকালে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা:) তাঁকে এই বলে শুভ সংবাদ দিলেন "তোমার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতেছে যে, উম্মতে মুহাম্মদীর যে কোন সম্প্রদায়ের কোন একটির শৃংখলা রক্ষা তোমাকে দিয়েই করানো হবে"।

জাতির সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনি যে কাজকে গুরুত্ব বলে মনে করছিলেন, তা বাস্তবায়নে তিনি কঠিন বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে সঠিক মঞ্জিলে মাকসুদ পর্যন্ত পৌঁছেন।

হযরত শাহ সাহেবের কুরআন অনুবাদের প্রচেষ্টা আল্লাহ্‌র নিকট এত প্রিয় হল যে, এর পর থেকে অন্যান্য ভাষায় ও কুরআন অনূদিত হয়েছে। আজ পৃথিবীর এমন কোন উল্লেখযোগ্য ভাষা নেই, যে ভাষায় কুরআন মজীদ অনূদিত হয়নি। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফল এই হল যে, প্রতিটি ঘরের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কুরআনের ভাবার্থ হৃদয়াঙ্গম করে এর সাথে পরিচিত হল। আর তাদেরও এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, কুরআন না বুঝে পড়ার ও সুন্দর কভার দিয়ে মুড়ায়ে রাখার এবং এমনিভাবে তা দিয়ে শুধু বরকত ও পুণ্য লাভের জন্যই অবতীর্ণ হয়নি, বরং কুরআন মজীদের অর্থ হৃদয়াঙ্গম করে চিন্তা-ফিকির ও গবেষণার সাথে পড়ার জন্যে এবং তাকে স্বীয় জীবনের প্রকৃত পথ প্রদর্শন বানিয়ে উহার আদেশ নিষেধ ও মাসায়েলের (সমাধানের) উপর আমল করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

কুরআনের অনুবাদ ব্যতীত ও হাদীস, হাদীসের মূলনীতি, তাফ্‌সীর তর্কশাস্ত্র, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, সূফীতত্ত্ব, কাশ্‌ফ্‌ ও ইল্‌হাম ইত্যাদি এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাকী ছিল না, যার উপর তিনি স্বার্থক গবেষণা ও তথ্য বহুল পুস্তক রচনা করেননি। কিন্তু সবচেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য পুস্তক ছিল "হুজ্জাতুলাহিল্‌ বালেগাহ"। এই পুস্তক তাঁর জন্য উপযুক্তও ছিল। এর বিষয়বস্তুর সারমর্ম হল ইসলাম কিভাবে একটি বিশ্বব্যাপী ধর্মরূপে প্রতিটি দেশ ও জাতির জন্য উপযোগী? তা কিভাবে মানব জাতির সার্বিক জীবন ব্যবস্থা হিসেবে উন্নতি, সফলতা ও মুক্তির যিম্মাদার হতে পারে? এই বিষয়ের উপর শাহ সাহেব যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং সূক্ষ্মতার সাথে বাক্য প্রয়োগ করেছেন, তা শুধু তাঁরই অবদান। প্রকৃতপক্ষে আজ যদি পৃথিবীতে কারো গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত করার ইচ্ছে থাকে তবে তাঁর রচনাবলী এবং হিদায়েতের বাণীর ভিত্তিতেই কাজ শুরু করা যেতে পারে। ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দ, মুতাবিক—১১৭৬ হিজরী, তিনি দিল্লিতে ইন্তিকাল করেন। দিল্লীর সেন্ট্রাল জেলের পেছনে তাঁর পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত

করা হয়। স্থানটি জান্নাতুল বাকীর সাদৃশ্য। "আল্লাহ্ তাঁর উপর অশেষ করুণা ও বরকত অবতীর্ণ করুন"।

হযরত শাহ সাহেবের বংশ পরিচয়

হযরত শাহ্ সাহেবের ইন্তিকালের পর তাঁর সন্তানগণের মধ্যে প্রত্যেকই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আমলের আকাশের চন্দ্র-সূর্য তুল্য ছিলেন। যাঁরা ছিলেন পিতার যোগ্য প্রতিনিধি। তাঁর বড় ছেলের নাম ছিল শাহ আবদুল আযীয (রঃ)। ১১৫৯ হিজরীতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ১২৩৮ হিজরী, মুতাবিক ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি সতের বছর বয়সে যাবতীয় জাহেরী ও বাতেনী ইল্‌ম অর্জন করে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। ষাট বছর পর্যন্ত তিনি এই কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাঁর হাদীস শিক্ষা দানের ফল ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি সূফীতত্ত্বের সার্বিক গুণের অধিকারী হওয়ার কারণে "তাযকিরায়ে উলামায়ে হিন্দ" এর লেখক বলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন— آية من آيات الله ছিলেন।

শাহ্ আবদুল আযীয সাহেবের ছোট ভাই ছিলেন শাহ্ রফী উদ্দীন। তিনি ১১৬৩ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২৩৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। শাহ আবদুল আযীয (রঃ) যখন বৃদ্ধ হয়ে গেলেন, তখন তাঁর অধ্যাপনার যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্ব আপন ছোট ভাই রফী উদ্দীনের উপর ন্যস্ত করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে কুরআন শরীফের উর্দু অনুবাদ অধিক প্রসিদ্ধ।

তৃতীয় ছেলের নাম ছিল শাহ্ আবদুল কাদির। তিনি ১১৬৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৩০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনিও ধর্মীয় বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু নির্জনবাস-ই তাঁর পছন্দনীয় ছিল। এই জন্য তাঁর সমস্ত জীবনই আকবর আবাদীর মসজিদের হুজরায় অতিবাহিত করেন। লেখা-লেখি বা পুস্তক রচনার প্রতি তাঁর তত অনুরাগ ছিল না। অবশ্য "মুজেহুল কুরআন" নামে

কুরআনের একখানা উর্দু-অনুবাদ করে ছিলেন। ইহা তাঁর জীবনের এক মহান কৃতিত্ব।

চতুর্থ ছেলের নাম ছিল শাহ আব্দুল গনী (রঃ)। তিনিও উচ্চ মর্যাদার বুযুর্গ ছিলেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে অধিক সম্মানের বিষয় হল যে, তিনি ছিলেন হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রঃ)-এর সম্মানিত পিতা। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ইল্‌ম ও তাকওয়া এবং পবিত্রতার এমন উচ্চ পদমর্যাদর অধিকারী ছিলেন যে, কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তাঁর মত মহামানব জন্মগ্রহণ করেননি।

মোট কথা এটা কেবল শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ (রঃ) ও তাঁর বংশের পবিত্রতার ফল। ইসলামী রাজত্বের অধঃপতন ও উহার সমাপ্তির পরও ভারতবর্ষ থেকে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। স্পেন থেকে মুসলমানদের রাজত্ব গিয়েছে. তৎসঙ্গে তাদের ধর্ম ও সেখান থেকে বিদায় নিয়েছে। সেখানের বহু মুসলমান মারা গিয়েছেন এবং যারা বাকী ছিলেন, তাঁদেরকে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় খ্রীস্টান বানানো হল। কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা এই যে, ইংরেজরা এখানে রাজনৈতিক শক্তি-সামর্থ্য অর্জনের পর মুসলমানদেরকে স্বজাতীয় ধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিল। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অজস্র টাকা পয়সা খরচ করে তাদের ধর্মীয় পুস্তকের প্রসার ঘটাল। মিশনারী পাদ্রীদের মাধ্যমে জোরেশোরে খৃস্ট ধর্মের তাবলীগ চালিয়ে এবং ধর্মীয় চর্চা ও বিতর্কসভার মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এইরূপ প্রচার কার্য চলে। কিন্তু তবুও এখানকার মুসলমান স্বীয় ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। স্পেনের মত এখানে ধর্মত্যাগের বিপদ সাধারণ হয়ে দেখা দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে এ সবই হযরত শাহ সাহেবের এবং তাঁর সন্তানদের সার্বিক প্রচেষ্টার ফল।

হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রঃ)

মুসলমানদের অধঃপতনের যুগে শাহ সাহেবের কৃতিত্ব শুধু ওয়াজ-নসীহত, পুস্তক রচনা ও সংকলন এবং অধ্যাপনার মাধ্যমে সংস্কারমূলক কাজ-কর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তিনি তলোয়ার নিয়ে ও এই ভারত

বর্ষে-খিলাফতে রাশেদার পদ্ধতিতে ইসলামী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কঠোর সংগ্রাম করেছেন। যদিও তিনি এই সংগ্রামে কোন মাধ্যম ব্যতীত অংশগ্রহণ করেননি, তথাপি এতে সন্দেহ নেই যে, পরবর্তী সময়ে হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রঃ)-এর সংগ্রামও তাঁর বালাকোটের ময়দানে ধর্মীয় যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর ও পূর্ব বাংলার ও সীমান্ত প্রদেশে এই সংগ্রামের ধারা স্থায়ী রাখার জন্য মুজাহিদীনদের একটি স্থায়ী দল তৈরী হওয়া ইসলামের উন্নতি ও নেতৃত্বে পুনর্জীবিত করার পরিবেশ, হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রঃ)ই সৃষ্টি করেছিলেন। তৎপর ও ইহা জেনে রাখা চাই যে, হযরত শাহ্ আবদুল আযীয (রঃ) এবং শাহ্ আবদুল কাদির (রঃ)-এই বুযুর্গ কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। বিশেষ করে হযরত শাহ্ আবদুল কাদির (রঃ)-এর সঙ্গে আকবর আবাদীর মসজিদে সর্বদা যাতায়াত করতেন। তা' ছাড়া যুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে হযরত সাইয়িদ সাহেব (রঃ)-এর ডান হাত ছিলে মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রঃ)। যাঁর সম্পর্কে একটু আগেই আলোচনা হল। হযরত ইসমাঈল (রঃ), হযরত শাহ আবদুল-গনী (রঃ)-এর সুযোগ্য সন্তান এবং হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রঃ)-এর পৌত্র ছিলেন। হযরত শাহ শহীদ (রঃ) আপন চাচা হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ) থেকে বিশেষভাবে দীক্ষা নিয়ে ধন্য হয়ে ছিলেন। আর চাচাও স্বীয় উদীয়মান ভ্রাতুষ্পুত্রের উপযুক্ততা দেখে তাঁর লালন-পালনের কোন ত্রুটি করেন নাই। অতএব এ সম্পর্কে চিন্তা করলে মাওলানা উবাদ-দুল্লাহ্ সিন্ধির কথানুযায়ী ইহা স্পষ্ট দৃষ্টি গোচর হবে যে, হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ (রঃ) প্রকৃত পক্ষেই ইসলামী বিপ্লবের মহাসংগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। যদিও দুর্ভাগ্যবশত এই দেশে ইসলামী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হতে পারেনি, তথাপি প্রতিক্রিয়া অবশ্যই বাকী আছে। যার ফলে এই দেশে মুসলমান একটি জাতি হিসেবে আজও বেঁচে আছে। এই দেশের ধর্মীয় অবস্থাও অন্যান্য দেশের তুলনায় ভাল আছে। ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার চর্চাও যথেষ্ট বাকী আছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ও নগরে মাদ্রাসসমূহ আজও বিদ্যমান। ওয়াজ-নসীহতের মাহ্ফিলে আজও মানুষ আগ্রহের সাথে যোগদান করে। ইসলামের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের অনুভূতিও এখানে জাগ্রত। সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় মুসলমানগণ এ ব্যাপারে অন্যান্য মুসলিম দেশের ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অনুভূতির তুলনায় অগ্রগামী।

পর্যালোচনা

বর্তমান ও অতীতের তুলনা

পূর্বের আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, আমাদের অবনতি ও অধঃপতনের ইতিহাস খিলাফতে রাশেদার সমাপ্তিকালের পর থেকেই আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু এরূপ ধারণা করা একটি মারাত্মক ভুল হবে যে, আমাদের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের অতীত বর্তমান থেকে অনেক গুণে ভাল ছিল। আমাদের অতীতকাল বিভিন্ন কারণে যতই অধঃপতিত হউক না কেন, আমাদের বর্তমান অবস্থা থেকে সর্বাবস্থায় শত গুণে আশাব্যঞ্জক এবং বীরত্বপূর্ণ ছিল। এই অবস্থার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। আমরা এগুলোকে নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি, যেন আমরা আমাদের অধঃপতনের সঠিক অবস্থা অনুধাবন করতে পারি। অতীতের অবনতির দিনগুলোতে সবচেয়ে বড় কথা এই ছিল যে, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক দিয়ে অবস্থা যতই সঙিন ও শোচনীয় হউক না কেন, মুসলমানদের তো রাজ্য ও রাজত্ব ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা যতই অত্যাচারী বা অন্যায়কারী হউক-না-কেন, কখনও তাঁরা আল্লাহর 'আয়াত' বা নিদর্শনাবলীর অপমান ও হেয় প্রতিপন্ন করার দুঃসাহস করতে পারতেন না। কেননা সত্যপন্থী আলিমগণের জামাআত সর্বযুগেই বর্তমান ছিলেন। এই জন্য তাঁরা সময় ও সুযোগ উপযোগী সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সম্পর্কে কর্তব্য পালনে কখনও অবহেলা করেননি। এমনিভাবে কোন না কোন পন্থায় মন্দ অবস্থার সংশোধন হয়েই যেতো। খলীফা ব্যক্তিগতভাবে সত্যপথ থেকে যতই দূরে থাকুক না কেন, সত্যপন্থী আলিমদের সম্মুখে তাঁকে সতর্ক থাকতে হতো। সবাই একথা মানতে বাধ্য যে, অনেক বিশেষ সময়ে আলিমগণের এইরূপ কার্যক্রম শাসকগণের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

সত্যপন্থী আলিমগণের সংশোধন প্রচেষ্টা

এরূপ ঘটনার অসংখ্য বর্ণনা ইতিহাসের পুস্তকসমূহে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দু'একটি ঘটনা উপমা হিসেবে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিখ্যাত উমাইয়া খলীফা সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালিক মনস্থ করেছিলেন যে, তাঁর ছেলেকেই উত্তরাধিকার বানাবেন। কিন্তু সেই যুগের বিখ্যাত তাবেঈ ইমাম-হযরত রেজা ইবনে হাইয়্যা-র পরামর্শক্রমে তিনি তাঁর ইচ্ছা পরিবর্তন করে হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রঃ)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রঃ)-এর বায়আত (আনুগত্যের শপথ) নিয়ে নেন। ফলে পুনরায় জনগণ খিলাফতে রাশেদার দৃশ্য দেখার সুযোগ পেল।

হাজ্জাজের নাম এবং তাঁর হত্যাকাণ্ড নির্দয় স্বভাবের কথা কে-না জানে? একদা তাঁর দরবারে ইমাম হুসাইনের আলোচনা উঠলো, বললেন, "হুসাইন রাসূলুল্লাহ্‌র ذريات সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত নন"। ঘটনাক্রমে-সেই সভায় বিখ্যাত তাবেঈ আলিম-ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে-ইয়ামার ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, "আপনি মিথ্যা বলেছেন"। হাজ্জাজ বললেন, "আপনার কথা কুরআনের ভাষায় প্রমাণ করুন। অন্যথায় আপনার মৃত্যু অনিবার্য। হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়ামার তখন কুরআনের আয়াত ومن ذريته داؤد وسليمان - الاية "এবং তাঁর সন্তানদের মধ্য হ'তে দাউদ ও সুলায়মান', ... পাঠ করলেন এবং বললেন যে, এই আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ)-কে তাঁর-'মা'র সম্পর্ক থেকে হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ)-কে তাঁর 'মা' এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত হইবে না কেন? হাজ্জাজের তখন অগ্নিমূর্তি ছিল। কিন্তু সেই সময় হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে-ইয়ামারের সত্য ভাষণে তাঁর উপর এমন প্রতিক্রিয়া হ'ল যে, তিনি বলে উঠলেন যে, আপনি সত্যই বলেছেন"। আমি এই আয়াতটি পড়তাম কিন্তু আমি তা' বুঝতাম না। আল্লাহ্‌র শপথ! আপনার উত্থাপিত প্রমাণ খুবই আশ্চর্যজনক ও অভূতপূর্ব।

এমনিভাবে অপর আর একটি ঘটনা উল্লেখ আছে-যে, একদা হাজ্জাজ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি আরবী উচ্চারণে তো-কোন ভুল করি না? ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়ামার এর একটি সূক্ষ্ম উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, ترفع ما يخفض و تخفض ما يرفع হাজ্জাজের প্রশ্ন অনুসারে ইহার অর্থ হল যে, "আপনি (كسرة) 'যের' এর পরিবর্তে (رفع) 'পেশ' এবং 'পেশের' পরিবর্তে 'যের' পাঠ করেন"। কিন্তু এই বাক্যের অন্য অর্থ ও হয়। অর্থাৎ আপনি অতিশয় অত্যাচারী ও অবিবেচক। যে ব্যক্তি নিম্ন পদের উপযুক্ত তাঁকে উচ্চ পদ প্রদান করেন এবং যিনি উচ্চাসনের অধিকারী তাঁকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেন"। ঐতিহাসিক ইবনে খালকান বর্ণনা করেন যে, হাজ্জাজ এইরূপ সত্য ভাষণে এত খুশী হলেন যে, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়ামারকে-খুরাসানের বিচারক নিযুক্ত করে দিলেন।

ইমাম আওযাঈ শামের ইমাম ছিলেন। একদা আব্বাসী খলীফা সাফ্‌ফার চাচা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আলী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি বনী উমাইয়ার যে রক্তপাত করেছি এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? ইমাম আওযাঈ প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করেছিলেন। কিন্তু যখন বারবার জিজ্ঞেস করা হল, তখন তিনি পরিষ্কার ভাষায় বললেন যে, "আল্লাহ্‌র শপথ! তাদের রক্ত প্রবাহিত করা আপনার উপর অবৈধ ছিল"। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আলী অপরিসীম ক্ষিপ্র মেজাজ ও কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন। এই উত্তর শুনে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন "আপনি কিভাবে একথা বললেন? মহান ইমাম উত্তর দিলেন যে, এ বিষয়ে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস রয়েছে যে, "কোন মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করা ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত নিম্নের তিন অবস্থার কোন এক অবস্থা পাওয়া যায় না।

(১) যখন কোন বিবাহিত নরনারী ব্যভিচার করে, (২) কিংবা যখন কোন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে, (৩) অথবা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে' 'মুরতাদ' হয়। অতঃপর আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আলী জিজ্ঞেস করলেন আমাদের রাজত্ব কি ধর্ম ভিত্তিক নয়? ইমাম আওযাঈ পাল্টা প্রশ্ন করলেন কিভাবে তৎপর আবদুল্লাহ্‌ বললেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কি হযরত আলী (রাঃ)-এর জন্য (উত্তরাধিকারের) 'অসীয়ত করে যাননি? প্রতি উত্তরে ইমাম

আওযাঈ বললেন, যদি অসীয়ত করে যেতেন তবে হযরত আলী (রাঃ) নিজের পক্ষ হতে কাউকে আদেশ প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী বানাতেন না। এইরূপ কথোপকথনের পর ইমামের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, তাঁকে হয়তঃ হত্যা করা হবে। কিন্তু ফল হল উল্টো। অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবনে আলী যদিও সেই সময় ইমামের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে রাজ দরবার থেকে বহিষ্কার করে দিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এক হালি দীনার উপঢৌকন হিসেবে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। ইমাম তখন উহা প্রকৃত প্রাপক (মিস্কিন)-দের মধ্যে বিতরণ করে দেন।

একদা খলীফা হারূনুর রশীদ এবং শাহ্যাদাগণ ইমাম মালিকের পাঠশালায় গমন করেন এবং তিনি বলেন যে, "আমি হাদীস পাঠ করবো, আপনি শ্রবণ করুন। কিন্তু শর্ত এই যে, সাধারণ শ্রোতাদেরকে আপনার দরবার থেকে বহিষ্কার করে দিতে হবে"। ইমাম মালিক বললেন, "যদি বিশেষ ব্যক্তিবর্গের খাতিরে সাধারণকে বঞ্চিত করা হয়, তবে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তাতে কোন স্বার্থ হবে না"। এই উত্তর দিয়ে তিনি ছাত্রদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, হাদীসের পাঠ আরম্ভ কর। ছাত্ররা তৎক্ষণাৎ উস্তাদের নির্দেশ কার্যকরী করল। খলীফাকে তখন চুপ থাকতে হলো।

এইরূপ ঘটনাবলী অসংখ্য। ইতিহাসের পুস্তকসমূহের এর দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। কত আর বর্ণনা করা যাবে? মোট কথা এই যে, তাঁরাই ছিলেন সত্যপন্থী আলিম, যাঁরা সময়ে সময়ে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের কর্তব্য সম্পাদন করে তৎকালের খলীফাদেরকে তাঁদের ভারসাম্যহীনতা ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে সতর্ক করতেন। এমনিভাবে তাঁরা একনায়কতন্ত্র শাসন পদ্ধতির অনিষ্টের সম্প্রসারণ প্রতিরোধের আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। একদা আব্বাসী খলীফা-হাদী মনস্থ করেছিলেন যে, স্বীয় পুত্রকে নিজের উত্তরাধিকার বানিয়ে আপন ভাই হারূনুর রশীদকে খিলাফত থেকে বঞ্চিত করবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি রাজদরবারে একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করলেন। সেখানে হারছামাহ্ ইবনে আ'য়ূন ও উপস্থিত ছিলেন। যখন বিষয়টি উত্থাপিত হল, তখন দরবারের সকলই খলীফার মনের প্রবল ইচ্ছা বুঝতে পেরে চুপ রইলেন। কিন্তু হারছামাহ্ ইবনে আ'য়ূন বললেন, হে

খলীফা, আপনার এই পদক্ষেপ সঠিক নয়। কেননা আপনার পিতা আপনাকে এবং হারুনুর রশীদ উভয়কেই উত্তরাধিকার বানিয়ে ছিলেন। অতএব আপনার এই কথার কি প্রমাণ আছে যে, আপনি স্বীয় পুত্রের জন্য যে বায়আত নিতেছেন, তা কি আপনার পিতা প্রদত্ত বায়আত (আনুগত্যের শপথ) থেকে অধিক শক্তিশালী হবে? যে ব্যক্তি প্রথম 'বায়আত' ভঙ্গ করতে পারে, সে ব্যাক্তি দ্বিতীয় 'বায়আত' ও ভঙ্গ করতে পারবে'। অথচ ব্যাপারটি তাঁর ছেলের ছিল। কিন্তু খলীফা হাদী হারছামার সত্য কথায় দুঃখিত হলেন না। তিনি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, "আপনারা সকলই মন্দলোক। আপনারা আমাকে ধোঁকার মধ্যে রেখেছিলেন। আমার একমাত্র বন্ধু হলেন হারছামাহ্। তিনি আমার প্রতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতার হক আদায় করেছেন। এখন একটু ভেবে দেখুন, হারছামা সেই সময় অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ কাজ করে দেশবাসীকে কত বড় বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন।

মামুনুর রশীদ এবং কাযী ইয়াহ্ইয়া ইবনে আকছামের ঘটনাবলী ইতিহাস প্রসিদ্ধ। একদা খলীফা মামুন রাষ্ট্রীয় নির্দেশ লেখালেন যে, "হযরত মুআবীয়া (রাঃ)-এর উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করা হউক"। কিন্তু কাযী সাহেবের যথা সময়ে হস্তক্ষেপ করার ফলে মামুন এই নির্দেশ প্রত্যাহার করেন। এমনিভাবে একদা মামুনুর রশীদের উপর শিয়া সম্প্রদায়ের প্রবণতা প্রবল হয়ে দেখা দিল। সুতরাং তিনি "নিকাহ মুতায়া" "মেয়াদী বিবাহ প্রথা" বৈধ হওয়ার নির্দেশ জারি করেন। কাযী সাহেব যখন একথা জানতে পারলেন, তখন তিনি দ্রুত গতিতে তাঁর নিকট আগমন করে মামুনুর রশীদকে বুঝালেন যে, কুরআনের দলীল মতে "নিকাহ্ মুতায়া" আর ব্যাভিচারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এই কথার এমন প্রতিক্রিয়া হল যে, মামুনুর রশীদ স্বীয় ভুল মেনে নিলেন এবং তৎক্ষণাৎ নিকাহ্ মুতায়াকে অবৈধ ঘোষণা করলেন। শুধু বনু উমাইয়া এবং বনী আব্বাসীর দরবারের বৈশিষ্ট্যই এমন ছিল তা নয়, বরং যে সব দেশে যখনই মুসলমানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন অল্প-বেশী এমন সত্যপন্থী উলামার অবস্থান সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়েছে, যারা শাসকদের অসাম্যতার উপর বাধা প্রদান করে সত্য প্রচার করেছেন এবং দেশকে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন। মিসরের বিখ্যাত শাসক রুকুনুদ্দীন বিবরাস খুবই প্রতাপশালী বাদশাহ ছিলেন। একদা তিনি জিহাদের জন্য

মুসলমানদের নির্দিষ্ট ট্যাক্স ছাড়াও কিছু অতিরিক্ত ট্যাক্স সঞ্চয় করতে চেয়ে ছিলেন। সহীহ্ মুসলিম শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকারী আল্লামা নববী ইহার বিরোধিতা করলেন এবং সুলতানকে বললেন, "আমার জানা আছে যে, আপনি আমীর "বন্দী কৃতদাস ছিলেন, তখন আপনি একটি শস্য দানারও মালিক ছিলেন না। এখন আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে রাজত্ব প্রদান করেছেন এবং আপনি বর্তমানে হাজারো দাস খরিদ করেছেন, যাদের সমস্ত আসবাবপত্র সোনার কারুকার্য খচিত। তদুপরি আপনার রাজ প্রাসাদে শতশত দাসী বিদ্যমান, যারা মূল্যবান অলংকারে সুসজ্জিত। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অবগত না হবো যে, এই সব মূল্যবান বস্তুসমূহ আপনি জিহাদের খরচের জন্য স্বীয় দাস-দাসীর নিকট থেকে না নিয়েছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত দেশের গরীব মুসলমানদের নিকট থেকে অতিরিক্ত টাকা পয়সা নেওয়ার 'ফতুয়া' লিখে দিব না"। বিবরাস—আল্লামার এইরূপ সত্য কথায় অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কার করে দিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে এই আদেশ বাতিল করে আল্লামাকে পুনরায় দামেশ্‌ক্ আগমনের এবং তথায় বসবাস করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু জগতের মুকুটহীন সম্রাট আল্লামা বললেন যে, "যতদিন বিবরাস বিদ্যমান থাকবে, আমি সেখানে যাব না"। এই ঘটনার এক মাস পর বিবরাসের মৃত্যু হল।

মিসরের আব্বাসী খলীফা মুস্তাক্‌ফী বিল্লাহর রাজত্বকালে রাজ্যের 'যিম্মী' প্রজাগণ এই মর্মে দরখাস্ত করলেন যে, 'যিম্মী' হওয়ার কারণে আমাদের উপর যে অপবাদ লেগে আছে, তা দূর করে দিন। এর বিনিময় আমরা সম্মিলিতভাবে বার্ষিক সাত লাক্ষ টাকা অতিরিক্ত প্রদান করবো। মন্ত্রী ও খলীফা উভয়েরই প্রবল ইচ্ছে ছিল যে, এই দরখাস্ত মঞ্জুর করবেন। কিন্তু আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এতে হস্তক্ষেপ করে বললেন, "ইসলামের নির্দেশ কোন কিছুর বিনিময়ে বিক্রি করা যায় না"। খলীফাকে বাধ্য হয়ে ইসলামের ফাতুয়ার সম্মুখে মাথা নত করতে হলো। তিনি তখন যিম্মীদের দরখাস্ত না মঞ্জুর করে দেন।

উসমানী বংশের বিখ্যাত সুলতান সালিম আউয়াল একদা স্বীয় রাজত্বের বিখ্যাত 'মুফতী' শায়খ জামালীর কাছে জিজ্ঞেস করলেন যে, "দেশ জয়

করা উত্তম, না বিভিন্ন জাতিকে মুসলমান বানানো উত্তম''? শায়খ উত্তর দিলেন, "বিভিন্ন জাতিকে মুসলমান বানানো উত্তম''। সুলতান ইহা শ্রবণ করে ঘোষণা দিলেন যে, আমার রাজত্বে যে সব ব্যক্তি মুসলমান হবে না, তাদেরকে হত্যা করা হবে।'' 'মুফতিয়ে আজম' ইহা শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ সুলতানের নিকট গমন করলেন এবং বললেন যে, আপনার এই নির্দেশ কুরআনের নির্দেশের পরিপন্থী। অমুসলিমকে 'জিযিয়া' কর নিয়ে তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত। প্রধান মুফতির এই ব্যাখ্যা শুনে সুলতান স্বীয় আদেশ প্রত্যাহার করলেন। অতএব মুসলমানগণ একটা বড় অপরাধ থেকে বেঁচে গেল।

আল্লামা ইযযুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম, হিজরী সপ্তম শতাব্দীর বিখ্যাত আলিমগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি যখন নিশ্চিন্তভাবে জানতে পারলেন যে, উপকূলীয় দাসগণ মিসরের সুলতানের কৃতদাস—স্বাধীন নয়। তখন তিনি সাধারণ ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে' এইসব দাসদের কার্যক্রম স্বাধীন হওয়া অবৈধ। তিনি দাসদেরকে জানালেন যে, "তোমাদের-বিক্রি করে দিব।'' আল্লামার বন্ধু-বান্ধবগণ তাঁকে বুঝালেন যে, আপনার এই পদক্ষেপ বিপদমুক্ত নয়। কিন্তু তিনি তা' মানেননি। পরিশেষে মিসর রাজত্বের নায়েব, যিনি একজন কৃতদাস ছিলেন, নিজের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে আল্লামাকে হত্যার জন্য গমন করলেন। আল্লামার বাড়ীতে পেঁছে তাঁকে বাহিরে আসার জন্য আহবান জানালেন। আল্লামা যখন বের হয়ে আসলেন তখন তাঁর চেহারা দেখে 'নায়েব' সাহেব কেঁপে উঠলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বললেন, মাওলানা! আপনি কি করতে চাচ্ছেন? তিনি বললেন আমি আপনাদেরকে বিক্রি করে দিব। কেননা আপনারা হলেন বায়তুলমালের সম্পদ। অতএব তাই করা হল।

সুলতান সানজির—ইমাম গাযযালীর ইঙ্গিতে চলতেন। শিহাব উদ্দীন ঘোরী—ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর খুবই অনুগত ছিলেন। 'হাজী' আদ্দাবীর' তাঁর লিখিত ইতিহাসে একটি বিস্তারিত ঘটনা লিখেছেন, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম রাযী ঘোরীর কতক ভ্রান্ত বিশ্বাসকে সংশোধন করে দিয়ে ছিলেন। সত্যপন্থী আলিমগণ খলীফাদের কার্যক্রমের সমালোচনাও'

করতেন। এ ব্যাপারে তাঁরা পৃথক পুস্তকও রচনা করছেন, তাতে খলীফা ও সুলতানগণ তার দিক-দর্শন হিসেবে কাজ করতে পারে। যেমন-কাযী আবু ইউসুফ (রঃ) হারুনুর রশীদের জন্য "কিতাবুল খেরাজ' লিখেছেন। এমনিভাবে "রাজনৈতিক পদ্ধতি" লিখেছিলেন—"ইবনুল মাক্‌ফা'।

ইমাম আবু উবায়দুল কাসেম ইবনে সালাম (মৃত্যু-২২৪ হিঃ)-এর বিখ্যাত পুস্তক "কিতাবুল আমওয়াল" একটি প্রামাণ্য পুস্তক। অতএব এর প্রথম অধ্যায়েই ইমাম সাহেব "বাদশাহ ও প্রজাদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্কে" শীর্ষক বিষয় বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইমাম মালিক (রঃ)-এরও এ সম্পর্কে একটি ছোট পুস্তক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি তা হারুনুর রশীদের জন্যে-লিখে ছিলেন। এতে তিনি খলীফাকে বিভিন্ন উপদেশও প্রদান করেছেন।

খলীফাগণ, মন্ত্রীবর্গ এবং আমীরদের সংশোধন ব্যতীত ও বহির্জগতের যে সব কার্যক্রম স্বদেশের মধ্যে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও দুষ্কর্মের প্রসার ঘটাতো, সত্যপন্থী আলিমগণ-বীরত্বের সাথে এরও মুকাবিলা করতেন। অতএব বাগদাদে যখন অন্যায় অবিচার সাধারণ হয়ে গেল তখন "খালিদ আদ্‌দরবেশ" তা প্রতিরোধের জন্য একটি দল সংগঠন করেন। এমনিভাবে সাহ্‌ল ইবনে সালামা আল্‌সারীও একটি দল সংগঠন করেন। উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের মাধ্যমে যাবতীয় অন্যায় অবিচারের মূলোৎপাটন করা। অতঃপর হাম্বলী মাযহাবীগণকে দৃঢ়তর সঙ্গে বাতিল পন্থীদের মুকাবিলা করেছেন, তা জ্ঞানীদের অজানা নয়। এই জন্য আলিমদেরকে জেল-জুলুমের শিকার হতে হয়েছিল। যেমন ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম আবু-হানীফা প্রমুখ বড় বড় আলিমগণের সাথেও অত্যাচারমূলক ব্যবহার করে হয়েছে। কিন্তু তদুপরিও তাঁদের সত্যের আওয়ায থেমে যায়নি। এর ফলে মুসলিম রাষ্ট্রের কার্যক্রম সর্বদাই ইসলামী ছিল। এই জন্য দ্রুত গতিতেই হউক অথবা ধীর গতিতেই হউক—এই রূপ সত্য আওয়াযের একটা প্রতিক্রিয়া হতেই ছিল। অন্যায় কর্মের সংশোধন কোন-না-কোন

অবস্থায় হইয়ে যেতো। মামুনুর রশীদ স্বভাবতঃই অত্যাধিক মদ্যপায়ী এবং অতিশয় পক্ষপতিত্বকারী ছিলেন। তদুপরি তিনি 'জিনদীক' (নাস্তিক)-দের অস্তিত্ব কখনও সহ্য করতে পারেন নি। মাহদী এই ভ্রান্তদলের সঙ্গে যে রূপ কঠোরতামূলক ব্যবহার করেছেন, মামুনও তাদের সঙ্গে সে-রূপ ব্যবহারই করেছিলে।

সম্মানিত সূফীদের জাতীয় সংস্কার কার্যে অংশগ্রহণ

আল্লাহ্ভীরু আলিমগণের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সম্মানিত 'সুফীগণ ও ইসলামের সেবা করেছেন। তাঁরা রাজ্য ও রাজত্বের কোলাহল হতে দূরে থেকে অমুসলিমদেরকে মুসলিম এবং মুসলমানদেরকে খাঁটি মুসলমান হিসেবে তৈরী করতে অতিশয় নীরবে কাজ করে যাচ্ছিলেন। তারা একদিকে আধ্যাত্মিক অধ্যবসায় এবং 'বাতেনী আলিম' (আল্লাহ্তত্ত্বের ধ্যান-ধারণার কাজ) দ্বারা মুসলমানদের আত্মা-বিশুদ্ধ করার কাজে লিপ্ত থাকতেন। অপরদিকে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করে ইসলামের বাণী অন্যদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতেন। তাই ইতিহাস সাক্ষী যে, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, চীন, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপসমূহ, জাভা, সুমাত্রা, মলেয়েশিয়া, বোর্নিও, নিউগিনি এবং ফিলিপাইন ইত্যাদি স্থানে ইসলামের প্রচার ও প্রসার অধিক মাত্রায় সুফীসাধকদের প্রচেষ্টায়েই হয়েছিল। তারা একাকী অথবা আপন সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে এখানে আগমন করেছিলেন এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে জনগণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশতী আজমীরী (রঃ) রাজ পুতানায় এবং খাজা কতুবউদ্দীন বখ্তিয়ার কাকী (রঃ) দিল্লী ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইসলামের প্রদীপ প্রজ্বলিত করেছিলেন। তাদের এই অবদানের ফলেই মূর্তিপূজার দেশ ভারতবর্ষে আজ (তৎকালে) মুসলমানের সংখ্যা নয় কোটিরও অধিক। (বর্তমানে বিশ কোটিরও অধিক) উত্তর আফ্রিকায় আজ আযানের যে ধ্বনি শোনা যায়, কে বলতে পারবে যে. উহা প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত শায়খ আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াস, মুহাম্মদ ইবনে আলী আস্সনুসী এবং বিজয়ী দলসমূহের প্রচেষ্টার সফল অবদান নয়? সুমাত্রা, মালয়েশিয়া এবং জাভাতে তাওহীদের যে প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে কে অস্বীকার করতে পারবে যে, তা

হযরত শায়খ আবদুল্লাহ্ আরিফ, সাইয়্যিদ বুরহানুদ্দীন, শায়খ আবদুল্লাহ্ আল-ইয়ামানী, মাওলানা মালিক ইবরাহীম এবং শায়খ নূরুদ্দীনের মত পবিত্র আত্মার অধিকারী মহামানবদের প্রচেষ্টার সুফল মাত্র।

ইসলামী রাজত্বের সাধারণ বরকত বা প্রাচুর্যসমূহ

যা হউক এই সত্যটাকে উপেক্ষা করা যায় না যে, যাবতীয় বরকত (প্রাচুর্যসমূহ) শুধু এই জন্য ছিল যে, মুসলমানদের নিজস্ব রাজ্যও রাজত্ব ছিল। তারা নিজেরাই উহার স্বাধীনতা ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এই রাজত্বের ভাল-মন্দ যাই হউক, সর্বাবস্থায় তো তা নিজেদের ছিল। বাদশাহ ব্যক্তিগত পর্যায়ে যত অন্যায়কারী ও অত্যাচারীই হউক না কেন আসলে তিনি তো ছিলেন মুসলিম। অমুসলিম জাতিসমূহের মুকাবিলায় তাদের ধর্মীয় অনুরাগ ও অনুভূতি শিরা উপ-শিরায় প্রবাহমান ছিল। তলোয়ার যখন নিজেদের হাতে ছিল তখন অনেক সময় নিজেরাই নিজেদের গলা কাটতো। আর শত্রুর মুকাবিলায় ইসলাম এবং মুসলমানদের সংরক্ষণের কাজ ও ইহা দ্বারা হতো।

মুসলমান বাদশাহদেরই এইসব বৈশিষ্ট্য ছিল। তাদের মধ্যে যেসব বাদশাহ আল্লাহভীরু ছিলেন যেমন মানসুর, নূরুদ্দীন, গিয়াসউদ্দীন, শামসুদ্দীন ইলতুত্‌মিশ এবং আওরঙ্গজিব (আলমগীর) (রঃ) প্রমুখ। তারা তো ইসলামী আচার-ব্যবহার এবং আদেশ-নিষেধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেনই, কিন্তু তাদের ব্যতীত ও যেসব বাদশাহ আনন্দ-উল্লাস ও স্ফূর্তিতে জীবন-যাপন করতেন, (সীমিত সংখ্যক ব্যতীত) তাঁরাও ইসলামী হুকুমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে কারো থেকে কম ছিলেন না। খলীফা-হারুনুর রশীদ দাসীদের আসরে বসে আনন্দ উল্লাসে মত্ত থাকলেও প্রতিরাত্রেই শত রাকাআতে নামায পড়তেন।

জাহাঙ্গীর নিজেই মদ্যপায়ী, যুলফীধারী ও মাথায় লম্বা চুলে আটক ছিলেন। কিন্তু তার রাজত্বে কারো শক্তি ছিল না যে, মুখ খুলে এই অপকর্ম সম্পর্কে কথা বলতে পারে। তার বিচারালয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিচারকার্য সম্পন্ন হতো। মসজিদসমূহ আবাদ ছিল।

স্থানে স্থানে ইসলামী মাদ্রাসা ও পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানে ছোট ছোট শিশুদেরকে ইসলামী শিক্ষায় প্রতিপালন করা হতো। উলামা ও মাশায়েখগণ শান্তিতে ইসলামের সেবা কার্য সম্পাদন করতে ছিলেন। সমাজে অন্যায় কাজ সাধারণভাবে চলতে পারতো না। মুসলমানগণ স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করতে পারতেন। কোন মুসলমান কোন অমুসলমাসের দাস ছিল না। এমনকি সম্ভবতঃ কারো হয়ত এমন ধারণা ও ছিল না যে, মুসলমান কোন অমুসলিম রাজত্বে শাসিত হয়ে থাকতে পারে। এ কারণেই হয়তঃ ফিকাহ্‌র কিতাবসমূহে সর্বপ্রকার বিষয়ের অধ্যায় বর্ণিত হলেও এ বিষয়ে কোন পৃথক অধ্যায় নেই যে, কোটি কোটি মুসলমান যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন বিজাতি কর্তৃক শাসিত হয়, তখন তারা কিভাবে জীবন-যাপন করবে ? তদুপরি এ বিষয়ে ও একটু ভেবে দেখুন যে, 'কারামাতা' এবং 'বাতেনিয়া' এব মত বিরাট বিভ্রান্ত দল ও ইসলামে সৃষ্টি হয়েছে, তাদের মুলোৎপাটন কে করল ? এতে সন্দেহ নেই যে, সম্মানিত আলিমগণ বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে এদের মুকাবিলা করেছিলেন। কিন্তু যদি ইসলামী রাষ্ট্রীয় শক্তি এর পশ্চাতে সাহায্যকারী না হতো, তবে কি এই সব বিভ্রান্তিমূলক ঝগড়া-ফাসাদের নিষ্পত্তি হতো ? তৎপর এটাও একটি সত্য যে, মুসলমান বাদশাহগণ যে সব দেশ জয় করেছেন, এতে তাঁদের উদ্দেশ্য যাই হউক না কেন, সর্বাবস্থায় এই সব বিজয়ের কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় সুফল একেবারে স্পষ্ট। তন্মধ্যে একটি হল ইসলাম ধর্ম কার্যকরী পদ্ধতিতে প্রসার লাভ করেছে। আরবী ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ইসলামী জীবন পদ্ধতি ও সাংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী চালু হয়েছে। এই এসব কিছুই হয়েছে শুধু মুসলমানদের নিজস্ব রাজত্ব ছিল বলে।

উপসংহার

মুসলমানদের উত্থান ও পতনের যে মিশ্র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আপনি শুনলেন, এতে অনুমান করা যাবে যে, যতক্ষণ মুসলমানগণ ইসলামী আইন-কানুনের উপর চলে ছিলেন, ততক্ষণ তাঁরা উন্নতি করছিলেন। কিন্তু যখনই তাদের মধ্যে ইসলামী সঞ্জীবনী শক্তির দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল, তখনই

তাঁদের মাঝে অধঃপতন সৃষ্টি হতে এই অধঃগতি এমন ছিল যে, প্রতিরোধ হবার ছিল না, বরং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিই পাচ্ছিল। প্রত্যেক অপরাধেরই একটি বৈশিষ্ট্য আছে। অতি দ্রুতগতিতেই হউক কিংবা ধীরগতিতেই হউক এর কুফল অন্যায়কারীর উপর পতিত হবেই। একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় অপরাধ হল রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাচারিতা, প্রজাগণের প্রতি বে-পরওয়া ভাব, রাজ্যের আয়কে শাসকের বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশের উপর খরচ করাকে নিজের অধিকার মনে করা। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া। যখন কোন শাসকের মধ্যে উল্লিখিত অপরাধসমূহ প্রকাশ পায় তিনি মুসলমান হউন কিংবা অমুসলমানই হউন, এই সব অপরাধে তিনি যতটুকু লিপ্ত হবেন, সেই অনুপাতেই নিজের মৃত্যু ডেকে আনবেন। একজন শাসক ব্যক্তিগত বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশের মধ্যে যদি অন্যায় অবিচারে ও লিপ্ত থাকেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি রাষ্ট্রীয় আইন শৃংখলার ব্যাপারে উদাসীন না থাকেন এবং প্রজাদের ব্যাপারে ন্যায়বিচার ও সুষম বন্টন ব্যবস্থা নিজের হাতছাড়া না করেন, তখন আল্লাহ্ হয়তঃ এমন শাসককে ক্ষমা করতে পারেন। ইতিহাসে এমন অনেক দৃষ্টান্তও রয়েছে। কিন্তু অবিচারী ও অত্যাচারী, স্বার্থপর ও স্বেচ্ছাচারী শাসককে কখনও ক্ষমা করা হয় না।

আমাদের ইতিহাস আমাদের ভাল-মন্দ যাবতীয় কর্মের স্বচ্ছ দর্পন। আমি স্বীকার করি যে, পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে ইসলামী রাষ্ট্র সমূহের উপর সমালোচনা করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কিছুটা স্পষ্ট ভাষায় কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এর উদ্দেশ্য অন্যদেরকে নিজেদের উপর উপহাসের সুযোগ দেয়া নয়, বরং বলার উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, আজ আমাদের উপর যে অধঃপতন চেপে বসেছে, তা নিঃসন্দেহে আমাদের অতীত অপকর্মেরই প্রতিফল। মহান দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলা তো এমন অত্যাচারী নন যে, তিনি নিজেই আমাদেরকে বিপদে নিপতিত করেছেন ? অতএব আমাদের কর্তব্য হল যে, আমরা যেন আজ নিজেদের অতীত ইতিহাসে কৃত অপকর্মের খতিয়ান মিলিয়ে দেখি। কেননা কোন মুসলিম রাষ্ট্রের অপরাধ শুধু এককভাবে রাষ্ট্র বা সরকারের নয়, বরং এই অপরাধ সমগ্র জাতির। নিজেদের অপকর্মের

হিসেব নেয়ার পর আল্লাহ্‌র দরবারে এই সব অপকর্মের জন্য কায়মনোবাক্যে 'তাওবা' করা চাই এবং ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করা চাই যে, আমরা ভবিষ্যতে কখনও সেরূপ কোন অপরাধে আর লিপ্ত হবো না। আমাদের উচিত হবে আমরা যেন অধঃপতিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত জাতিকে উত্থান ও উন্নতির আবাসস্থলে রূপান্তরিত করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যাই।

আমাদের কর্মপন্থা আমাদের জন্য নির্ধারিত আছে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها — الخ

"এই জাতির শেষ পর্যন্ত সেই পথেই সংশোধন হবে, যে পথে এই জাতি প্রথমে সংশোধিত হয়েছিল"।

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا

تمت بالخير

ইফাবা. (উঃ)/৮৯-৯০/অঃ সঃ/৪১১৯-৩২৫০/৩০-৯-৮৯ ইং